শঙ্খচিলের ডানা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্খচিলের ডানা

একদিকে কালকাসুন্দের ঝোপ অন্যদিকে কাঁটানটের জঙ্গল, মাঝের একচিল্‌তে পথ দিয়ে ঘোল্‌সাপুকুরের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে শঙ্খ দেখল, ডানদিকের বাঁশঝাড় থেকে একখানা পেল্লাই জাওয়াবাঁশ আড় হয়ে ঝুঁকে আছে পথের ওপর। জাওয়াবাঁশের গাঁটে গাঁটে কঞ্চি। এহেন ঝুঁকে-পড়া বাঁশ এখন পেরুনো খুব মুশকিল। উমনো-ঝুমনোরা প্রায়ই বলে, এ হল বেঁশে-ভূতের কান্ড। যদি তুই বাঁশের তলা দে গুঁড়ি মেরে পার হতি যাস্, তাহলে বেঁশে-ভূত তোকে চেপে মেরি ফেলবে নির্ঘাতি। আর যদি বাঁশের ওপর দে ডিঙিয়ে পার হতি যাস্, অমনি বাঁশগাছটা তোকে সুদ্ধ খে হয়ে উঠে যাবে সেই মগডালের কাছে। তারপর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিযে ফেলাই দেবে কোন তেপান্তর মুল্লুকে কে জানে।

কথাটা মনে হতেই দৃশ্যটার সামনে এক লহমা নিথর হয়ে থাকল শঙ্খ। শিরিয়ে উঠল শরীরের ভেতরটা। সঙ্গে সঙ্গে দিক বদ্‌লালো। অনেক ঘুরেঘেরে খেজুর বাগানের ভেতর দিয়ে পার হয়ে গেল জায়গাটা। তাতে চান করতে যেতে একটু দেরিই হয়ে গেল তার।

অথচ তার আজ ভারী তাড়া। ঘোল্‌সাপুকুরের ঠাণ্ডা কনকনে জলে ধাঁ ধাঁ করে চারটে ডুব দিয়েই উঠে পড়ল দ্রুত। জলে ঝাঁপাই জোড়ার একটু উপায় নেই এখন, ফুরসতও নেই আজ। একেই তো অঘ্রানের শীতরাত ঘোল্‌সাপুকুরের জলে যেন বরফ চুবিয়ে রেখেছে, বেলা সাড়ে নটা বাজতে চলেছে অথচ এখনও জলে গা ডুবোলে শরীরে হাড়হিম কাঁপ ধরে যাচ্ছে, তার উপর আজ তাদের ইস্কুলে রেজাল্ট আউট। হাপিসটিপিস করছে তার বুকের ভেতর। হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার পর এই তার প্রথম অ্যানুয়াল, কী রেজাল্ট হয় কে জানে। ঠাকুর্দা তাকে বলেছেন, সামনে ঘোর দুর্দিন আসছে, ফার্স্ট হতিই হবে কিন্তু। কথাটা ভাবতে গিয়ে শরীরে আরও কাঁপ ধরে আসছে তার। কিনারে উঠে ভিজেগায়েই বেঁশে-ভূতের নাগাল এড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুট লাগাল বাড়িমুখো।

শঙ্খদের বাস্তুর পশ্চিমপ্রান্তে এই বাঁশঝাড়, পুকুর—সবই গাঁয়ের গেরমানি মানুষ আনন্দ চাটুজ্জের। ডাইনে বাঁশঝাড় বাঁয়ে খেজুরবাগান, তার মাঝ-বরাবর এই সরু চিল্‌তে-পথ এসে মিশেছে ঘোলসাপুকুরে। সে-পথ দিয়ে ছুটতে গেলে পায়ে বিঁধে যায় নটেকাঁটা, গায়ে আঁচড় বোলায় কালকাসুন্দে। ঝোপজঙ্গল যা হয়েছে এখন, আনন্দ চাটুজ্জে মুনিশ লাগিয়ে পরিষ্কার না করালে ঘোলসাপুকুরে চান করতে আসাই যাবে না ক'দিন পর।

ঘোল্‌সাপুকুরের ঠিক বগল ঘেঁষে পুব থেকে পশ্চিমে বওনা দিয়েছে সরু খাল মরাসোঁতা। মরাসোঁতার পুবপ্রান্ত জোড়া আছে ইছামতীর সঙ্গে, ইছামতীতে জোয়ার এলে মরাসোঁতার ছিপছিপে শরীরেও জল ঢুকে আসে। ঘোল্‌সাপুকুরের কোনও একটা ঘোগ দিয়ে সে-জল আবার ঢুকে পড়ে পুকুরের ভেতর। ভাঁটায় আবার ফিরে যায় সে-জল। ইছামতী বরাবর ফিরে যায় হয়তো সমুদ্দুরেই। সমুদ্দুরেই, কেননা ভর শীতকাল ঘোল্‌সাপুকুরের জল হাকুচ্‌-নোনতা।

মরাসোঁতা কিংবা, ইছামতীর জলেও এখন এমনই নুন। চান করতে গিয়ে দু-এক ঢোক জল গালে গেলে—

ঠাকুর্দা কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বলেন, এখন কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় কে জানে। ঘোল্‌সাপুকুরে চান করতে গিয়ে কথাটা প্রায়ই মনে হয় শঙ্খর। সেই সমুদ্দুরের জল কিনা এসে ঠেক্ খায় ঘোল্‌সাপুকুরে! রগড়টা কম নয়।

একছুট্টে তাদের বাড়ির উঠোনে ঢুকতে গিয়েই ফের থেমে দাঁড়াল শঙ্খ, ভিজে গা, তার পরনের লাল গামছাটা থেকে টুপিয়ে টুপিয়ে জল ঝরছে। সে জলে তকতকে নিকোনো উঠোন ভেজালে তার ঠাক্‌মা এসে হৈ-রৈ শুরু করে দেবে এক্ষুনি। উঠোন নিকোনো হয়েছে কেননা আজ কুলুই চণ্ডীর ব্রত। বারোটা মাসই ঠাম্মার কোনও না কোনও ব্রত থাকে। পাড়ার মেয়ে-বৌদের ডেকেডুকে নিয়ে এসে ফি-মাসে ব্রতের আসর বসাবে সারাদিন ধরে। পুজোয়াচ্চা সেরে বেশ ফলাও করে শোনাতে বসবে ব্রতকথা। কখনও নীল ষষ্ঠীর ব্রত, কখনও যমপুকুর ব্রত, কখনও চাপ্‌ড়াষষ্ঠীর বা লোটন ষষ্ঠীর, কখনও সাবিত্রী চতুদর্শীর বা অনন্ত চতুদর্শীর, কখনও নাটাই চণ্ডীর, কখনও বা জয়মঙ্গলবার, আবার এখন সারা অঘ্রানমাস জুড়ে ইতুর ব্রত তো আছেই। ঠাকুর্দা প্রায়ই বলেন, তোমার বেরতোর খরচ জোগাতি জোগাতি সর্বস্বান্ত হব একদিন—

কিন্তু বেশ গুছিয়ে গল্প বলতে পারে ঠাক্‌মা। শঙ্খকে রোজ রাতে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে আজ কতকাল ধরে রূপকথার গল্প শোনাচ্ছে। লালকমল-নীলকমলের গল্প, দুধকুমারের গল্প, রাজপুত্রের রাজকন্যা-উদ্ধারের গল্প, এমন আরও কত কত। রোজ নতুন গল্প চাই শঙ্খর। দারুণ রোমহর্ষক সব কাহিনী না শুনলে তার চোখের পাতা জুড়ে আসতে চায় না। তেমনি পাড়ার মেয়ে-বৌদেরও শোনায় রকমারি ব্রতের কাহিনী। সে কত-না-কত দেবদেবীর মাহাত্মবর্নন। শুনতে শুনতে শঙ্খরও মুখস্থ হয়ে গেছে বারোমাসে তেরপার্বনের আশ্চর্য সব কাহিনী, সে-সব গল্পে দুঃখীর দুঃখহরণ হয়, নির্ধনের ধন হয়, অপুত্রের পুত্র হয়। তাতে কত সওদাগর নৌকো নিয়ে বাণিজ্যে রওনা হয়, কত দৈব দুর্বিপাকে পড়ে, ফের দেবীর কৃপায় তাদের ধনলাভ হয়, রাজ্যলাভ হয়। শঙ্খ সে-সব মন দিয়ে শোনে, আর অবিশ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে এটা-ওটা। তার মনে উথাল দিয়ে ওঠে হাজারো সব প্রশ্ন। সে-সব গল্পে তার মনে জন্ম হয় অজস্র সব 'কেন'র, সে প্রশ্ন তীরের মতো আছড়ে পড়ে ঠাক্‌মার ওপর।

কখনও জিজ্ঞাসা করে, এত সব ব্রতকথা সব কি সত্যি, ঠাম্মা?

—সত্যি নিশ্চয়, না হলি আর বইএ লেখা হল কী করে?

শঙ্খ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে, কিছু যেন ভাবে, তারপর আবার বলে, তুমি যে এতসব ব্রত করো, তাতে কী হয়, ঠাম্মা?

—ব্রত করলি পুণ্যি হয়।

শঙ্খর পরবর্তী প্রশ্ন, তা'লি শুধু মেয়েছেলেরা ব্রত করে কেন? ব্যাটাছেলেদের পুণ্যি লাগে না?

প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে ঠাক্‌মা কখনও রেগে ওঠে, আবার কখনও বলে, মেয়েছেলেদের পুণ্যি হলি তার বাতাস ব্যাটাছেলেদেরও গায়ে লাগে।

শঙ্খর তবু প্রত্যয় হয় না, কথাটা নিজের মনে অনেকক্ষণ ঢালা-উপুড় করে, ফের প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, কী করে বাতাস লাগে, ঠাম্মা?

ঠাক্‌মা তখন সত্যি-সত্যি রেগে যায়, বলে, সবসময় তক্কো করতি নেই। তক্কো মানেই

সেজবাবুর লা আর ন'বাবুর লা।

পরক্ষণেই শঙ্খ জিজ্ঞাসা করে, সেজবাবুর লা আর ন'বাবুর লা কী, ঠাম্মা?

ঠাক্‌মা তখন আবার সাতকাহন গল্প শোনাতে বসে। সেই ওপার বাংলায় গাঙের ধারে ঘর ছিল তাঁদের। ঘরের পাশেই খেজুর-গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটলা। সেখানে একটা বাহারি নৌকো নোঙর করা দেখে পাড়ার মুখুজ্জেবাড়ির দু'ভায়ে তক্কো জুড়ে দিল। একজন বলল, এটা সেজবাবুর লা। অন্যজন প্রতিবাদ করে বলল, উঁহু, এটা ন'বাবুর লা। প্রথমজন তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়জনকে দাবিয়ে দিয়ে বলল, তুই বেশি জানিস্? এটা সেজবাবুর লা। অন্যজন রুখে উঠে বলল, তুই ঘোড়ার কচু জানিস্। এটা ন'বাবুর লা।

তা এই সেজবাবুর-লা আর ন'বাবুর-লা বলতে বলতে প্রথমে তক্কো, তারপর ঝগড়া, তারপর মারামারি, তারপর রক্তারক্তি। শেষে কোর্ট-কাছারি হল। মামলা করতে করতে ফতুর হয়ে গেল দু'ভাই, আর যাদের নৌকো, জমিদারবাড়ির সেই সেজবাবু ন'বাবু জানতেই পারলেন না তাদের বাড়ির নৌকোর জন্য সর্বস্বান্ত হয়ে গেল মুখুজ্জেবাড়ির ভাইরা। তর্কের এই হল পরিণাম।

ঠাক্‌মার গল্পগুলো এমনি সব মজার। একবার বলেছিল সেই বুড়োর গল্প। ছেলেমেয়ে নিয়ে গয়নার নৌকোয় বাড়ি ফিরতে গিয়ে কালবোশেখির তুমুল ঝড় উঠল। যাত্রীবোঝাই নৌকো ডুবে যায় আর কি। বাড়ির ঘাট আসতেই বুড়ো তড়িঘড়ি ডাঙায় নেমে বলল, নেড়ি, নেমিছিস? খেন্তি, নেমিছিস? হোই বগ্‌লা, নেমিছিস? ছেলেমেয়েরা সব নেমে এসেছে শুনে বুড়ো নিশ্চিন্ত হল। তারপর যাত্রীবোঝাই নৌকোর দিকে তাকিয়ে উল্লসিতকণ্ঠে বলে উঠল, যা রে লা, এবার তুই ডুবে যা—

এহেন ঠাকমার কাছ থেকে ব্রতের নানান কাহিনী শুনতেও এক রোমাঞ্চ। এই যেমন অঘ্রানমাসের দিন পড়তেই উঠোন জুড়ে কুলুই মঙ্গলচণ্ডীর আয়োজন করেছে ঠাক্‌মা। কাল থেকেই গোছগাছ চলছিল, আজ ভোর থেকে জেলেবাড়ির আন্না-বৌ এসে গোবরজল দিয়ে নিকিয়েছে মস্ত উঠোনটা। নিকোনো উঠোনের ঠিক মাঝখানে পোতা একটা কুলগাছের ঝাঁকড়া ডাল। তার চারপাশে পিটুলিগোলার চমৎকার ফুল-ফুল আলপনা। তার উপর বসানো আলপনা-আঁকা ঘট, তার সঙ্গে ফুল, দুব্বো, ধূপ, দীপ দিয়ে সাজানো হয়েছে পুজোর উপাচার, একপাশে আতপচালের নৈবেদ্য। তার ওদিকে জোড়া কলা, জোড়া কুল, চিঁড়ে, মিষ্টি, পাটালি দিয়ে ধান-দুব্বোর অর্ঘ্য।

ঠাকমা বলেছিল বটে, আজ কুলুই মঙ্গলবার। ইস্কুল থিকে সকাল-সকাল রেজাল্ নে চলে আসিস। আমাদের সঙ্গে ফলার খাবি—

সে-কথা এইমুহূর্তে শঙ্খর মনে পড়তেই হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল। সে এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে, আজ সে ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে উঠবে। এখন কি আর পাড়ার মেয়ে-বৌদের সঙ্গে একজোট হয়ে উঠোনে পাত্ পেড়ে বসে চিঁড়ে-কলা, পাটালি দিয়ে মেখে ফলার খাওয়া যায়!

ভাবনাটা একলহমা ভেবেই পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে হাঁক ছাড়ল, ঠাম্মা, ভাত—

ইস্কুলে যাওয়ার মুহূর্তে প্রতিদিনই এমন একটু তাড়াহুড়ো থাকে শঙ্খর। তাদের মাদারীপুর হাইস্কুলে ঠিক এগারটায় প্রেয়ারের ঘন্টা বাজে। তার অন্তত আধঘন্টা আগে তাকে ইস্কুলে পৌঁছতে হয়, পৌঁছতে না পারলে তাদের ক্লাসে ফার্স্টবেঞ্চে বসার জায়গা পাওয়া যায় না। সে প্রায় রোজই আগেভাগে ক্লাসে ঢুকে দখল করে নেয় প্রথম সিটটা। দৈবাৎ কোন দিন ফার্স্ট বেঞ্চে না বসতে পারলে মনে হয় সেদিন স্কুলে আসাটাই বৃথা। পেছনের বেঞ্চ থেকে

মাস্টারমশাইদের পড়া ঠিকঠাক বোঝা যায় না। ব্লাকবোর্ডের লেখাও মনে হয় অস্পষ্ট।

আজ অবশ্য ক্লাস নেই, তবু একইরকম তাড়াহুড়ো করছিল শঙ্খ। আজ একটা শিরশিরে হাওয়া তার শরীরের রোমকূপ ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়ে তুলছে যেন, কেন যেন ঘনঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ভাত খেতে বসেও সেই উৎকণ্ঠা ঘিরে ধরছে সর্বশরীর। আজ তার জীবনে একটা অন্যরকম দিন। আজ রেজাল্ট-আউট।

অথচ পাঠশালা ছেড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হল এই তো সেদিন। খড়ের চালওলা পাঠশালা ছেড়ে যেদিন সে প্রথম তাদের ঈশ্বরীপুর গাঁ থেকে দু-মাইল পথ হেঁটে গিয়ে হাইস্কুলের ফার্স্টবেঞ্চে বইখাতার ব্যাগটা রেখেছিল সেদিনও তার বুক জুড়ে ছিল এমনই হাপিসটিপিস। নিঃশ্বাস এমনই ঘন আব ভারী, দেখার চোখও হঠাৎ অন্যবকম হয়ে গিয়েছিল। যেন সে একলাফে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। হাঁটার চলনও অনেক দ্রুত চালে। বইখাতার ব্যাগটিও আগের চেয়ে ভারী। প্রাথমিক নয়, তখন সে হাইস্কুলের ছাত্র। মোটা-মোটা বই। অনেক খাতা। ভারী গম্ভীর আর বাশভারী তাদের হেডমাস্টারমশাই, মাস্টারমশাইরাও সবাই নিশ্চয় কড়াধাতেব। হয়তো সবসময় বেতের ছপ্‌টি উঁচিয়ে থাকেন। প্রথম-প্রথম মাস্টারমশাইদের সামনে কথা বলতে গেলে তার জিব জড়িয়ে যেত। শুকিয়ে যেত গলার স্বর। মনে হতো যদি ভুল হয়ে যায়! এমন অনেকদিন হয়েছে, মাস্টারমশাই হয়তো জিজ্ঞাসা করেছেন কোনও প্রশ্ন, বলো তো——। কে বলতে পার? শঙ্খ উত্তর জেনেও চুপচাপ বসে থেকেছে। বলতে সাহস পায়নি। যদি ভুল হয়ে যায়! ভুল হলে যদি——

দেখতে দেখতে একটা বছর পার হয়ে গেল। কখন যে পার হয়ে গেল সে বুঝতেই পারল না। গোটা একটা বছর এমন একটা আলো-আঁধারি ঘোর। স্বপ্নের রেলগাড়ি চড়ে একটা গোলাপি-গোলাপি ভালো-লাগার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এসে আজ তাদের ক্লাসে ওঠাউঠি। তার বাবা সেই সাগরদ' থেকে চিঠি লিখেছেন, শঙ্খ নিশ্চয় খুব ভালো ফল করবে। ফল বেরুলেই যেন সে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়। কিসে কত পেল তা-ও।

সাগরদ' শঙ্খদের এই ঈশ্বরীপুর থেকে ঢের-ঢের দূরে। সেই এক্কেবারে বর্ডারের কাছে। ঈশ্ববীপুর থেকে দু-দুটো বাস বদল করে পৌঁছতে হয় তেঁতুলিয়া ঘাট। একটা মস্ত লকগেট আছে সেখানে। ঘাটে বাঁধা থাকে সারসার গয়নার নৌকো। সেখান থেকে টলটলে স্বচ্ছ জলের সোনাই নদী বরাবর পাড়ি দিতে হয় একবেলার জলপথ।

শঙ্খর বাবা এর আগে থাকতেন মউগাঁ নামের একটা গাঁয়ে। আসলে জায়গাটার নাম মৌগ্রাম। সেখানে কয়েকবার শঙ্খ ঘুরে এসেছে। এখন মউগাঁ থেকে বাসা তুলে দিয়ে নতুন বাসাবাড়ি করেছেন সাগরদ'য়। সেখানে এখনও একবারও যায়নি সে। সেখানে তার মা, আর দুইবোন টুয়া আর বিন্নি থাকে। শঙ্খর ইস্কুলের ছুটি পড়লে কখনও তার বাবা এসে নিয়ে যেতেন মৌগ্রামে। গরমের ছুটিতে কিংবা পুজোর ছুটিতে। কখনও অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর। ছুটির পরে পরে কোনও পরীক্ষা থাকলে তার ঠাকুর্দা অবশ্য বারণ করে দেন, এখন নে যেতি হবে না। আগে পরীক্ষা, তারপর বেড়ানো। সে বছর তার আর বাবা-মা'র কাছে বেড়াতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। এবারও তো কতদিন হল ওরা সাগরদ'য় গেছে, কিন্তু সে যেতে পারেনি। যাবেই বা কী করে। এবার তো পুজোর ছুটির পরই পরীক্ষা ছিল। অ্যানুয়াল——

কখনও বাবা আবার মা-বোনদের সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন ঈশ্বরীপুরে। তবে সেও ক্বচিৎ-ক্বদাচিৎ। যখন আসতে পারেন না, তখন চিঠি লেখেন। যেমন এবারও লিখেছেন, শঙ্খ নিশ্চয়ই ভালো রেজাল্ট করবে। প্রতিবছরই ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে এসেছে সে। রেজাল্ট-আউটের দিন তাদের

পাঠশালার হেডমাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই তার নাম ডাকতেন। বলতেন, প্রথম হয়েছে শঙ্খ চ্যাটার্জী। এবার শঙ্খ বুঝে উঠতে পারছে না, তার রেজাল্ট ভালো হবে কি না। পাঠশালা মানে একটা ছোট্ট খাল, অনেকটা মরাসোঁতার মতোন। হাইস্কুল হচ্ছে ইছামতীর মতো একটা বড় গাঙ্। অনেক মরাসোঁতা এসে মিশেছে হাইস্কুলে। এখানে অনেক ছাত্র, অনেক বড় একটা ব্যাপার। শুধু তাদের ক্লাস ফাইভেই ছিল তিনটে সেকশন। আশপাশের আরও পনের-বিশটা পাঠশালা থেকে ছাত্র এসে ভিড় করেছে হাইস্কুলে। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম হওয়া ছাত্র। অনেক-অনেক ভালো ছেলে একসঙ্গে পড়ছে তাদের ক্লাসে। তাদের সবাইকে টপকে, সব ভালোছেলেদেব হারিয়ে হাইস্কুলে স্ট্যান্ড করাটা ভারী শক্ত কাজ।

হয়তো সে জন্যেই সকাল থেকে তাব বুকের ভেতর একধরনেব হিমকাঁপ, ঘোল্‌সাপুকুরের কনকনে ঠান্ডা জলে ডুব দেওয়ার পর সেই কাঁপ আরও ঘন, আরও হিম হযে জড়িয়ে রয়েছে তার একরত্তি গায়ে।

এবারের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর তার ঠাকুর্দা তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী রে, ফার্স্ট হতে পারবি তো? শঙ্খ একবুক ভয় নিয়ে তাকিয়ে ছিল বয়স্ক মানুষটার দিকে। প্রায় ষাটেব কাছাকাছি বয়স ঠাকুর্দার। মুখের চামড়ায় কোঁচ, চোখে কেমন ভাসা-ভাসা চাউনি। পূব-বাংলা থেকে এপারে আসার পর এক নিরন্তর অভাবের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন দাঁতে দাঁত চেপে। বলেছিল, ফার্স্ট না হতি পারি, অন্তত সেকেন্ড বা থার্ড হব। প্রথম তিনজনের মধ্যে একজন।

বলেছিল বটে, কিন্তু বুকের গহনে সংশয় ছিল। এখন ভাতের থালায় গুমড়ি খেয়ে পড়ার পর সেই সংশয় ফণা বিস্তার করছে ক্রমশ। কোনও ক্রমে নাকে মুখে দুটো গুঁজে ঝপ করে উঠে দাঁড়াল। ঘড়িতে বোধ হয় দশটা বাজল এতক্ষণে। ওদিকে বাড়িব ভেতরেব কামবা থেকে রনোকাকার পড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। রনোকাকা বরাবর গুনগুন করে পড়ে, আজ একটু জোরেই পড়ছে। আব তিনমাস পবে রনোকাকার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। হযতো তাইই চেঁচিয়ে পড়ছে। কিন্তু মণিকাকাকে কোথাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন! মণিকাকাও তো ইস্কুলে যাবে। এবার ক্লাস এইটে উঠবে মণিকাকা। এদিক-ওদিক তাকিয়ে তাকে কোথাও দেখতে পেল না। বোধহয় একটু দেরি করে যাবে। মণিকাকা তো বরাবর শঙ্খর চেয়ে একটু দেরি করেই ইস্কুলে যায়।

জামা-প্যান্ট পরে প্রস্তুত হয়ে শঙ্খ প্রথমেই ঢুকে পড়ল তাদের ঠাকুবঘরে। টুকটুক করে সব কটা ঠাকুরকে হাতজোড় করে চোখ বুজিয়ে পেন্নাম সেরে নিল দ্রুত। একবার আলাদা কবে মা সরস্বতীকেও। সামনের মাসেই সরস্বতী পুজো। যদি রেজাল্ট ভালো হয তাহলে সে এবার কিছুতেই সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাবে না। এমনকি উমনো-ঝুমনোদের বাড়ির উঠোনে ঝাঁকড়া বিলিতি কুলগাছটার টোপা-টোপা পাকা কুলও নয়। মা কালীর দিব্যি, না। মা সরস্বতীর দিব্যি, না।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে ঠাক্‌মাকে পেন্নাম করতেই মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল ঠাক্‌মা, রেজাল নে সকাল-সকাল ফিরিস। আজ দুপুরে ফলার।

শঙ্খর মগজে এখন আর কুলুই মঙ্গলবারের ফলার-টলার কিছু নেই। শুধু ঘাই দিয়ে উঠছে রেজাল্টশীটের ভাবী চেহারাখানা। ধারাপাতের কয়েকটা সংখ্যা লেখা থাকবে কাগজখানায়। সেই সংখ্যাগুলোই এখন শঙ্খর জীবনের সর্বস্ব। তার উপরই ভাগ্য নির্ভর।

একটু আগেই পুকুর থেকে চান করে এসেছে ঠাক্‌মা। ভিজে কাপড়ে ঘুরঘুর করছে একবাব

ঘরে একবার বাইরে। সে হেসে বলল, আগে রেজাল পাই তো, ঠাম্মা।

সেসময় হঠাৎ চমক ভাঙল, পাশেই ছোটঠাকুর্দার বাড়ি থেকে ভেসে আসা মন্টার টিয়াটার কথায়, কে যায়, কে যায়।

শঙ্খ সে-ডাক শুনে হাসল, মনে মনে বলল, শঙ্খ যায়, শঙ্খ যায়, শঙ্খ রেজাল্ট আনতে যায়।

ছোট্‌ঠাকুর্দার ছোটছেলে মন্টা শঙ্খর সঙ্গেই পড়ত। সে নাকি ‹খে যাচ্ছে খুব, তাই ছোটঠাকুর্দা তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তার মাসির বাড়িতে। কলকাতার কাছেই কোথাও। মন্টা অনেকদিন ঈশ্বরীপুরে আসেনি। এখন তার টিয়াকে ছাতু-জল-খাওয়ায় মন্টার দিদি খুশিপিসি। টিয়াটা তবু অহরহ ডেকে চলে মন্টা, মন্টা রে—

নিকোনো উঠোনেব পাশে এতক্ষণ ঘুরঘুর করছিল জেলেবাড়ির আন্নাবৌ। হঠাৎ দূর থেকে তার নজরে পড়ল মাথায় ঘোমটা দিয়ে টুকটুক করে হেঁটে আসছে পল্টনের মা রোহিনীমাসি। তাকে দেখতে পেয়ে আন্নাবৌ বলল, এই যে এয়ে পড়েছ, মাসি। তুমরা না এলি পুজো আরম্ভ হতি পারছে না।

রোহিনীমাসির নাম অবশ্য রোহিনী নয়, অন্য কিছু। সে নাম এ তল্লাটের মানুষ মনে করতে পারে না। তাঁর স্বামী রোহিনীনন্দন মুখুজ্জে থাকেন শঙ্খদের একটা বাড়ি পরেই। তাঁর নামটা কীভাবে যেন জুড়ে গেছে তাঁর দাপুটে স্ত্রীর সঙ্গে। রোহিনীমাসিকে এ তল্লাটের মানুয বেশ ভয় করে। অন্যের হাঁড়ির খবর টেনে বার করতে তাঁর জুড়ি নেই। মেয়েমহলে পা ছড়িয়ে বসে, তাঁর কাঁচাপাকা চুল এলো করে ছড়িয়ে দিয়ে সে-সব হাঁড়ির খবর রসালো করে পরিবেশন কবেন অন্য মেয়ে-বৌদের কাছে। আজ শঙ্খদের বাড়ি তাঁরও কুলুইচন্ডী ব্রতের নেমন্তন্ন। নিকোনো উঠোন এখনও ফাঁকা দেখে গালে হাত দিয়ে অবাক হলেন, কেউ আসিনি এখনও? ও মা, কী কান্ড। পাড়ার বৌ-ঝিদের সব হল কী?

আন্না-বৌ জবাব দিল, এই সব এয়ে পড়বে'খন। পুজোর জোগাড়যন্তর সব শেয। পাশের বাড়ির রাঙাখুড়িমা চান করতি গেছেন। তিনি এয়ে পড়লিই—

রোহিনীমাসি বললেন, তা'লি সব বোধায় চাড়ুজ্জেপাড়ায় গিইছে।

ততক্ষণে ভিজে-কাপড় পরা ঠাক্‌মার চেহারাখানা দেখতে পেয়েছে রোহিনীমাসি। তাঁকে দেখে ঠাক্‌মা বললেন, চাড়ুজ্জেপাড়ায় আবার কী হল?

রোহিনীমাসি চোখ কপালে তুলে বললেন, ও মা, তুমি খবরটা শোননি। চাড়ুজ্জেদের মেজতরফের বড়বৌএর যে আজ কলাগাছের সঙ্গে বে হচ্ছে—

ঠাক্‌মা সত্যিই অবাক হলেন, সে আবার কী।

—আর বলো কেন বৌদি। ওনার যে বছ্বর-বছ্বর বাচ্চা হয়েই চলেছে। এমন বছ্বর-বিয়োনি বৌ কেউ সাতজন্মে দ্যাকেনি। এই তো গতমাসেই একটা হল। এই নিয়ে সতেরটা—

—তাই বলে কলাগাছের সঙ্গে বে দিতি হবে?

রোহিনীমাসি তখন দু'হাতে একখানা তালি দিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লেন, তাই নে তো কী হাসাহাসি চলছে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়। উত্তরপাড়া থে ভট্‌চায্যিমশাই নাকি বিধান দেছেন, কলাগাছের সঙ্গে বে দিতি। তা'লি নাকি বিয়োনো বন্ধ হবে—

রোহিনীমাসির তীক্ষ্ণ গলার স্বর যেন ছুঁচ হয়ে বিঁধছিল শঙ্খর কানে। রনোকাকারা আড়ালে-আবডালে রোহিনীমাসির নামকরণ করেছে পাঁচাদার বলে। এমন রসালো পাঁচা করেন বলে পাড়ার বৌ-ঝিরা তার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে শোনে। শঙ্খ কথাগুলো না শোনারই চেষ্টা

করছিল। এ সব কথা তার মনে হল অযাত্রা। এই সব ভালো-ভালো দিনে, শুভকাজে বেরুবার মুখে অযাত্রা-কথা শোনা খুব খারাপ। যেমন কচ্ছপ দেখা, কিংবা কচ্ছপের কথা ভাবাও খুব খারাপ। ইস্, এই মুহূর্তে কচ্ছপের কথাটা হঠাৎ কেন যে তার মনে পড়ে গেল, রেজাল্ট-আউটের দিনে!

আসলে কয়েকদিন আগে ইছামতীর চরে একটা বিশাল কচ্ছপ দেখেছে সে। কচ্ছপটা নরম মাটির ওপর বসে জিরোচ্ছিল। দুপুরের গনগনে রোদ পড়ে ইছামতীর বিস্তীর্ণ চর তখন রূপোর মতো চকচক করছিল। তার ওপর সারাপিঠে চৌকো চৌকো ঘর-কাটা অদ্ভুতদর্শন কচ্ছপটা ঝুম হয়ে ছিল বহুক্ষণ। শঙ্খ দু-চারবার ঢিল মেরেও তার সাড় ফেরাতে পারেনি। যেন রোদে পিঠ ফিরিয়ে বসে সে শীতের তাপ শুষে নিচ্ছিল পরম আরামে। ভারী সুন্দর লেগেছিল দৃশ্যটা। কিন্তু এখন কেন যে স্মরণে সে-কথা উদয় হল তার!

দাওয়া থেকে নেমে একবার তাকালো নিকোনো উঠোনের মাঝখানে বেশ যত্ন করে পোতা ঝাঁকড়া কুলগাছটার ডালের দিকে। হাত জোড় করে মাথা নুইয়ে কুলুইচণ্ডীকে স্মরণ করল কিছুক্ষণ। সামনেই রোহিনীমাসিকে দেখে তাকেও ঝুপ করে একটা পেন্নাম সেরে নিল। পরীক্ষার দিনে কিংবা রেজাল্ট-আউটের দিনে সামনে গুরুজন কাউকে দেখলে পেন্নাম করাটাই রেওয়াজ। তারপর বাড়ির চৌহদ্দি পার হয়ে পথে পা দিতেই একটা বড় করে নিঃশ্বাস নিল। পুরো ফুসফুস জুড়ে। পরক্ষণেই তাকাল পাশেই মস্ত শিউলিগাছটার ডালে বসা একটা লেজ-ঝোলা ফিঙের দিকে। কী লম্বা লেজ! কী বাহারি রং! এভাবে তারিফ করল মনে মনে। তারিফ করে খুশি হল। তারপর পথে বেরিয়ে হনহন করে হেঁটে চলল মেটেপথ বরাবর।

ডাইনের ফাঁকা জমিতে এবারে মসুর বুনেছে মৈনুদ্দি। তার ওপাশে ঝুপসি ক'টা আমগাছ। দূর থেকেই এখন স্পষ্ট বোঝা যায় বোল ধরেছে তার ডালে-ডালে। কিন্তু সে সব এখন নিরিখ করে দেখার সময় নেই শঙ্খর। মেটেপথে বাঁক নিয়ে নদীর কাছাকাছি আসতেই একঝলক ঠান্ডা হাওয়া। ইছামতীর কনকনে জল ছুঁয়ে আসছে বলে অঘ্রানের শীত এখন সকাল সন্ধেয় হাড়ে কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে। হিমহাওয়ার দাপটে শিরশির করছে শরীর। গায়ে একটা সোয়েটার থাকলে ভালো হতো। দুপুরের দিকে রোদ থাকে বলে শঙ্খ আজ সোয়েটার গায়ে দেয়নি। না দেওয়ার অবশ্য একটা অন্য কারণও আছে। তার সোয়েটারটা ছিঁড়ে গিয়েছে ঠিক বগলের কাছে। হাত তুললেই ছেঁড়াটা দেখা যায়। ইস্কুলে তার বন্ধুরা—পার্থ, সুনীল, কিংবা মহাদেবের চোখে পড়লে বলে, কী রে, সোয়েটারে আবার জানলা রেখেছিস না কি রে, শঙ্খ?

আজ রেজাল্ট-আউটের দিন বলে তার প্রিয় সেই সবুজরঙের সোয়েটারটা পরেনি। এ দিন ইস্কুলের ফলাফল দেখতে আসেন অনেক গার্জেনরা। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও। হয়তো কলকাতা থেকে আসবেন ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট ভোলানাথ মুখার্জী। কিংবা হয়তো স্বয়ং ফাদারই এসে পৌঁছবেন তাঁর পেল্লাই মোটর সাইকেলে চড়ে গলায় ক্রশ ঝোলানো, পা পর্যন্ত-লুটোনো শাদা ধব্ধবে আলখাল্লা পরা ফাদারের চেহারাটা দেখতে ভারী ভালো লাগে তার।

নদীর সঙ্গে দেখা হতেই তার মনের ভেতর এক আশ্চর্য প্রশান্তি জেগে ওঠে। নদীর সঙ্গে তার কতকালের ভাব-ভালোবাসা। সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই। ইছামতীর ধার বরাবর চলতে চলতে অন্যদিন সে দু'দন্ড তাকিয়ে থাকে নদীর ছোট-ছোট ঢেউএর দিকে। দ্যাখে, এখন জোয়ার, না ভাঁটা। ভাঁটা হলে সারভাঁটা কি না। জোয়ার হলে পুরুনি হতে আর কত দেরি। কিন্তু আজ তার নদীর সে-সব রংঢং দেখার বিন্দুমাত্র অবসর নেই। আজ তার শরীর জুড়ে অন্য এক শিরানি। আজ সে আরও একটু বড় হয়ে উঠবে। ঠাকুর্দা বলেন, শঙ্খ হল স্বাধীনতার

বয়সী বালক। স্বাধীনতার সম-সম সময়ে তার জন্ম। এখন তার বয়স নয় পেরিয়ে দশের দিকে। ঠিক-ঠিক বলতে গেলে সাড়ে নয়। তার জন্ম হয়েছিল পুব-বাংলায়। হঠাৎ দেশবিভাগ হতে তার একরত্তি শরীরটা কাপড়ের পুঁটলিতে মুড়িয়ে তার ঠাকুর্দা সপরিবারে পাড়ি দিয়েছিলেন এই বাংলার দিকে। সে বড় হয়ে শুনেছে, কী অদ্ভুত সেই বর্ডার পেরুনোর অভিজ্ঞতা।

ইছামতীর ঠান্ডা হাওয়া বুকের ভেতর টানতে টানতে একঝলক হাসল শঙ্খ। নিজের মনেই। বাঁয়ে ইছামতী, ডাইনে শীতলাতলা রেখে সে এগুচ্ছে দ্রুতপায়ে। বাঁয়ে খেয়াঘাটের কোল ঘেঁষে যে বিশাল কদমগাছটার নীচে বসে তারা হাওয়া খায় সেদিকেও তাকালো না আজ।

শীতলাতলা পার হলে জেলেপাড়া। বাঁশের ভারায় সারসার শুকুতে দেওয়া রয়েছে কোনওটা মহাজাল,কোনওটা ফাঁদিজাল, কোনওটা বেগ্‌তিজাল। নীল নাইলন জাল দেখলে বারবার কেন যেন সমুদ্রের কথা মনে পড়ে তার। এই নাইলন জাল বিছিয়েই তো মাছমারারা সমুদ্দুরে গিয়ে মাছ ধরে। সে-সব গল্পগাছা কত কত তারা দল বেঁধে শুনেছে যজনবুড়োর কাছে। ভারী বগড়ের গল্প বলতে পারে জেলেপাড়ার যজনবুড়ো। সমুদ্দুরে মাছ মারার গল্প।

জেলেপাড়া শেষ হলে ডাইনে মস্ত পাঁচিল দেওয়া আনন্দ চাটুজ্জের বাড়ি। আনন্দ চাটুজ্জের পেল্লাই তিনতলা বাড়িখানা দু'দন্ড দাঁড়িয়ে দেখার মতো। বাড়ির বাইরেটা এত সুন্দর, ভেতরে আরও কত না সুন্দর কে জানে। শঙ্খর প্রায়ই মনে হয় বাড়িটার ভেতরে নিশ্চয় এক আশ্চর্য রূপকথার জগৎ আছে। সে রূপকথার পৃথিবী সে এখনও দেখেনি। দু'দুটো উড়ে দারোয়ান সারাক্ষণ লাল চোখ উঁচিয়ে আছে সে বাড়ির চারপাশে। ভেতরে ঢোকাই তো মানা। সে মস্ত তিনতলা বাড়ির পেছনে ঢাকা পড়ে গেছে গোটা চাটুজ্জেপাড়া। পাড়া নয় তো একটা গোটা গাঁ-ই যেন।

বাঁয়ে তখনও ইছামতী চলেছে, তবে একটু দূর দিয়ে। রাস্তা আর ইছামতীর মাঝখানে মস্ত একটা চর উঠেছে, বহুকাল আগে। এই চরজমি নাকি এককালে ইছামতীর মধ্যেই ছিল। এখন সে জমিতে সোনালি ধান হয়েছে। হয়তো চাষিরা ধান কাটতে নেমে পড়বে ক'দিনের মধ্যেই।

আর একটু পরেই বাঁয়ে আরও বাঁক নিয়ে ইছামতী চলে গেল দৃষ্টির বাইরে, ততক্ষণে ডাইনে বারোয়ারির মাঠ, তারপর চন্ডীমন্ডপ, আরও কিছুটা পর রক্ষেকালীতলা। তারও পর রানির দ'। কেউ বলে, রানিশায়র। রানিশায়রের জল ঠান্ডা, টলটলে, তার ঠিক কিনারে মস্ত বকুলগাছটার মগডালে তাকিয়ে দেখল, এখনও ফুল ধরেনি তাতে। শীতকাল পার হয়ে গ্রীষ্ম শুরু হলেই—

রনিশায়রের সামনে দাঁড়ালে রোজই তার মনটা কি জানি কেন কেমন উদাস কেমন ধু-ধু হয়ে যায়। এই মস্ত বড় শায়রটা বরাবরই তার ভারী প্রিয়, ভারী আদরের। রোজ ইস্কুলে যাওয়া-আসার পথে তারা সব বন্ধুরা মিলে রানিশায়রের কিনারে খানিকক্ষণ করে সময় কাটায়। দু-চোখ ভরে দ্যাখে শায়রের জলে ভেসে-থাকা পদ্মপাতার বাহার। ফুল থাকলে ফুল। সারে সারে লাল পদ্ম যখন শায়রময় ফুটে থাকে তখন রানিশায়র যে কী-ই মোহময় হয়ে ওঠে তা বলা যায় না। লালপদ্ম নয়, কোকনদ। শঙ্খদের বাংলা পড়ান যে পণ্ডিতমশাই তিনি বলেছেন। আরও বলেছেন, শ্বেতপদ্ম হল পুণ্ডরীক। নীলপদ্ম হল ইন্দিবর। শুদ্ধ সংস্কৃতে নাম বলতে ভারী পছন্দ করেন পন্ডিতমশাই। নীলপদ্ম নাকি দেখাই যায় না কখনও। সে নাকি পাওয়া যায় এক রূপকথার দেশে। রূপকথার লালকমল-নীলকমল নীলপদ্ম তুলে এনেছিল একশো আটটা। রানিশায়রের কাছে এলেই রূপকথার কথা মনে পড়ে যায় শঙ্খর।

এত সব ভাবতে ভাবতে শঙ্খ পৌঁছে গেল জেলারো-আপিসের মোড়ে। ধুলোট পথ পেরিয়ে এতক্ষণে দেখতে পাওয়া গেল পাকারাস্তা। ততক্ষণে ধুলোয় ভরে গেছে তার দু'পায়ের

গোড়ালি।

কিন্তু রাস্তাটা নামেই পাকা। আসলে হাড়গোড়-বেরুনো, খানাখন্দে ভরা। পিচ কবেই উঠে গেছে, ছড়িয়ে গেছে কুচো-খোয়াও। তবু পাকা তো! তার ওপর দিয়ে আরও একটু দ্রুত পা চালালো শঙ্খ। ইস্কুলে যাওয়ার সময় তার সর্বক্ষণই মনে হয়, এই বোধহয় দেরি হয়ে গেল। সে ইস্কুলে পৌঁছনোর আগেই হয়তো প্রেয়ারের ঘন্টা পড়ে যাবে। সে ইস্কুলে গিয়ে দেখতে পাবে, সব ক্লাস থেকে ছাত্ররা দল বেঁধে বেবিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এ-মুড়ো ও-মুড়ো ছড়ানো বারান্দায়। হাতদুটো জোড় করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারবদ্ধ হয়ে। হেডমাস্টারমশাই তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরগলায় প্রেয়ার পড়াচ্ছেন, দাউ গিভ আস্ ব্লেজিংস্, ও গড্...। কিন্তু ইস্কুলে গিয়ে দেখেছে, তার কোনও দিনই দেরি হয়নি। সে পৌঁছে গিয়েছে ঢের আগে।

তবু আজ সে দ্রুতই হাঁটছে অন্যদিনকার চেয়ে। হয়তো তার বুকের ভেতর একটা অন্যরকম ধুকপুকুনি আছে বলেই। চলতে চলতে হঠাৎ চমক ভাঙলো পেছনে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দে। তাকাতেই দেখতে পেল, হরিসাধনস্যার। ধবধবে ধুতি আর শাদা শার্ট পরে ইস্কুলের দিকে চলেছেন হরিসাধনবাবু। চোখে কালোরঙের ডাঁটিঅলা ভারী চশমা। কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। মুখ শক্ত পাথরের মতো। হরিসাধনস্যারকে বরাবর একটু সমীহ করে চলে ছাত্ররা। ভীষণ কড়াধাতের মানুষ। কখনও মনে হয়, হেডস্যারের চেয়েও রাগী। শঙ্খদের ক্লাসে অঙ্ক করান। যতক্ষণ ক্লাসে থাকেন, ছাত্রদের বুকের ভেতর থরহরিকম্প। শঙ্খর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হরিসাধনবাবু একবার কড়া চোখে তাকালেন তার দিকে। প্রায় কটমট করে। হরিসাধনস্যারের তাকানোটাই ওইরকম, তবু শঙ্খর মনে হল, যেন দু'চোখ দিয়ে ভর্ৎসনা করে গেলেন তাকে। কেন তা সে বুঝতে পারল না, তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল হঠাৎ।

একটা অদ্ভুত ভয়, অন্যমনস্কতা, ঘোরের ভেতর দিয়ে সে পার হয়ে যেতে লাগল পিঁচরাস্তা। খানিক পরেই বাজার, বাজারের পরে ডানদিকে বিশাল খোলা জায়গাটা, যেখানে সোম-শুক্রবারে ঈশ্বরীপুরের হাট বসে। তার একটু পরেই বাঁয়ে বাঁক নিলে বাসস্ট্যান্ড। তারপর শ্মশান। এখানকার লোকে বলে মহাশ্মশান। ঠিক শ্মশানের কাছটায় দু-দুটো বিশাল আমগাছ ঝুঁকে পড়ে আছে পথের ওপর। তার তলা দিয়ে যেতে বরাবরই গা শিরশির করে তার।

ঠিক ইস্কুলে ঢোকার মুখে দেখা হল তাদের ক্লাসের সুধীরের সঙ্গে. বেশ কাচা ইস্তিরিকরা জামা আর হাফপ্যান্ট পরে এসেছে, গলায় উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে ফার্স্ট হবে রে, শঙ্খ? কে ফার্স্ট হবে! পার্থ, মহাদেব, সুনীল, সুবোধ, সে—সবাইই তো এক-এক পাঠশালায় ফার্স্ট হতো। এবার কে? শঙ্খর বুকের ভেতরটায় ধক করে উঠল, তার চোখের সামনে একরাশ শূন্যতা। শুকনো মুখে বলল, আমি কী করে বলব?

ক্লাসরুমের ভেতর ঢুকতেই সে হঠাৎ অবাক। তাদের ইস্কুলটা বেশ লম্বা-ধরনের। তাতে টিনের পার্টিসন দিয়ে পর পর ক্লাসরুম। আজ সেই পার্টিসন সরিয়ে ফেলে একটা মস্ত হলঘর। তার একদিকে অনেকগুলো চেয়ার। চেয়ারের সামনে একখানা বড় টেবিল, তার উপর শাদা ধবধবে টেবিলক্লথ। টেবিলে রজনীগন্ধায় উপছে পড়ছে দুটো ফুলদানি।

টেবিলের অন্যদিকে সারসার বেঞ্চি সাজানো। তাতে ছাত্ররা এসে জায়গা নিচ্ছে একে-একে। শঙ্খও মাঝামাঝি একটা জায়গায় গিয়ে চুপ করে বসে পড়ল। একবার চোখ তুলে দেখল, আশে-পাশে চেনা কেউ আছে কি না। নেই দেখে নিশ্চিন্ত হল। আজ কারোরই মুখোমুখি হতে চাইছে না সে।

তাদের ইস্কুলের সামনে বিশাল ফুটবল খেলার মাঠ। সে মাঠের সবুজ আর নরম ঘাস

পেরিয়ে এক-এক ঝলক কনকনে ঠান্ডা বাতাস এসে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে ক্লাসরুমের ভেতর। যতটা পারছে, সে গোটোসোটো হয়ে বসছে। কিছুটা ঠান্ডায়, কিছুটা নিজেকে লুকিয়ে রাখার একটা দুর্বোধ্য প্রয়াসে। ক্রমে মাস্টারমশাইরা একে-একে ঢুকতে লাগলেন হলঘরের মধ্যে। প্রথমে ভূগোলের টিচার নৃপতিবাবু। তারপর মণিবাবু। মণিবাবু নীচের ক্লাসে ইংরেজি পড়ান। ভীষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বাতিক। অভ্যাসমতো বারবার ধুতির খুঁট তুলে ধরে মুখ মুছছেন। ইতিহাসের টিচার অমিয়বাবু ঢুকলেন খুব ধীরগতিতে। খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাঁর চোখমুখ। তারপর নীলকান্তবাবু আর বিজ্ঞানের টিচার জীবেশবাবু একসঙ্গে। একটু পরেই শঙ্খদের ক্লাসটিচার একলব্যবাবু। তাঁর লিকলিকে শরীরে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে রেখেছেন, হাতে অবশ্য ছপ্‌টি নেই আজ। একলব্যবাবুর হাতে ছপটি বেত যাই থাকুক, দেখলেই শঙ্খর গায়ে জ্বর আসে।

কিছুক্ষণ পর ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন অচেনা ভদ্রলোককে নিয়ে ঢুকলেন হেডস্যার। তাঁদের পেছন-পেছন হরিসাধনবাবু। অচেনা ভদ্রলোক একেবারে মাঝখানের চেয়ারে বসতেই শঙ্খ বুঝে নিল, ইনিই ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট ভোলানাথ মুখার্জী। কলকাতার কলেজের প্রফেসর। খুব বিখ্যাত মানুষ। তাঁরা ঢুকতেই ছাত্ররা সবাই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল।

ততক্ষণে সমস্ত বেঞ্চিগুলো ভরে উঠেছে। তাদের কথায়, গল্পে গমগম করছিল হলঘর। প্রেসিডেন্টকে নিয়ে হেড্‌মাস্টার সুরেশবাবু ঢুকতেই মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল সবাই। সে বোধহয় কয়েক মুহূর্ত। তারপর ক্রমে ফিসফাস, গুঞ্জন।

শঙ্খর পাশে কখন যেন গুটিগুটি এসে বসে পড়েছে পার্থ। পার্থর সঙ্গে শঙ্খর একটা আলাদা রকমের বন্ধুত্ব। ক্লাসের ফার্স্টবেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে ওরা। আজও পার্থ ঠিক খুঁজে-খুঁজে তার পাশে এসে বসেছে। তবে ফার্স্ট বেঞ্চে নয়, তারা মাঝখানের দিকে বসেছে আজ। বসেই ফিসফিস করে বলল, আমার খুব ভয় করছে।

শঙ্খ বলতে চাইল, তারও ভয় করছে। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনও স্বরই বেরুল না। তার ঝাপসা চোখের সামনে তখন নড়াচড়া করছে চেয়ারে বসা মানুষজন। চেয়ারের পেছনেও ভিড় করে আছে অনেক লোক। নিশ্চয় গার্জেনই হবেন ওঁরা। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে।

পার্থর ওপাশে হঠাৎ কোত্থেকে টুক করে এসে বসল ভবানী। বসেই চোখ নেড়ে বলল, এই, ক্লাস ফাইভ তো জলের পাইপ ছিল, ক্লাস সিক্স কী হবে রে?

শঙ্খ অবাক হয়ে তাকালো ভবানীর দিকে। ভবানী বরাবরই খুব ডেকোহেঁকো ধরনের ছেলে। ক্লাস পালিয়ে টো-টো করে ঘুরে বেড়ায় আগানবাগান। পড়াশুনোর তোয়াক্কা করে না, তবু আজ রেজাল্ট-আউটের দিন তার মাথায় এই সব ঘুরছে!

পার্থ মাথা নাড়ল, ফিসফিস করে বলল, জানি নে—

—এই শঙ্খ, তুই জানিস?

শঙ্খও মাথা ঝাঁকায়, সে এখন এসব কিছু ভাবতেই পারছে না। তার সামনে গোটা পৃথিবীটা এখন দুলছে।

ভবানী বলে চলেছে, ক্লাস ওয়ান—ইস্কুলের দারোয়ান, ক্লাস টু—ভগবানের বন্ধু, ক্লাস থ্রি—খায় বিড়ি, ক্লাস ফোর—জুতো চোর, ক্লাস ফাইভ—জলের পাইপ, ক্লাস সিক্স তাহলে কী?

সেই মুহূর্তে অগনিত গুনগুন, কানাকানি, ফিসফাসের ভেতর গমগম করে উঠল হেডমাস্টার মশাইএর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সাইলেন্স প্লিজ—

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হলঘরের ভেতর এক দম-বন্ধ-হওয়া নিঃস্তব্ধতা। টুঁ শব্দটি শোনা গেল না কারও গলায়। পরক্ষণেই হেড্‌-মাস্টারমশাই বলে উঠলেন, আজ মাদারীপুর হাইস্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার দিন। আমি প্রথমেই ক্লাস ফাইভের ফলাফল ঘোষণা করছি। পর-পর মেরিট অনুযায়ি। সফল ছাত্রদের হাতে ফলাফল তুলে দেবেন আমাদের স্কুলের প্রেসিডেন্ট শ্রী ভোলানাথ মুখার্জী। এবার ক্লাস ফাইভ থেকে সিক্সে প্রথম হয়ে উঠেছে—

চারপাশে ভীষণ নিঃস্তব্ধতা, শুধু হেডস্যারের ভরাট-গম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করে ধ্বনিত হচ্ছে, আর শঙ্খর চারপাশে নেমে এল এক অদ্ভুত ঘোর, এক অদ্ভুত অন্ধকারময় পৃথিবী। সেই অন্ধকারের মধ্যেই সে শুনতে পেল, হেডস্যার ঘোষণা করছেন—

—সুবোধ মন্ডল।

নামটা শুনেই শঙ্খর চারপাশে ঘনিয়ে এল আরও ঘন অন্ধকার। ঝাপসা চোখে দেখতে পেল, পেছন থেকে উঠে এসে দু'সারি করে সাজানো বেঞ্চের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সুবোধ। খুবই শান্তশিষ্ট, লাজুক ধরনের ছেলে সুবোধ, শঙ্খর খুব বন্ধুও। সেই সুবোধ এবার ফার্স্ট হয়েছে তাদের ক্লাসে! চারপাশে তখন তুমুল হাততালি। হাততালির রেশ মিলোতে না মিলোতে আবার শোনা গেল হেডস্যারের গলা, সেকেন্ড মহাদেব মল্লিক। আবার হাততালি। ততক্ষণে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে মার্কশীট নিয়ে ফিরে আসছে সুবোধ, আর মহাদেব বড় বড় পা ফেলে চলেছে সেদিকে।

—থার্ড পার্থ সেনগুপ্ত।

শঙ্খর পাশ থেকে তিড়িং করে উঠে দাঁড়াল পার্থ। তার বুটের গটগট শব্দ শোনা গেল সারা হলঘরে। শঙ্খর চারপাশে তখন একরাশ কালো অন্ধকার আরও নিবিড় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ঘিরে আসছে। ফার্স্ট নয়, সেকেন্ড নয়, থার্ডও হতে পারেনি সে। তার শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে. ঝাপসা হয়ে আসছে সমস্ত পৃথিবী। তার পর হঠাৎ শুনল, ফোর্থ—শঙ্খ চ্যাটার্জী।

শঙ্খ দাঁড়াতে গিয়ে দেখল, তার পায়ে জোর নেই। অবশ হয়ে আসছে তার দু'পায়ের গোড়ালি, হাঁটু। পা বাড়াতে গিয়ে মনে হল, কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না চোখে। রাশিরাশি ছেলেদের মাঝখান দিয়ে টালমাটাল পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় ঝাপসা চোখে দেখতে পায়, বাকি সবাই যেন তার দিকে তাকিয়ে বাঁকা ঠোঁটে হাসছে। বলছে, ইস, শেষমেশ ফোর্থ!

ফোর্থ হওয়াও যা, লাস্ট হওয়াও তাই। শঙ্খর ঠোঁট যেন এরকম ভাবতে ভাবতে বিড়বিড় করছে। ততক্ষণে হাতে মার্কশীট নিয়ে ফিরে আসছে পার্থ, তার মুখখানা শঙ্খ ভালো করে দেখতেও পেল না। দেখতে পাচ্ছে না সামনেই চেয়ারে বসে থাকা প্রেসিডেন্টের মুখখানাও। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হেড্‌স্যার, হরিসাধনবাবুকেও। রাস্তায় আসার সময় কেন হরিসাধনবাবু সাইকেলের বেল বাজিয়ে তার দিকে কড়াচোখে তাকিয়ে ছিলেন তা এখন বুঝতে পারছে। নিশ্চয় রেজাল্ট এত খারাপ হয়েছে বলেই।

কোনও ক্রমে প্রেসিডেন্টের হাত থেকে রেজাল্টশীট নিয়েই সে পালিয়ে এল বসার জায়গাটিতে। তার বুকের ভেতর তখন ঢেঁকির পাড়। কানদুটো ঝাঁ-ঝাঁ, চোখ ঝাপসা। শঙ্খর মনে হল, তার জীবনে এমন দুর্দিন খুব কমই এসেছে। তার মণিকাকাও নিশ্চয় এসেছে রেজাল্ট নিতে। কোথাও বসে আছে বেঞ্চিতে চুপটি করে। শঙ্খর রেজাল্ট এমন বিশ্রী হয়েছে জেনে নিশ্চয় লজ্জায় বসে আছে মাথা নিচু করে।

বেঞ্চিতে বসে পার্থকে কোথাও দেখতে পেল না সে। ওপাশে বসা ভবানী বলল, কী রে শঙ্খ, ফোর্থ হয়ে গেলি! আমি তো ভেবেছিলাম, ফার্স্ট-সেকেন্ড কিছু হবি নিশ্চয়। যেরকম

ভালোছেলে ভালোছেলে মুখ করে বসে থাকিস।

কথাগুলো শঙ্খর কানের ভেতর দিয়ে গরম সিসের মতো গলতে গলতে ঢুকছিল। এরকম আরও অনেক টিটকিরি, অনেক বকুনি তার সামনে এখন অপেক্ষায়। শঙ্খর বাবা শুনলে নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। বাড়িতে রনোকাকাও তার স্কুল ফাইনালের পড়া থামিয়ে বলবে, কী রে শঙ্খ, শেষপর্যন্ত ফোর্থ! আর তার ঠাকুর্দা হয়তো বিড়িতে টান দিতে ভুলে যাবেন, মুখটা কালো করে বলবেন, ফার্স্ট হতে পারলি নে? সামনে যে ঘোর দুর্দিন আমাদের।

তারপর আরও অনেক নাম ডাকা হচ্ছে পর পর। একসময় ফাইভের ছেলেদের পালা শেষ হলে আরম্ভ হল সিক্সের ছেলেদের ডাকা। ওরা সবাই সেভেনে উঠবে। তাদের নাম শুনতে শুনতে হঠাৎ পাশে বসে থাকা ভবানী বলল, আমার নাম ডাকেনি রে শঙ্খ।

শঙ্খ চমক ভেঙে বলল, কেন রে?

—যারা ক্লাসে উঠতে পারেনি, তাদের নাম ডাকা হয় না।

শঙ্খ প্রবল বিস্ময়ে তাকালো ভবানীর দিকে, তার চেখেমুখে বিন্দুমাত্র শোকের চিহ্ন নেই, বরং মিটমিট করে হেসে বলল, কেন ক্লাসে উঠলাম না, বলতো? ক্লাস সিক্স মানে চারশো বিশ। ফোর টুয়েন্টি! হি হি, তোরা সব ফোর টুয়েন্টি—

শঙ্খ আব বসে থাকতে পারল না বেঞ্চিতে। পাশে কোথাও হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর একটি ছেলে। নিশ্চয় তাদের ক্লাসেরই। ওর নামও নিশ্চয় আজ ডাকেননি হেডস্যার। শঙ্খ চোরের মতো লুকিয়ে বেরিয়ে এল হলঘর থেকে। বাইরে মাঠের সবুজ ঘাস মাড়িয়ে চলে এল পাকারাস্তায়। হনহন করে হেঁটে যেতে থাকল সবার নাগাল এড়িয়ে। মহাশ্মশান, গঞ্জের বিশাল চত্বর পেরিয়ে চলে এল জেলারো আপিসের কাছে। তারপর ডাইনে বাঁক নিয়ে নেমে পড়ল তাদের মেটেপথটিতে।

কিন্তু যতই বাড়ির দিকে এগোতে থাকে, ততই নিথর, ততই অবশ হয়ে আসতে থাকে তার পা দুটো। মার্কশীটটিকে সে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে তার প্যান্টের পকেটে। কেবলই কামনা করছে যেন এই মুহূর্তে তার চেনাজানা কারও সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। দেখা হলেই তো জিজ্ঞেস করবে, কী রেজাল্ট হল রে তোর, শঙ্খ? সেই জিজ্ঞাসা করার মুহূর্তটিই যে তার কাছে ভয়ঙ্কর, ভীষণ অপমানের, লজ্জার। সে তখন কোথায় তার মুখটি লুকোবে ভেবে পাবে না। ভাবতে ভাবতে একসময় শঙ্খ পার হয়ে গেল তার প্রিয় রানিশায়র। রানিশায়রের জল পেরিয়ে মুখোমুখি হল ইছামতীর। ইছামতীর কিনারে একটা শাদা ধবধবে বক একঠেঙে হয়ে বসে আছে দেখে সে নেমে পড়ল মেটেরাস্তা ছেড়ে চরের দিকে। ঠিক জলের কিনারে ঝুঁকে পড়ে আছে একটা ঝাঁকড়া ধরনের বিশাল শিরীষ গাছ। তার শক্তপোক্ত গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসে নিজের লজ্জা লুকোতে চাইল শঙ্খ — ফোর্থ হওয়ার লজ্জা।

ইছামতীর জলে তখন পুরুনি জোয়ার। তবু শঙ্খর মন-খারাপ, ভীষণ মন-খারাপ। তখন মধ্যদুপুর পেরিয়ে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম বরাবর। শীতের রোদ ভারী মিঠেন, গা-শিরশির-করা। এতক্ষণে নিশ্চয় তাদের বাড়ির নিকোনো উঠোনে গোল হয়ে বসেছে গোটা পাড়ার মেয়ে-বৌরা। ঠাক্‌মা সুর করে সবাইকে শুনিয়েছেন কুলুই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা। চুরি করে জোড়া-কলা খেয়ে ফেলেছিল যে ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার যমজ ছেলে হয়েছিল। অপরাধী মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ব্রাহ্মণ। সে তার দুইছেলে আকুলি-সুকুলিকে নিয়ে কুটির বেঁধেছিল গভীর বনে। একদিন সেই আকুলি-সুকুলি বসে আছে নদীর ধারে, অমনি দ্যাখে কি, এক সদাগরের ধন-রত্ন বোঝাই বাণিজ্যপোত। দেখে বলেছিল, আমরা বড় গরীব, আমাদের কিছু দান করে

যাও। সদাগর বলল, নৌকোয় গাছপালা আছে, আর কিছু নেই। শুনে আকুলি-সুকুলি বলল, তবে তাই হোক। তাতে কী আশ্চর্য, সদাগরের সমস্ত ধন-রত্ন সত্যি-সত্যি গাছপালা হয়ে গেল। স্তম্ভিত সদাগর এসে কেঁদে পড়ল তাদের কাছে। তাতে ব্রাহ্মণ কন্যা বলেছিল, কুলুই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করতে। তাহলেই আবার –

এহেন ব্রতকথা শোনার পর এতক্ষণে নিশ্চয় সবাই পাত পেড়ে ফলার খেতে বসেছে। হয়তো এতক্ষণে এসে গেছে তাদের পাশের বাড়ির উমনো-ঝুমনোও। নিশ্চয় ওদের ভাই টুপুরও এসেছে। তবে টাপুরদা নিশ্চয় আসবে না। টাপুরদা তো এখন বড়ো হয়ে গেছে। ফলারের অমন জমকালো দৃশ্য মনে-মনে নাড়াচাড়া করেও শঙ্খ পারলো না বাড়ি ফিরতে। ফিরলেই তো সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করবে –

জলের কিনারে বসে বসে একটা-একটা করে নিদারুণ মুহূর্ত পার করে দিল শঙ্খ। জল তার ভারী প্রিয়। তার খুব প্রিয় এই ইছামতী। ওই যে নীলরঙের পাল তোলা নৌকোটা ভেসে যাচ্ছে কাটাখালির দিকে, তার এখন খুব ইচ্ছে করছে ওই নৌকোয় চেপে বসে দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে। রাজপুত্রের মতো অনেক লোকালয় অনেক জঙ্গল পার হয়ে কোনও তেপান্তরে গিয়ে হাজির হতে - যেখানে এই ফোর্থ হওয়ার লজ্জা নেই।

ক্রমে বিকেল নেমে এল নদীর বুকে। বেলা ফুরিয়ে আসতেও শঙ্খ স্তব্ধ, স্থির হয়ে রইল একা-একা। কিন্তু কতক্ষণই বা লুকিয়ে থাকবে এভাবে! সন্ধে আসি-আসি হতে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। শীতলতলা পার হয়ে ভীরু অবশ পায়ে এসে পৌঁছল তাদের বাড়ির সামনে। দেখল, সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সে এখনও কেন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরেনি বলে। মণিকাকা অনেকক্ষণ আগেই ফিরে এসেছে তার মার্কশীট নিয়ে। তার কাছে সবাই শুনে ফেলেছে শঙ্খর রেজাল্ট। রেজাল্ট হাতে নিয়ে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছে দুপুরে, অথচ এখনও কেন বাড়ি ফেরেনি তাই নিয়ে বলাবলি করছে সবাই। তাকে দেখতে পেয়েই রনোকাকা জিজ্ঞাসা করল, কী রে, এতক্ষণ কোথায় গিছলি তুই?

শঙ্খর ঠোঁট তখন থরথর করে কাঁপছে। সে কিছুই বলতে পারছে না। শুধু দেখছে, তার দিকে একগলা বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে রনোকাকা, মণিকাকা, ওপাশে ঠাকুর্দা, ঠাকুমাও। অবনীকাকাকে দেখতে পাচ্ছে না কোথাও। নিশ্চয় গঞ্জ থেকে এখনও ফেরেননি। ফিরলে তিনিও এমনই অবাক, এমনই ভৎর্সনার চোখে তাকিয়ে থাকতেন তার দিকে।

আর শুধু কি বাড়ির লোক! উমনো-ঝুমনোও তো মুখ টিপে হাসবে। খড়্গপুর থেকে পুজোর ছুটিতে এসে স্বপ্নাদিই বা কী বলবে তাকে! অথবা চাটুজ্জেপাড়ার যতীনদার রাঙা টুকটুকে বৌ—সেই রাঙাবৌদিও তো কী মুখ ভার করে থাকবে তার রেজাল্ট শুনে। রাঙাবৌদি যে বড্ড ভলোবাসে তাকে। আর পল্টন তো হেসেই মরবে, ও বাবা, এই তুই ভালো ছেলে!

হঠাৎ ঠাকুর্দা জীবেন্দ্রনাথ বললেন, কই দেখি তোর মার্কশীট।

শঙ্খ তার হাফপ্যান্টের পকেট থেকে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া কাগজটা বাড়িয়ে দিল কাঁপা-কাঁপা হাতে। সে দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঠাকুর্দা হঠাৎ বললেন, হরিসাধনের সঙ্গে দেখা হল ফেরার পথে। বলল, আপনার নাতি দুটো লেটার পেয়েছে। আর দু'নম্বর বেশি পেলেই থার্ড হতো। পাঁচনম্বর বেশি পেলে সেকেন্ড। ভীষণ কম্পিটিশন হয়েছে নাকি এবার। ফার্স্টবয়ের সঙ্গে ফোর্থবয়ের মাত্র দশ নম্বরের তফাৎ।

শঙ্খ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ঠাকুর্দার মুখের দিকে। মনে হল, তাঁর চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। নিশ্চয় তার ফোর্থ হওয়ার দুঃখে। শঙ্খরও চোখ ফেটে জল আসছিল।

অপমানের জল, লজ্জার জল। সেসময় ঠাকুর্দা হঠাৎ বললেন, দু'মাস আগে অত বড় একটা টাইফয়েড থেকে উঠলি। যা ফল হয়েছে ভালোই হয়েছে। আমি তো এতটাও আশা করিনি।

শঙ্খ হঠাৎ কেঁপে উঠল। অবাক হয়ে তাকালো ঠাকুর্দার দিকে। টাইফয়েড নয় ডাক্তার বলেছিলেন, প্যারাটাইফয়েড। টানা তেরদিন জ্বরের ঘোরে ছিল সে। তার পর আরও দিন দশেক ভীষন দুর্বল ছিল, বই নিয়ে বসতেই পারেনি। কিন্তু তার রেজাল্ট খারাপের কারণ যে সেই অসুখটা তা এতক্ষণ ভাবেইনি সে। ঠাকুর্দা তা ভেবেছেন, ভেবে তাকে এই চরম লজ্জার হাত থেকে রেহাই দিতে চাইছেন। কথাটা মনে করে কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল শঙ্খর। এতক্ষণে তার চোখ ফেটে হু-হু করে গড়িয়ে এল জল। ঠাকুর্দা তাকে যে ভীষণ ভালোবাসেন। ভালোবাসেন বলেই—

দাওয়ায় জলচৌকিব ওপর উবু হয়ে বসে নীলসুতোর বিড়িতে একটা বড় করে টান দিলেন জীবেন্দ্রনাথ। তাঁর কাঠামোটা বড়সড়, কিন্তু ক্ষয়াটে চেহারা, শিরাবহুল হাত-পা, চামড়া কুঁচকে এসেছে। এই ক'দিন আগে ছাপ্পান্ন পার হয়েছেন, সে তুলনায় তাঁকে একটু বয়স্কই দেখায়। কপালে তিন-চারটে কোঁচ পড়ে থাকে, ভুরুতেও। হয়তো একটু বেশি চিন্তা করেন বলেই। এখনও সেভাবেই তাঁর চোখদুটো স্থির হয়ে রয়েছে তাঁদের নতুন মাটি ফেলা ভিতটার দিকে। শুধু ভিতটুকু তৈরি হওয়ার পর বন্ধ হয়ে রয়েছে কাজ। এরপর চারপাশে ঝাউ কিংবা শালের খুঁটি, তার ওপর বাঁশের মস্ত ফ্রেম, তার ওপর টালি বসাতে হবে। টালি দিয়ে ছাওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে ঘরের চারপাশে উঠবে মাটির চওড়া দেওয়াল। তারপর মেঝে, দেওয়াল সব নিকোনো হবে গোবর দিয়ে। এরপরেই ঝকঝকে নতুন ঘরে গৃহপ্রবেশ।

মাটি ফেলা ভিতটুকুর দিকে তাকিয়ে জীবেন্দ্রনাথের চোখদুটো কিছুক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই দু'চোখে ঘনিয়ে আসে হতাশা। হাতে রেস্ত বলে কিছু নেই। প্রায় মাসখানেক হতে চলল, ভিত হয়ে অমনি পড়ে আছে নতুন ঘরের প্ল্যান। দ্রুত পার হয়ে গেল শীতকাল, চৈত্রমাস পড়তে না পড়তেই আজকাল কাল-বোশেখি শুরু হয়ে যায়। তারপর বর্ষা সামনে। সামনের বর্ষার আগেই এ ঘরখানা শেষ না করলেই নয়। তাঁদের পুরনো এই গোলপাতায় ছাওয়া ঘরখানার চালে হাঁ বেরিয়ে আছে সর্বত্র। এই গোলপাতার চালের বয়স নয় পেরিয়ে দশ হতে চলল। কদ্দিন আর টিকবে। এবার ঘোরবর্ষায় কী যে হাল হবে তা ভেবে কুল কবতে পারছেন না জীবেন্দ্রনাথ। পণছয়েক খড় কিনে চালে গুঁজবেন বলে ভাবছেন অনেকদিন ধরে। তাও হয়ে ওঠেনি টাকার অভাবে।

বিড়িতে আর একটা টান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। বড় ছেলে ব্রজনাথকে দু'দুটো

পত্রও দিয়েছেন গত একদেড়মাসের মধ্যে, তার কোনও উত্তর এসে পৌঁছয় নি। অন্তত শতখানেক টাকাও যদি সে পাঠাতে পারে, তাহলে তিনি ঘরামি লাগাতে পারতেন।

এই ছাপ্পান্নবছর বয়সেও জীবেন্দ্রনাথের মনে পড়ল তাঁর ছেলেবেলার কথা। তাঁর বাবা সুরেন্দ্রনাথ বলতেন, মাথার ওপর একটা ছাউনি থাকলে বড় বল্‌ভরসা রে। আর গোলায় দু-মুঠো ধান।

পুব-বাংলার সম্পত্তি, জমিজমা ছেড়ে চলে আসার পর এ বাংলায় তাঁদের ধেনোজমি বলতে আর কিছু নেই। জমি বলতে এই বিঘেখানেকের বাস্তু। তাতে কোনও ক্রমে একটু মাথা গোঁজার আস্তানা করেছিলেন, তাও ন'-দশ বছরের ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে গেছে। গোলার ধান তো এখন তাঁদের কাছে একটা স্বপ্ন।

বিড়িতে একবার টান দিতে গিয়ে দেখলেন, তাতে আগুন নিভে গেছে। নিভন্ত বিড়িটার দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল তাঁর চোখমুখ, এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন যে—

সম্বিত ফিরতে গাঁটির দিকে হাত বাড়ালেন ফের। খুঁজে পেতে বার করলেন দেশলাইটা। বিড়িটার এখনও আদ্দেকের ওপর বাকি আছে। নীলসুতোর বিড়ি বেশ লম্বা ধরনের হয়। দামও একটু বেশি। বাজারে যে বেগুনিসুতোর বিড়ি পাওয়া যায়, তাতে একটু গরীব-গরীব ছাপ থাকে। একটু বেঁটে ধরনের, দামেও সস্তা। কিন্তু কী কারণে যেন জীবেন্দ্রনাথ সে বিড়ি কিছুতেই কিনতে পারেন না বাজার থেকে। বাধো-বাধো ঠেকে যেন। তার চেয়ে নীল-সুতোর বিড়িতে একটা অন্য দেমাক আছে।

বোধহয় আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, তাতেই বিড়িটা ধরাতে গিয়ে পরপর দুটো দেশলাইকাঠি খরচ হয়ে গেল। দিনে একবাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই, মাগ্গিগন্ডার দিনেও এটুকু আর ছাড়তে পারেননি। বেটাছেলের যদি এই ছোটখাটো নেশা এক-আধটা না থাকে—

কার মুখে যেন শুনেছিলেন, ছোট নেশা না থাকলে পুরুষমানুষকে নাকি বড় নেশায় ধরে। কথাটা সত্যি কি না তা কে জানে।

বিড়িটা তৃতীয়বারের চেষ্টায় ধরিয়ে বেশ বড় করে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন। শেষের কাঠিটা ঝাঁকিয়ে নিবিয়ে ফেলে ছুড়ে দিলেন মাটিতে। পাশাপাশি তিনটে নিবে যাওয়া কাঠি, শেষেরটা থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তিনটে দেশলাইকাঠির পাশাপাশি শুয়ে থাকা শবদেহের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন জীবেন্দ্রনাথ। দেশলাইও বেশ আক্রা হয়ে গেছে এখন। সব জিনিষের দাম হু-হু করে বাড়ছে, এই টানাটানির দিনে তিনটে কাঠি খরচ হয়ে যাওয়াটা বড় বেহিসেবি কাজ।

খুব দুর্দিন যাচ্ছে বটে।

২

দেশবিভাগ হওয়ার পর চারটি ছিন্নমূল পরিবার বর্ডার পার হয়ে লাট খেতে খেতে এসে ঠেকে গেছে এই ঈশ্বরীপুর গ্রামে। দুইভাই জীবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ যেদিন জানতে পারলেন খুলনা আর হিন্দুস্থানে নেই, পাকিস্থানে পড়েছে, গরুর গাড়িতে বৌছেলেমেয়ে তুলে তদ্দণ্ডেই রওনা দিয়েছিলেন অন্যপারের দিকে। জীবেন্দ্রনাথের হাতে তখন মাত্র চৌষট্টি টাকা সম্বল।

সাতক্ষীরা থেকে বর্ডার পেরোলেই বসিরহাট। তারই কাছাকাছি ইছামতী নদীর ধারে ঈশ্বরীপুর। ছোট্ট গঞ্জ এলাকা, তার দক্ষিণে বিশাল দক্ষিণপাড়ার এক প্রান্তে চাটুজ্জেপাড়া। আনন্দ চাটুজ্জে জীবেন্দ্রনাথের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ঈশ্বরীপুরে তাঁর মেলাই জমিজমা, মস্ত তিনতলা বাড়ি। এ তল্লাটে তিনতলা বাড়ি আর একটাও নেই। নদীর ধারে তাঁরই কিছু পতিত

জমির উপর গরানের বেড়া আর গোলপাতার ছাউনি দিয়ে ডেরা বাঁধলেন দু'ভাই, পাশাপাশি দু'বিঘে জমি নিয়ে দু'টো প্লট করে। তাঁদের সঙ্গি হয়ে এলেন আরও দুটি পরিবার, তাঁরাও এক-এক বিঘে জমি নিয়ে বাস করতে লাগলেন জীবেন্দ্রনাথদের লাগোয়া জায়গায়। তার একটি রোহিনীনন্দন মুখুজ্জের। রোহিনীনন্দন সাতক্ষীরায় জীবেন্দ্রনাথের প্রতিবেশি ছিলেন। আর একটি রাঘবেন্দ্র বাঁড়ুজ্জের। এই দুটি পরিবারও দু'ভায়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রওনা দিয়েছিলেন অনির্দেশ্যের উদ্দেশে।

আনন্দ চাটুজ্জে বলেছিলেন, আপনারাও বামুন, আমরাও বামুন। এ পাড়ায় তো বাস করার একটা হক আছে আপনাদের। জমিটা পতিত হয়ে রয়েছে, এখন বাস করতে থাকুন। তারপর কিছু-কিছু করে জমির দাম শোধ করে দেবেন।

দশবছর হতে চলল, জীবেন্দ্রনাথ এক পয়সাও শোধ করে উঠতে পারেননি সে ঋণ।

পতিত জমি হলেও জঙ্গল কেটে, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে বেশ চলনসই হয়ে উঠেছে চারটি বাস্তু। ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণপ্রান্তে এই চাডুজ্জেপাড়ার পর কিছুটা জায়গা নিয়ে জেলেপাড়া। তারপর গাঁয়ের শেষপ্রান্তে এই নতুন পত্তনিদের বাস। জেলেপাড়াই এতকাল ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণপাড়ার শেষ বসতি ছিল। পতিত জমিতে জীবেন্দ্রনাথরা বসতি গড়ার পর গাঁয়ের সীমানা এসে দাঁড়াল একেবারে ইছামতীর কিনার পর্যন্ত।

জীবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের বাড়ি প্রায় লাগোয়া।। তাঁদের মেজভাই নগেন্দ্রনাথ কিন্তু সাতক্ষীরার ভিটে ছাড়েননি। বলেছিলেন, পিতৃপুরুষের ভিটে, এ আমি ছেড়ে যেতে পারব না। তোমরা গেলে যাও। আসলে নগেন্দ্রনাথ একটু ডাকাবুকো ধরনের লোক, প্রায় ইস্পাতের মতো ধারালো শরীর। বাকি দু'ভাই চলে যাওয়ামাত্র তাঁদের জমি একত্রে ভোগ করতে পারবেন এ কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন। জীবেন্দ্রনাথ খবর পেয়েছেন, তিনভায়ের জমি একাই সামলেসুমলে রেখে বেশ তোফা আরামে আছে নগেন। তার বড় ছেলে আতা এখন বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে। কিসের যেন রমরমা ব্যবসাও চালাচ্ছে। বরং তাঁরা দু'ভাই হুট করে এদেশে চলে এসে এখন খাবি খাচ্ছেন। দু'জনেরই মস্ত সংসার, শুধু খাইখরচ জোগাতেই যা টাকা লাগে তা রোজগার করতেই প্রাণান্ত হচ্ছেন। সাতক্ষীরা থাকতে জমিজমা তো ছিলই, উপরন্তু সাতক্ষীরা কোর্টে মুহুরিগিরি করে নিতান্ত মন্দ ছিল না তাঁদের রোজগার। এখানে এসে দু' ভায়ে বসিরহাট কোর্টে শুরু করেছেন সেই একই পেশা। কিন্তু নতুন জায়গায় নতুনভাবে জমিয়ে তোলা বেশ কঠিন। বসিরহাটে নামী-উকিবাবুদের কাছে ঘেঁষা খুবই দুরূহ। তা ছাড়া পুরনো মুহুরিরা এমন জাঁকিয়ে ব্যবসা করছে এখানে, মক্কেলপত্র ধরে রেখেছে কায়দা করে যে, নতুন মুহুরিদের পক্ষে কাজকর্ম করা ভারী মুশকিল। এ ছাড়াও, এইসব উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষদের তেমন পছন্দ করছেন না এ পারের মানুষ। প্রায়ই 'রিফিউজি' বলে উল্লেখ করেন তাঁদের সম্পর্কে কথা বলার সময়। শব্দটা এখন প্রায় গালাগালের মতো মনে হয় জীবেন্দ্রনাথের।

রোহিনীনন্দনের বাস্তুটি তাঁদের ঠিক পরেই। মাঝখানে একফালি চলার পথ। তিনি ছিলেন সাতক্ষীরার কাছেই বসন্তপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। এখানে এসে অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে শিক্ষকতা জুটিয়ে নিয়েছেন স্থানীয় একটি পাঠশালায়। জীবেন্দ্রনাথদের মতো রোহিনীনন্দন মুখুজ্জে অবশ্য একেবারে খালিহাতে আসেননি। সাতক্ষীরার কয়েকটি মুসলিম পরিবারের সঙ্গে তাঁর জমিজমা বিক্রির একটা বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন আসার সময়। এখানে আসার পর দু-দফায় পুব-বাংলায় গিয়ে নিয়ে এসেছেন টাকাকড়ি। তাতে একটা ছোটখাটো পাকাবাড়ি করে

উপরে টালি দিয়ে ছেয়ে ফেলেছেন। কন্যাটিরও বিবাহ দিয়েছে ক'বছর হল। ছেলেটি অবশ্য এখনও ছোটই। তাঁর দূরদর্শিতা দেখে মাঝেমধ্যে আপসোসও করেন গণেন্দ্রনাথ, জীবেন্দ্রনাথকে এসে কখনও বলেন, দাদা, আর একবার দুভায়ে মিলে দেশে গেলি হতো। মেজদা তো একাই ভোগ করছে সব জমিজমা। ভাগের ভাগ নিয়ে এলি সংসারের একটু সুরাহা হতো।

জীবেন্দ্রনাথ গম্ভীরমুখ করে সেসব কথা শোনেন, তারপর নীলসুতোর বিড়িতে ধোঁয়া উড়িয়ে বলেন, নাহ্, যে হাঁড়ি ফেলে দিইছি আঁস্তাকুড়ে, তা আর তুলে এনে ভাত রাঁধা যায় না।

জীবেন্দ্রনাথের স্ত্রী স্নেহবাসিনীও বলেন, তাতে কী হয়েছে! মেজঠাকুরপো তো আমাদের নিজেদের লোক। সবটুকু জমি একাই বা ভোগ করবে কেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জীবেন্দ্রনাথ বলেন, যখন ছেড়েছুড়ে চলে এসেছিলাম তখন তো আর এসব কথা ভাবিনি। নগেন এই দশবছর একাই সব ঝক্কি ঘাড়ে নে সামলে রেখেছে জমিজমা। সে না থাকলে তো জমি ফেরত পাবার কোনও প্রশ্নই উঠত না। কম ঝড় যাচ্ছে নাকি ওর ওপর?

স্নেহবাসিনীও সে খবর রাখেন। মাঝেমধ্যে ওপার থেকে নানারকম ভয়াবহ খবর এসে পৌঁছয় এপারে। তখন মনে হয় চলে এসে ভালোই হয়েছে। কিন্তু এখানে সংসার চালানো দিনদিন যেরকম দুরূহ হয়ে উঠেছে তাতে না জীবেন্দ্রনাথ না স্নেহবাসিনী কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না বাকি দিনগুলো কীভাবে চলবে। বড়ছেলে ব্রজনাথ তার চাকরি নিয়ে চলে গেছে সীমান্তের কাছাকাছি এক গ্রামে। সেখানেই তার বৌ মেয়েদের নিয়ে থাকে। শুধু ছেলেটাকে রেখে গেছে তাদের কাছে। সেখানে ভালো ইস্কুল নেই। এখানে থাকলে তবু ভালো ইস্কুলে লেখাপড়া করতে পারবে। এখানকার মাদারীপুর ইস্কুলের বেশ নামডাক আছে। ব্রজ মাসমাস কুড়িটে করে টাকা পাঠায়। সেইটেই একমাত্র ভরসা জীবেন্দ্রনাথের। মেজছেলে অচিননাথ প্রায় বেকার। কলকাতার দিকে চাকরির সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছে। কখনও টুকটাক কিছু পেলে—দশ-কুড়ি টাকা দুচারমাস অন্তর দিয়ে যায়। সেজ অবনী বসে আছে। বাকি দুইছেলে রনো আর মণি এখনও স্কুলের গন্ডি পেরোয়নি। রনোর এবার স্কুল ফাইনাল। মণি এইটে উঠল।

গণেন্দ্রনাথের চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বড়ছেলে রমেন কাজের খোঁজ করছে কলকাতায়। বড়মেয়ে গোলাপের বিয়ে হয়েছে সবে। তার পরেরটা খুশি, সে মাথায়-মাথায়। মেজছেলে গোরা তাঁর মণির সমবয়সী, এক ক্লাসে পড়ে। আর একটা ছেলে তার মাসির বাড়িতে থেকে পড়ে। আরও একটা কোলে। পাশাপাশি থাকেন দু'ভাই, কিন্তু অভাবে-অভাবে দু'জনেই জর্জর। এখন দূর আত্মীয়ের মতো মনে হয়। পতিত জমির একেবারে নদীর দিকে ঘর বেঁধেছেন রাঘবেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে তাঁর দুইছেলেকে নিয়ে, বড়ছেলে তোতা ছোটখাটো একটা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে ঈশ্বরীপুর বাজরে। চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে তার। মেজছেলে ব্রহ্ম এখানকার বাসস্ট্যান্ডে স্টার্টারি করে। ছোটছেলে চাকরি করে রেলে। বৌ-মেয়ে নিয়ে খড়গপুরের কোয়ার্টারে থাকে। বছরে একবার দেশে-ঘরে আসে পুজোর ছুটিতে।

জলচৌকিতে উবু হয়ে বসে এইসব সাতপাঁচ ভাবছিলেন জীবেন্দ্রনাথ। তাঁর দশবছরের নাতি শঙ্খ নতুন ভিতের ওপাশে এক্কা-দোক্কা খেলছে তার সঙ্গিনীদেব নিয়ে। আজ ছুটির দিন। তাঁর কোর্ট-কাছারিও নেই। ফলে সারাদিন একটানা অবসর। একটা পুরনো দলিল দিয়ে গেছে তাঁর মক্কেল হরেন মল্লিক। দশ বিঘের একটা বেনামী জমি কিনেছে তেঘরিয়া মৌজায়। তারপর হুজ্জুত বেধেছে দখল নিতে গিয়ে। এখন মামলা-মোকদ্দমা ছাড়া জমির আর কোনও হিল্লে হবে

না। সেই দলিলটাই ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বার করে এনে আগাগোড়া পড়বেন এমন মন করছেন, এমন সময় নাতি তার এক্কা-দোক্কা খেলার খোলামকুচি হাতে নিয়ে ছুটে এল তাঁর কাছে, দাদু, সেই লোকটা—

—কোন লোকটা? জীবেন্দ্রনাথ অবাক হন।

—সেই যে, কাঁধে লাল গামছা নিয়ে ঘোরে।

আনন্দ চাটুজ্জেকে এ তল্লাটের সবাই চেনে। খালি গায়ে কাঁধে একটা লাল গামছা ফেলে ঘোরেন সবসময়। বাড়িতে তো বটেই, যখন বাড়ির আশেপাশে জমিজমা তদারকি করতে বেরোন, তখনও সেই একই পোশাক।

জীবেন্দ্রনাথ একটু অবাক হলেন, খানিক অস্বস্তিতেও। আনন্দবাবু তাঁদের এ জমিতে থাকতে দিয়েছিলেন মৌখিক সম্মতিতে। এখনও পর্যন্ত দাম হিসেবে তাঁকে কিছু টাকা-পয়সা ধরে দিতে পারেননি বলে মনে-মনে বেশ কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন জীবেন্দ্রনাথ। আনন্দবাবু তাঁদের আত্মীয় হলেও এই সামান্য কারণে কয়েকবছরে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে জমিদার-প্রজার মতোই। কতই বা দাম হবে এই পতিত জমির! গত দশবছরে হয়তো তাইই কখনও জমির মূল্য মুখ ফুটে চাননি আনন্দবাবু। কিন্তু মাঝেমধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর প্রজাদের বাড়ির সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েন। যেন তাঁর নিজেরই জমি এমনভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন চার প্রজার জমির একোণ-ওকোণ। অনেকসময় জীবেন্দ্রনাথকে যেন দেখেও দেখেন না। আবার কখনও খবরদারি করেন, এ জায়গায় একটা তেঁতুলগাছ পুতলেন কেন জীবেনবাবু? এ তো গোটা জমিটাকেই ছায়ায় ভরিয়ে দেবে। দুটো-চারটে যাও সব্জি হতে পারত জমিটায়, ছায়া পেলে তাও আর হবে না।

এ সময়টাতে ভারী অসহায় লাগে জীবেন্দ্রনাথের। কীরকম অপমান-অপমান মনে হয়। জমির দামটা কোনও ক্রমে একবার ধরে দিতে পারলে আর এসব খোঁচা দেওয়া কথা শুনতে হতো না তাঁকে। আনন্দবাবু এমন জমিদারি ভঙ্গিতে ঘুরতেও পারতেন না যথেচ্ছভাবে। কিন্তু অদূরভবিষ্যতে সে টাকা দিয়ে উঠতে পারবেন এমন ভরসাও হয় না জীবেন্দ্রনাথের। বোধহয় আনন্দবাবুও সে কথা বুঝতে পারেন বলে এমন উপেক্ষা দেখাতে সাহস পান।

এরকম গায়ে জ্বালা ধরানো কথা বলে আনন্দবাবু একদিন চোখের আড়াল হতেই রনো ফেটে পড়েছিল, এ কিন্তু ওঁর ভারী অন্যায়। হলই বা ওঁর জমি। এ জমি তো এককালে পতিত ছিল। কোনও কাজেই লাগছিল না ওঁর। আমরা এত কষ্ট করে জমিটা পোষ্কার করে, লেভেল করে তোয়ের করে নিয়েছি বলেই না—

জীবেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, জমির রেকর্ডে যে ওঁর নাম লেখা আছে রে হতভাগা। চটে আর কী করবি বল্? দেখি, যদি টাকাকড়ি কোনও দিন জোগাড় করতে পারি—

রাগ তো জীবেন্দ্রনাথেরও হয় মনে-মনে। এই তো মাসকয়েক আগের কথা। হঠাৎ একদিন আনন্দবাবু ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলেন জীবেন্দ্রনাথের দাওয়ার দিকে, উবু হয়ে বসে থাকা জীবেন্দ্রনাথকে বেশ আচম্‌কাই বললেন, চাটুজ্জেমশাই, এই সেদিন দেখে এসেছি সিঁদুরকোটো আমগাছটায় আম পেকে টুসটুস করছে, আজ দেখছি প্রায় সব ফর্সা। কী হল বলতে পরেন?

প্রশ্নটায় কেমন এক ধরনের খোঁচা ছিল। শুনে কানমুখ গরম হয়ে গেল তাঁর। তাঁদের প্লটের দক্ষিণ-পশ্চিমে আনন্দবাবুর বিশাল আমবাগান। সে বাগান থেকে শুধু আম বেচেই উনি প্রতিবছর কয়েকহাজার টাকা পান। কতরকম আমগাছই না আছে ওঁর বাগানে। গোলাপখাস্, রানিপছন্দ্, বাদশাভোগ, দিলখুস্, এমনকি ল্যাংরা, বোম্বাই, ফজলিও দু-চারটে করে আছে। কত দেশবিদেশ থেকে আমগাছ এনে নিজের বাগানে লাগিয়েছেন, বাঁচিয়েছেন কত কষ্ট করে সে

বৃত্তান্তও গল্প করতে করতে শুনিয়েছিলেন একদিন।

আনন্দবাবুর প্রশ্নের জবাবে ভুরু কুঁচকে বললেন, কী বলতে চান আপনি? আপনার আমবাগান থেকে আম পেড়ে এনেছি আমরা?

আনন্দবাবু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, না, ওই যে ওরা বলছিল, রিফিউজিদের ছেলেরা ঢিলিয়ে পেড়ে নেয় আম।

রিফিউজি শব্দটা আবার খট্ করে কানে বাজল জীবেন্দ্রনাথের, মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। নিজে যদিও তদ্বির করছেন রিফিউজি সার্টিফিকেটটা সরকারি দপ্তর থেকে জোগাড় করার জন্য, উদ্বাস্তু প্রমাণপঞ্জী থাকলে এ দেশে কিছু কিছু সুবিধে পাওয়া যাবে বলেছে গভর্নমেন্ট। কিন্তু অন্যের মুখ থেকে এমন তাচ্ছিল্য সহকারে রিফিউজি কথাটা শুনলে কেমন অপমান লাগে। দেশ ভাগের দায়ভার তো তাঁদের ছিল না। লোকটা অপমান করতে পারে বটে মুখের উপর!

তাঁর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জীবেন্দ্রনাথ বললেন, দেখুন আনন্দবাবু, আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু আমার ছেলেরা আপনার গাছ থেকে চুরি করে আম পাড়তে যাবে না। দেশে আমাদেরও একটা মস্ত আমবাগান আছে। বছরভর খেয়ে বিক্রি করে শেষ করতে পারতাম না। নেহাৎ তার কিছুই এখানে নেই বলে এতবড় কথাটা আজ আপনি বলতে পারলেন। তবে হ্যাঁ, দু-তিনদিন আগে যে ঝড়টা হয়ে গেল, তাতে অনেক আম টুপ-টুপ করে পড়েছিল। তাতে এ-পাড়ার অনেকেই ঝড় মাথায় করে আম কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে, জেলেপাড়া থেকেও এসেছিল ছেলেমেয়েরা। সেখানে হয়তো আমাদের বাড়ির ছেলেরা গিয়েছিল আম কুড়োতে। তারা না কুড়োলে অন্য কেউ সে আম নিয়ে যেত।

আনন্দবাবু আর বেশি কথা বাড়াননি। তিনি চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত কপালের দু'দিকটা দপ্‌দপ্ করেছিল জীবেন্দ্রনাথের, হঠাৎ দেশভাগ হতে তাঁদের পায়ের তলায় আর মাটি নেই, এখন এত গরীব হয়ে গিয়েছেন যে যে-কেউ এসে তাঁদের অপমান করে যাচ্ছে।

রনো চোখ ছলছল করে বলেছিল, আগে চাকরি পাই, তারপর কড়ায়গণ্ডায় হিসেব করে মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে আসব টাকাটা।

জীবেন্দ্রনাথ শুধু বিড়বিড় করেছিলেন, দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য।

দেশটা দুভাগ হয়ে যেতে দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে আরও অনেক মানুষের জীবনে। বসিরহাট-বনগাঁ থেকে শুরু করে গোটা সীমানার এদিকে আছড়ে পড়েছে হাজার হাজার পরিবার। তখন সবাই ছিন্নমূল। কারও পায়ের নীচে মাটি নেই, মাথার উপরে ছাদ নেই। একমাত্র ছাউনি আকাশ। সীমানা পার হয়ে এক-এক পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে সাধ্যমতো ঠিকানা খুঁজে। বেশিরভাগ মানুষই নিজের ঘরবাড়ি হারিয়ে হঠাৎই নিরাশ্রয় হয়ে গেল।

যারা আরও একটু এগিয়ে আশ্রয় খুঁজতে গেল কলকাতায়, তাদের অবস্থা হয়ে উঠল আরও অবর্ণনীয়। শিয়ালদহ স্টেশনে হাজার হাজার ছিন্নমূল পরিবার পড়ে রইল নিরাশ্রয় হয়ে। কেউ চেনা লোক খুঁজে পেল তো সপরিবারে গিয়ে উঠল তার আশ্রয়ে, সেখান থেকে শুরু হল একটুকরো আস্তানা খুঁজে বার করার প্রয়াস, কেউ ভাড়াবাড়িতে গিয়ে উঠল, কেউ পতিতজমি খুঁজে বার করে বেঁধে ফেলল-বেড়ার ঘর। যারা তাও পারল না, তারা শিয়ালদহ স্টেশনের চত্বরে, নোংরা ফুটপাতে শুয়ে থাকল ভিখিরির মতো। কিছুদিন পরে তাদের চেহারা দেখে আর বোঝাই গেল না, পূব-বাংলায় তাদের ভিটেবাড়ি ছিল, জমিজমা ছিল, বাগান ছিল, একটা সম্মানজনক পরিচিতি ছিল সমাজে। নোংরা কাপড়ে, রোদে জলে, বৃষ্টিতে ভিজে অভুক্ত থেকে তাদের চেহারা হয়ে গেল ছন্নছাড়ার মতো।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার হঠাৎ একদিন মরীয়া হয়ে দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোনও পতিত জমি দখল করতে। বহুবছর ধরে পড়ে থাকা এইসব জমিতে হয়তো দরকার ছিল না কারও। জমির মালিক হয়তো ভুলেই গিয়েছিল এ জমি তার কোনও কাজে লাগতে পারে। কিন্তু এভাবে রাতারাতি হাজার হাজার বিঘে জমি দখল হয়ে যেতে সক্রিয় হয়ে উঠল মালিকরা। তার সঙ্গে পুলিশ। যারা দখলদার, তাদের পুরুষেরা দিনের বেলা বাড়ি থাকত না। পুলিশ এলে ঠেকান দিত বাড়ির মেয়েরা। পুলিশ লাঠি নিয়ে যখন তাড়া করত, মেয়েবৌরা বেড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত দা, বঁটি, ঝাঁটা হাতে নিয়ে।

জীবেন্দ্রনাথ সেসব কথা ভাবলে অবাক হয়ে যান। তাঁদের বাড়ির মেয়ে-বৌরা এসব দৃশ্য ভাবতেই পারে না। অথবা হয়তো পরিস্থিতি তেমন হলে এভাবেই মরীয়া হয়ে ওঠে মানুষ। তখন আর বজায় রাখা যায় না লাজলজ্জা, মানসম্মান। কিছুক্ষণ পর মাথা নাড়াতে লাগলেন নিজের মনেই। ঈশ্বরীপুর এসে, অতখানি না হোক, তাঁদেরও কি আর কম অপমান সইতে হচ্ছে প্রতিদিন! কোর্টে গিয়ে নিত্য অসহযোগিতা। যেন এখানকার কাজকর্মে কোনও এক্তিয়ার নেই তাঁদের। অনাহৃত, অপাঙ্‌ক্তেয়। ঈশ্বরীপুর গাঁয়েও যেন তাঁরা প্রায় অচ্ছুত। সাতক্ষীরায় যে প্রতিপত্তি নিয়ে বাস করতেন, তার ছিটেফোঁটাও নেই এখানে। চাড়ুজ্জেপাড়ার লোকেরাও তাঁদের আড়ালে, কখনও মুখের ওপর রিফিউজি বলে অবজ্ঞার ভাব দেখায়।

আজও আনন্দবাবুকে আবার হঠাৎ তাঁদের বাস্তুর সীমানার কাছে আসতে দেখে সেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার চেহারাটা ভেসে উঠল তৎক্ষনাৎ। রনোকে, মণিকে, এমনকি তাঁর নাতি শঙ্খকেও ডেকে বলে দিয়েছেন, খবরদার, কেউ আর ওদের বাগানে আম কুড়োতে যাবিনে। কেউ আর যায়ওনি। কিন্তু তারপর আজ আবার কী কারণে এসেছেন আনন্দবাবু তা বুঝতে পারলেন না জীবেন্দ্রনাথ। একটু পরেই দেখলেন, অন্যদিনকার মতোই আনন্দ চাটুজ্জে হাঁটতে হাঁটতে আসছেন এদিকে। সেই খালি গা, ফর্সা রং, গায়ে বড় বড় লাল আঁচিল। পরনে হাঁটু অবধি ধবধবে ধুতি, কাঁধে একটা লাল গামছা ঝোলানো। মাথার চুল যেন আরও শাদা হয়ে উঠছে দিনকে-দিন। ফর্সা গায়ের রঙে লাল আঁচিলগুলো কী অদ্ভুত দেখায়। কে যেন বলেছিল, গায়ে লাল আঁচিল থাকলে সুখ, কালো আঁচিল থাকলে দুঃখ। তা লাল আঁচিলের কল্যাণে আনন্দবাবুর সুখের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। অত বড় দালান, কয়েকশ বিঘে ধেনোজমি, বাস, ট্রাক। লোকে বলে, পাহাড়ি এলাকায় তাঁর চা-বাগানের ব্যবসা আছে। যখন সেখানে ব্যবসার কাজকর্ম দেখতে যান, আসার সময় নিয়ে আসেন টুকরি টুকরি ফল। কমলালেবু, আঙুর, এইসব। তাঁদের বাড়ির পেছনে কমলালেবুর খোসার পাহাড় হতে চলেছে।

ভাবতে ভাবতে জলচৌকির ওপর আর উবু হয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না জীবেন্দ্রনাথের পক্ষে। অনেকখানি এগিয়ে এসেছেন আনন্দবাবু, একেবারে তাঁদের দাওয়ার কাছাকাছি। অতএব উঠে দাঁড়িয়ে পইঠা বেয়ে নেমে এলেন মাটিতে, বললেন, কেমন আছেন?

আনন্দবাবুর চোখ অন্যদিনকার মতো তেমন কঠিন দেখাচ্ছে না, মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। আনন্দবাবুকে ঠিক এমন বিমর্ষ ভঙ্গিতে দেখতে অভ্যস্ত নন কেউ। আরও আশ্চর্যের কথা, এগিয়ে এসে জীবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ভালো আছেন?

কিন্তু আশ্চর্য হওয়ার তখনও কিছুটা বাকি ছিল। যা এর আগে কখনও করেননি, তাইই আজ করলেন আনন্দবাবু। দাওয়ায় পেতে রাখা মস্ত চাটাইখানার উপর বসলেন পা ঝুলিয়ে। চাটাইটা স্নেহবাসিনীর তৈরি। পশ্চিম দিকের আমবাগান ছাড়িয়ে একটু পরেই সারসার খেজুর গাছ। শীতের প্রথমেই শিউলি সামসের আলি এসে তার পাতা ঝোড়ে। গাছের ডগা চেঁচে তাতে

দুটো চোখ করে তার গোড়ায় নলি বসায়। নলি বরাবর ঠান্ডা মিঠেন র: কিং
হয়ে যায় নলির নীচে পেতে রাখা মাটির ভাঁড়ে। ঝুড়ে ফেলে-দেওা
স্নেহবাসিনী কুড়িয়ে নিয়ে আসেন যত্ন করে। সেগুলো রোদ্দুরে শুকি
তারপর বঁটিতে চিরে বার করে নেন খেজুরপাতা। সেই পাতা ভর শী
একখানা চাটাই। আনন্দবাবু চাটাইএ বসতেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন জীবেন্দ্রনাথ, চা
কেন? দাঁড়ান, একটা মাদুর এনে বিছিয়ে দি—

মাদুর হল আর একটু আভিজাত্যের প্রতীক। আনন্দবাবুর মতো লোক চাটাইএ বসবেন তা কি হয়!

কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করলেন আনন্দবাবু, কেন, এই চাটাই তো বেশ ভালোই। বেশ আরাম লাগছে আমার। বৌঠান বুনেছেন তো?

স্নেহবাসিনী ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জীবেন্দ্রনাথকে শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখে, আনন্দবাবুর কথা শুনে সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ। যেন তাঁর শিল্পকর্ম ধন্য হয়ে গেল আজ।

আজ জীবেন্দ্রনাথের কাছেও যেন পরের পর বিস্ময়। অন্যদিন আনন্দবাবু এসে কঠিন চোখে জরিপ করে বেড়ান, তাঁর প্রজারা জমিজমা ঠিকঠাক রক্ষণাবেক্ষণ করছে কি না। আজ হঠাৎ সেই প্রজার বাড়ি বসেছেন প্রায় আত্মীয়ের ভূমিকায়। আত্মীয়ই তো। শুধু অনেক বড়লোক হয়ে গেলে আত্মীয় আর ঠিক ঘনিষ্ঠের পর্যায়ে থাকে না বলেই—

জীবেন্দ্রনাথও এবার বড় চাটাইখানার অপরপ্রান্তে বসে বললেন, তারপর সব কুশল তো?

আনন্দবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সব ঠিক কুশলে নেই। তাই আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এলাম।

বিস্মিত হয়ে জীবেন্দ্রনাথ বললেন, কীসের পরামর্শ?

—আপনি তো সারাদিন দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটাঘাঁটি করেন। ভালোই বোঝেন-টোঝেন এ সব। সে ব্যাপারেই কিছু শলাপরামর্শ করব।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জীবেন্দ্রনাথের। মনে হল, দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে এই বিভূঁয়ে এসে পড়েও তাঁর অভিজ্ঞতা তাহলে অসার্থক হয়নি। জিজ্ঞাসুচোখে, শিরা-ওঠা কপালে কোঁচ ফেলে তাকিয়ে রইলেন আনন্দবাবুর মুখের দিকে।

—বুঝলেন কিনা, খায়রাশোল মৌজায় প্রায় পঞ্চাশবিঘে জমি একলপ্তে কিনেছিলাম বছর ছয়েক আগে। হঠাৎ শুনছি, কী একটা আইন হচ্ছে, সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেবে গভর্নমেন্ট। আমার তো এখন অনেক জমি। এত সম্পত্তি নাকি গভর্ণমেন্ট রাখতে দেবে না।

শুনতে শুনতে জীবেন্দ্রনাথের চোখেমুখে ছুঁয়ে গেল একটা চাপা হাসির ঝিলিক, তাহলে বটগাছও একদিন ঝড়ে ভাঙে। তিনি শুনেছেন, আনন্দবাবুর বেশিরভাগ সম্পত্তিই অন্যের কাছ থেকে ঠকিয়ে নেওয়া। সে ভাবেই তাঁর এত জমিজমা, বাড়ি, গাড়িঘোড়া। অন্যের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে নিয়ে বড়লোক হয়েছেন আনন্দবাবু। আর নিজের অর্জিত সম্পত্তি স্বেচ্ছায় ফেলে রেখে এসে গরীব হয়ে গিয়েছেন জীবেন্দ্রনাথ। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য এখানেই।

খুব বিপদেই পড়েছেন আনন্দবাবু, নইলে দেমাক ভেঙে এভাবে ছুটে আসেন তাঁর প্রজার কাছে! ঘাড় নাড়লেন জীবেন্দ্রনাথ, একদিন দলিলগুলো দেখাবেন তো, দেখি কী করা যায়। গভর্ণমেন্টের আইন যেমন আছে, তার ফাঁকফোকরও থাকে তেমনই। সেদিন আমার আর এক মক্কেলকে ফাঁকির পথ বাতলে দিয়ে এলাম।

শুনে আশ্বস্ত দেখাল আনন্দবাবুর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখখানা। তাঁকে দেখতে দেখতে জীবেন্দ্রনাথের মনে হল, এখন তিনি আর প্রজা নন, এখন তিনি পরিত্রাতার ভূমিকায়। তাঁর পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছেন, ফিরে আসছে তাঁর হারানো বাস্তু। আনন্দবাবু উঠে চলে গেলেন একটু পরেই। উল্লাসে জীবেন্দ্রনাথ ডাকলেন, শঙ্খ, এই হারামজাদা—

সকালের লালসূর্য টলতে টলতে এখন উঠে এসেছে মাঝ-আকাশ বরাবর। ডা-ডা করছে শেষ-ফাল্গুনের দুপুর। ভোরের দিকে হিম-হিম, অথচ রোদ উঠলেই চড়চড়ে রোদ। চড়ারোদে তেতে উঠছে মাথার চাঁদি। এমন সময় ঠাকুর্দার 'শঙ্খ' ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল শঙ্খ।

উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে প্রায় আধঘন্টাটাক ধরে এক্কা-দোক্কা খেলছিল। এই আধঘন্টার মধ্যে উমনো কিনে নিয়েছে দোক্কার ঘরটা, ঝুমনো কিনেছে তেক্কার ঘর। ফলে এক্কার ঘরে খোলমকুচি ফেলে শঙ্খকে লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছিল চৌকোর ঘরে। চৌকোর ঘরে অবশ্য একপায়ে দাঁড়াতে হচ্ছিল না, দু'পায়ে দাঁড়ানো যায় লাফিয়ে গিয়ে, কিন্তু সেটাও শঙ্খর পক্ষে বেশ দুরূহ হয়ে যাচ্ছিল। উমনো আজ বড়-বড় করে কেটেছে ঘরগুলো। শঙ্খ যতবার ছুটে গিয়ে একলাফে দাঁড়াতে চাইছিল চৌকোর ঘরে, ততবারই হয় দাগে পা পড়ে যাচ্ছিল, না হয় আছাড় খাচ্ছিল লাফানোর পর। তাকে নাজেহাল হতে দেখে উমনো-ঝুমনো হেসে আর বাঁচছিল না। নীলরঙের ফুল-ফুল ফ্রকের নিচটা দু'হাতে তুলে ধরে মুখে চাপা দিচ্ছিল ঝুমনো, আর হেসে কুটপাট হচ্ছিল। উমনোও হাসছিল ঠোঁট টিপে-টিপে। দোক্কা আর তেক্কার ঘর দুইবোনে জোট বেঁধে কিনে নেওয়ায় এহেন ফাঁপরে পড়েছে শঙ্খ।

শঙ্খও অবশ্য একটা ঘর কিনেছে। সেটা ছক্কার ঘরের আধখানা। তাতে তার যে কোনও লাভ হয়নি সেটা এখন হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছে। ফুচ্‌ফুচ্‌ করে উমনো-ঝুমনোর হাসির ছর্‌রা তাকে লজ্জায় ফেলছিল। হেরে যাওয়ার অপমানে ধুঁকছিল সে।

মধ্য-দুপুরের দিকে ঢলে পড়া রোদের ঝাঁঝে আরও গরম হয়ে উঠছিল তার মাথা। বেলা বারোটা বাজেনি যদিও, এরমধ্যে ঠাক্‌মা এসে দু'দুবার তাড়া দিয়ে গেছে, ওরে শঙ্খ, চান করতি যা। বেলা দুকুর যে গড়াই গেল—

ছুটির দিনে এরকম অনিয়ম তো নিত্যিদিনই হয়ে থাকে। ছুটির দিনটা তাদের কাছে একটা মস্ত তেপান্তরের মাঠ। সেই মাঠ বরাবর তারা ছোটরা মিলে ছুটতে থাকে গোটা সকাল, সকাল থেকে দুপুর। স্নান করে খেয়েদেয়ে উঠতেই একটা-দেড়টা বাজে। এখনও গঞ্জ থেকে অবনীকাকা ফেরেনি। মণিকাকাও চাটুজ্জেপাড়ায় গেছে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করতে। তারও তো দেখা নেই। তাহলে শুধুমুধু শঙ্খকেই বা এত ডাকাডাকি কেন! ডাকতে এসে ঠাকমা বলে গেছে, অতবড় ধাড়ি ছেলে, মেয়েছেলেদের সঙ্গে খেলিস কেন, অ্যাঁ?

শঙ্খ অবাক হয়। উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে খেলা, আর মেয়েছেলেদের সঙ্গে খেলা কি এক! উমনো শঙ্খর থেকে এক বছরের বড়, ঝুমনো একবছরের ছোট। ছোটবেলা থেকে এমন কত

এক্কা-দোক্কা খেলে আসছে তারা। এক্কা-দোক্কা খেলে, কড়ি খেলে, বকুলবিচি খেলে, চু-কিৎ কিৎখেলে, এমনকি উমনো-ঝুমনোদের পুতুল-খেলার আসরেও হাজির থাকে সে।

এতকাল তো কেউ তাদের সঙ্গে খেলায় বাদ সাধেনি! আজ হঠাৎ উমনো-ঝুমনো মেয়েছেলে হয়ে গেল!

খেলার ফাঁকে ফাঁকে উমনো-ঝুমনোদের দিকে বারকয়েক তাকিয়ে দেখল।যেন একটু অন্যচোখেই। উমনো-ঝুমনো নামদুটো শঙ্খর বেশ পছন্দের। নামদুটো রেখেছিলেন শঙ্খর ঠাকমা স্নেহবাসিনীই। তখন ঝুমনো সবে হয়েছে, উমনো দু'বছরের। এক অঘ্রানমাসের রবিবারে ইতুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে উমনো-ঝুমনোর মাকে বলেছিলেন তোর মেয়েদুটোর নাম উমনো-ঝুমনো রাখ, প্রভা। প্রথম জীবনে তোর মেয়েরা কষ্ট পাচ্ছে, কালে কালে ওরা নিশ্চয় বড়লোক হবে।

সেই উমনো-ঝুমনো এখন মাথায় বেশ বড় হয়ে গেছে। এখন দু'জনেরই পরনে নীলরঙের ফুল-ফুল ফ্রক। উমনোর মাথায় চুলের রাশ, একটা নীল ফিতে দিয়ে বেণী করে বাঁধা। ঝুমনোর চুল এখনও বেণী-বাঁধার মতো লম্বা হয়নি, ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা ঝাঁকড়া চুল এতক্ষণ লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে খেলার ফলে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে চোখেমুখে। সে চুলের রাশ ঝুমনো যতবার হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে, পরক্ষণে ঝামরে পড়ছে মুখে। পিঠোপিঠি দুইবোনে এই ভাব এই ঝগড়া। ঝগড়ার সময় ঝুমনোই একটু প্রবল হয়ে ওঠে, উমনোর পিঠে কিলও বসায় ঝপাঝপ। উমনো হাসে, সে বড় বলে ঝুমনোর দৌরাত্ম্য অম্লানবদনে সহ্য করে।

এহেন উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে শঙ্খর সেই জ্ঞান-হওয়া অবধি ভাব-ভালোবাসা। একসঙ্গে পাঠশালা যেত আগে। টইটই করে আগানবাগান ঘুরতেও শঙ্খ উমনো-ঝুমনোর সঙ্গি। খেলেও একসঙ্গে। কখনও তাদের খেলার সঙ্গি হয়ে আসে উমনো-ঝুমনোর ছোটভাই টুপুর। টুপুর ঝুমনোর চেয়ে দেড়বছরের ছোট। নিতান্তই ছোট বলে টুপুর ওদের সঙ্গে খেলায় পারে না। সে কেবলই হেরে যায়। খানিকক্ষণ খেলার পরেই হেরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে খেলা ভন্ডুল করে দেয় ওদের। আজও একটু আগে ঝুমনোর সঙ্গে হাতাহাতি করে উমনোর চুল টেনে চলে গেছে তার মায়ের কাছে। গিয়ে নালিশ করেছে, ওকে তারা যড় করে হারিয়ে দিচ্ছে বারবার। এরপরই সাধারণত উমনো-ঝুমনোর মা কঞ্চির ছপ্‌টি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। ঝুমনোকে তাড়া করে নিয়ে যান অনেকদূর—সেই ইছামতীর কিনার পর্যন্ত। ঝুমনো পালিয়ে চলে যায় খেয়াঘাটের ভেতর। এখনও উমনো-ঝুমনোর মাকে ছপ্‌টি হাতে দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় কোনও কাজে ব্যস্ত আছেন। আজ শঙ্খ চাইছিল, খেলাটা ভেঙে যাক। সে আজ ডাহা হেরে গেছে উমনো-ঝুমনোর কাছে। তাতে লাল হয়ে উঠছিল তার মুখ। হেরে যাওয়ার লজ্জা থেকে মুখ বাঁচাতে চাইছিল যা-হোক করে।

রোদ তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে চারদিকে। বারতিনেক আছাড় খাওয়ার পর যখন সে অপেক্ষা করছে উমনো-ঝুমনোর কাছে 'হেরে গেছে—দুয়ো' বাক্যবাণে বিদ্ধ হওয়ার, সেইমুহূর্তে ঠাকুর্দার 'শঙ্খ—' ডাক শুনে বর্তে গেল। এমন একটি ডাকের জন্য কতক্ষণ ধরে যেন অপেক্ষা করছিল সে। হাতের খোলামকুচিটা ঝুমনোর দিকে ছুড়ে দিয়ে 'দাঁড়া, আসছি' বলে ছুটতে ছুটতে চলে গেল তাদের বাড়ির দিকে। যেন পালিয়েই গেল। গিয়ে দেখল, ঠাকুর্দা তাঁর জলচৌকির ওপর ঠায় বসে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নতুন মাটি ফেলা ভিতটার দিকে। ঠিক যেন তাকিয়ে নেই, ভাবছেন। গভীর কিছু ভাবছেন।

শঙ্খ বুঝতে পারল না, কেন ডেকেছেন ঠাকুর্দা। তবে কি এত বেলা পর্যন্ত ডা-ডা রোদ্দুরে

এক্কা-দোক্কা খেলছে উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে সে কারণেই! না কি পড়ার বই শিকেয় তুলে খেলায় মত্ত হয়ে আছে তাইই? কিন্তু ঠাকুর্দা সাধারণত বকাবকি করেন না তাকে। অন্তত পড়ার কারণে তো নয়ই। বরং সন্ধেবেলা পড়তে বসার পর যখন তার চোখে ঘুম এসে যায়, হারিকেনের ওপর ঢুলে পড়ে, চিমনিতে ঠুল খেতে খেতে বেঁচে যায় দু-একবার, তখন ঠাকুর্দারি গলা শুনতে পায় বিছানার ওপর থেকে, ওরে, ওঠ, ওঠ, শুয়ে পড়। যা হবার তা হবে। তখনও হয়তো ঘড়িতে রাত আটটাও বাজেনি। ঠাকুর্দারি কথা কানে যাওয়ামাত্র সে বইখাতা গুটিয়ে তাকে তুলে রাখে। তারপর ঠাকুর্দারি পাশে গিয়ে একেবারে লম্বা। তাহলে আজ হঠাৎ ডাকলেন কেন!

—দাদু, আমারে ডাকছ?

—কেডা? ঠাকুর্দা যেন সম্বিত ফিরে পেলেন হঠাৎ। বললেন, তোর বাবারে তো দু-তিনখান পত্তর দেলাম। তার একখানারও জবাব এল না।

শঙ্খ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে ঠাকুর্দারি ফর্সা কোঁচপড়া মুখের দিকে। কী বলতে চাইছেন তা স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারল না। কী কারণে তার বাবাকে চিঠি দিয়েছেন ঠাকুর্দা, তা অবশ্য জানে। সেই কথাটাই ঠাকুর্দা আবার বললেন, এ বছর বর্ষাবাদলার আগে ঘরখানা না বাঁধলিই আর নয়। তোর বাবারে তোর জবানিতে একখান পত্তর দে। লিখে দে, শত্‌খানেক টাকা পাঠাও। নইলে ভরবর্ষাকাল জলে ভিজতি হবে এবার। কী, পারবিনে?

শঙ্খ তৎক্ষনাৎ ঘাড় নাড়ল, সে পারবে। গত বর্ষায় এক-এক ভন্নার দিনে ঘরের ভেতর ভিজে একশা হয়ে যেতে হয়েছে তাদের। মাঝরাত্তিরে গোলপাতার চাল ফুঁড়ে যেভাবে মশারির ভেতর টুপিয়ে জল পড়েছে, বিছানা ভাসিয়েছে, তাতে তাদের সবাইকে জেগে রাত কাটাতে হয়েছিল কত রাত।

—একখান্ পোস্টোকার্ড দিও। আমি লিখে দেব'খন।

শঙ্খর উত্তর শুনে ঠাকুর্দা আশ্বস্ত হলেন। তাঁর বিড়ির কৌটো থেকে নীলসুতোর বিড়ি বার করে তাতে আগুন ধরাতে ধরাতে বললেন, যা আক্রার দিনকাল পড়েছে, তাতে এই মাগ্গীগন্ডার দিনে একখান ঘর তুলতি কত টাকার হাঙ্গামা তা কে জানে। ঘরামিরা তো 'দা ঠাকুর নেমি পড়েন, ও ঠিক হয়ি যাবে' বলে নামিয়ে দিল কাজে। এদিকে একখানা বাঁশনি বাঁশের দাম তিনটাকা নেচ্ছে। সরু তড়পি বাঁশের দাম ষাটটাকা শ। সব জিনিষ কী আক্রা।

শঙ্খর ততক্ষণে চোখে পড়েছে, উমনো-ঝুমনো খেলা থামিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে নেই। তারা খেলা শুরু করেছে ফের। তাদের সঙ্গে খেলায় এসে যোগ দিয়েছে চাড়ুজ্জেপাড়ার জবা। জবা বেশ পাড়াবেড়ানি মেয়ে। বয়সে ঝুমনোর চেয়ে এক-আধমাসের ছোটই হবে, কিন্তু গড়নে-পেটনে বড় লাগে তাকে। এমনকি শঙ্খর পাশে দাঁড়ালেও জবাকেই একবছরের বড় বলে মনে হবে। সে এই অবেলায় এসে উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে খেলতে লেগে গেল তাতে কিছু আশ্চর্য হওয়ার নেই। জবার ধরনই অমন। যেমন টরটর করে কথা বলে, তেমনি তার চোখমুখ নাড়া।

শঙ্খ পায়ে-পায়ে চলে এল খেলার জায়গায়। এসে দেখল, জবা শঙ্খর জায়গায়ই দান নিয়ে খেলছে। একটু বেশিরকম স্বাস্থ্য ভালো বলে সে দিব্যি শঙ্খর বদলে নেমে বেশ দাপটের সঙ্গে খেলছে। এক্কায় খোলামকুচি ফেলে সে আশ্চর্য কৌশলে সরাসরি লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়াল চৌকোর ঘরে। শঙ্খ অবাক হল, মনে-মনে তারিফ করল, ঘাড় নাড়তে নাড়তে ভাবল জবার এলেম আছে বটে। রাজকন্যার মতো নরম-নরম মেয়ে নয়, তার দাপটে উমনো-ঝুমনোও ঠান্ডা। উমনো-ঝুমনো অবশ্য শঙ্খর দিকে আর তাকাচ্ছেই না। তারাও এখন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে জবার সিড়িঙ্গে লম্বা দুটো পায়ের দিকে। হঠাৎ কী করে যেন ভীষণ লম্বা হয়ে গিয়েছে জবা।

শঙ্খকে ছাড়িয়ে আরও অনেকটা। জবা এখন পাঞ্জার ঘর কিনে নিলে উমনো-ঝুমনো বেশ নাকানি-চোবানি খাবে তাতে সন্দেহ নেই।

'কেন আমাকে বাদ দিলি, আমি খেলব' তা এখন বলতে পারে শঙ্খ। সে হেরে যাচ্ছিল এই ভেবে তার কুঁকড়ে থাকার কথা। কিন্তু জবা এসে যাওয়ায় সে এখন আশ্বস্ত। বলতেই পারে, 'কেন বাদ দিলি? আমি পারতাম।' কিন্তু বলল না কিছু। ঝাঁ-ঝাঁ একগলা রোদের ভেতর সে কেবল জবার দিকে তাকিয়ে আছে বিস্ফারিত চোখে। কী অবলীলায় জবা খোলামকুচি ছুড়ছে। পরনের লালরঙের স্কার্টটা নাচাতে নাচাতে আর একটা ঘর কেনার তোড়জোড় করছে। তাতে উমনো-ঝুমনো কতটা নাজেহাল হবে ভেবে শঙ্খ এখন সুখ পাচ্ছে খুব। একটা নিষ্ঠুর সুখ।

জবার পরনের স্কার্ট-ব্লাউজটা বেশ দামি। ওর ঠাকুর্দা আকিঞ্চন চাটুজ্জে হলেন চাটুজ্জেপাড়ার ন' তরফ বেশ বড়লোক মানুষ ওরা। ঠিক কতটা বড়লোক তা শঙ্খর উপলব্ধিতে কুলোয় না। তবে আনন্দ চাটুজ্জের মতো তিনতলা না হলেও ওদের ইস্কুলবাড়ির মতো এল-প্যাটার্নের লম্বা দোতলা বাড়িটা কম পেল্লাই নয়। অনেক ধেনোজমি ওদের। বাড়িতে চাকরবাকরও কম নয়। খুব সম্প্রতি বাসও কিনেছে একটা। বাস থাকা মানেই বড়লোক।

তবে বড়লোক বলে জবার দেমাক তেমন নেই। সে প্রায়ই উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে খেলতে চলে আসে এদিকে। উমনো-ঝুমনোও কখনও চলে যায় জবাদের বাড়িতে। শঙ্খও যায়। জবাদের বাড়ি গেলে তাদের ঐশ্বর্যের ছোঁয়া একটা অন্যরকম আহ্লাদ এনে দেয় ওদের শরীরে। সে আহ্লাদের রকম মুখে ঠিক বলা যায় না। তবে বড়লোকদের বাড়ি গেলে আহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তিও যেন ঘিরে ধরে ওকে। সেও ঠিক প্রকাশ করা যায় না।

বরং শঙ্খ সেসময় চলে যায় জবাদের পাশেই যতীনদাদের বাড়ি। তার বৌকে মণিকাকারা ডাকে রাঙাবৌদি বলে। শঙ্খও রাঙাবৌদি বলে। লাল টুকটুকে চেহারা, মাথায় লাল আঁচলের ঘোমটা দিলে ভারী চমৎকার দেখায় রাঙাবৌদিকে। রাঙাবৌদির কোনও ছেলেপুলে হয়নি। শঙ্খকে দেখলে তিনি প্রায়ই তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, আমার ছেলে হলে ঠিক তোর মতো হতো। রাঙাবৌদির শাশুড়ি কিন্তু ভারী ঝগড়ুটে। প্রায়ই ভীষণ হেনস্থা করে রাঙাবৌদিকে। একা-একা রাঙাবৌদি তখন কাঁদে। শঙ্খ কখনও গিয়ে দেখেছে, তার চোখদুটো লাল, ফোলা-ফোলা।

রাঙাবৌদি কষ্ট পেলে কি জানি কেন ভীষণ দুঃখ হয় শঙ্খর। রাঙাবৌদির তিনকূলে কেউই তো নেই।

রেজাল্ট-আউটের পর এখনও দু'মাসও হয়নি শঙ্খদের ক্লাস শুরু হয়েছে। মাত্র দু-তিনটে নতুন বই কেনা হয়েছে তার। বাকি সব পুরনো। নতুন বই ক'টার শাদা পৃষ্ঠায় ঝকঝকে কালো অক্ষর। সে দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকেছে কতদিন। নতুন বই মানে এক নতুন পৃথিবী। তার ভেতরে কত অক্ষর। অক্ষরে অক্ষরে মিলমিশ হয়ে সহসা একটা অচেনা জগৎ উন্মোচিত হয় শঙ্খর চোখের সামনে।

নতুন বইএর মধ্যেই কয়েকদিন বুঁদ হয়ে ছিল শঙ্খ। তার পর আজ সকাল থেকে কেন যেন লাগামহীন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ একদিন পড়ার বই থেকে মুক্তি পেলে পৃথিবীটা অন্যরকম মনে হয়। আজ খুব ভোরে পল্টন এসে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল অন্য এক রোমাঞ্চের ভেতর। পল্টন থাকে শঙ্খদের থেকে একটা বাড়ি পরেই। ওর বাবা রোহিনীনন্দন মুখুজ্জে ইস্কুলের শিক্ষক। শিক্ষক বলেই নিয়মানুবর্তিতা পছন্দ করেন ভীষণ। তাঁর সতর্ক নজর এড়িয়ে বইখাতা

শিকেয় তুলে সাতসকালে পল্টন এসে ফিসফিস করেছিল, চ, শঙ্খ একটু সরেজমিন করে আসি।

মাস দু-তিন আগে বসিরহাট থেকে সরকারি আমিন ওদের এলাকার সব বাড়িঘর ফিতে ফেলে মাপজোক করতে এসেছিল। তারা বলাবলি করত, সরেজমিন তদন্তের ফল রেজিস্টারে উঠবে। মাপজোকের সময় খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন জীবেন্দ্রনাথরা সবাই। এতসব মাপজোক করে কী হবে তা শঙ্খরা না জানলেও সরেজমিন শব্দটা ভারী পছন্দ হয়েছিল তাদের। পল্টন সরেজমিন করতে যাচ্ছে শুনে শঙ্খও লাফিয়ে উঠেছিল প্রথম ঝট্‌কায়। পরক্ষণেই উৎসাহ নিভিয়ে বলে উঠেছিল, না রে—

শঙ্খ বলল বটে, কিন্তু যেতে খুবই ইচ্ছে করছে তার। পল্টনের সঙ্গে সরেজমিন করতে যাওয়া মানে এক অন্য উত্তেজনা। যেন কোনও নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে সরেজমিন শব্দটার ভেতর। অথচ আনন্দ চাটুজ্জের জমিতে যেতে বারণ করেছেন ঠাকুর্দা।

পল্টন বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ না হয়ে বলেছিল, সে তো আনন্দ চাটুজ্জের জমিতে যেতে না করেছেন। আমরা যাব আকিঞ্চন চাটুজ্জের জমিতে।

শঙ্খ বইখাতা মুড়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে পট্‌ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এক নিষিদ্ধ অভিযানের গন্ধে শিরানি জেগেছিল তার শরীরে। ঠাকুর্দা বোধহয় গঞ্জের দিকে গিয়েছেন বাজারঘাট করতে। পেছনের কামরা থেকে রনোকাকার পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঠাকুর্দা বাড়ি থেকে বেরুনোর পর মণিকাকাও নিশ্চয় এতক্ষণে চাড়ুজ্জেপাড়ায় চলে গেছে বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে। ঠাক্‌মা রান্নাঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত, এই ফাঁকে একলহমা আকিঞ্চন চাটুজ্জের জমিতে সরেজমিন করে আসার লোভ কি সামলানো যায়!

পল্টনের সঙ্গে ধাঁ করে বেরিয়ে পড়েছিল তক্ষুনি। শঙ্খদের বাড়ির পেছনে বাঁশবন আর খেজুরবাগানের মধ্যেকার একচিলতে মেটেপথ পেরিয়ে চলে গিয়েছিল ঘোলসাপুকুরের দিকে। ঘোলসাপুকুরের পেছনদিকে মরাসোঁতার মস্ত চরজমি। লম্বা ফালি জমি বহুদূর চলে গেছে হয়তো রথতলার দিকে। সেই চরের জমিতে থিকথিক করছে অসংখ্য খেজুরগাছ। মরুভূমিতে নাকি একমাত্র খেজুরগাছই যা হয়। এ খেজুরগাছ সব আকিঞ্চন চাটুজ্জের। শিউলি সামসের আলি ভর শীতকাল ধরে খেজুরগাছ ঝুড়ে তাতে নলি বসিয়ে রস সংগ্রহ করে। রোজ ভোরবেলা এক খেজুরগাছ থেকে আর এক খেজুরগাছে উঠে উঠে সেই রস পেড়ে জড়ো করে তার বাড়ির উঠোনে। সারাদিন তাতে জ্বাল দেয়। জিরেন রস হলে নলেন পাটালি, ওলারস হলে গুড় তোয়ের করে। শঙ্খ কতবার সামসের আলির বাড়ি গিয়েছে পাটালি কিংবা গুড়ের সন্ধানে। সামসের আলির হাতের মৌঝোলা গুড় ভারী সুস্বাদু।

আজ সারা সকাল পল্টনের সঙ্গে মরাসোঁতার চরে ঘুরে বেড়িয়েছে শঙ্খ। কোন কোন খেজুরগাছে আবার নতুন করে কাট্‌ দিতে পারে তাইই সরেজমিন করছিল দু'জনে। মরাসোঁতার বাঁশের সাঁকো পার হয়ে দু'জন মুনিশ তখন আসছিল এদিকে, সন্দেহজনকভাবে দুই বালক ঘুরছে দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কিসের লগে ঘুরতিছ, খোকারা?

খুব চমৎকার বানিয়ে বলতে পারে পল্টন, পট করে উত্তর দিয়েছিল, আমাদের একটা বাছুর ছুটকে এদিকে কোথাও এয়েছে কিনা, তাই সরেজমিন দেখতি এসছি—

ও, লোকগুলো চুপ করে গিয়েছিল। পল্টন এমন ডাহা একটা মিথ্যেকথা কীভাবে ঠোঁটের গোড়ায় জড়ো করে রেখেছিল তাইই ভেবে অবাক হচ্ছিল শঙ্খ। হাজার চেষ্টা করলেও তার ঠোঁট দিয়ে এমন মিথ্যেটি বেরুবে না।

পল্টন আসলে একটু ডেকোহেঁকো ধরনের ছেলে। শঙ্খব চেয়ে ছ'মাসের ছোট হলেও তার

চেহারাটা বেশ খোলতাই। তার বাবার কঠোর নির্দেশে সে ভোরবেলা ব্যায়াম করে। ইছামতীর ধার বরাবর জোরে একপাক ছুটে আসে। তাইতেই দিনদিন নধর হয়ে উঠছে তার শরীর। তাগড়াই চেহারার সঙ্গে তার বুকের ভেতর সাহসও একটু বেশিরকম ভরা। শঙ্খ জানে, এই যে এখন সাতসকালে পল্টন টো টো করে আকিঞ্চন চাটুজ্জের খেজুরবাগান ঘুরে যাচ্ছে, তার একটাই মানে—সে কাল ভোররাত্তিরে একটা-দুটো খালি ভাঁড় নিয়ে রওনা দেবে বাড়ি থেকে। তখনও হয়তো রাত ফর্সা হয়নি, ঘুরঘুট করছে শেষরাত, তাতেও প্রাণে একবিন্দু ভয় থাকে না পল্টনের। দিব্যি আনন্দ চাটুজ্জের বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে পা-টিপে-টিপে গিয়ে হাজির হবে এই দিকদিগন্ত বিস্তৃত খেজুরবাগানে। তারপর এ-খেজুরগাছ ও-খেজুরগাছ থেকে রস পেড়ে তার খালিভাঁড় বোঝাই করে নিয়ে যাবে বাড়ি।

পল্টন এমন ডেকোহেঁকো, নিডর, নিষ্কম্প শুধু! তার হাতের গুলতির টিপও কি কম? দূর অশত্থগাছের মগডালে বসে থাকা একটা ডাকপাখি কিংবা বককে সে বলে বলে একটিপে মাটিতে ফেলে দেবে। আর তাদের পাঠশালার থার্ডমাস্টার ভোদো ভটচায্যির কপালে কী ঘটেছিল সে কথাও কি শঙ্খ ভুলে যাবে কোনও দিন। বেতের ছপ্‌টি দিয়ে পল্টনকে পড়া-না-করে-আসার শাস্তি হিসেবে বারকয়েক ধাঁই ধাঁই করে পিটিয়েছিলেন থার্ডমাস্টার। পল্টনের হাতের ফর্সা তেলোয় ছপ্‌টির দাগ লাল লাল হয়ে দেগে গিয়েছিল, তিন-চারদিনেও মেলায়নি সে চিহ্ন। সে দাগ ক্রমে কালসিটে ধারণ করেছিল। তেলোর কালচে দাগ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই একদিন সিংহবাড়ির পাঁচিলের এক দুরূহকোণে আড়াল করে বসে তার লাল রবারের মস্ত গুলতিতে পোড়ামাটির বাঁটুল ভরে নিয়ে অপেক্ষা করছিল পল্টন। ঠিক পৌনে এগারটার সময় থার্ডমাস্টার ভোদো ভটচায্যি যখন হনহন করে এগোচ্ছেন পাঠশালার দিকে, পল্টনের বাঁটুল সাঁই করে ছুটে গিয়েছিল তাঁর বিশাল চকচকে টাকটি লক্ষ করে। তৎক্ষনাৎ টাক চেপে পথের ওপর বসে পড়েছিলেন থার্ডমাস্টার। পল্টনের বাঁটুলের ঠিক ডবল-সাইজের হয়ে টাকটা ফুলে উঠেছিল।

পরে হি হি করে হাসতে হাসতে পল্টন বলেছিল, বাঁটুলটা বোধহয় টাকের ভেতর ঢুকে গেছে রে—

থার্ডমাস্টারের টাকের ভেতর বাঁটুল ঢুকে গিয়েছিল কি যায়নি তা শঙ্খ জানে না, তবে তারপর টানা পনের দিন তিনি আর পাঠশালায় আসতে পারেননি। তার পরও যখন এলেন, শঙ্খরা অবাক হয়ে দেখেছিল, তাঁর মাথায় সত্যিই বাঁটুলের আকারের একটা ফোলা। বদলার সেই চিহ্ন বেশ কয়েকদিন ধরে চোখে পড়েছিল ঈশ্বরীপুরের মানুষের।

এহেন পল্টনের সঙ্গে টো-টো করে ঘুরতে যাওয়ার রোমাঞ্চই আলাদা। কখনও খেজুরবাগানে কখনও মটরশুঁটির ক্ষেতে, কখনও আখবনে, কখনও বা আম কুড়োতে। শঙ্খর এই ন'দশবছরের জীবনে এমন কত না গা-শিরশির-করা দিন।

ভাবতে ভাবতে যখন শঙ্খর শরীর সত্যিই শিরশির করছে, তখন জবা আরও একটা ঘর কেনার তোড়জোড় করছে। তার পাশে চোখ ছানাবড়া করে দাঁড়িয়ে আছে উমনো আর ঝুমনো, হয়তো ভাবছে, এর চেয়ে শঙ্খর সঙ্গে খেললেই বোধহয় ভালো ছিল, তাতে এমন গো-হারা হারতে তো হতোই না, উল্টে হেরো শঙ্খকে দুয়ো দেওয়া যেত।

কিন্তু জবার আর ঘর কেনা হল না, তার আগেই তাদের চোখে পড়ল, শীতলাতলার ওদিক থেকে একজন তরুণ ধীর পায়ে হেঁটে আসছে তাদের দিকেই। তার হাতে একটা টিনের সুটকেস, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ । বেশ ফর্সা, সুন্দর চেহারার ছেলেটা, হয়তো মণিকাকার চেয়েও বড়, রনোকাকার বয়সীও হতে পারে, কি তার থেকে একটু কম, গালে হালকা-ধরনের গোঁফদাড়ি,

শঙ্খর মনে হল যেন কোন দেবদূতই। তাদের ক'জনকে এক্কা-দোক্কা খেলতে দেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, এখানে তোতা বাঁড়ুজ্জের বাড়ি কোনটা?

উমনো-ঝুমনো খানিকটা অবাক হয়ে গেল। তাদের মধ্যে উমনোই সবার থেকে বড়, সে চটপট আঙুল তুলে বলল, ওই তো, ওই বাড়িটা, আমাদের বাড়ি।

—তাই! তরুণটি উমনোর মুখের দিকে একবার গভীর করে তাকাল, কী যেন ভাবলও একলহমা, তারপর আস্তে আস্তে পা বাড়াল সে-বাড়ির উদ্দেশে। ঝুমনো অবাক হয়ে বলল, কে রে?

উমনোর বিস্ময় তখনও যায় নি। তার এই দশ-এগার বছরের জীবনে এহেন কোনও আত্মীয়কে দেখেনি কখনও। তাঁদের সাত-সাতখানা পিসি, তারা কেউ না কেউ অহরহ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঈশ্বরীপুরে বেড়াতে আসে, থেকেও যায় দু-দশদিন। তাদের প্রত্যেকের ঠিকুজি-কোষ্ঠি উমনোর মুখস্থ। কিন্তু এই তরুণটি তো তার অচেনাই। সে ঘাড় নাড়ল, এই তরুণটিকে সে চেনে না।

জবা তখন তাড়া দিচ্ছে, এই এদিকে তাকা, এই ঘরখানা আগে কিনে নি।

কিন্তু উমনো তখনও থ হয়ে আছে, বলল, একটু পরে কিনিস জবা, একটুক্ষণ দেখে আসি, ছেলেটা কে?

জবা ঠোঁট উল্টে বলল, বাবা, দু'দন্ড পরে দেখলি হবে না? ছেলেটা তো থাকতেই এয়েচে। পালিয়ে তো যাবেনা। সুটকেস-ব্যাগ নে যখন এয়েচে—

কিন্তু উমনো ততক্ষণে তার এলোচুল দু'হাত তুলে খোঁপা করতে করতে ছুটেছে তাদের বাড়ির দিকে। সেদিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে জবা হঠাৎ বলল, এই শঙ্খ, তুই খেলবি, আয় না—

শঙ্খ ঘাড় নাড়ল, এখন আর খেলব না। বেলা দুকুর হয়ে গেছে। এক্ষুনি ঠাকমা লাঠি নিয়ে এল বলে—। চান করতি যেতি হবে। এই ঝুমনো, গাঙে চান করতি যাবি?

ঝুমনোরও তখন উসিবিসি শুরু হয়ে গেছে ভেতরে-ভেতরে। সে তার ঘাড়-অবধি নেমে-আসা ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, ধুর, গাঙে তো কামট এয়েচে। চান করতি গিয়ে মরি আর কি—

শঙ্খ ভুলেই গিয়েছিল কামটের কথা। আরে তাই তো। সেদিন খেয়াঘাটের কালোমানিককাকা তো বলছিল, ইছামতীর জলে কামট দেখতে পেয়েছে কে যেন।

ঝুমনোও তখন বাড়ির ভেতরে যাওয়ার তোড়জোড় করছে। উমনো এতক্ষণে হয়তো নতুন-আসা ছেলেটার মুখ থেকে হাঁ করে কত-না গল্প শুনছে। সেসব গল্প থেকে ফাঁকি পড়ে যাচ্ছে ঝুমনো। কিন্তু যাব-যাব করেও তার আর ভেতরে যাওয়া হল না। একরাশ বিস্ময় নিয়ে বেরিয়ে এসেছে উমনো। উত্তেজনায় তার এলো-করে-বাঁধা খোঁপা ফের ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে পিঠময়, ছুটতে ছুটতে এসে বলল, জানিস, অর্ঘদা এখানে একেবারে থাকবে বলে এয়েচে।

তাহলে নতুন যে মানুষটা তাদের বাড়িতে এল, তার নাম অর্ঘদা।

—এখেনে থাকবে? একেবারে?

ঝুমনোর গলায়ও তখন একরাশ অবাক মাখানো।

—একেবারে। এখেনে থেকে পড়বে। এখেনকার ইস্কুলে ভর্তি হবে।

শঙ্খও অবাক হয় কম নয়। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে উমনো। তার ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

হয়তো বাড়ি পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ফের দৌড়ে এসেছে বলে—

—কোন ক্লাসে ভর্তি হবে রে অর্ঘদা?

—ক্লাস টেনে। এবারেই তো ফাইনাল দেবার কথা ছিল। ওখানকার ইস্কুল ভালো নয় বলে ছেড়ে দিয়ে চলে এয়েচে।

শঙ্খর আবার অবাক হওয়ার পালা। যে-কিনা এবার স্কুল ফাইনাল দেবে, সে ইস্কুল ভালো নয় বলে ইস্কুল ছেড়ে চলে এল ঈশ্বরীপুর! তাদের এখানে মাদারিপুর হাইস্কুলের যে বেশ নামডাক আছে তা তো দশবিশটা গাঁয়ের লোক জানেই, কিন্তু তাই বলে—

—কোত্থেকে এল রে তোদের অর্ঘদা?

এইটুকু সময়ের মধ্যে অনেক খবর জোগাড় করে এনেছে উমনো। তৎক্ষনাৎ চোখমুখ নেড়ে বোঝাতে বসল, সে অনেক দূরের দেশ। সেই বর্ডারের কাছে। হিন্দুস্থান-পাকিস্থান হয়েছে যেখেনে। ওদের গাঁয়ের নাম কাঁকিদহ।

কাঁকিদহ! বাহ্, বেশ নাম। কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ যেন ছড়িয়ে আছে কাঁকিদহ নামটার মধ্যে. কেন মিষ্টি তা শঙ্খ বুঝতে পারে না। বর্ডারের কাছে আর একটা গাঁযে তার বাবা-মা থাকেন, সে গাঁ-টার নাম সাগরদ', ঠিক সেইজন্যেই কি! না কি বর্ডারের কাছে বলে ওপার-বাংলার একটা সবুজ ঘ্রাণ মিশে আছে কাঁকিদহের নামের সঙ্গে! অথবা অচেনা কোনও গাঁয়ের কথা শুনলেই শঙ্খর বুকের ভেতর একটা রূপকথার জগৎ অমনিই তৈরি হয়ে যায়, তাইই! অচিন মানুষ, অচিন গাঁ, অচেনা পরিবেশের উপর শঙ্খর একটা চিরকালীন টান। সেই রহস্যময় নতুন দেশ থেকে একটা নতুন মানুষ অনেক পথ উজিয়ে এসেছে বলে শঙ্খর ভেতরে একটা অন্য শিরানিব জন্ম হচ্ছে এই মুহূর্তে।

উম্‌নো ততক্ষণে বলছে, জানিস, আমাদের ইছামতী দেখে অর্ঘদার খুব আমোদ হয়েছে। বলছে, আম্মো তো নদীনালার দেশের মানুষ, তাই নদী দেখলে ভারী আমোদ হয়। নদীর জল কত দূর-দূর দেশের মাটি ছুঁয়ে আসে—

অর্ঘদা তাহলে নদীনালার দেশের লোক! তাই তার চোখদুটোয় এমন একরাশ স্বপ্ন মাখানো রয়েছে চমৎকারভাবে। 'নদীনালার দেশের মানুষ' কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ বুঝতে পারল, কেন অর্ঘদা নামের নতুন মানুষটা,আর তার কাঁকিদহ গাঁ-টিকে এতক্ষণ ভালো লাগছিল তার। আসলে অর্ঘদাও যে নদী ভালোবাসে, সেও যে নদীনালার দেশের মানুষ, তা তাকে একপলক দেখেই তখন মনে হয়েছিল। শঙ্খ নিজেও তো নদী ভালোবাসে। ওই, একটু দূরের ইছামতী নদী যে তার প্রাণের প্রাণ প্রিয়। নদীর সঙ্গে তার যে কত ভালোবাসা, তার সঙ্গে সারাদিন কত যে কথা বলে শঙ্খ!

ভাবতে ভাবতে অর্ঘদা নামের নতুন অচেনা মানুষটিকে ভারী পছন্দ হয়ে গেল শঙ্খর। হঠাৎ মনে হল, সে একছুট্টে উমনো-ঝুমনোদের বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়, অর্ঘদার সঙ্গে আলাপ করে আসে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় তার সব কথা। তার কথা, তার আত্মীয় পরিজনের কথা, তার গাঁ কাঁকিদহের সব বৃত্তান্ত। কিন্তু পারল না। নতুন কোনও মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে যে তার বরাবরের ভারী লজ্জা।

সেদিন দুপুরে ঘোলসাপুকুরে ঝুপঝুপ করে ডুব দেওয়া থেকে শুরু করে বিকেলের মন-কেমন-করা ক্ষণটুকু পর্যন্ত সেই লজ্জা ঘিরে রইল শঙ্খর সারা শরীর। সন্ধেয় বই নিয়ে পড়তে বসার সময়ও বারবার মনে পড়ছিল নদীর কথা। নদী যার প্রিয় সেই মানুষটার কথা। এই ইছামতী নদীও নিশ্চয় ভারী পছন্দ হয়ে যাবে অর্ঘদার।
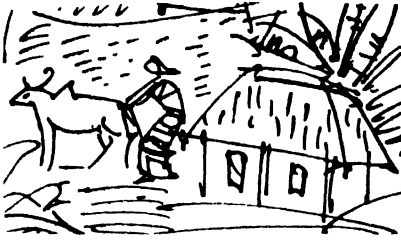
ইছামতীর জলে এখন ভাঁটার লগনশা। কিনার থেকে জল নেমে গেছে অনেকখানি, কয়েকটা খেজুরগাছের ছোট-ছোট গুঁড়ি ফেলে সিঁড়ি বানানো রয়েছে। তার উপর পা রেখে এক-পা এক-পা করে সে রোজ নেমে যায় জলের কিনারে। জলে আঙুল ডুবিয়ে বলে, নদী, ভালো আছো তো?

নদীর সঙ্গে দিনে অন্তত একবার দেখা না হলে ভারী মন খারাপ হয়ে যায় শঙ্খর। তাদের বাড়ি থেকে একদৌড় দিলে শীতলাতলা। সেখান থেকে বাঁদিক বরাবর ছুটলেই ইছামতী। ইছামতীর জলে মাঝেমধ্যে একটা চোরাটান ঘুলিয়ে ওঠে। ওরা বলে, ঘুর্ণি। ইছামতীর সঙ্গে শঙ্খর তেমনি একটা ভাব-ভালোবাসা, চোরাটান। জলের ধারে দাঁড়িয়ে সে ওই ঘুর্ণির মধ্যে পড়ে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। শুনতে পায় জলের খিলখিল হাসি, চটুল মস্করা। অনন্ত জলরাশি ক্ষণে ক্ষণে ঢেউ হয়ে চোখ নাচাতে থাকে শঙ্খর দিকে তাকিয়ে।

দুপুরে যেদিন ভাঁটা থাকে, ইস্কুল যাওয়ার তাড়া না থাকলে, তারা সব ছেলেমেয়ে মিলে ঝাঁপাই জুড়ে দেয় নদীর জলে। বহুক্ষণ উম্‌সুম্‌ হয়ে থাকে জলের নোন্‌তা স্বাদে। কিন্তু ভর জোয়ারের লগন হলে তখন নদীর অন্যরূপ। তখন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে হয় ইছামতীকে। একূল ওকূল জুড়ে থইথই করে পুরুনির জল। হাওয়া থাকলে ছোট ছোট ঢেউ। তার সঙ্গে জলের চোরাটান। তখন ইচ্ছে করলেও এত বড় গাঙ সাঁতরে পার হতে পারবে না সে।

রাত একটু গভীর হয়ে এলে হঠাৎ মিঠেন হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসে আড়বাঁশির সুর। শব্দটা আসে খেয়াঘাটের মাঝি কালোমানিকের চালাঘর থেকে। ক্লাস সিক্সের পড়া তোয়ের করতে করতে তখন হয়তো ঝিম ধরেছে শঙ্খর চোখে। ঘুম-ঘুম চোখে বাঁশির আওয়াজ এসে ঠোনা দিতেই ঘুম উড়ে যায়। মন চলে যায় খেয়াঘাটের দিকে, প্রায় উড়তে-উড়তেই।

এখন গভীর রাতে খেয়ানৌকোর হালে জিরেন। মাঝি কালোমানিক তার ছোট্ট চালাঘরে বসে আছে ঠেসান্‌ দিয়ে। পড়ার বইএ চোখ রেখেই শঙ্খ বুঝতে পারে, আড়বাঁশিতে ঠোঁট নড়াচড়া করছে কালোমানিকের। লম্বা আঙুলগুলো ফুঁয়ের কাঁপনের সঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে সুরের ঝিরিঝিরি। কালো টিকের মতো গায়ের রং কালোমানিকের। সুঠাম চেহারা, মাথার চুলে আলবোট কাটা। দিনকতক আগে শঙ্খকে স্নানে নামতে দেখেই হাঁ হাঁ করে উঠেছিল, এ গাঙে আর চান করবা কীরম করে। কাল তো সন্ধের লগনে কামট দেখা গেছে —

শঙ্খর পা মাটির সঙ্গে তক্ষুণি গেঁথে গিয়েছিল নিথর হয়ে। এই কালই তো সে ঝাঁপাই জুড়ে স্নান করে গিয়েছে নদীতে। এর মধ্যে কামট এসে গেল কখন!

এ গাঙে কোন মরসুমে কখন যে কামট এসে পড়বে তা কেউ জানে না। তখন আর অনেকদিন গাঁয়ের কেউ পা দেয় না নদীর জলে। ক'দিন ডিঙিও ভাসাবে না জেলে-মাঝিরা। নদী তখন অচ্ছুত।

শঙ্খ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলেছিল, তুমি নিজের চোখে দেখেছ কালোদা?

কালোমানিক তার ঝকঝকে শাদা দাঁত মেলে হাসে, না! তবে পঞ্চু জেলে দেখিছে। কাল গাঙে জাল ফেলবার সময় –

কামটের নামে তাদের গোটা ঈশ্বরীপুরে প্রবল তরাস। দু'বছর আগে পাশের গাঁয়ের কাবুল মাস্টার সাঁতারে নেমেছিল। তার ছিল ভীষণ দম। এক-এক ডুবে পার হয়ে যেত ইছামতীর অন্য কিনারে। ডুব দিয়েছে তো দিয়েইছে। এক থেকে একশো গোনার পরও ওঠে না এমন দম। তারপর অন্যপারে গিয়ে ভুস্ করে ঠেলে উঠত। এমন ঘটত রোজ-রোজ। সেদিনও তিনবার পারাপার করেছে, ডুব দিয়েছে চতুর্থবার, একশো গোনা শেষ, দুশোও। যারা চান করছিল, তারা সবাই অবাক। কে একজন বলল, কী রে বাবা, ডুব দিয়ে গিয়ে শেষমেশ বসিরহাট ঠেলে উঠবে নাকি! ঈশ্বরীপুর থেকে বসিরহাটের দূরত্ব পিচরাস্তা বরাবর সাতমাইল। কিন্তু না, বসিরহাট নয়, কাবুলমাস্টার গিয়ে উঠল তিনটে গাঁ পেরিয়ে লক্ষীনারায়ণপুরের ঘাটে। তাও চারদিন পর। দিনচারেক পরে ভাঁটার জল সরে যেতে দেখা গেল তার লাশ ঝুলে আছে গাঙের কিনারে ঝুঁকে পড়া এক বাব্‌লাগাছের ডালে। লাশ নয়, হাড়গোড়। শরীরের মাংস কে যেন খুবলে খেয়ে নিয়েছে। গাঁয়ের লোক জরিপ করে বলল, কামট। সেই থেকে কামটের নামে এমন ভয়তরাস।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল শঙ্খর। তারপর গত তিনদিন আর নদীমুখো হয়নি। এখন বেশ ক'দিন আর গাঙের জলে ঝাঁপাই জুড়তে পারবে না তারা। একদিন দু'দিন করে গুনতে থাকবে মুহূর্ত, যদ্দিন না ঈশ্বরীপুরের মানুষ নিশ্চিন্দি হবে কামটটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। ভেসে উঠছে না তার কালো শরীর।

জলে নামে না বটে, কিন্তু শঙ্খ সে ক'দিন ধীর পায়ে গিয়ে নদীর পাড়ে ঘাসের উপর জাবড়ি মেরে বসে থাকে। ওপারের দিকে তাকিয়ে থাকে অপার এক কৌতূহল নিয়ে। খেয়ায় ওপারে গেলে একটা সরু মেঠোপথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে চিংড়িপোতার দিকে।

চিংড়িপোতা এখান থেকে কতদূর, তা শঙ্খ জানে। দূরে অনেকখানি মাঠ পার হলে তবে একটা সবুজ গাছপালায় ঘেরা গাঁ। সেখান থেকে কখনও হেঁটে কখনও সাইকেলে চড়ে মানুষজন এসে পৌঁছয় ওপারে। খানিকক্ষণ এপারের দিকে নিরিখ্ করে হাঁক পাড়ে, হালের মাঝি আছ নাকি?

কালোমানিক থাকলে কালোমানিক, না থাকলে তার দাদা তারাশশী চালাঘর থেকে বেরোয়, ওপারের মানুষ ঠাহর করে নোঙরের দড়ি খুলে দ্যায়। মাত্র একজন লোক দেখে হয়ত আপন-মনে বিড়বিড় করে, পোষায় না পোষায় না, একজন লোকের পারানির জন্যি কি এত খাটুনি পোষায়!

লোক দেখতে হয় হাটের দিন। ঈশ্বরীপুরের গঞ্জে সোম-শুক্র হাট। সেদিন কেবল চিংড়িপোতা নয়, আরও দূর দূর গাঁ নাচিন্দা, কুসুমপুর, মাচদহ থেকে শয়ে-শয়ে লোক আসে হাটে। কেউ কিনতে, কেউ বেচতে। সেদিন সকাল থেকে দু'ভাইয়ের অবসর থাকে না। বেলা যত বাড়তে থাকে তত মানুষের ভিড় বেড়ে চলে। বিকেলের দিকে খেয়ানৌকো টালমাটাল হয়। আবার সন্ধে পেরুলে শুরু হয় ফিরতি মানুষের ভিড়। যারা খালিহাতে গিয়েছিল তাদের মাথায় ঝাঁকামোট।

খেয়াঘাট থেকে একটু দূরেই ইছামতীর কিনারে লাবনি বৌ-এর ঝুপড়িঘর। যেদিন কালোমানিক আড়বাঁশিতে সুর তোলে গভীর রাত পর্যন্ত, তার পরদিন লাবনি বৌ কালোমানিককে ঝামট মেরে বলে, কেনে বাজাও ওই বাঁশিটা। জান না, রেতে বাঁশির সুর

শুনলে এক ছেলের মায়ের আর ভাত খেতি নেই! ছেলের অমঙ্গল হয় --

কালোমানিক সে ঝামট খেয়ে হাসে, এক-একদিন না হয় নাইবা খেলে লাবনিবৌ। সুর শুনলি কি তোমার মন ভরে না?

শঙ্খ মনে-মনে মাথা নাড়ে। কথাটা ভেবে সেও তাদের বাড়িতে রাতের বেলা আড়বাঁশির সুরে উদাস হয়ে যায়। শীতলাতলার-মাঠ পেরিয়ে তাদের গোলপাতার ছাউনির ঘরে এসে ঠোনা দেয় কালোমানিকের ফুঁয়ের মিঠেন আওয়াজ। সে বই এর পাতায় চোখ রাখে, কিন্তু ইচ্ছে করে বইটই ফেলে ছুটে যায় খেয়াঘাটের দিকে, চালাঘরে ঢুকে বসে থাকে কালোমানিকের পাশে। তখন চারপাশে ঘোর হয়ে থাকবে ঘন আঁধার। পাশে ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা চির-র্-র্-র্ শব্দ। সে আওয়াজ ছাপিয়ে বাতাসে পাক খাবে বাঁশির সুর। সে যেন এক আশ্চর্য রূপকথাব জগৎ হবে।

যা কিছু শঙ্খর নাগালের বাইরে-- সে সবকিছুই তার কাছে রূপকথায় মোড়া এক স্বপ্নের পৃথিবী। রাতে ঘুমের ঘোরে যেমন সে দেখতে পায় ঝালর-দেয়া শাদা পোশাকের ফুরফুরে চমৎকার পরীদের। ইছামতীর ওপারে জল থইথই করতে থাকা, একূল-ওকূল দেখা যায় না এমন ভেড়ি, তার উপর ফুটে থাকা নালফুল, শাপলার পাতা, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একঠেঙে বক, নীলরঙের চমৎকার মাছরাঙা—এ সবকিছুই তার কাছে রূপকথা। এমনকি দূরে সবুজ গাছগাছালিতে ঢাকা চিংড়িপোতা গাঁও। চিংড়িপোতার তিনদিকে ভেড়ির জল। বাচ্চারা ছোট থেকেই শালতি বেয়ে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে চলতে শিখে যায়। ইস্কুলে যাবার সময়েও নাকি শালতি!

চিংড়িপোতা পেরিয়ে নাচিন্দা, মাচদহ সবই তার কাছে এক অপরূপ দেশ। শঙ্খ কখনও সেসব দেশ দেখেনি। একদিন এইসব গাঁ হেঁটে-হেঁটে, শালতিতে চড়ে, ঘুরে-ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে তার।

পাশের বাড়ির উম্‌নো-ঝুম্‌নো তাকে চোখ মুখ নেড়ে শাসন করে, ওই লোকটার সঙ্গে তুই মিশিস কেনরে। কালোমানিক খুব খারাপ লোক। রাতবিরেতে লাবনিবৌ-এর বাড়ি যায়।

উম্‌নো-ঝুম্‌নো দু'জনেই ওকে খেয়াঘাটে যাওয়ার জন্য দুয়ো দেয়, তর্জনী তোলে। কালোমানিক কেন খারাপ তা ওরা জানে, শঙ্খ জানে না। শঙ্খ বুঝতেও পারে না, কেন লোকটা মন্দ। এমন চমৎকার আড়বাঁশি যে বাজাতে পারে সে লোক কি কখনও খারাপ হতে পারে!

লাবনিবৌকে অনেকবার দেখেছে শঙ্খ। তাদের ছোট্ট মেটেঘরখানার দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকে, কোলে দু'বছরের ছেলেটা। লাল ডুরে শাড়িই তার পরনে থাকে বেশিরভাগ সময়। তাতে তার গায়ের কালোরং বেশ খোল্‌তাই হয়। মাথার একঢাল চুল থাকে বুকে পিঠে ছড়িয়ে, তাতে আরও আশ্চর্য সুন্দর দেখায় তাকে। তার ঠাম্মা তাকে যে রূপকথার গল্প বলে রোজ-রোজ তাতে রাজকুমারীর গায়ের রং থাকে দুধে-আলতা। লাবনিবৌ-এর রং যদি দুধে-আলতা হতো তাহলে সে রূপকথার রাজকন্যা হতে পারতো অনায়াসে।

কখনও পানের লালরসে তার ঠোঁট দু'টো রাঙা টকটকে হয়ে ওঠে, তখন হাসলে মনে হয় একজোড়া দুপুরেচণ্ডী ফুল ফুটে আছে চমৎকার হয়ে। কানে দুলদুল করে যে মাক্‌ড়ি, তা যেন দু'দুটো ঝুমকোফুল। তবু একদিন কালোমানিককে সে জিজ্ঞাসা না করে পাবে না, কেন যাও গো তুমি লাবনিবৌ-এর বাড়ি?

কালোমানিক তার ঠোঁট থেকে আড়বাঁশি নামিয়ে অবাক হয়ে তাকায়, কেন যাব না? ওর বরটা সেই কোথায় না কোথায় পড়ে থাকে? মালদ জেলায়। ন'মাসে ছ'মাসে একবার গাঁয়ে

আসে। ব্যস্। কে দ্যাখে বল তো একলা মেয়েছেলেটাকে! গাঙের পাড়ে তো এই একটাই বাড়ি। রাতবিরেতে ডাক দিলিউ একটা লোক দিগরে খুঁজে পাবে না। ডাকাত হামড়ে পড়লিও জানতি পারবে না কেউ।

শুনতে শুনতে শিউরে ওঠে শঙ্খ। কালোমানিক ঠিকই বলেছে. সত্যিই লাবনিবৌকে দেখবার তো কেউই নেই।

হয়তো তাইই ঘাটে লোক না থাকলে কালোমানিক গিয়ে বসে থাকে লাবনিবৌ-এর দাওয়ায়। দু'জনে গল্প করে। এত তাদের কী গল্প তা কে জনে। কথা বলতে বলতে পার হয়ে যায় কতখানি বেলা। নদীর ঘাটের ওপার থেকে তখন পারানির লোক হাঁক পাড়তে থাকে, হালের মাঝি আছ নাকি? হালের মাছি, ও হালের মাঝি—

হালের মাঝি সে হাঁক শুনতে পায় না। তার কানে তখন মধু বর্ষণ করছে লালডুরে শাড়িতে ওম্ হয়ে থাকা লাবনিবৌ। দখ্নে মিঠেন হাওয়ায় লত্পত্ করে উড়তে থাকে টকটকে লাল আঁচল। পান-খাওয়া ঠোঁটে ঝরতে থাকে দুপুরে-চণ্ডীর লাল পাপড়ি।

একদিন নাচিন্দার শিখরবাবু তাকে হাঁক দিয়ে না পেয়ে বেশ করে দাবড়ে দিলেন কালোমানিককে, কী রে, তোকে ডেকে ডেকে হদিশ করা যায় না। গলা চিরে রক্ত উঠে এল তবু তোর টিকিটির দেখা নেই। ঠিক ফের ওই মাগিটার ঘরে গিয়ে গপ্পো মারছিলি। তোর রস খুব উথলে উঠেছে, তাই না?

শিখরবাবু নাচিন্দার বেশ বড় মানুষ। সবসময়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফিনফিনে ধুতি তাঁর পরনে। গলায় সোনার চেন, গোঁফে কী একটা গন্ধও যেন মাখেন। গায়ের রং বেশ ময়লাই। শ্যামবর্ণ থলথলে শরীর। পায়ে পাম্পশু, হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। রোজ বিকেলে একবার করে ঈশ্বরীপুরের গঞ্জে যাওয়া চাই। ফেরেন অনেক রাতে। মাঝেমাঝে এত রাত হয়ে যায় যে কালোমানিক বিরক্ত হয়ে বলে, লোকটার জ্বালায় আর পারিনে।

বলে বটে, কিন্তু কালোমানিক খেয়া ছেড়ে ঘরে ফিরতে পারে না। শিখরবাবু বিকেলে পার হবার সময় বলে গিয়েছেন, আজ আমার ফিরতে একটু রাত হবে বাপু, জেগে থাকিস, কালোমানিক।

কালোমানিক জেগে থাকে। রাত গড়াতে গড়াতে মধ্যরাত হয়ে যায়। আড়বাঁশির সুর তখন সুর তুলে ঢেউঢক্কার যায় বহুদূর। কোথায় তা কে জানে। হয়তো ইছামতীর স্রোতের সঙ্গে মিশে ঢেউ ভাঙতে থাকে। হয়তো চলে যায় সে-ই বসিরহাট পর্যন্ত। যতক্ষণ না শিখরবাবু ফিরে আসেন ততক্ষণ। খেয়ায় উঠে একটা দু'টাকার নোট গুঁজে দেবেন কালোমানিকের হাতে। জেগে থাকার বখশিশ। কালোমানিকের এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু একদিন অন্যথা হলেই—

শিখরবাবু চলে গেলে কালোমানিক থম্ হয়ে বসে থাকে। তার মুখ কাল্চে মেরে যায়। চলে যেতে থাকা শিখরবাবুর পিছন দেখতে দেখতে হঠাৎ মুখ বিকৃত করে বলে, রস তো তোমারও উথলে উঠছে শিখরবাবু। নইলে রোজ-রোজ অত রাত করে ফের কেন? শরীর অমন টলমল করে কেন? কথা অমন জড়িয়ে যায় কেন? গা দিয়ে অমন বিটকেল গন্ধ ভুরভুর করে কেন?

শঙ্খও থ হয়ে বসে থাকে। অমন গেরমানি লোকটা কিনা বেশ করে দাব্ড়ে গেল কালোমানিককে! শঙ্খর সামনে তখন ভাঁটার টান ধরেছে এমন থইথই ইছামতী। জোয়ারের সময় জলে যত না টান, ভাঁটার টান তার দ্বিগুণ। দুদ্দাড় করে ছুটে যাওয়া স্রোতের সামনে সে বসে থাকে আনমনে। একটা-দু'টো কাগজের টুকরো ছুড়ে দেয়। টুকরোগুলো ভাসতে ভাসতে

চলে যায় দক্ষিণমুখো। আরো দক্ষিণে, হয়তো শঙ্খর মা-বাবা থাকেন যে গাঁয়ে, সেদিকেই।

ভেসে যাওয়া কাগজের টুকরোগুলো দেখতে দেখতে শঙ্খ ভাবে, এগুলো হয়তো ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকবে সাগরদ'র ঘাটে। তার মা এতক্ষণে নিশ্চয় বাসন ধুতে এসে বসেছেন নদীর ঘাট্‌লায়, বড় পাথরটার উপরে। চারপাশে ছড়ানো রয়েছে হাঁড়ি, কড়া, খুন্তি, থালা—এইসব। তারমধ্যেই হয়ত শঙ্খর কাগজটা হঠাৎই গিয়ে ঠেকবে তার মায়ের আঁচলের কাছে। মা অবাক হয়ে কাগজটা তুলে নেবেন একবুক কৌতূহল নিয়ে, ভাববেন, দেখি তো, চিঠিটা কার। শঙ্খর হাতের গন্ধ মাখানো রয়েছে মনে হচ্ছে।

মুখের থম্‌ভাবটা ততক্ষণে কাটিয়ে কালোমানিক হঠাৎ বলে, কী হল, শঙ্খবাবু, একা-একা কার কথা ভাবছ! শঙ্খ বলতে পারে না, লজ্জা পেয়ে যায়। কলোমানিকের মুখখানা আর গোমড়া নেই দেখে আশ্বস্ত হয় মনে-মনে। কেন অমন কাল্‌চে মেরে গিয়েছিল তার মুখখানা তা বুঝতে পারে না। তবে কি সত্যিই তার কোনও দোষ হয়েছে?

পল্টনও একদিন মুখখানা কেমন বাঁকিয়ে বলেছিল, ওর সঙ্গে মিশিস্‌ নে শঙ্খ। কালোমানিক ভারি অসভ্য।

শঙ্খ অবাক হয়ে বলল, কেন! অসভ্য কিসের!

পল্টন যেন ভারি বুঝদার মানুষ এমন ভঙ্গিতে চোখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বলেছিল, ও লাবনিবৌ-এর ঘরে যায় রেতের বেলা। সেখেনে অসভ্য করে।

শঙ্খ তেমন করে বুঝতে পারেনি সবকিছু। তাহলে কি কালোমানিক সত্যিই কোনও অসভ্য লোক। লাবনিবৌ-এর বর চলে যায় বিদেশে, অনেক নদী সমুদ্দুর পেরিয়ে তার কাজের জায়গায়, আর কালোমানিক দৈত্য হয়ে রাজকন্যাকে দখল নিতে যায়! সে বন্দী করে রেখে দিয়েছে গাঙের ধারে ছোট্ট চারচালাখানার ভেতরে!

মনে মনে ভারী রাগ হয়ে যায় শঙ্খর। সে কয়েকদিন আর খেয়া পারাপার দেখতে যায় না। রাশিরাশি জলরাশি একবার জোয়ার ঠেলে এতদূর এসে পৌঁছোয়, আবার ভাঁটার লগনশায় চলে যায় কোথায় না কোথায়। কোথা থেকে এত জল আসে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর! অবিশ্রাম, অবিশ্রান্ত। এমন প্রিয় নদীর কাছে যেতে না পেরে তার ভেতরটা গুমরিয়ে ওঠে।

শঙ্খর রনোকাকা রাত জেগে পরীক্ষার পড়া পড়ে। তার এ-বছর ফাইন্যাল। ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা। পড়তে পড়তে হঠাৎ মুখ তোলে। তার বইতে লেখা আছে, নদী, তুমি কোথা হইতে আস। নদী তার কলকল খলখল ধ্বনির মধ্যে উত্তর দেয়, মহাদেবের জটা হইতে।

শঙ্খ অবাক হয়ে চোখ বড় বড় করে সেই মহাদেবের বিশাল জটার কথা ভাবতে থাকে। তার ঠাম্মা রূপকথার গল্প বলতে বলতে একদিন হঠাৎ সেই কথাই বলেছিল। মহাদেব তাঁর একটা জটা হঠাৎ উপড়ে ফেললেন এক ঝট্‌কায়, আর অমনি হু-হু ধারায় গঙ্গা ধেয়ে এলেন মর্তে।

নদীর সঙ্গে দেখা না হলে শঙ্খর আবার পড়ায় মন বসে না। তার চোখের পাতা লেগে থাকে বই-এর পাতার সঙ্গে। কিন্তু ছোট-ছোট ছাপার হরফে চোখ রাখতে গিয়ে সব ঝাপসা হয়ে যায়। ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়ের মতো অক্ষরগুলো লাফেরা করতে থাকে তার স্বপ্নে, জাগরণে। সে তখন খেয়ানৌকোয় নদী পার হয়ে হাঁটতে থাকে ভেড়ির দিকে। ভেড়ি পেরিয়ে আরও দূর চিংড়িপোতার দিকে। একটা শালতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে অনেক ভেড়ি, অনেক মাঠ, অনেক ধানবন। ধানক্ষেতের ভিতর একগলা জল। যত জল বেড়ে যায়, তত ধানগাছের মাথা আরও

উঁচু হয়ে ওঠে। এক মানুষ দেড়মানুষ উঁচু ধানগাছ। তার ডগায় লকলক করছে সবুজ ধানের শিস। তার ভেতর দিয়ে একা-একা শালতি বাইতে থাকে শঙ্খ। ক্রমে রাত বেড়ে যায়। সামনে হারিকেন জ্বলছে, তার কাচে কালি পড়তে থাকে। বই-এর সামনে বসে বসে ঘুম পেয়ে যায় তার। বিছানাটা ওম্ হয়ে রয়েছে, তাকে হাতছানি দিচ্ছে মৃদু মৃদু, অথচ সে ঘুমোতে যেতে পারছে না। তার পরীক্ষার দেরি আছে, তবু গতবারে ফল ভালো হয়নি বলে এবারে আরও বেশি-বেশি করে পড়তে হবে। সে সিক্স থেকে সেভেনে উঠবে সামনের বছর। আরও একটু বড় হয়ে উঠবে সে। তার ঘোলাটে পৃথিবীটা আরও একটু স্বচ্ছ হতে থাকবে। রানিশায়রের জলের মতো টলটলে কাকচক্ষু।

ঠিক সেই মুহূর্তে নদীর কিনার থেকে ভেসে আসে আড়বাঁশির শব্দ। সুরটা চালাঘর থেকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা গাঁয়ে, সমস্ত বিশ্বচরাচরে। যেমন শঙ্খদের বাড়ির দিকে আসছে, তেমনি নদী পেরিয়ে ভেড়ির দিকে, তেমনি লাবনিবৌ-এর ঘরেও।

আর তক্ষুণি শঙ্খর মনে হল, সে যেমন কাগজের টুকরো নদীর জলে ভাসিয়ে দেয় তার মায়ের কাছে, তেমনি কালোমানিকও বাঁশির সুর হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে লাবনিবৌ-এর কাছে পৌঁছুবে এমন ইচ্ছেয়। লাবনিবৌ একলা-একা ঘরে শুয়ে থাকে তার কচি ছেলেটাকে নিয়ে। খাঁ খাঁ নির্জন চারধার। তাকে দেখবার কেউ কোত্থাও নেই। তবু কালোমানিকের বাঁশির আওয়াজ তার কানে গেলে একটু বল্‌ভরসা, একটু সাহস। অন্তত তাকে দেখবার একজন কেউ আছে, এমন ভাবতে পারে সে।

তাহলে কালোমানিক দত্যি নয়, সে শ্যামবর্ণ রাজপুত্তুর, তার বাঁশির আওয়াজ সোনার কাঠি হয়ে প্রতি রাতে জাগিয়ে তোলে লাল টুকটুকে ঠোঁটের লাবনিবৌকে।

এমন ভাবতে পেরে আশ্বস্ত হয় শঙ্খ। একটু রূপকথার আদলে মুড়ে নিলে কত চমৎকার হয়ে উঠতে পারে পৃথিবীটা। ইস্, সমস্ত জগৎ-সংসারটা যদি সত্যিই রূপকথা হয়ে উঠত, অমন স্বপ্নময়, নীলাভ আলোছায়ার মতো, তাহ'লে কী মজাই না হতো!

একদিন আড়বাঁশি শুনতে শুনতে সেই রূপকথার জগতে বুঁদ হয়ে কথাটা বলেছিল কালোমানিককে। শুনে সে আড়বাঁশি নামিয়ে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, রূপকথার দেশ তো আর এই ঈশ্বরীপুরে নেই, সে আছে সোঁদরবনে। ওই জেলেপাড়ার মাছমারারা যেখানে ভর শীতকাল পড়ে থাকে। এই ক'দিন পরেই নৌকোর সার নিয়ে তারা ফিরল বলে—

সওদাগরের সপ্তডিঙা যেভাবে বাণিজ্য শেষ করে ফিরে আসে, ঠিক সেভাবেই সারাটা শীত সোঁদরবনে কাটিয়ে, লাল-নীল-সবুজ-মেরুন পালের পেটে হাওয়া ধরিয়ে ঈশ্বরীপুরে ফিরে আসছে জেলেপাড়ার মাছমারারা।

ছেঁড়া গামছাটা কোমরে কানি করে জড়িয়ে গাঙে চান করতে নেমেছিল যতনখুড়ো। দখ্নে হাওয়ার ঝাপট তার শরীরে ঠোনা দিতেই যথারীত ভুরুতে হাত রেখে ঠাহর করছিল ইছামতীর

গতিপথের দিকে। তখনই তার চোখে পড়েছিল দৃশ্যটা। সঙ্গে সঙ্গে চিল্লিয়ে উঠেছিল এক দম-বন্ধ-করা উল্লাসে, উরা এইস্যে গেছে মনে হয়—

আশেপাশে আরও যারা চান করতে নেমেছিল ঘাটে, তারাও একলহমা থমকে গিয়ে পরমুহূর্তে সায় দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিল, তাইতো রে ঠিক—

সঙ্গে সঙ্গে গোটা জেলেপাড়ায় চাউর হয়ে গিয়েছিল সে কথা, উরা এইস্যে গেছে, উরা এইস্যে গেছে—

হ্যাঁ, ঠিকই। মাছমারারা তাদের দীর্ঘ বাণিজ্য সেরে ফিরে আসছে আজ।

ওদের বাণিজ্য কোনও বন্দরে নয়, সোঁদরবনের নদীনালা-খাঁড়ি-সমুদ্দুরে। প্রায় তিনমাস আগে রওনা দিয়েছিল জেলেপাড়া থেকে। শীত পড়ো-পড়ো এমনি সময়ে। বর্ষার শেষে, যখন পাহাড়ধোয়া ঘোলা জল গিয়ে সমুদ্দুরে মেশে, তখন ডিমপাড়ার ইচ্ছে জাগে ইলিশের। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে পড়ে মোহানার নদীতে, সোঁদরবনের খাঁড়িতে। মোহানার সমুদ্দুরে তখন রূপোলি ইলিশের উৎসব। ঠিক সেসময় ইছামতী পার হয়ে কাটাখালি, সেখান থেকে বসিরহাট পার হয়ে হাসনাবাদ, তারপর হিঙ্গলগঞ্জের পথ ধরে ঈশ্বরীপুরের মাছমারারা হারিয়ে যায় সোঁদরবনের নদীতে-খাঁড়িতে, মোহানায়, সেখানে নদীর যেমন দশাসই চেহারা, তেমনি যেদিকে তাকাও শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। চারদিকে শুধু গেঁউয়া, বাইন, ক্যাওড়া, হেঁতাল আর গরাণের বন, তার সঙ্গে হরকোচ্, বনঝামা, তেকাঁটাল, হোগলা, শরখড়ির ঝোপ। কোথাও থে হয়ে থাকে ফণীমনসা আর বাজবরণ।

সে জঙ্গলে সুন্দরীগাছ এখন আর নেই বললেই চলে। অথচ মহাদেবখুড়ো বলে, ওরে ছ্যামড়া সুঁদ্‌রিগাছের নামেই তো সোঁদরবন। সে গাছের রূপ দেখলি চোখ ঝল্‌সে যায়। তা ধরিত্রী তো সোন্দর জিনিষরে বেশিদিন বুকে ধরি রাখতি পারে না। তাই সুঁদ্‌রিগাছও চোখে পড়ে না এখন। কত আঁতিপাতি খুঁজিছি—

এবার অবশ্য সবচেয়ে কম নৌকো ছিল মাছমারাদের সঙ্গে, সাতখানা। অথচ গত সনের আগের সনেও মহাদেবখুড়ো এগারখানা নৌকোর বাণিজ্য সাজিয়ে মাছ মারতে গিয়েছিল। প্রায় গোটা জেলেপাড়া উজাড় করে। সেবার এদেশের নদীনালায় তেমন মাছ পাচ্ছিল না কেউ। খ্যাপলা ফ্যালো, ফাঁদিজাল ফ্যালো, ছাঁকনিজাল ফ্যালো, খাঁড়ির মুখে দোন পেতে রাখো, দিগরে যেন মাছ বলতে নেই। না ইছামতীতে না কাটাখালিতে। সব্বার ঘরে টান পড়েছিল রেস্তয়। যে বচ্ছর রেস্তয় যত টান পড়ে, সে বচ্ছর সমুদ্দুরে যাওয়ার হিড়িক তত বাড়ে। নৌকো সার-সার সাজিয়ে সমস্বরে বলে ওঠে ঃ

দরিয়ার পাঁচপীর বদর বদর।

দেশ-গাঁয়ের নদীনালায় মাছ না পেলে ভরবছরের খোরাকি জোগানোর আর কী উপায়! সোঁদরবন হল মাছমারাদের স্বপ্নের জায়গা। সেই ঘন সবুজে ওম্ হয়ে থাকা সুন্দরবন পেরিয়ে সমুদ্রে পৌঁছতেই বারোচোদ্দদিন। সমুদ্রে গিয়ে সেই সবুজ আর নীলে মেশামেশি পটভূমিকায় তারা নৌকো দিয়ে সমুদ্র বেঁধে ফেলে। নাইলনের নীল বেঙ্গতিজাল বিছিয়ে মাছমারারা চৌকি দেয়—কখন জোয়ার আসে সমুদ্দুরে, ফের ভাঁটা এলে সে-জল ফিরে যাবে আরও গভীর সমুদ্দুরে। সে জালের নীচে বাঁধা আছে অন্তত একশো আধলা ইঁট, ওপরে ভেসে থাকে সার-সার তল্‌তা বাঁশের চোঙা. জালের 'সেতে' হাত দিয়ে পরখ করতে হয়, সুতোয় টান পড়ে কি না।

নাইলনের নীল জাল ফেললেই রূপোলি ইলিশ ঝকঝক করে ওঠে পাটাতনে। রূপোলি

ইলিশ মানেই কড়কড়ে পাতি। তাদের ধূসর জীবনযাপনে হঠাৎ রঙের আঁচড় ফুটে ওঠে। সে রং বড়ো মনোরম। একবার সোঁদরবন করে ফিরে এলে গোটা বছর নিশ্চিন্দি। খোরাকির জোগাড় তো হয়ই, সেবছর হাঁ-হয়ে-থাকা চালে দু'পণ খড় গোঁজা যায়, কি আইবুড়ো মেয়েটার জন্যে একটা বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজা যায়। ঘরের মাগ্-ছেলে-মেয়ের গায়ে নতুন জামা-কাপড় দেওয়া যায়। গোটা জেলেপাড়া হৈ-রৈ করে ওঠে এক অদ্ভুত খুশির জেল্লায়।

সোঁদরবন আবার কখনও দুঃস্বপ্নও। টানা তিন-চার মাস বাড়িঘর ছেড়ে, দেশ-গাঁ ছেড়ে, পরিবার-পরিজন ছেড়ে, কাটাতে হয় সেই কোন দূরদেশে— নৌকোর পাটাতনে, ছইএর নীচে! কখনও পাটাতনের দু'পাশে, নদীর দু'পাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে গেঁউয়া, হেঁতাল কি গরাণের ঝাঁকড়-জঙ্গল। কখনও দু'পাশে শুধু জল আর জল। ঝড়-রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এই দীর্ঘকাল তাদের কপালে কত না রকম নাটাঝামটা। আকাশের বিশাল চাঁদোয়ার নীচে একটা একটা পার হয়ে যায় অনেক বিপন্ন দিন। টালমাটাল দিনগুলোতে তাদের তামাটে গা আরও কাল্চে মেরে যায়। সে কৃষ্ণাভ শরীরে শাদা খড়ি উঠতে থাকে ক্রমশ। শরীর শুকোতে শুকোতে একসময় দড়ি-দড়ি হয়ে যায়। যখন ঝড়ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরবাসের পর তারা ঘরে ফেরে, নৌকোর নোঙর ছুড়ে দিয়ে ডাঙায় পা দেয়, তখন তাদের কাউকে আর চেনবার জো থাকে না। তারা সব তখন যেন এক অচিন দেশের মানুষ।

ঘরে ফিরে তারা বলতে থাকে এই ঝড়ঝাপ্টার দিনগুলির বৃত্তান্ত। হয়তো বিশালকায় এক কুমীর তাড়া করতে করতে উঠে পড়েছিল তাদের নৌকোয়। নৌকো টাল খেয়ে উল্টে যায় আর কি। তার সেই ভয়ঙ্কর হাঁ দেখে হাঁটুর মালাইচাকিতে ঠকঠকি ধরে যায়। দুর্দান্ত সাহস দেখিয়ে গুঁটচেহারার পঞ্চু কীভাবে হালের পেছনদিক কষিয়েছিল কুমীরটার মাথায় সেই গল্প শুনতে থাকে মাছমারাদের পরিবার-পরিজন। ভাগ্য ভালো তাই জান্‌প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে তারা। আবার ফিরতে পারেনি কোনও একজন, সে ঘটনাও কোনও কোনও বার না ঘটেনি এমন নয়। একবার সোঁদরবনের দেবী মা বনবিবি 'কর' নিয়েছিল তাদের হলধরকে। বাইশবছরের জোয়ান ছেলে হলধর, সবে সেবার বে করে নতুন বৌ ঘরে রেখে বেরিয়ে পড়েছিল মাছ মারতে। যেতে যেতে গহীন এক জঙ্গলের ঘাটে নৌকো নোঙর করে বেঘোরে ঘুমিয়েছিল রাতের বেলা। ভোরে উঠে দেখা গেল, পাটাতনে সবাই শুয়ে আছে সার দিয়ে, শুধু হলধর নেই। নেই তো নেই, কিন্তু যেখানে হলধর শুয়েছিল, সেখানে শুধু চাপ-চাপ রক্তের দাগ, সেবার মহাদেবখুড়ো বলেছিল, মা বনবিবি হলধরকে কর নিয়েছে। নির্ঘাত কোনও অনাচার করেছিল।

কী অনাচার তা অবশ্য স্পষ্ট করে মহাদেবখুড়ো না বললেও জেলেপাড়ার মানুষ ভয় তাড়সে কেঁপে উঠেছিল। মহাদেবখুড়োর কথার ওপর আর কোনও কথা চলে না। সে-ই হল জেলেপাড়ার দন্ডমুন্ডের কর্তা। তার হাঁকডাক শুনলে বড়োদের জিব শুকিয়ে যায়। হলধর সম্পর্কে মহাদেবখুড়োর রায়ই শেষ কথা। নিশ্চয় হলধর অনাচার করেছিল।

তারা বছর-বছর সমুদ্দুরে যায়। সমুদ্দুরে মাছ মারতে যাওয়ার অনেক রীতিনীতি আছে। যারা নৌকোয় চড়ে বসে, গোটা মাছ মারার দিনগুলোয় সে রীতিনিয়ম মেনে চলতে হয় তাদের। তেমনি আরও কিছু রীতিনিয়ম মানতে হয় যারা ঘরে থাকে সেই মেয়ে-বৌদেরও। না মেনে চললেই এমন অনাছিষ্টি।

যেমন আরও একবার হয়েছিল বিষ্টুপদর। চানে নেমে হঠাৎ কীভাবে উধাও হয়ে গেল তিন ছেলেমেয়ের বাবা বিষ্টুপদ সে-কথা স্মরণে এলে আজও কাঁটা দিয়ে ওঠে গায়ে। বিষ্টুপদ সাঁতার জানত না এমন নয়। জলে-জলেই যাদের গোটা জীবন কেটে যায়, জলের পোকাই

বলা যায় তাদের। সেই বিষ্টুপদ চান করছিল সমুদ্দুরের জলে। নৌকোর কাঁধ দু'হাতে ধরে পর-পর দু-তিনটে ডুব দিতে না দিতে কে যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার শরীরটা। আর ভেসে ওঠেনি। কেউ বলে, চোরাঘুর্ণিতে পড়ে গিয়েছিল বিষ্টুপদ। চোরাঘুর্ণিতে পড়লে মানুষ তো মানুষ, গোটা বহরের নৌকো থে হয়ে ডুবে যায় মাটির গভীরে। কেউ বলে, কুমীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিষ্টুপদকে।

সোঁদরবনের গাঙে কি সমুদ্দুরে মাছ মারতে গেলে পদে পদে এমন ভয়তাড়স। ঘরের মানুষ দখ্নের দেশে ডিঙি ভাসালে তাই গোটা দিনগুলো হাপিসটিপিস করে মরে জেলেপাড়ার মেয়ে-বৌরা।

যারা সমুদ্দুরে যায়, তারাও ঘরের বৌ-ছেলেমেয়ে কি মা-বাপের জন্যে কম ভাবনায় থাকে না। তাদেরও মগজে ঘাই মেরে যায় কত না অনাসৃষ্টি ভাবনা। এই দীর্ঘকাল বাইরে-বাইরে কাটনোর পর ঘরে ফিরে সব মানুষগুলোকে ঠিকঠাক দেখতে পাবে তো! তাদের নীল নাইলনের জালে ধরা পড়ে যে নধরকান্তি ইলিশ, সে ইলিশ চাঙ্-চাঙ্ বরফে ভিজিয়ে তুলে দেয় ফোড়ে-পাইকারদের হাতে, সে মাছ বিকোনোর টাকায় ভরে ওঠে তাদের গেঁজে, সেই চকচকে পাতিতেই তো তাদের ভরবছরের খোরপোষ। তবু তারা সারাক্ষণ ভয়ভিত্‌রি নিয়ে কাটায়, যে মানুষগুলোর জন্যে তাদের এই রোজগার, তারা সবাই বেঁচে-বত্‌তে আছে তো!

এহেন স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নে ভরা তাদের শীতঋতু। শীতের ঠাণ্ডা কনকনে দিন পার হয়ে বসন্তের দখ্নে হাওয়া ছাড়লেই ঈশ্বরীপুরের গোটা জেলেপাড়ায় জেগে উঠতে থাকে এক অদ্ভুত শিহরণ। দখনে হাওয়ার সঙ্গে মিলমিশ্ হয়ে আসে যারা সমুদ্দুরে মাছ মারতে গিয়েছে তাদের ঘরে ফেরার বার্তা। ঘরের মানুষ তখন ঘাটে গিয়ে ভুরুতে হাত রেখে ঠাহর করতে থাকে, বাণিজ্য সেরে ফিরে আসছে কি না লাল-নীল পাল তোলা নৌকাগুলো।

এতদিন ঠায় অপেক্ষার পর ঘাটে চান করতে গিয়ে শেষমেশ যতনখুড়োরই নজরে পড়েছিল দৃশ্যটা। দেখতে পেয়েই চিল্লাতে শুরু করেছিল, ওরে কে কুথায় আছিস, দ্যাখ্‌তো এসে—

বহুকাল পর এবচ্ছর সমুদ্দুরে যায়নি যতনখুড়ো। কারণ যাবার কালে তার ঘরে রামীবৌ তখন ভরা মাসের পোয়াতি। কথাটা পাঁচকান হতেই জেলেপাড়ার সব মানুষজন ঠারেঠোরে হেসেছিল। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছিল যতনখুড়ো, তখন তার বয়স চল্লিশ। কুড়িবছরের রামীবৌকে ঘরে এনেছিল বটে, কিন্তু কী কারণে যেন রামীবৌএর পেটে বাচ্চা আসেনি তখন। এসেছিল দশবচ্ছর পরে। লোকে বলেছিল, যাক্, শেষপর্যন্ত ছেলে হয়েছে এই ঢের। সেই ছেলের বয়স এখন দশ পুরতে চলল, হঠাৎ এতবচ্ছর পরে রামীবৌ ফের—

ফলে মানুষজন মুখে কাপড়চাপা দিয়ে না হেসে পারেনি। বলেছিল, বলিহারি ক্ষ্যামতা তুমার যতনখুড়ো, যাটবচ্ছর বয়সে—

সেই যতনখুড়ো চান করতে গিয়ে দুরে ইছামতীর জলে লাল-নীল পালের বহর দেখে চিল্লিয়ে উঠেছিল। চান আধসারা করে ছুটতে ছুটতে গিয়ে খবর দিয়েছে পাড়ায়। তিন-তিনটে মাস বড় কম সময় নয়। গোটা পল্লী তখন প্রায় পুরুষ-শূন্যি। কেবল থেকে গেছে দু-চারজন বুড়োমানুষ। থেকে গেছে যতনখুড়োর মতো দু-চারজন পোয়াতি বৌদের সোয়ামিরা। এদানী কোনও কোনও ছেলে-ছোকরারা তাদের পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছেড়ে টুকিটাকি অন্য ব্যবসাবাণিজ্যে মন দিয়েছে, তারাও।

নৌকোগুলো সার বেঁধে ঘাটে ফিরছে শুনে পাড়াময় সবাই তখন হুড়িয়ে এসেছে ঘাটে। মেয়ে-বৌদের ভিড়ই বেশি। কুচোকাচাও থিকথিক করছে। এত মানুষের কলরবের মধ্যে শুধু

শোনা যাচ্ছে, এইস্যে গেচে, এইস্যে গেচে—

সধবারা এই তিনমাস তাদের চুলে তেল ছোঁয়ায়নি, সিঁথিতে সিঁদুর দেয়নি, পেঁয়াজ-রসুন ঘরে তোলেনি। নৌকো ঘাটে আসার খবরে ছুটে এসেছে নবনী-বৌ, জটাইপিসি, আন্নাকালী, চাঁপা, টুকাই, পদ্মমাসি, পুণ্যিবৌ, নূপুর ঠাকুরঝি—এমনকি বাইশদিনের পুটুস ছেলে কোলে নিয়ে রামী-বৌও।

পদ্মমাসি ওদের মধ্যে একটু বেঁটেখাটো চেহারার। এই ভিড়ের মধ্যে লাফঝাঁপ দিয়েও দেখতে পাচ্ছিল না নৌকোর লোকজনকে। তার সামনে দাঁড়ানো লম্বাপানা রামীবৌকে হঠাৎ ঠেলে দিয়ে বলল, সর্ না মুখপুড়ি, তুই আবার ঘাটে এসে পথ আড়াল করে দেঁড়িয়ে রইছিস কেন? তোর মিন্‌সে তো আর মাছ মারতে যায়নি। তোর আঁচলের তলায় শুয়ে থেকেছে। সর্ সর্—

রামীবৌ তার বাচ্চা সামলে থতমত মুখে পিছিয়ে এল খানিক। ততক্ষণে ঘাট্‌লায় এসে একে-একে ঠেক্ খাচ্ছে নৌকোগুলো, পাটাতনে উঠে দাঁড়িয়েছে রোদে তাতে ঝলসানো কালো-কালো মানুষেরা। ওদিক থেকে নবনীবৌ বলল, এই হতচ্ছাড়ারা, তোরা হাঁ করে তাকিয়ে রইছিস যে বড়, ধর, ধর, নোঙরের দড়িগুলো ধরতি লাগ্—

যাদের উদ্দেশে বলা, সেই ছেলেছোকরারা তখন নোঙরের দড়ি ধরার জন্যই চুকিয়ে রয়েছে। নবনীবৌএর কথা শুনে তাদের মধ্যে থেকে ভোদো বলল, রও না মাসি, আগে নৌকোর মুখ ঘাটে লাগতি দাও—

সাত-সাতখানা নৌকো পাল নামিয়ে ঘাটে ভিড়তেই হৈ-চৈ লেগে গেল মুহূর্তে। মাঝি-কাঁড়ার-মাল্লারা দড়িদড়া ছুড়ে দিতেই তা টপাটপ ধরে ফেলছে কিনারে অপেক্ষায় থাকা যতনখুড়ো, পঞ্চা, ভোদো, পটল, যজনবুড়ো—সব্বাই। দড়িদড়া খুলে নোঙর বাঁধতে বাঁধতেই তারা শুনতে পেল মহাদেবখুড়োর গলা, হেই ছাবালরা চিল্লাসনি, চিল্লাসনি, তিনমাসের নাটাঝাম্‌টায় মাথাটাথা খারাবি হয়ে আছে। আগে ডাঙায় নামতি দে—

তখন সাতখানা নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে উদগ্রীব চাউনি ছুড়ে দিচ্ছে ঘরে-ফেরা মানুষেরা। চুল উসকো-খুসকো, শুকনো চোখমুখ, সারা গায়ে খড়ি-ওঠা রুক্ষতা, রোদের তাতে গায়ের তামাটে রঙে কাল্‌চে ছোপ। তবু এতদিন পর ঘরে ফেরার একটা মিষ্টি আমেজ খেলা করে যাচ্ছে তাদের চোখের পাতায়। ঘাড় উঁচু করে দেখছে তাদের ঘরের লোকজন কে কোথায় ঘাটে এসে ভিড় করেছে।

ঘরের মানুষরাও তন্নতন্ন চোখ রাখছে ডিঙির পাটাতনে। তাদের ঘরের মানুষটা ঠিক-ঠিক ফিরে এসেছে কি না। চোখে পড়লে শরীরে বয়ে যাচ্ছে খুশির শিহর। এমন দেখতে দেখতে হঠাৎ জটাইপিসি চেঁচিয়ে উঠল, ওরে, কই রে, মাধব কই গেলা—। দেখতি পাতিছি নে তো।

মাঝেব একটা নৌকো থেকে মাধবের গলা শোনা গেল, এই তো পিসি, এই এখেনে—

তারপরই শোনা গেল যজনবুড়োর খ্যানখেনে গলা, ওরে ও পচা, পচা রে, কোথায় রইলি বাপ্?

পচা দাঁড়িয়েছিল একেবারে শেষের নৌকোয়, সে তার বাবার গলা শুনে চেঁচাল, এই তো, এখেনে—

শুনে যজনবুড়োর গলায় উল্লাস, মুখপোড়া, এ্যাত্‌খন্ সাড়া দিসনি কেন?

এতসব হাঁকাহাকি ডাকাডাকির মধ্যে মাথায় ঘোমটা টাঙানো পুণ্যিবৌ হঠাৎ কারে যেন শুধাল, ও কুথায়, ওরে তো লৌকোয় দেখছি নে—

পাশে দাঁড়ানো মাঝবয়সী যতনখুড়োও আঁতিপাতি নজর করে। এ-নৌকো ও-নৌকোর

পাটাতন দেখতে দেখতে হঠাৎ গলা উঁচিয়ে বলে ওঠে, ও খুড়ো, পবন কই? পবনরে তো দেখতি পাতিছি নে?

কথাটা শুনে হঠাৎ সবাই যেন চুপ মেরে যায়। সাতখানা নৌকোয় খানিক যেন থমথমা। কেউ যেন রা কাড়ছে না। প্রাথমিক স্তব্ধতা কেটে যাওয়ার পর একটা হিমস্রোত খেলা করে যায় ঘাটে জড়ো হওয়া সমস্ত মানুষের মনে। সত্যিই তো, পবনকে কোনও নৌকোয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

পুণ্যিবৌএর বুকের ভেতরটা হঠাৎ কোনও এক অজানা আশঙ্কায় ছাঁত করে ওঠে।

কয়েকলহমা পরে মহাদেবখুড়োর গলা শোনা গেল। ভারী উঁচেনো গলায় বলল, পবন লৌকোয় নেই। পবনরে জঙ্গলে বাঘে নে গেছে।

—বাঘে! সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঘাট্‌লার মানুষজনের ভেতর একটা ঘোর শিহরণ বয়ে গেল। ঘাটে অপেক্ষায় থাকা মানুষগুলোর চোখ বিস্ফারিত হয়ে ঠেলে বেরুতে চায়, বাঘে নে গেছে পবনরে!

—বাঘে! পবনরে? কথাটা ঠিকমতো ঠাহর হতেই হঠাৎ কাঁপ ধরে গেল পুণ্যিবৌএর শরীরে, পরক্ষণেই ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

হুরুষে এতক্ষণ হৈ-হৈ করছিল ঘাটলায় দাঁড়ানো যে মানুষগুলো, আপনজনদের কাছে পেয়ে উল্লাসের শিরানি বয়ে যাচ্ছিল অপেক্ষায় থাকা যে মানুষগুলোর মনে, তারা সবাই একযোগে থম্ মেরে গেল। ডুকরে কেঁদে-ওঠা পুণ্যিবৌএর টলে ওঠা শরীরটা ধরে ফেলল হতভম্ব হয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা জটাইপিসি, ও বৌ,কাঁদিস নে, বাড়ি চল্—

পুণ্যির পিঠোপিঠি বোন মঙ্গলা কোথায় যেন গিয়েছিল, হঠাৎ ঘাটের সোরগোল শুনে ছুটতে ছুটতে এসে চোখ বিস্ফারিত করে চিল্লিয়ে উঠল, কী বলো কি তুমরা? একটা জলজ্যান্ত লোকরে বাঘে নে গেল, আর তোমরা দেখতি পালে না?

সমস্ত মানুষ তখন থম্ হয়ে গেছে। তার চিল্লানি শুনে কারও মুখে কথা নেই। একরাশ নৈঃশব্দের মধ্যে মাথা নিচু করে নোঙরের দড়িদড়া বাঁধছে ঘাটের সবাই। এদিক-ওদিকে গুঞ্জন, ফিসফিসানি ছড়িয়ে পড়ে। পুণ্যি আর মঙ্গলা পিঠোপিঠি দুই বোন হলেও মঙ্গলা ভারী কারোয়ান। তারও বিয়ে হয়েছিল এই ঈশ্বরীপুরের জেলে পাড়ায়। কিন্তু তারও পোড়া কপাল। তার স্বামী কালীপদও মারা গিয়েছিল এভাবেই—অপঘাতে। সে প্রায় পাঁচ-ছ বছর আগের কথা। গাঙের ঘাটে খ্যাপ্‌লা জাল ফেলে পুঁটি, ট্যাংরা আর খলসেমাছ ধরছিল। আকাশে মেঘ করে ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন, মেঘ ডাকছিল ঘনঘন, তবু তার জাল ফেলার বিরাম ছিল না। এক-একবার জাল ফেললেই এক-এক মুঠো মাছ পাচ্ছিল, তো ঘরে ফেরেই বা কোনমুখে। ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ আকাশে চিক্কির মেরে একটা আলোর ঝলকানি। তারপর কড় কড় কড়াৎ—। কিছুদূরে নৌকোর ছইএর ভেতর গা আড়াল করে মাথা বাঁচাচ্ছিল জেলেপাড়ারই আর এক মাছমারা প্রহলাদ। সে দেখল, গাঙের কিনারে কলাগাছের মতো ঝপাৎ করে পড়ল কালীপদ। জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল তার অতবড় শরীরখানা। প্রহলাদই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে খবর করেছিল সেবার, কালীপদর মাথায় বাজ পড়েছে। খবর শুনে সে বাজ পড়েছিল মঙ্গলার মাথায়ও।

পুণ্যি ডুকরে কাঁদছে ওদিকে। মঙ্গলা ফের ক্যার ক্যার করে হামলে পড়ল মহাদেবখুড়োর ওপর, তোমরা লোকটারে রেখে আলে? অ্যাঁ?

মহাদেবখুড়ো গলা উঁচিয়ে ফের বলল, ফেরার পথে পবন বাহ্যে করতে নেমিছিল জঙ্গলে। সেখেন থিকে যদি বাঘে নে যায়, তার আমরা কী করতি পারি?

জঙ্গলের বাঘের গল্প তখন সাতকাহন হয়ে ঘুরছে ঈশ্বরীপুরের পাড়ায়-পাড়ায়। একঘর থেকে আর এক ঘরে কানাকানি হচ্ছে, পবনকে কী করে বাঘে নিয়ে গেল তার ফলাও কাহিনী। কেউ বলল, মহাদেবখুড়ো তো সত্যিকথাটা বলেনি। আসল কথা হল গিয়ে, সমুদ্দুরে পৌঁছবার আগেই পবন নৌকো থেকে নিখোঁজ। সোঁদরবনের খাঁড়িতে রাতে নৌকো নোঙর করে ঘুমোচ্ছিল মাছমারারা। এক নৌকোয় পাশাপাশি পাঁচজনে। কখন রাতের ঘোরে তিনি এসে মুখে করে নে গেলেন পবনরে তা নৌকোর বাকি চারজনের কেউই টের পায়নি। সে এক আশ্চয্যি কান্ড।

চাটুজ্জেপাড়ার কুটুকাকা বললেন, রাতের বেলা তো নয়, ঘোর দিনের বেলা। কাঠ কাটতে নেমেছিল পবন। পবনটা ভালোমানুষ বলে বাকি সবাই ওকেই পাঠিয়েছিল জঙ্গলে। ডাঙায় নামতে না নামতে তিনি এসে ঘাড় মটকে—। সক্কলের চোখের সামনেই—

চাটুজ্জেপাড়ার কুটুকাকা ঈশ্বরীপুরের নিরিবিলি জীবনে এক অন্য বিস্ময়। কুটুকাকা হল গিয়ে লেখাদির বাবা। লম্বা ফিনফিনে চেহারা, ফর্সা গায়ের রং। আড়ালে-আব্‌ডালে এ গাঁয়ের অনেকে তাঁকে 'গেজেট' বলে অভিহিত করে। সারাদিন বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়েন তাঁর গঞ্জের আড়তে বসে, তারপর যাঁকেই সামনে পান, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের বৃত্তান্ত আঁতিপাতি করে শোনাতে চান। যে খবর লেখা হয় না, তারও কাহিনী শুনিয়ে দেন রসালো করে। কুটুকাকার বলার ধরনই এমন যে, তা শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যাবে। গঞ্জের আড়তে তাঁর শ্রোতাও কম নয়। শ্রোতা হওয়ার সুবিধে এই যে, তাতে দু-তিনবার ফ্রিতে চা পাওয়া যায়। কুটুকাকার মস্ত পাটের কারবার, রোজগারও মেলাই, একসময় সিনেমায় নামার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন। নামতে না পেরে এখন খুব নেশাভাঙ করেন। তখন তাঁর জ্ঞান নাকি আরও বেড়ে যায়। তাঁর আড়তের সামনে চায়ের দোকান থেকে সারাদিন এন্তার চা আসে মাটির ভাঁড়ে।

ক'দিন আগে লেখাদিকে ভূতে পাওয়ার পর ক'দিন সেই ভূতের ধমক খেয়ে চুপচাপ ছিলেন। হঠাৎ বাঘের গল্প শুনে ফের মুখ খুলেছেন।

একদিন ইস্কুল থেকে ফেরার পথে সে-কথা শুনে এসে শঙ্খ ব্যাপারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল মনের ভেতর। পরদিন সকালে গিয়ে ধরল ঈশ্বরীপুর গাঁয়ে আসা নতুন মানুষ অর্ঘদাকে, সত্যি অর্ঘদা, সব্বার চোখের সামনে থে এভাবে নিয়ে গেল বাঘটা?

সেই কোন অচিন্‌দেশ থেকে এসেছে বলে শঙ্খর মনে হয়, অর্ঘদা অনেককিছু জানে। জলজংলার দেশের মানুষ অর্ঘদা, জানেও অনেক, সেদিন শীতলাতলার বটগাছটার ফোকরে একটা গোঁড়িভাঙা কেউটে দেখে বলেছিল, পানশিউলির ডাল পাওয়া যায় এখানে? পানশিউলির ডাল একবার ওদের নাকের কাছে ঘুরোলে খুব জব্দ। তারপর আবার বলেছিল,

মনিরাজ গাছের শেকড় দুধ দিয়ে ফুটিয়ে খাইয়ে দিলে তবে গোঁড়ি-কেউটের বিষ নামে। খুব সাংঘাতিক সাপ।

শঙ্খর প্রশ্ন শুনে আজ বলল, বাঘ তো এমন সবার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার নেয় না। শিকার চোখে পড়লে তাকে অলক্ষে ফলো করে। নিঃসাড়ে। কখনও শিকারের চারপাশে ঘের দিতি দিতি এগোয়। তারপর পেছন থেকে গে—

কয়েকদিনের মধ্যেই ঈশ্বরীপুর গাঁয়ে আসা ভিনদেশি মানুষ অর্ঘদার সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গেছে শঙ্খর। হঠাৎ-হঠাৎ বইখাতা ফেলে উমনো-ঝুমনোদের বাড়ি সেঁধিয়ে যায় সে, গিয়ে দেখে, ওদের ছোট্ট কামরার ভেতর বাঁশের মাচানে বিছোনো বিছানায় উপুড় হয়ে শাদা খাতার ওপর আঁকিবুকি কাটছে অর্ঘদা। সে আঁকিবুকি কখনও সখনও এক-একটা ছবি হয়ে ওঠে। বেশিরভাগই গ্রামবাংলার দৃশ্যপট। পেন্সিলের শিস এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে কখনও উড়িয়ে নিয়ে যায় একদঙ্গল পাখি। কখনও শাদা কাশফুলের বনে একরাশ উদাস হাওয়া। কখনও ছোট্ট একটা শান্ত নদী, তার দু'তীরে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক'টা লম্বা নারকেলগাছ। কখনও গাছগাছালিতে ঢাকা নিরিবিলি গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে উধাও হয়ে যাওয়া সরু একফালি মেটে পথ।

সবই পেন্সিলে আঁকা। তাতে কোথাও রং দেয় না। অথচ শঙ্খর আবার ভারী পছন্দ রং। গাঁ-বাংলায় ছড়ানো-ছিটোনো এত-এত রং, অথচ অর্ঘদা কেন রং দেয় না ছবিতে তা বুঝতে পারে না।

তবু রুদ্ধশ্বাসে ছবিগুলো দেখতে দেখতে সম্মোহিত হয়ে যায় সে। তাদের ঈশ্বরীপুরের প্রকৃতি, পথঘাট, নদী, গাছগাছালি একরকম, আর অর্ঘদার আঁকা ছবিগুলোর গাঁ-গেরাম যেন আর একরকম। এগুলো নিশ্চয় কাঁকিদহের নদী,পথঘাট, গাছ-গাছালি। ঠিক যেন রূপকথার মতোই এক দেশ। ছবিগুলো দেখলে সেই চমৎকার দৃশ্যপটের ভেতর হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। এরকম কোনও মেটে পথ বেয়েই হয়তো রূপকথার রাজপুত্র পার হয়ে যায় আশ্চর্য সব বিভুঁই। অর্ঘদা যেন সে-সব দেশেরই একজন।

অর্ঘদা তখন বলে চলেছে, জঙ্গল আর এ-বাংলায় কোথায়, সবই তো পুব-বাংলায় পড়েছে। যেমন জঙ্গল, তেমনই বাঘের দাপট সে-দেশে। গয়নার নৌকোয় প্রায়ই খবর চলে আসে, বাঘে মানুষ নে গেছে। যারা কাঠ কাটতে যায়, মধু পাড়তে যায়, মাছ ধরতে যায়, তাদের কাউকে না কাউকে তেনারা এসে দখল নেয়। শুধু জঙ্গল করলি তো আর হবে না, করও দিতি হবে।

করের কথা শুনলে শঙ্খর বুকের ভেতরটা কেমন গুরগুর করে ওঠে। জেলেপাড়ার মাঝিমাল্লারা এমন করের কথা কতবার শুনিয়েছে তাদের। একবার নাকি মহাদেবখুড়োকে রাতের বেলা স্বপন দিয়েছিল, কেঠোকে কর চাই। গোটা নৌকোর লোক ভিরমি খেয়েছিল সেই স্বপ্নের কথা শুনে। কী ভয়ঙ্কর স্বপন দেখেছে মহাদেবখুড়ো! পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান ছেলে কেঠো সে স্বপনের কথা জানতে পেরে নৌকো থেকে সবার অজান্তে পালিয়ে আসে। অনেক জঙ্গল পায়ে হেঁটে পার হয়ে একেবারে সোজা তার ঘর। কিন্তু তাতেও বাঁচতে পারেনি। ঘরে ফেরার তৃতীয়দিনে হঠাৎ বাজ পড়ে মারা যায়। শঙ্খরা এখনও বলাবলি করে সে বৃত্তান্ত।

—তুমি কখনও বাঘ দেখেছ, অর্ঘদা।

—বাঘ দেখিনি, তবে বাঘে-খাওয়া মানুষ দেখেছি, বলতে বলতে অর্ঘদা হঠাৎ কেমন

উত্তেজিত হয়ে পড়ে, জানিস, একবার খবর পেলাম, আমাদের গাঁয়ের হাসপাতালে বাঘে খাওয়া মানুষ এসেছে। শুনে আমরা সবাই ছুটতে ছুটতে গেলাম হাসপাতালে। লোকটা তার ভাইএর সঙ্গে কাঠ কাটতে গিয়েছিল জঙ্গলে। ডাঙায় নেমে দু'জন দু'জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঠ কাটছিল, হঠাৎ একজনের নজরে পড়ে আর একজনকে পেছন থেকে এসে বাঘে ধরেছে। দেখামাত্র সে তার হাতের কুড়ুল উঁচিয়ে গিয়ে বাঘের পিঠে এক কোপ। ঘা-খাওয়া বাঘটা ঘুরে দাঁড়িয়ে কুড়ুল-উঁচোনো লোকটার চোয়ালে সপাটে এক থাবা বসায়। লোকটা ছিটকে গিয়ে পড়েছিল পাশের কাঁটাগাছের ঝোপের ভেতর। বাঘটার কাঁধ তখন প্রায় দু'ফাল। তাতেও কাবু হয় নি। কাঁটাঝোপের দিকে আর না গিয়ে আগের লোকটাকে নিয়ে চলে যায় গভীর জঙ্গলের ভেতর। বাঘের থাবা খেয়ে কাঁটাঝোপের ভেতর তখন গোঙাচ্ছে এই লোকটা। তার গোঙানি শুনে ছুটে এসেছিল কাছাকাছি নোঙর করে থাকা অন্য নৌকোর মাঝিমাল্লারা। তারাই টানা তিনদিন নৌকো বেয়ে তাকে নিয়ে এসেছিল হাসপাতালে। আমরা যখন তাকে দেখতে যাই, লোকটার চোয়াল তখন এমন ভয়ঙ্করভাবে ফুলে গিয়েছে যে মনে হচ্ছে লোকটার একটা মাথার জায়গায় তিনটে মাথা। আব কী আশ্চর্য, তখনও জ্ঞান ছিল লোকটার। হাসপাতালের ডাক্তার অবশ্য সেখানে রাখতে সাহস পাননি। তাকে নৌকোয় তুলে পাঠিয়ে দেন মহাকুমা হাসপাতালে। কিন্তু যাওয়ার পথেই লোকটা মারা যায়—

বলতে বলতে অর্ঘদা হঠাৎ দু'হাতে চোখ ঢাকে, উহ্, সে যে কী বীভৎস দৃশ্য!

শেষকথাটা এমন আর্তনাদের স্বরে বলল অর্ঘদা যে চমকে উঠল শঙ্খ। দু'হাতে চোখ ঢেকে অর্ঘদা তখন তার মাথাটা গুঁজে দিয়েছে দু'হাঁটুর ভেতর। শঙ্খর মনে হল, অর্ঘদার শরীর থরথর করে কাঁপছে। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ তার এহেন পরিবর্তনে আশ্চর্য হয়ে যায় শঙ্খ। অর্ঘদার শরীরটা হঠাৎ কাঁপছেই বা কেন! তাহলে কি অর্ঘদা কাঁদছে? কাঁদছে কেন অর্ঘদা!

কিছুক্ষণ পর অর্ঘদা হাঁটুর ভেতর থেকে চোখ তুলে তাকাল। শঙ্খ অবাক হয়ে দেখল, সে চোখ জবাফুলের মতো লাল। শঙ্খর ধারণাই তাহলে ঠিক, এতক্ষণ ফুলে ফুলে কাঁদছিল অর্ঘদা।

—কী হল, অর্ঘদা?

অর্ঘদা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেল। লাজুক-লাজুক মুখে হাসতে চেষ্টা করল একটু, বলল, আসলে মৃত্যুর কথা আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি নে। যে-কোনও মৃত্যুই আমার কাছে অসহ্য, বীভৎস মনে হয়।

শঙ্খর জীবনে এমন কোনও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা নেই। ইস্কুলে যাওয়া-আসার পথে সে দু-চারবার শবদেহ বয়ে নিয়ে যেতে দখেছে. মৃত্যুর সেই দৃশ্যও শঙ্খর কাছে মনে হয় অস্বস্তিকর, শোকাবহ। একদিন ইস্কুল থেকে সন্ধেবেলা ফেরার পথে শ্মশানকালীতলায় একটি শবদেহ নামানো রয়েছে দেখে কৌতূহলী হয়ে দেখতে গিয়েছিল। চালিতে শোয়ানো ছিল বাইশ-তেইশ বছরের একটি যুবকের দেহ, তার নিষ্পাপ, কচি মুখ দেখে শিউরে উঠেছিল তৎক্ষনাৎ। শুনেছিল ছেলেটি হাঁটুজলে নেমে ধানের চারা বুনতে গিয়ে সাপের ছোবল খায়। এক ঘন্টার মধ্যেই মুখে গাঁজলা উঠে ঢলে পড়েছিল মাটিতে।

এখনও সেই দৃশ্য শঙ্খর মাথার ঘাই দিয়ে উঠলে ভয়ে কেঁপে ওঠে সে। সেও তো অর্ঘদার মতো মৃত্যুর দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর। মুহূর্তে খালি করে নিয়ে যায় ভরভরন্ত ঘর।

কথা ঘোরাবার জন্য শঙ্খ অন্য প্রসঙ্গ পাড়ে, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা অর্ঘদা, তোমাদের

বাড়ি থেকে বর্ডার কতদূর? কখনও গিয়েছ বর্ডারে?

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে অর্ঘদা, সে তো একেবারে কাছেই। আমাদের বাড়ি থেকে তো একমাইলও হবে না। আমরা তো হরদম যাই ওপারে—

—সে কি? শঙ্খ আশ্চর্য হয়, তোমাদের পাশপোর্ট লাগে না!

অর্ঘদা হাসল, পাশপোর্ট তো সবে দু-একবছর হল চালু হয়েছে। কিন্তু আমাদের লাগে না। আমরা তো সব চেনা লোক। তা ছাড়া, আমাদের বাজার-হাট করতে তো ওপারে যেতেই হয়। ওপারে ফণিমনসাতলার হাটটাই তো আমাদের ও দিগরের মানুষের এক মাত্র হাট। হিন্দুস্থান-পাকিস্থান হয়ে এখন বর্ডারের ওপারে পড়ে গেছে বলে কেউ তো আর শুনবে না। শনি-বুধবারে হাটের দিন মাছ কিংবা সব্জি কেনার টানে-টানে অমনি চলে যাবে।

শঙ্খর তবু যেন প্রত্যয় হয় না, আর পুলিশ?

—পুলিশ? অর্ঘদা হঠাৎ কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। তার সারামুখ জুড়ে কেমন যেন এক আতঙ্ক। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এপার-ওপার দু'পারের পুলিশই তো আমাদের চেনা।

বলল বটে অর্ঘদা, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

অর্ঘদার এই হঠাৎ-হঠাৎ পরিবর্তনে শঙ্খ বেশ অবাক হয়। মানুষটা এই মুহূর্তে কত হাসিখুশি, এই দ্যাখো কত রগড়ের গল্প বলছে, হাসছে, হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে ওঠে পরমুহূর্তে। শঙ্খ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অর্ঘদার মুখের দিকে, কিছু বুঝতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অর্ঘদা হঠাৎ আবার বলল, হিন্দুস্থান-পাকিস্থান হলেই যে সবাই মেনে নেবে এমন কোনও কথা নেই। আমাদের গাঁয়ের একজনের শোবার ঘর হিন্দুস্থানে তো তার রান্নাঘর পাকিস্থানে। তারা কী করবে?

আবারও অবাক হল শঙ্খ, তাই?

কথা বলতে বলতে দু'জনে গিয়ে পৌঁছয় ইছামতীর ধারে। খেয়াঘাটের পাশে মস্ত এক কদমগাছের নীচে বসে থাকে দু'জনে। এমন গল্পে-গল্পে কতদিন দুপুর কাবার হয়ে যায়। শঙ্খর ঠাক্‌মা কখনও তাকে খুঁজতে বেরোন, কী রে, তোর কি আজ নাওয়া-খাওয়া নেই নাকি! তোর দাদু তো তোর সঙ্গে খাবে বলে বসে আছে।

কখনও অর্ঘদার সঙ্গে বিকেলবেলা হাঁটিতে হাঁটিতে চলে যায় ইছামতীর কিনার বরাবর। তখন হয়তো হু-হু করে ভাঁটার জল ভাঙছে দক্ষিণদিক বরাবর। তীব্রস্রোতের দিকে তাকিয়ে হয়তো উদাস হয়ে যায় অর্ঘদা। নিশ্চয় এসব সময় অর্ঘদা তার বাড়ির কথা ভাবে। কখনও একটা গয়নার নৌকো দেখলে বলে, নিশ্চয় এটা কেটেঘাট হয়ে তেঁতুলিয়র দিকে যাচ্ছে। তেঁতুলিয়া হয়েই তো কাঁকিদহর নৌকো যায়—

তেঁতুলিয়ার নাম শুনলে শঙ্খর বুকের ভেতরটাও কেমন যেন করে ওঠে। তার মা-বাবা-বোনেরাও তো সেই বর্ডারের কাছের দেশ সাগরদ'য় রয়েছে। কাঁকিদহ থেকে সাগরদ' কতদূরে তা শঙ্খ জানে না। তবু তার মনে হয়, এইসব কোনও একটা গয়নার নৌকোয় চড়ে বসলে হয়তো সেও অর্ঘদার সঙ্গে চলে যেতে পারবে সাগরদ'য়। নিশ্চয় কাঁকিদহর খুব কাছেই হবে সাগরদ'। হয়তো তাইই অর্ঘদাকে ভারী আপন, ভারী কাছের মানুষ মনে হয় শঙ্খর।

কখনও দু'জনে হাঁটিতে হাঁটিতে চলে যায় রানিশায়রের তীরে। রানিশায়রের স্বচ্ছ টলটলে জলের কিনারে বসে ছোট ছোট খোলামকুচি ছোঁড়ে। সে-খোলামকুচি জলের ওপর দিয়ে

পিছল্ কেটে কেটে চলে যায় বহুদূর—তারপর একসময় টুপ করে ডুবে যায় কোনও শালুক কি পদ্মপাতার আড়ালে। ইছামতীর জলে এরকম কোনও খোলামকুচি ছোড়া যায় না। সেখানে সবসময় স্রোত, কখনও জোয়ারের, কখনও ভাটার। খোলামকুচি ফেলতে না ফেলতে হারিয়ে যায় স্রোতের টানে।

কিন্তু রানিশায়রের জল একজায়গায় থেমে আছে। তার জলে হাওয়া লেগে কখনওবা তিরতির করে সামান্য ঢেউ ওঠে বটে, কিন্তু বছরের বেশিরভাগ সময়ই সে জল শান্ত, চুপচাপ। রানিশায়রের জল অনেক বেশি নিরিবিলি। তার কিনারে বসে থাকার একটা অন্যরকম সুখ। কখনও একঠেঙে বক, কখনও ডাহুক, কখনওবা চড়ুইপাখির দঙ্গলের দিকে চোখ পড়ে যায়। কখনও পদ্মফুলের উপর ডানা মেলে ওড়ে রকমারকম প্রজাপতি। সেসব প্রজাপতির ডানার রং, তার কারুকাজ দেখলে মনে হয়, নিশ্চয় কোনও শিল্পীর আঁকা। কোনও এক উঁচুদরের শিল্পী রং আর তুলি দিয়ে এঁকেছেন প্রজাপতির ডানা। কিন্তু কে সেই শিল্পী! অর্ঘদাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল শঙ্খ, কী করে প্রজাপতির ডানা এমন সুন্দর হয়, বলো তো?

অর্ঘদা হেসে উঠে বলেছিল, এই যা কিছু দেখছিস, সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা যা আছে, সব। স—ব।

স—ব! শঙ্খ নিজের ভেতর উথালপাথাল হয়, স—ব!

কখনও অর্ঘদাকে সঙ্গে নিয়ে মরাসোঁতার সাঁকো পার হয়ে চলে যায় পুবদিকে। ও পারের নাম তিন্তিড়িপাড়া, গোটা গাঁয়ে মুসলমানদের বাস। আনন্দ চাটুজ্জের জমিতে চাষবাস করে যে মৈনুদ্দি, আকিঞ্চন চাটুজ্জের খেজুরবাগান ঝুড়ে নলিতে ঘন মিষ্টি রস আনে যে সামসের আলি, সবাই এই তিন্তিড়িপাড়ায় থাকে। গোটা তিন্তিড়িপাড়ায় শুধু আমবাগান আর আমবাগান। যত না বাড়িঘর, তার চেয়ে আমবাগান বেশি। এমনকি গাঁয়ে ঢুকতে যে ছোট্ট মসজিদটা, তার ওপরও বারোমাস ছায়া দেয় একটা বিশাল সিঁদুরকোটো আমগাছ।

দু'জনে ঘুরতে ঘুরতে কত অচেনা, অল্পচেনা পথ আবিষ্কার করে। কোথায় রাস্তার পাশে একটা বক্‌ফুলের গাছ আছে,তাতে থোকা-থোকা শাদা বক্ ফুলে উপুরঝুপুড় হয়ে থাকে, কোথায় খানাখন্দের পাশে একটা ফলসাগাছে ভর্তি হয়ে থাকে পেকে টুসটুসে হয়ে থাকা লালবেগুনিরঙের ফলসা, কোথায় বনের মধ্যে চুপিচুপি বড় হয়ে ওঠা একটা করমচা গাছ, তাতে টক-মিষ্টি করমচায় লাল হয়ে থাকে ডাল, কোথায় একটা কুঁচফলের গাছ, কোথাওবা হাত বাড়ালেই নোয়ানো যায় এমন ছোট্ট আমগাছের ডালে ভরে আছে কচি-কচি বৌলে।

এমন হাজারো আবিষ্কারে মৌজ হয়ে থাকে শঙ্খ। অর্ঘদা কখনও তাকে বসন্তবৌরি পাখি চেনায়, কখনও নকল করে শোনায় টুনটুনি কিংব ময়নার ডাক, কখনও বিশাল শিরীষগাছের ডাল থেকে ভেসে আসা কোকিলের ডাককে ফিরিয়ে দেয় কু-হু, কু-হু ডাক দিয়ে।

যে-সব আন্‌কাপথ বেয়ে বেয়ে তারা এমন আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠে, ফেরার সময় সে পথ আবার খুঁজে পাওয়া যায় না। বনবাদাড়ে এক পথ থেকে কখন অন্য কোনো পথে গিয়ে পড়ে বুঝতেই পারে না তারা। অর্ঘদা তখন এলোমেলো ঘুবতে ঘুরতে বলে, বাহ্, আমরা তো কলম্বাস হয়ে গেলাম রে। কত যে নতুন পথ খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাচ্ছি। এভাবেই কোনও একদিন নতুন একটা আমেরিকা আবিষ্কার করে ফেলব আমরা। এমন বেঘোরে ঘুরতে ঘুরতে কোনওদিন বা সন্ধে ঘনিয়ে আসে। কখনও বা একটু রাতও। একদিন শঙ্খ ঘরে ফিরে দেখল ঠাকুর্দা তার অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে। একটু রাগতই দেখাচ্ছে তাঁকে। তাকে দেখেই, যা কখনও করেন না, হঠাৎ বকে উঠলেন, একটা অপোগণ্ড ছেলের

পাছ্-পাছ্ কোথায় ঘুরিস রোজ। সে না-হয় বাউন্ডুলে। লেখা পড়ার নাম করে না। ইস্কুলে ভর্তি না হয়ে টো-টো করে আগান-বাগানে ঘুরে বেড়ায়। তার সঙ্গে মিশে তুইও লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিচ্ছিস নাকি? কেন বাড়ি থেকে হঠাৎ পালিয়ে এসে রয়েছে এখেনে তাও বুঝতি পারিনে—

শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে ঠাকুর্দার মুখের দিকে।

জলচৌকির ওপর উবু হয়ে বসে রাস্তার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন জীবেন্দ্রনাথ। বেলা প্রায় আটটা বাজতে চলল, তবু হীরালাল অধিকারীর দেখা নেই। অথচ পরশু বুধবার সন্ধেবেলা জে.এল.আর.ও অফিসের সামনে দেখা হতেই বলেছিল, শুক্রবার ভোরে উঠেই আপনার বাড়ি যাচ্ছি, তালুইমশাই। অনেক পরামর্শ আছে।

কেন যে হীরালাল তাঁকে তালুইমশাই বলে ডাকে, তা জীবেন্দ্রনাথ জানেন না। তঁর সঙ্গে হীরালালের আত্মীয়তার কোনও সম্পর্কই নেই। হীরালালরা ঈশ্বরীপুরে বাস করছে আজ সাতপুরুযেব ওপর। আব জীবেন্দ্রনাথরা উদ্বাস্তু হয়ে এখানে বসত গড়েছেন মাত্র ন'দশবছর আগে। হীরালালের সঙ্গে সেই তখন থেকেই আলাপ। আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই বলে তালুইমশাই বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবু কী জানি কেন, এই ডাকটা ডেকেই বোধহয় হীরালাল তাঁর সঙ্গে একটা অলিখিত আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলেছে। শুধু তাঁর সঙ্গেই নয়,হীরালাল এভাবে এ তল্লাটের দশ-বিশটা গাঁয়ের মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে।

না বাঁধার কোনও কারণও নেই অবশ্য, কারণ হীরালালের গুণ অনেক। ছোট্টখাট্ট রোগাপাত্লা চেহারা তার। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো হবে। ছোট্ট চেহারা বলে আঠাশ-তিরিশও মনে হয় অনেকসময়। কিন্তু বয়স যাই হোক, ওইটুকু শরীরের মধ্যে সবসময় একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ চকমক করছে যেন। কথাবার্তায় তুখোড়, শানদেওয়া বুদ্ধি, পরিশ্রম করার অসীম ক্ষমতা হীরালালের। তার উপর লোকের উপকার করার জন্য সদা উদগ্রীব এই মানুষটির সঙ্গে দু-দন্ড মিশলেই বোঝা যায়, চাপা আগুন লুকিয়ে আছে তার ভেতর। দশ-বিশটা গাঁয়ের লোক একডাকে হীরালাল অধিকারীকে চেনে।

এহেন মানুষটা হঠাৎ জীবেন্দ্রনাথকে এত পছন্দ করে ফেলেছে কেন কে জানে। হঠাৎ-হঠাৎ ছোট-ছোট পায়ে লম্বা-লম্বা ধাপ ফেলে এসে হাজির হয় তাঁর বাড়িতে, দাওয়ায় ওপর বিছোনো খেজুরপাতার চাটাইতে পা মুড়ে জুতজাত হয়ে বসে চেঁচিয়ে ওঠে, তালুইমা, অনেকপথ হাঁটিতে হাঁটিতে আসছি। এক গেলাস ঠান্ডা জল খাওয়াতে হবে!

দিন পনের আগেও সেরকমই এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর বাড়িতে। তারপর জলটল খেয়ে ঠান্ডা হয়ে শলা-পরামর্শ করতে বসেছিল জীবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। বলেছিল, কী করি বলুন তো তালুইমশাই। কংগ্রেস থেকে তো নমিনেশন দেবে বলে মনে হচ্ছে না।

জীবেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বলেছিলেন, তাই নাকি?

—সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলাম। চীফ্ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলাম খুব, কিন্তু ডাঃ রায় সময় করে উঠতে পারেননি।

জীবেন্দ্রনাথ খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন, বেশ আশ্চর্যও। ক'দিন আগে তিনিই বড় মুখ করে বলেছিলেন, তোমাকে নমিনেশন দেবেই ওরা। এ তল্লাটে তোমার যা নামযশ হয়েছে, তাতে তোমাকে ক্যান্ডিডেট না করলে ভুল করবে কংগ্রেস।

—বুঝলেন তালুইমশাই, কম্যুনিষ্টপার্টি থেকে আমাকে বলছে, ওদের হয়ে দাঁড়নোর জন্য। কংগ্রেস থেকে আমাকে নমিনেশন দেয়নি শুনে সেদিন বসিরহাট থেকে ওদের সুশীতল বিশ্বাস এসেছিল। বলল, ওদের পার্টিতে আমাকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

জীবেন্দ্রনাথ দ্বিধান্বিত চোখে তাকিয়েছিলেন হীরালালের দিকে। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই দ্বিতীয়বার সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে। পাঁচবছর আগে, উনিশশো বাহান্নতে তিনশো আটত্রিশটা আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছিল একশো পঞ্চাশটি আসন। কম্যুনিস্টদল পেয়েছিল মাত্র আঠাশটি। এই ক'বছরে কম্যুনিস্টরা এখনও তেমন প্রতিপত্তি অর্জন করেনি যে তাদের হয়ে দাঁড়ানো লাভের হবে। বরং গত পাঁচবছরে বিধান রায় অনেকগুলো ভালো কাজ করেছেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্রুত ও সঠিক রূপায়ণই নজরে পড়েছে সবার। তাছাড়া উদ্বাস্তু-সমস্যা যেভাবে মোকাবিলা করছেন তাতে উদ্বাস্তুরা তাঁর কাছ থেকে আরও অনেককিছু আশা করছে। কংগ্রেসের ভাবমূর্তি এই মুহূর্তে এমনই যে কম্যুনিস্টদলের ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসা নিতান্তই দুরাশা। হীরালাল যদি কম্যুনিস্টদলের হয়ে ভোটে দাঁড়ায়—

হীরালাল পরক্ষণেই বলল, ওদের প্রস্তাবে আমি রাজি হইনি। ছোটবেলা থেকে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করে এলাম, রাতারাতি কম্যুনিস্ট হয়ে যাই কী করে, বলুন?

জীবেন্দ্রনাথ মাথা নেড়েছিলেন, ঠিকই তো। কিন্তু কংগ্রেস তোমাকে নমিনেশন না দিলে কাকেই বা দেবে?

— শুনছি পাতাসোরের সিরাজুল হক দাঁড়চ্ছে। ঈশ্বরীপুরের আশেপাশে সবই তো মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকা। কংগ্রেস সেই ভাবনাটা মাথায় রেখেছে —

জীবেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, তাহলে তো খুব মুশকিল হয়ে গেল। তুমি ইলেকশনের জন্য এতটা এগিয়ে গিয়েছ, আর এখন —

— খুবই ভাবনায় পড়েছি, তালুইমশাই। এই মুহূর্তে আমার কী করা উচিৎ, তাই নিয়ে আপনার সঙ্গে শলাপরামর্শ করব বলেই এই সাতসকালে ছুটে এসেছি।

জীবেন্দ্রনাথের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিড়িতে বার দুই-তিন টান দিয়ে হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন, তুমি আর একবার চেষ্টা করে দেখ। কলকাতা গিয়ে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দেখা করো। যদি তাতেও কিছু না হয়, তবে নির্দল হয়ে নমিনেশন ফাইল করো। তাতে কংগ্রেস ভয় পেয়ে শেষে তোমাকেই দলীয় প্রতীক দিতে বাধ্য হবে। নইলে নির্দল হয়েই লড়ে যাও। জিত তোমার হবেই—

হীরালাল অধিকারী তাঁর ডানহাত তুলে একটা তুড়ি দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, ঠিক বলেছেন তো তালুইমশাই। এ'কথাটা আমার মাথায় আসে নি। লোকে সবসময় পার্টি দেখে ভোট দেয় তা নয়, ক্যান্ডিডেট দেখেও ভোট দেবে।

জীবেন্দ্রনাথ মাথা নেড়েছিলেন, ঠিকই তো।

তারপর গত পরশুই দেখা হয়েছিল হীরালালের সঙ্গে। দেখা হতেই বলেছিল, কাল নমিনেশন সাবমিট করছি, তালুইমশাই। আপনার কথামতো নির্দল হয়েই দাঁড়াচ্ছি। খুব খাটতে

হবে কিন্তু আপনাকে –

জীবেন্দ্রনাথ তৎক্ষনাৎ বলেছিলেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

সেদিন বড় গলায় বলেছিলেন বটে, নিশ্চয়ই খাটব। জান লড়িয়ে দেব তোমাকে জেতাতে। ক'দিন ধরে বুঝতে পারছেন শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছে না তাঁর। অম্বলের পুরনো ব্যারামটা হঠাৎ চাগাড় দিয়ে উঠেছে। একটু বেশি হাঁটা-চলা করলে ধড়ফড় করে বুকের ভেতর। একটা কিসের না কিসের যেন আংটি ধারণ করে অর্শটা একটু কমেছিল, মাসখানেক যাবৎ আবার বেড়েছে। আংটিটা দেওয়ার সময় লোকটা বলেছিল, নিষেধগুলো মেনে চলবেন চাড়ুজ্জেমশাই। দেখবেন একেবারে সেরে যাবে। হয়তো এরমধ্যে তাঁর অজান্তে কোনও নিষেধ অমান্য করে ফেলেছেন।

ভাবতে ভাবতে বেলা ন'টা বেজে গেল দেখে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না জীবেন্দ্রনাথ। নিশ্চয় হীরালাল কোনও অসুবিধেয় পড়েছে, নইলে তার তো কথা সচরাচর ফেল হয় না। তাহলে কি কাল কোনও কারণে নমিনেশন দিতে পারেনি! কালই তো লাস্ট ডেট ছিল মনে হয়। না কি অন্য কোনও কারণে –

হঠাৎ জলচৌকি থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ঘরের ভেতর গিয়ে পরনের খাটো ধুতিটা বদলে একটা ফর্সা ধুতি পরে নিলেন। গায়ের ফতুয়াটা খুলে ব্রাকেট থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেন শাদা শার্টটা। পরতে গিয়ে দেখলেন, শার্টের কলারের কাছটায় একটা ফাট্ ধরেছে। দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরুল তাঁর বুক থেকে। শার্টটার আর দোষ কোথায়। গত চার-পাঁচবছর ধরে এই একটাই শার্ট পরে আসছেন। সপ্তাহান্তে একবার শার্টটা কেচে দেন স্নেহবাসিনী। সেইটেই বাকি ছ'দিন ধরে পরতে হয়।

পোশাক পরে, অভ্যাসমতো লম্বা ডাঁটিঅলা ছাতিটা হাতে নিয়ে সবে দাওয়া থেকে নামতে যাবেন, হঠাৎ দেখলেন, দূরে ছোট-ছোট পায়ে এদিকেই আসছে হীরালাল। জীবেন্দ্রনাথকে দেখে নিচু হয়ে প্রণাম করে বলল, কোথায় চললেন তালুইমশাই?

হীরালাল আসতে জীবেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হলেন। ছাতাটা দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে বললেন, গঞ্জের দিকেই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, নিশ্চয় কোনও অসুবিধেয় পড়েছ, তাই একবার খোঁজ করে আসি।

হীরালাল লজ্জিত হয়ে বলল, আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, সকাল থেকে বাড়িতে এত লোকজন এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলে তবে আপনার কাছে আসতে পারলাম। বলতে বলতে চাটাইএর উপর পা গুটিয়ে বসে পড়ল হীরালাল।

এতক্ষণ যে ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলেন জীবেন্দ্রনাথ, সেই কথাই জানতে চাইলেন প্রথমে, কাল নমিনেশন দিয়ে এসেছ?

—দিয়ে তো এলাম তালুইমশাই। তবে নির্দল হয়ে নয়।

তাহলে! জীবেন্দ্রনাথ ভারী আশ্চর্য হয়ে তাকালেন হীরালালের দিকে। হয়তো কংগ্রেস শেষপর্যন্ত মত বদলেছে এমন ভাবলেন।

—কংগ্রেস কর্মী পরিষদের হয়ে দাঁড়ালাম।

—কংগ্রেস কর্মী পরিষদ! জীবেন্দ্রনাথের মনে হল, এই নামে যে একটা দল আছে তা বোধহয় তিনি জানেনেই না।

—হ্যাঁ। শেষমুহূর্তে ওদের পার্টির তরফ থেকে যোগাযোগ করল আমার সঙ্গে। বলল, আমাদের পার্টির সংগঠন বেশ জোরদার হচ্ছে। প্রচুল ওয়ার্কার পেয়েছি। ডিভোটেড

ওয়ার্কার। খুব খাটাখাটুনি করবে আমার হয়ে।

জীবেন্দ্রনাথকে এতক্ষণে আশ্বস্ত দেখালো। উজ্জ্বলমুখে বললেন, তাহলে তো বেশ সুখবর।

—এখন আপনাদের আশীর্বাদ আমার ভরসা। কাল থেকেই ক্যাম্পেন শুরু হচ্ছে। তিরিশহাজার পোস্টার ছাপার অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রেসে। সামনের সপ্তাহ থেকে মিটিং শুরু করছি।

—বাহ্, বাহ্, জীবেন্দ্রনাথ যেন স্বগতোক্তি করলেন, লেগেপড়ে নেমে যাও। আমরা সবাই তোমার পেছনে আছি।

হীরালাল অধিকারীর এতক্ষণে নজরে পড়ল বাড়ির সামনে নতুন মাটি ফেলা ভিতটার দিকে। বললেন, আর একটা ঘর তুলবেন বললেন তালুইমশাই, তা শেষ করলেন না?

ঘাড় নাড়লেন জীবেন্দ্রনাথ, একখানা ঘর না তুললেই নয়। এই পুরনো ঘরখানার চালে গোলপাতাগুলো সব শুকিয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সামনেই বর্ষা আসছে। গেল বর্ষায় যা ভন্না হয়েছিল, তাতে রোজ ঘরের মেঝে জলে থইথই করেছে। এবার বর্ষায় এ ঘরে আর বাস করা যাবে না। কিন্তু ঘরে এমন রেস্ত নেই যে খুঁটি পুতে চালের ফ্রেম তোয়ের করি।

বলে হাসতে চেষ্টা করলেন জীবেন্দ্রনাথ, এদিকে দু-তিনটে ছেলে বেকার। রনোটাও তো এবার ফাইনাল দিচ্ছে—চাকরি না পেলে সংসারের কী যে হাল হবে কে জানে!

জীবেন্দ্রনাথের এতখানি উৎকণ্ঠিত হওয়ার কারণও আছে। জিনিষপত্রের দাম যেভাবে হু-হু করে বাড়ছে, তাতে দু-বেলা খোরাকি জোগাড় করতেই প্রাণান্ত হচ্ছেন। চারপাশে যেরকম খাদ্যাভাব লক্ষ করছেন, তাতে হঠাৎ আবার একটা দুর্ভিক্ষ না হয়ে যায়। পঞ্চাশের মন্বন্তর এই তো সেদিনকার কথা। মাত্র চোদ্দবছর আগেকার সে দিনগুলো জ্বলজ্বল করে ভাসছে তাঁর চোখের সামনে। তেরশ পঞ্চাশের বছর দুয়েক আগে থেকেই বীজ বোনা হচ্ছিল খাদ্যাভাবের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক অনিবার্য পরিণতি আছড়ে পড়ছিল ভারতবর্ষের বুকেও। সেবার আউশ-আমনের ফলন মার খেল প্রচন্ডভাবে। তেরশ ঊনপঞ্চাশের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বন্যায় প্লাবিত হল মেদিনীপুরসহ আরও কিছু-কিছু জেলা, সেসব এলাকায় ধানের সবচেয়ে ভালো ফলন হয়েছিল সেবার। তার উপর জাপানি ফৌজ এসে রেঙ্গুন দখল করে নেওয়ায় বার্মা থেকে চাল আসা বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। বাংলাদেশের চালের দাম তখন আকাশছোঁয়া। হঠাৎ চোদ্দটাকা মনের চাল বিকোতে লাগল চল্লিশটাকায়। চাটগাঁয় তার দাম হল আশিটাকা। ঢাকায় সে দাম ছাড়িয়ে একশোয় পৌঁছুল। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল হাঁ বাড়িয়ে ছুটে এল কালোবাজারি আর মুনাফাখোররা। তার ফলে লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ ক্রমশ অনাহারে কাটাতে লাগল দিন। খাদ্যাভাবে ধুঁকতে লাগল গোটা বাংলাদেশ। রাজপথে জমা হতে লাগল অসংখ্য মৃতদেহ। সে লাশ ডিঙিয়ে পার হতে লাগল আরও অসংখ্য মৃতপ্রায় মানুষ। কঙ্কালসার মানুষের স্তূপীকৃত মৃতদেহের দুর্গন্ধে ভরে গেল গোটা বাংলাদেশের বাতাস। কত লক্ষ মানুষ যে মারা গেল, তার ইয়ত্তা নেই। কেউ বলল পনের লক্ষ, কেউ সাতাশ।

জীবেন্দ্রনাথ সে-সব দৃশ্য নিজের চোখে দেখেছেন। তখন তো তাঁর ঘরে চাল-ডাল ছিল। কিন্তু এখন তিনি নিঃস্ব, সম্বলহীন। একদম একা মানুষ।

হীরালাল তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, এ নিয়ে আপনি বেশি ভাববেন না, তালুইমশাই। ইলেকশনে যদি রিটার্ন করি, তাহলে চাকরির জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। শুধু

আশীর্বাদ করুন—

জীবেন্দ্রনাথের মুখটা আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেভাবে একটা একটা করে দিন কাটাচ্ছেন প্রবল অর্থকষ্টের মধ্যে, তাতে ভয় হয়, কতদিন আর এভাবে সংসার টানতে পারবেন। মুহুরিগিরি থেকে কখনও একপয়সাও রোজগার হয় না। সেদিন সারাদিন ঠায় বসে থেকে হঠাৎ খেয়াল হল, পকেটে একটাও পয়সা নেই। বসিরহাট থেকে ঈশ্বরীপুরে ফিরে যাওয়ার বাসভাড়াটাও নয়। কারোর কাছে চাইতেও লজ্জা পেয়েছিলেন। অগত্যা দুপুরের রোদ পড়ে আসতে টানা সাতমাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফিরেছিলেন। ঘরে এসে চৌকিতে বসে একঘন্টার মতো সময় কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলতে পারেননি। সেদিন কে একজন বলল, বরং ঈশ্বরীপুর গঞ্জে একটা দোকান দিন, চাটুজ্জেমশাই, তাতে দু'পয়সা ঘরে আসবে। কিন্তু একটা দোকান খুলতেও তো আর কম রেস্ত লাগে না। সে পয়সাই বা কোথায় পাবেন!

একটু পরে হীরালালের চোখে পড়ল দাওয়ার এককোণে বসে শঙ্খ একা-একা চুপচাপ বসে কিছু একটা লিখছে খাতায়। হয়তোবা অঙ্কই কষছে। তার দিকে খানিকক্ষণ নির্নিমেষ তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, আপনার নাতি এবার কেমন রেজাল্ট করেছে পরীক্ষায়? লেখাপড়ায় খুব ভালো বলেছিলেন—

জীবেন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, যতটা আশা করেছিলাম, ততটা হয়নি। ফোর্থ হয়েছে এবার। ফার্স্টবয় ওর চেয়ে দশনম্বর বেশি পেয়েছে। থার্ডবয় মোটে দু'নম্বর। তবে তার জন্যে ওকে বিশেষ দোষ দিতি পারিনে। পরীক্ষার আগে তেরদিন টাইফয়েডে ভুগেছে। আমাদের সরকারি ডাক্তারকে তো তিনবার কল্ দিয়ে দেখাতি হল—

—বাহ্, তাহলে তো ভালোই রেজাল্ট করেছে বলতে হবে। এ বছর ভালো করে পড়ুক, যাতে ফার্স্ট হতে পারে।

কথাগুলো শঙ্খর কানেই গেল না হয়তো। অথবা লজ্জা পেয়েছে, শুনেও না শোনার ভান করল। একটু পরেই এ-কথা সে-কথা বলে দাওয়া থেকে উঠে পড়ল হীরালাল অধিকারী। উঠোনে নেমে বলল, প্রথম জনসভা যেদিন করব, আপনাকে খবর দেব'খনে। সভায় আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে কিন্তু।

জীবেন্দ্রনাথ ঘাড় নাড়লেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

হীরালাল অধিকারী লম্বা-লম্বা ধাপে দ্রুত বেরিয়ে যেতেই জীবেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে গেলেন নিজের ভাবনার মধ্যে। হীরালালের চলার পথের দিকে তাকিয়ে হয়তো একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। ন'-দশবছর ধরে চরম দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এখন ছেলেগুলো যদি একটু রুজিরোজগার করতে পারতো, তাহলে এই পড়ন্ত বয়সে হয়তো একটু সুখের মুখ দেখতে পারতেন। রাজনীতিতে এই অল্পবয়সেই বেশ নাম করেছে হীরালাল। সভাসমিতিতে বেশ ভালোই বক্তৃতা করতে শিখেছে। একটু কেটে-কেটে, থেমে-থেমে বক্তৃতা করে, কিন্তু তার প্রতিটি শব্দই বেশ ধারালো। বিষয়বস্তুর গভীরে ঢুকে তার বক্তব্য বেশ সরল অথচ শাণিত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করতে পারে জনগণের সামনে। জীবেন্দ্রনাথের ধারণা, এবার ভোটে হীরালালের জয় অবশ্যম্ভাবী। ভোটের আগে ক'টা দিন যদি সব এলাকায় একটা-দুটো করে মিটিং করে, তাহলে জনমানসে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ খোদাই হয়ে যাবে। আর হীরালাল জিতে গেলে তাঁর পরিবারের হয়তো হিল্লে হয়ে যাবে একটা।

ভাবতে ভাবতে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন তিনি। মনে-মনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

ছবি আঁকা হয়ে গেল তাঁর ভেতরে। পুব-বাংলার যে জীবন ছেড়ে এসেছেন, যে সুখশান্তি, যে বৈভব একনিমেষে বাতিল করে দিয়ে চলে এসেছিলেন এ-পারে, তার কিছুটাও যদি অর্জন করতে পারতেন, তাহলে এ দেশের মানুষ তাঁদের এমন হেলাফেলা করতে পারতো না। গরিব হওয়া খুব অপমানের।

হীরালাল চলে যাওয়ার পর একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার এসে বসলেন জলচৌকির ওপর। একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে ডাকলেন স্নেহবাসিনীকে, কিছু খেতে দিতে পারো? সকাল থেকে খালিপেটে আছি বলে বোধহয় শূল বেদ্‌নাটা চাগাড় দিয়ে উঠেছে—

সকালের খাবার বলতে মুড়ি আর নারকেলকোরা। মুড়িতে অম্বল দমন থাকে। স্নেহবাসিনী দ্রুত ঘরের মধ্যে গিয়ে কুরুনিটা পেতে নারকেল কুরতে বসলেন।

শঙ্খ তখন দাওয়ার এককোণে বসে একের পর এক অঙ্ক কষে যাচ্ছে। গত পরীক্ষায় তার অঙ্কের নম্বর একেবারেই ভলো হয়নি। তাদের ইস্কুলের অঙ্কের মাস্টার হরিসাধনবাবু একদিন জীবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে বলেছেন, আপনার নাতি অঙ্কটা ভালো পারে না। অঙ্কের ওপর একটু জোর দিতে বলবেন। সে-কথা তিনি শঙ্খকে বলেছেন। বোধহয় তার পর থেকেই—

মুড়ি-নারকোলকোরা চিবুতে চিবুতে একটু পরে কী যেন ভেবে হঠাৎ জীবেন্দ্রনাথ বললেন, হরিসাধন কেমন পড়ায় রে?

হাতের কলম থামিয়ে মাথা তুলল শঙ্খ, ভালোই তো। তবে—

—তবে কী?

—হরিসাধনবাবু খুব কড়া। ক্লাসে এমন গম্ভীর হয়ে থাকেন—

—মাস্টারমশাই একটু গম্ভীর হওয়াই ভালো। মাস্টার কড়া হলেই ছাত্ররা তটস্থ থাকবে। পড়া করে আনবে ঠিকমতো। খুব মারে-টারে নাকি?

শঙ্খ একটু আড়ষ্ট হয়ে বলল, না, আমাকে কোনওদিন মারেননি। তবে কেউ অঙ্ক না করে নিয়ে গেলে কিংবা বোর্ডে অঙ্ক কষতে গিয়ে ভুল করলে এক-একদিন তার পিঠে বেত ভেঙে ফেলেন।

ইস্কুলে অবশ্য শঙ্খ সবচেয়ে ভয় পায় যাঁকে, তিনি হরিসাধনবাবু নন। সবচেয়ে ভীতিপ্রদ তাদের সিক্সের ক্লাস-টিচার একলব্যবাবু। ধুতি-পাঞ্জাবিতে তাঁর চেহারাটাও বেতের মতোই লিকলিকে। তাঁর হাতের ছপ্‌টি কিংবা বেতটিও তাঁর মতোই একরোখা আর খিটখিটে। কারণে-অকারণে ছাত্রদের পিঠে প্রায়শ ভাঙেন সেটি। বেত ভেঙে গেলেও অবশ্য দুঃখিত হন না। পরদিন যার পিঠে বেত ভাঙবেন, তাকেই হুকুম করেন, ইস্কুলের কাছেপিঠে ইছামতীর ধারে যে বেতবন আছে, সেখান থেকে একটা বেত কেটে নিয়ে আসতে। বলেন, বেশ জম্পেশ করে তোয়ের করে আনবি, যেন সহজে না ভাঙে।

শঙ্খরা সমীহ করে নীলকান্তস্যারকেও। নীচের ক্লাসে বাংলা পড়ান নীলকান্তবাবু। টুকটুকে

লাল ফর্সা রং, লম্বাচওড়া চেহারা। শাদা হাফশার্ট আর ফিনফিনে ধুতি পরে ইস্কুলে আসেন। শার্টের হাতার বাইরে তাঁর বাইসেপ দেখলে তাকিয়ে থাকতে হয়। রোজ নাকি মুগুর ভাঁজেন নীলকান্তবাবু। গলার স্বরও তেমনি গমগমে।

ক্লাস ফাইভে ভর্তি হওয়ার পর একদিন নীলকান্তস্যার তাদের ক্লাসে একটা গল্প বলেছিলেন। অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা 'দি সেলফিস্ জায়েন্ট'। গল্পটায় দৈত্যের চেহারা যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন, তাতে দৈত্যটা সম্পর্কে একটা ভয় গেঁথে গিয়েছিল তার মনে। রূপকথায় যে রাক্ষসের গল্প সে শুনে থাকে ঠাক্‌মার কাছে, এই দৈত্য যেন তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। যে চমৎকার ফুলবাগানে বাচ্চারা খেলাধূলা করত, তার গেটের সামনে দৈত্য লিখে রেখেছিল, ট্রেস্‌পাসার্‌স্ উইল বি প্রসিকিউটেড্।

দৈত্যটার বর্ণনা শুনে শঙ্খ কেন এত ভয় পেয়েছিল তা ঠিক বুঝতে পারে না। হয়তো গল্পটা নীলকান্তস্যারের মুখ থেকে শোনা বলেই। শুনতে শুনতে তার মনে হয়েছিল, নীলকান্তবাবুই যেন সেই দৈত্য। অমনই তাগড়াই চেহারা তাদের বাংলার টিচার নীলকান্ত স্যারের। তাঁর গায়ের রং এতটাই ফর্সা যে, রক্ত ফেটে বেরুচ্ছে যেন মুখচোখ দিয়ে। 'সেল্‌ফিস জায়েন্ট' গল্পের সাহেব-দৈত্য বলতে যেন নীলকান্তবাবুকেই ভালো মানায়।

কিন্তু চেহারা এমন দশাসই হলেও নীলকান্তবাবু পড়ান বেশ ভালোই। পড়াতে পড়াতে কত যে গল্প বলেন রোজ-রোজ। নীলকান্তবাবুর ক্লাস থাকলে ছাত্ররা বেশ নড়েচড়ে বসে। অনেক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, অনেক ভূতের গল্প, অনেক রহস্যকাহিনী তাঁর স্টকে থাকে। ভূতের গল্প বেশ ভয়াল করে রসিয়ে বলতে বলতে যখন বড়-বড় চোখ করে তাকান, তখন রীতিমতো গা ছমছম করে শঙ্খর।

ইস্কুলে আর একজনকেও তারা বেশ সমীহ করে চলে। তিনি হেড্‌স্যার। খুব রাশভারী আর গম্ভীর ধরনের মানুষ। গলার স্বরে যেন বান ডাকে। তবে হেডমস্টারমশাই ক্লাস সিক্সে কোনও ক্লাস নেন না। তিনি ক্লাস নেবেন সেভেন থেকে। ইংরেজির ক্লাস। সে এখনও একবছর দেরি। ততদিন তারা অন্তত হেডস্যারের দিক থেকে নিশ্চিন্দি।

নীলকান্তবাবু সেদিনও তাদের ক্লাসে নতুন একটা গল্প বলতে শুরু করেছিলেন। বেশ হাসির গল্প। শুধু হাসির নয় অবশ্য, তার সঙ্গে মিশেল দেওয়া আছে ভূত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা। গল্প বলার সময় নীলকান্তবাবুর চোখমুখ কেমন অদ্ভুত আকার ধারণ করে। তাতে হাসিও পাচ্ছিল, আবার ভয়ও লাগছিল ওদের। কখনও কখনও হাসি চাপতে না পেরে কেউ কেউ হেসে উঠছিল হি-হি করে। গল্পটা লুল্লুভুতের।

লুল্লু নামের এক ভূত কোনও এক আমীরের বৌকে রাতের বেলা ঘরের বাইরে পেতেই অমনি চুরি করে নিয়ে পালালো। তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল হিমালয়ের কোলে, এক সরোবরের নীচে ছোট্ট একটা কুঠুরিতে। আমীর তার বৌএর খোঁজ করে করে পাগল। খুঁজতে গিয়ে প্রথমে এক গান-গাওয়া তাঁতির পাল্লায় পড়ে। তারপর ঘ্যাঁঘো নামের এক ভূতের সঙ্গে আলাপ হয়, ঘ্যাঁঘোর নির্দেশে গোঁগা নামের আর এক ভূতকে সে বন্দি করে ফেলল এক আশ্চর্য কৌশলে। তারপর তাকে কলুর ঘানিতে ভাঙিয়ে সেই ভূতের তেল নিয়ে গিয়ে কীভাবে তার বৌকে লুল্লুভূতের হাত থেকে উদ্ধার করল, তা শুনতে শুনতে মাঝে-মাঝেই হেসে উঠছিল শঙ্খরা।

নীলকান্তবাবু অবশ্য হাসছিলেন না, বলছিলেন, দেখেছ ভূতের কান্ড। বৌ পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায়।

তাঁর বলার ধরনে আরও একবার হো-হো করে সবাই হেসে উঠল। একটু জোরেই হেসে উঠেছিল বোধহয়। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ এক কান্ড ঘটলো। পাশের ক্লাসে সেভেনের অঙ্ক নিচ্ছিলেন হরিসাধনবাবু। হাসির শব্দে বিরক্ত হয়ে হঠাৎ তিনি চক-ডাস্টার ফেলে হনহন করে এসে ঢুকলেন শঙ্খদের ক্লাসে। প্রবল রাগে থমথম করছে তাঁর মুখ। সারা শরীর কাঁপছে। ক্লাসে ঢুকেই সটান এগিয়ে গেলেন ছাত্ররা যেখানে বসে আছে সেদিকে। ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে প্রবল ধমকের সুরে বলে উঠলেন, এটা স্কুল, না বৈঠকখানা? সারা ক্লাসে এত হাসির ছররা ছুটছে যে পাশের ক্লাসে পড়ানোই যাচ্ছে না। যত সব ইডিয়ট।

বলেই আর দাঁড়ালেন না হরিসাধনবাবু। পাশেই চেয়ারে বসে থাকা নীলকান্তবাবুর দিকে একবারও না তাকিয়ে যেমন হনহন করে এসে ঢুকেছিলেন, তেমনই দ্রুতপায়ে স্যান্ডেল ফটফট করতে করতে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

ক্লাসের সমস্ত ছাত্র ভয়ে ততক্ষণে চুপ মেরে গেছে। এর পরই টিফিন। তারপর এই হরিসাধনবাবুই তো তাদের ক্লাস নিতে আসবেন। তখন হয়তো বেত চালাবেন খুব—

কিন্তু নীলকান্তবাবুও তখন থম হয়ে বসে আছেন চেয়ারে। তাঁর মুখচোখ আরও লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। পাশের ক্লাস থেকে আর এক টিচার এসে তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের ধমকে যাওয়া মানে আসলে নীলকান্তবাবুকেই শাসন করে যাওয়া। হরিসাধনবাবু অবশ্য নীলকান্তবাবুর চেয়ে অনেক সিনিয়র। তাঁর বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি। সবাই জানে, হরিসাধনবাবু বেশ কড়াধাতের মানুষ। তবু অন্য একজন টিচারকে এসে এভাবে অপমান করে যাওয়া—

বেশ কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকার পর নীলকান্তবাবু হঠাৎ গম্ভীরস্বরে বললেন, তোমাদের আজ কী পড়া ছিল?

শঙ্খর পাশেই বসে ছিল সেকেন্ডবয় মহাদেব মল্লিক। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার, ব্যাকরণ হবে আজ। সন্ধি-বিচ্ছেদ পড়িয়েছিলেন আগের দিন।

মহাদেবের হাত থেকে ব্যাকরণ বইটা নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নীলকান্তস্যার বললেন, ঠিক আছে, দেখি কে কীরকম পড়া করে এসেছ। অনুকূল, বোর্ডে এসো। লেখ, চলচ্ছক্তি—সন্ধি বিচ্ছেদ করে দেখাও।

ভূত নিয়ে এতক্ষণ হাসিতে-হাসিতে ক্লাস ভরপুর হয়ে থাকার পর হঠাৎ সন্ধিবিচ্ছেদের মতো একটা কাঠখোট্টা বিষয় শুরু হতে তালটা কেটে গেল যেন। অনুকূল শ্লথপায়ে বোর্ডে এসে সন্ধি বিচ্ছেদ করে লিখল—চলঃ+ছক্তি।

বেশ যত্ন করে লিখে চকটা টেবিলে রাখতেই নীলকান্তবাবু তার কান ধরে মোচড়াতে মোচড়াতে বললেন, আগেরদিন একশোবার করে এটা শিখিয়েছিলাম তোদের। এর মধ্যে ভুলে মেরিছিস, অ্যাঁ?

মুগুর-ভাঁজা আঙুলে অনুকূলের কান প্রায় ছিঁড়ে আসার উপক্রম হল। মিনিট পাঁচেক পর তাকে ছেড়ে দিয়ে নীলকান্তবাবু বললেন, নেক্সট্। হীরু, বোর্ডে এস—

হীরু এমনিতেই পড়া পারে না। তার উপর নীলকান্তস্যারের রুদ্রমূর্তি দেখে আরও ঘাবড়ে গিয়ে সে-ও ভুল বানান লিখল বোর্ডে। ফলে তার কানের উপর আরও শক্তি প্রয়োগ করলেন নীলকান্তস্যার। কানের লতি থেকে এক বিন্দু রক্তও বেরুল খানিকক্ষণ পর। হীরু সিটে ফিরে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

ক্লাসের সমস্ত ছাত্র তখন ভয়ে হিম হয়ে আছে। নীলকান্তস্যার এর পর 'নেক্সট্' বলে কার দিকে তাঁর হিংস্রচোখদুটো ফেলবেন কে জানে। হুঁ, আর পড়লও।

—সুবোধ, বোর্ডে এসো, তুমিই তো এই ক্লাসের ফার্স্টবয়।

সুবোধের চোখমুখ তখন ভয়ে সেঁধিয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে সেও এসে ভুল বানান লিখল। নীলকান্তস্যার যেন ক্ষেপে গেলেন ফার্স্টবয়ের দুরবস্থা দেখে। ডাস্টার হাতে নিয়ে লাফিয়ে উঠলেন তৎক্ষণাৎ, 'বাহ্, বাহ্, ক্লাসের ফার্স্টবয়ের কী দুর্গতি, অ্যাঁ!' বলেই ডাস্টার দিয়ে সজোরে মারলেন তার মাথায়।

সুবোধের মাথাটা বাঁই করে ঘুরে গেল যেন। সে মাথায় হাত দিয়ে ব্যথাটা অনুভব করার আগেই আর একটা ঘা পড়ল তার মাথায়। তারপর আরও একটা ঘা। তারপর আবার। সুবোধের মাথাটা ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে মনে হল।

ক্লাসের বাকি ছাত্ররা তখন থরথর করে কাঁপছে। সুবোধকে কতক্ষণ ধরে মারবেন কে জানে। এর পর কার পালা তা নিয়েও ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে সবাই। শঙ্খ প্রাণপণে সন্ধিবিচ্ছেদটা আওড়াচ্ছে মনে মনে। তারও যেন ভুল না হয়ে যায়। শ-টা ঠিকঠাক লিখতে হবে। সুবোধের কোনও দোষ নেই। সে আগের দিন ক্লাসে আসেনি। সবে দু-আড়াই মাস ক্লাস শুরু হয়েছে। এখনও ব্যাকরণবই কেনা হয়নি ওর। তা ছাড়া সুবোধ খুব গরীব, সব বই সারাবছরের মধ্যেও কিনতে পারে না ও। একদিন শঙ্খকে বলেছিল, ক্লাসে সেই ওয়ান থেকে ফার্স্ট হচ্ছি বলে মাইনে দিতে হয় না। মাইনে দিয়ে পড়তে হলে আমার আর পড়াই হবে না। সেই সুবোধকে নীলকান্তস্যার এমন বীভৎসভাবে মারলেন!

সেই প্রহারপর্ব আরও কতক্ষণ চলতো কে জানে, হঠাৎ সবাইকার উৎকণ্ঠা দূর করে ক্লাস শেষ হওয়ার ঘন্টা বেজে গেল। ঘন্টার শব্দ কানে যেতেই হুঁশ ফিরল নীলকান্তস্যারের। সুবোধকে ছেড়ে দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, পরের দিন একজনেরও যদি পড়া না হয়—

কী করবেন সেটা আর কাউকে বলে দিতে হল না। চক আর ডাস্টার হাতে নিয়ে স্যান্ডেলে শব্দ তুলে ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে গেলেন তিনি। অন্যদিন টিফিনের ঘণ্টা বাজলেই সবাই হৈ-হৈ করে ছুটে যায় সামনের মাঠে। মাঠের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে পর-পর চার-পাঁচটা আমগাছ। ঝাঁকড়া আমগাছগুলোর নীচে বেশ ঠান্ডা ছায়া-ছায়া পরিবেশ। সেখানে ঘাসহীন তকতকে মাটিতে পর-পর পিল কাটা আছে। টিফিনের সময় শঙ্খরা মার্বেল খেলে সেখানে। শাদা পাথরের বড়-বড় মার্বেলে কার কত টিপ তার পরখ হয়। থ্রি, সিক্স, নাইন, টুয়েলভ্, ফিফ্‌টিন, এইটিন, তারপর গুলিতে গুলিতে ঠোক্কর লাগলেই নাথিং। যে আগে নাথিং করতে পারবে,তারই জিত। সুবোধ, পার্থ , মহাদেব, সুনীল আর শঙ্খ, এই পাঁচজনে প্রায়শ একসঙ্গে মার্বেল খেলে। কিন্তু আজ তাদের মনের অবস্থা এমন ভয়তাড়সে ডুবে আছে যে মার্বেল খেলার কথা ভাবতেই পারছে না। তা ছাড়া সুবোধ তখনও বেঞ্চে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। এখানে ওখানে ফুলে গেছে তার মাথা। পার্থ গিয়ে ডাকল, সুবোধ, এই সুবোধ—

সুবোধ সাড়া দিল না। অপমানে, লজ্জায় তার মাথাটা আজ হেঁট হয়ে গেছে সবার সামনে। তার ওপর ডাস্টার দিয়ে মারের জ্বালাযন্ত্রনা তো আছেই।

শঙ্খ, মহাদেব, সুনীল, পার্থ পরস্পর চোখোচোখি করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাইরে। সমস্ত আবহাওয়াটাই দারুণ ভারী হয়ে উঠেছে আজ। আম্রবাগানের নীচে পিলগুলোর দিকে করুণ চোখে চাইতে চাইতে ওরা চলে এল অন্য দিকে। মাদারীপুর হাইস্কুলের পাশ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর পিচ রাস্তা। তার থেকে ইস্কুলের মাঠের পাশ দিয়ে কাঁচারাস্তা পশ্চিম দিকে চলে গেছে গড় নসিমপুরের দিকে। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ওরা চারজন। দু'পাশে ঘন গাছগাছালির ঝোপ। চারপাশই সবুজে সবুজ। কিছু দূর এগোনোর পর বাঁদিকে

মস্ত এক শান-বাঁধানো পুকুর। পুকুরের পাড়ে বসার জন্য শান-বাঁধানো বেঞ্চিও আছে। সেই বেঞ্চিতে বসতেই এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে গা জুড়িয়ে দিল ওদের।

বেঞ্চিতে বসেই মহাদেব বলল, সুবোধের খুব লেগেছে কিন্তু—

সুনীল বলল, লাগবে না? নীলকান্তবাবুর গায়ে তো দৈত্যের মতো শক্তি।

শঙ্খ মনে-মনে বিড়বিড় করল, দি সেলফিস জায়েন্ট। মুখে বলল, আমাকে ওভাবে মারলে আমি হয়তো মরেই যেতাম। সুবোধের শক্তপোক্ত গড়ন বলেই না—

পার্থ বলল, আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। তক্ষুনি ঘন্টা না পড়লে হয়তো অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

শঙ্খ পার্থর দিকে তাকায়। পার্থর চেহারাটা অবশ্য তেমন দুবলা না হলেও তার অজ্ঞান হওয়ার রোগ আছে। তাদের মাদারিপুর ইস্কুলে প্রতিবছর ছাব্বিশে জানুয়ারী আর পনেরই আগস্ট খুব ঘটা করে প্রজাতন্ত্র দিবস আর স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। খুব ভোর-ভোর উঠে ইস্কুলে যেতে হয় তাদের সবাইকে, যার-যার ক্লাসের ভেতর ছাত্রদের লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হয় কখন হেডমাস্টারমশাই গলা চড়িয়ে ডাকবেন এক-একটি ক্লাসকে। প্রথমে ক্লাস টেন, তারপর নাইন, এইট থেকে একেবারে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। ডাকামাত্র ছেলেরা পর-পর লাইন দিয়ে ছুটতে ছুটতে নামবে মাঠের ভেতর। সবচেয়ে লম্বাছেলে দাঁড়াবে লাইনের প্রথমে। সবচেয়ে বেঁটে ছেলে দাঁড়াবে লাইনের শেষে। টেন থেকে ফাইভ—ছ'টা ক্লাসের ছেলেরা পর-পর ছ'লাইন করে দাঁড়াবে। তারপর শুরু হবে বন্দেমাতরম গান। গান শেষ হলে লেফট-রাইট-লেফ্‌ট। তারপর অ্যাটেনশন। তারপর স্যালুট টু দি ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ছেলেরা স্যালুট অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে, ওদিকে হেডমাস্টারমশাই জাতীয় পতাকা তুলবেন। পতাকা তোলা হলে প্রথমে কপাল থেকে হাত নামাতে বলবেন, তারপর আবার 'স্ট্যান্ড ইজি' পজিশনে দাঁড়াবে সবাই। তখন দু-একজন মাস্টারমশাই, তারপর হেডমাস্টারমশাই বক্তৃতা করবেন। প্রজানন্ত্র দিবস কিংবা স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব কতখানি আমাদের জাতীয় জীবনে তাইই বলবেন চমৎকার করে। সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে প্রায়ই বেলা নটা-সাড়ে নটা বেজে যায়। এর মধ্যে কখনও চড়া হয়ে ওঠে রোদ্দুর। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দু-চারজন ছেলে প্রতিবছরই ঢিব্ ঢিব্ করে পড়ে যায় অজ্ঞান হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ধরাধরি করে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় টিচার্সরুমে। চোখেমুখে জল দিয়ে দুধ-বিস্কুট খেতে দেওয়া হয়। আর যারা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে, অনুষ্ঠানের শেষে তাদের খেতে দেওয়া হয় জিলিপি আর বোঁদে। ক্লাস ফাইভে দু'বার, ক্লাস সিক্সে গত জানুয়ারী মাসে একবার, পার্থ তিনবারই পড়ে গেছে মাটিতে। ও অতক্ষণ রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এ বছর হেডমাস্টারমশাই ওকে বকুনি দিয়ে বলেছেন, তোমার নার্ভ খুব উইক। ভালো করে ডাক্তার দেখাবে। রোজ সকালে একটু করে ফ্রি-হ্যান্ড।

এহেন পার্থর পক্ষে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। নীলকান্তবাবুর অমন বীভৎস মার দেখে শঙ্খ নিজেও কি খুব ভালো অবস্থায় ছিল। তারও তো গলা শুকিয়ে আসছিল, ঢিব্‌ঢিব্ করছিল বুকের ভেতরটা। মনে হচ্ছিল, সমস্ত শরীর জুড়ে জ্বর আসছে তার।

এখন এই শান-বাঁধানো পুকুরের ধারে বসে ঠান্ডা হাওয়ায় মনে হচ্ছে সেই জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে গা থেকে। সুনীল আস্তে আস্তে বলল, আচ্ছা, হরিসাধনবাবু অমন রেগেমেগে আমাদের ক্লাসে ঢুকলেন কেন রে?

শঙ্খ গলায় উষ্মা মিশিয়ে বলল, তোরা বড় হি হি করে হাসছিলি যে। তাইতেই তো রেগে গেলেন উনি।

—বাহ্, হাসির গল্প শুনে হাসব না? নীলকান্তস্যার রোজই তো কেমন ভয়ের গল্প বলেন। কোনওদিন ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড, কোনওদিন ফ্রাঙ্কেন্স্টাইন, কোনওদিন বা 'দি ইনভিজিব্‌ল ম্যান'। কেবল আজই তো লুল্লুর গল্প। উফ্, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছিল।

—কথায় বলে না, যত হাসি তত কান্না। বলে গেছে রামছন্না। আমাদের আজ তাই হয়েছে।

—রামছন্না নয় হে, রামশর্মা, ওদিক থেকে শুধরে দিল মহাদেব।

পার্থ হঠাৎ বলল, আমাদের মনে হচ্ছিল, হরিসাধনবাবু রেগে গিয়েছিলেন আমাদের উপর নয়। আসলে রাগটা দেখালেন নীলকান্তস্যারকেই।

শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন, উনি পড়ানোর বদলে গল্প করছিলেন বলে? কিন্তু গল্পগুলো তো ভালো। এগুলোও আমাদের জানা উচিত।

পার্থ গম্ভীর হয়ে বলল, ও হল আত্মীয়ে আত্মীয়ে ঝগড়া। হরিসাধনবাবু আর নীলকান্তবাবু থাকেন পাশাপাশি পাড়ায়। দু'জন দুজনের আত্মীয়। সেদিন দেখলাম নীলকান্তবাবু হরিসাধনবাবুর বাড়িতে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী সব বলছেন। হরিসাধনবাবুও অবশ্য তার উত্তর দিচ্ছিলেন বেশ কড়া গলায়। আমার মনে হচ্ছে, আজকের ঘটনা তারই জের।

সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল পার্থর কথা শুনে, তাই নাকি!

মহাদেব জিবে চুকচুক শব্দ করে বলল, ইস্, তার জন্যে আমাদের সুবোধ, অনুকূল, হীরু ওরা মার খেল!

কয়েকমুহূর্ত ওরা চারজনে শান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটে গুম হয়ে বসে রইল। সুবোধের জন্যই সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল ওদের। শুধু ওদের বন্ধু বলেই নয়, ও আগের দিন ব্যাকরণ পড়ানোর সময় ক্লাসে ছিল না, তার উপর প্রায় কোনও বইই কেনা হয়নি ওর। বেচারি অকারণে খুব মার খেল আজ।

পুকুরের টলটলে জলের ওপর দিয়ে আরও কিছু ঠান্ডা হাওয়ার ঝলক বয়ে আসতে ওদের মনের ক্ষত জুড়িয়ে আসে ক্রমশ। পুকুরটা পেল্লাই। শঙ্খদের দক্ষিণপাড়ার রানিশায়রের মতো বিশাল না হলেও এটাও ভারী চমৎকার। একটা ঝাঁকড়া আমগাছ অতবড় পুকুরের আধখানা ছায়াঘন করে রেখেছে। পুকুরের চারপাশ রকমারি গাছগাছালি, লতাগুল্মে একদম সবুজ হয়ে আছে। সে সবুজের ছায়া পড়ে টলটলে জলও কী সুন্দর সবুজরং ধারণ করেছে। সমুদ্রের ছবি দেখেছে ওরা, সে জলের রঙ নীল। কিন্তু এমন সবুজ রঙের জল দেখলে কীরকম স্বপ্নের দেশ বলে মনে হয়। এ পুকুরের কাছে এতদিন আসেনি কেন ওরা!

বেশ অনেকক্ষণ পর পার্থ হঠাৎ বলল, দাঁড়া, মুখেচোখে একটু জল দিয়ে আসি। যা চাপ গেল আজ ফোর্থ পিরিয়ডে।

পার্থ তার বসার জায়গা থেকে উঠে শানের সিঁড়ি বেয়ে জলের কিনারে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই তার হাত টেনে ধরল মহাদেব, আরে, বেশ ছেলে তো তুই। ও পুকুরের জলে তো পা দেওয়াই মানা।

পার্থ আশ্চর্য হয়ে বলল, বাহ্, কেন?

—কী জানি। লোকে বলে, এই পুকুরের জলের ভেতর নাকি জক্কিবুড়ি থাকে।

—জক্কিবুড়ি! সে আবার কে?

—কে তা আমি কী করে জানব, মহাদেব ঠোঁট ওল্টায়, তবে জলে কেউ পা দিলেই নাকি তার পা ধরে হুড়হুড় করে টেনে নিয়ে যায়।

সুনীল ওদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। খুব ভালো ফুটবল খেলে ও। কালো, গুঁট ধরনের চেহারা। বলল, যাহ্, বাজে কথা।

মহাদেবের বাড়ি এই মাদারীপুরেই। এই পুকুরে জক্কিবুড়ি থাকে কি না তা তার পক্ষেই জানা সম্ভব। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, এই পুকুরে কেউ স্নান করে না তা জানিস? এ তল্লাটের কত ছেলে সাঁতার কাটতে গিয়ে জলে ডুবে গেছে, আর ওঠেনি। এই তো গেল সনে এ পাড়ার অঘোরকাকার বৌ চান করতে নেমেছিল, অমনি পা হড়কে একেবারে ডুবজলে। ব্যস্, খোঁজ খোঁজ খোঁজ, আর খোঁজ। পরদিন সকালে তার লাশ—

শঙ্খর বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে। তার আবার খুব ভূতের ভয়। তাদের ঈশ্বরীপুরে প্রায়ই ভূতের উপদ্রব হয়ে থকে। সন্ধের পর শ্মশানকালীতলার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়াই দায়। ক'দিন আগেই উমনো-ঝুমনোর বাবা শ্মশানকালীতলার পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসতে গিয়ে ঠুল খেয়েছেন অশথগাছের ঝুরিতে। পরদিন সকালে পরখ করতে গিয়ে দেখেছেন, সেখানে কোথাও ঝুরি নেই। তাহলে নির্ঘাত ব্রহ্মদৈত্যের পা।

সে ভয় পেয়ে বলে উঠল, চল্ রে পার্থ। ওদিকে টিফিন শেষ হয়ে এল বোধহয়। আমরা অনেকদূর চলে এসেছি। ইস্কুলে ঘন্টা বাজলে হয়তো শুনতেই পাব না।

চারজনে দ্রুতপায়ে কাঁচারাস্তা বরাবর ফিরে চলল ইস্কুলের দিকে। শঙ্খ জানতো না, মাদারীপুরেও এমন অদ্ভুত সব অলৌকিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে। সে এতদিন জানতো, হয়তো তাদের ঈশ্বরীপুরেই এমন সব অদ্ভুত কান্ড ঘটে থাকে। এক চাটুজ্জেপাড়ায় কত সব অবাক-করা ব্যাপার ঘটে যে চোখ কপালে উঠে যায় তাদের।
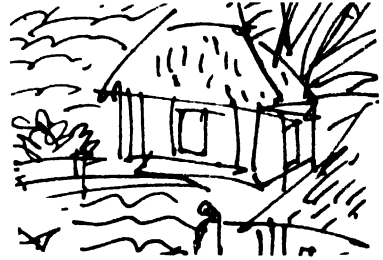
চাটুজ্জেপাড়ার ঠিক মাঝখানে প্রায় দেড়বিঘে জায়গা নিয়ে একটা মস্ত উঠোন। সেই উঠোনে গোবর-জল দিয়ে নিকিয়ে তকতকে করে তোলা হয়েছে। তার উপর পেল্লাই একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে একটা উৎসব-উৎসব পরিবেশ। নিকোনো উঠোন জুড়ে শাদা পিটুলি-গোলা দিয়ে রকমারি লতাপাতা আঁকা আল্পনা। আল্পনার উপর অনেকগুলো মাটির সরাইতে আলো-চাল ধান দূর্বা সাজিয়ে সার-সার নৈবেদ্য সাজানো। নতুন গামছা, শাড়ি সাজানো রয়েছে সারে-সারে। সকাল থেকে চাটুজ্জেবাড়ির বড়তরফ অনন্তদাসের সেজছেলে নবনীপ্রসাদ নতুন ধবধবে ধুতি পরে, তারই একটা খুঁট খালিগায়ে জড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে দেখাশুনো করছেন উৎসবের আয়োজন। উত্তর পাড়া থেকে ভটচায্যিমশাই এসেছেন পুজো করতে। নামাবলী গায়ে জড়িয়ে রাখলেও তার বাইরে বেরিয়ে আছে ফর্সা তেল চুকচুকে বিশাল নোয়াপাতি।

আশেপাশের পাড়া থেকে অনেকেই হুড়িয়ে এসেছে উৎসব দেখতে। এমন উৎসব এ দিগরে সচরাচর কেউ দেখেনি। চাটুজ্জে-বংশের বড়তরফ অনন্তদাস আজ দশবছরের ওপর হল শয্যাশায়ী। বছর দশেক আগে হঠাৎ পক্ষাঘাত হতে সেই যে বিছানা নিয়েছেন, এখন

খাওয়া-দাওয়া, মলমূত্রত্যাগ সবই বিছানায় বসে। অনন্তদাসের সাত-সাতটি ছেলে, অথচ এক সেজ নবনীপ্রসাদ ছাড়া আর কোনও ছেলে ভুলেও তাঁর খবর নেন না। অনন্তদাসের নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে অচল হলেও উর্দ্ধাঙ্গ এখনও সচল। চোখে একটু কম দেখলেও বা কানে বেশ কম শুনলেও গলার স্বর বেশ চাঙ্গা আছে। তবে বয়স নব্বই হওয়াতে মাথাটা আগের মতো তেমন কাজ করে না, কিন্তু বুঝতে পারেন সব। তাঁর বাড়ির সামনে চাঁদোয়া টাঙিয়ে এতবড় পুজোয়াচ্চার আয়োজন দেখে আড়িয়ে যাওয়া জিবে থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, গোবিন্দ, ও গোবিন্দ, কীসের পুজো হচ্ছে আজ?

গোবিন্দ নবনীপ্রসাদের মেজছেলে, এবার ক্লাস এইটে উঠেছে। সে তার দাদুর ভারী ন্যাওটা। রোজ সকালে দাদুর ঘুম ভাঙলে গোবিন্দই তাঁকে পাঁজকোলা করে তুলে বাইরে দাওয়ায় এনে বসিয়ে দেয়। আবার সময়মতো সে-ই ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয় বিছানায়। দাদুর আড়িয়ে যাওয়া কথাগুলো একমাত্র সে-ই ঠিকঠাক বুঝতে পারে, একটু চেঁচিয়ে উত্তর দিয়ে দাদুকে বুঝিয়েও দেয় সে। আজ কিন্তু দাদুর প্রশ্ন শুনে গোবিন্দ মুখ গোঁজ করে রইল।

আসলে দশবছর ধরে বাবার সেবা করে করে নবনীপ্রসাদ আর তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সবাই বেশ ক্লান্ত। কিছুটা বিরক্তও। বয়স নব্বই হলেও অনন্তদাস আরও কতদিন বাঁচবেন, তা ঈশ্বরীপুর হাসপাতালের সরকারি ডাক্তারও বলতে পারছেন না। অবশেষে নবনীপ্রসাদ শরণাপন্ন হয়েছিলেন উত্তরপাড়ার নামডাকঅলা পুরোহিত অখিল ভটচায্যিমশাইএর। তিনি শাস্ত্র ঘেঁটে বিধান দিয়েছেন, চান্দ্রায়নব্রত করো। খুব দুরূহ ব্রত, প্রায় মাসাধিককাল ধরে পালন করতে হবে হোম, যাগযজ্ঞ। তাতে হয় অনন্তদাস ভালো হয়ে উঠবেন, নচেৎ দ্রুত যাত্রা করবেন পরলোক অভিমুখে। অনেক ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছেন নবনীপ্রসাদ। তাঁর স্ত্রী সুভাষিনী প্রায়ই ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, আর পারিনে বাপু, তোমার বাবার পায়খানা-পেচ্ছাপ পরিষ্কার করে করে। আমারই বলে মরার বয়স হয়ে এল, আর তোমার বাবা এখনও সারাদিন বিছানায় বসে হাঁকডাক করে অস্থির করে দিচ্ছেন।

চাটুজ্জেপাড়ায় এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা এর আগেও বহুবার ঘটেছে। এই তো ক'দিন আগে মেজতরফের বড়ছেলের বৌএর বিয়ে হয়ে গেল কলাগাছের সঙ্গে। এমন বছর-বিয়োনি বৌ কেউ কক্ষনো দেখেনি বা শোনেনি এ দিগরে। উনিশবছর বিয়ে হয়েছে, এরমধ্যে সতেরবার বিইয়েছে হাসকুটে বৌটা। এত যে ধকল যায় তার শরীরের ওপর দিয়ে, তবু মুখের হাসিটি লেগেই আছে তার। আর তেমনই শক্তপোক্ত শরীরের গড়ন। কাঁচা সোনার মতো রং যেন ফেটে পড়ছে তার গায়ে। এহেন সুন্দরী বৌ বছরবিয়োনি হলে কার কী করার আছে! সতেরটা বাচ্চার মধ্যে এখনও চোদ্দটা ছেলেমেয়ে দিব্যি টিকে আছে। কিন্তু এবার তো বন্ধ দেওয়া দরকার। তাই এই ভটচায্যিমশাইই বিধান দিয়েছিলেন কলাগাছের সঙ্গে—

তারপর ন'তরফের মেয়ে লেখাকে ভূতে-পাওয়ার ঘটনাটাই কি কম অদ্ভুত! কিম্বা সেজতরফের যে ছেলেটা মিলিটারিতে চাকরি করত, যতবার ছুটিতে আসত তার বাবা-মা বিয়ের কথা তুললেই পালিয়ে চলে যেত চাকরির জায়গায়, তাকে গতবছরমায়ের বাড়াবাড়ি অসুখ বলে টেলিগ্রাম করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে সেই রাতেই ধরা-বিয়ে দিল—তাও কি কম আশ্চর্যের।

এমন অদ্ভুত ঘটনা তো এ দিগরে এক চাটুজ্জেপাড়াতেই হয়ে থাকে। কিন্তু এবারের চান্দ্রায়ন-ব্রত ঘিরে চারদিকের মানুষের মনে যেমন কৌতূহল, তেমনই ফিসফিসানি, গুঞ্জন, ছিছিক্কারও হচ্ছে কম নয়। কেউ বলছে ভালোই হয়েছে, এভাবে আধমরা হয়ে বেঁচে থাকার

কোনও মানে হয় না। যা-হোক ভালো-মন্দ কিছু একটা হয়ে যাক। কেউ বলছে, ছি ছি, আর ক'টা বছরই বা বাঁচতো বুড়ো। ওরা আর একটু তর সইতে পারল না! এবারে যাগযজ্ঞি করে মারতে হবে! কেউ বলছে, হয়তো সেরেও উঠতে পারে বুড়ো। এখনও গলার স্বর কেমন টঙ্ক আছে দেখেছ? কেউ বলছে, উৎসবের কী ঘটা! বুড়ো এবার ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে যাবে। একেই বলে পুত্রভাগ্য।

ওদিকে দাওয়ায় থে হয়ে বসে অনন্তদাস ক্রমাগত চেঁচাচ্ছেন, ও গোবিন্দ, গোবিন্দ, কীসের পুজো হচ্ছে রে তোদের বাড়ি? এত লোকজন এয়েচে কেন আজ?

নব্বই কি একশোবছর আগে এই ঈশ্বরীপুরে চাটুজ্জেবংশের প্রথম পুরুষ বাঁশরীমোহন চাটুজ্জে এসে ছোট্ট একটা বেড়ার ঘর বেঁধেছিলেন ইছামতীর কোল ঘেঁষে। তখন প্রায় দ্বিগুণ চওড়া ছিল ইছামতী। পরে কাটাখালির খাল কেটে ইছামতীর মূল স্রোত ঘুরিয়ে দেওয়ায় ঈশ্বরীপুরের নদীতে চর পড়তে শুরু করেছে। এ পারে চর গড়ছে তো ভাঙছে ও পারে। চরের পরিমাণ যত বাড়ছে ঈশ্বরীপুরের দিকে, চাটুজ্জেপাড়ার আয়তনও বাড়ছে তত। একঘর চাটুজ্জে এখন ঝাড়েবংশে বাড়তে বাড়তে তিরিশ-চল্লিশ ঘরে দাঁড়িয়েছে।

বাঁশরীমোহন চাটুজ্জে গত হয়েছেন সেও আজ তিরিশ-বত্রিশবছর হতে চলল। তাঁর পাঁচছেলের মধ্যে এক বড়তরফ অনন্তদাসের নাতিপুতি মিলিয়েই প্রায় বারো-চোদ্দঘর। তাঁর সাতছেলের মধ্যে বড় অমিয়প্রসাদের কাঠের ব্যবসা, মেজ নকুলপ্রসাদের একটা বাস আছে লাইনে, সেজ নবনীপ্রসাদের সম্বল একটি মোটরগাড়ি—যা তিনি নিজেই চালিয়ে ভাড়া খাটান, শেয়ারের যাত্রী তুলে যাতায়াত করেন ঈশ্বরীপুর থেকে বসিরহাট পর্যন্ত। অন্যরা কেউ ইস্কুলমাস্টারি, কেউ বাসের স্টার্টারি করেন, কেউবা রেশনদোকানের মালিক। কেবল ছোট কৃষ্ণপ্রসাদ কিছুই করে না, শুধু মদ খায়। তাও সবই পরের পয়সায়।

বাঁশরীমোহনের অন্য চারছেলে—দয়ালদাস, কিশোরীমোহন, আকিঞ্চন চাটুজ্জে-কেউ আশি, কেউ সত্তর। একমাত্র আনন্দ চাটুজ্জের বয়স ষাটের নীচে। সবারই ছেলেমেয়ে নাতিপুতি নিয়ে ভরভরন্ত সংসার। কারও কারও ছেলে বা নাতিরা আলাদা হয়ে নতুন নতুন ঘর তুলছে বছর-বছর। তাঁদের মধ্যে শেষ দু'জনের অবস্থা ঈশ্বরীপুর গাঁয়ের মধ্যে চোখে পড়ার মতো। এরকম সম্পন্ন পরিবার এ তল্লাটে নেই বললেই চলে। তাঁদের যে শুধু কয়েকশো বিঘে করে ধেনোজমিই আছে তা নয়, দু'জনেরই বিশাল দালানবাড়ি, ঈশ্বরীপুর বাজারে পেল্লাই পাটের আড়ত, আরও নানান ব্যবসা। প্রচুর ঠাকুর-চাকর-দাসদাসী নিয়ে রমরমা অবস্থা। খুব সম্প্রতি দু'জনে দু'খানা বাসও নামিয়েছেন ঈশ্বরীপুরের বাসরুটে।

সব মিলিয়ে ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণপ্রান্তে ইছামতীর কোল বরাবর এই গোটা চাটুজ্জেপাড়াকে একটা গাঁ-ই বলা যায় এখন। এখানে-ওখানে দালান বাড়ি উঠছে ফটাফট। পাড়ায় তিন-তিনখানা বাস, দু'খানা মোটরগাড়ি, সব মিলিয়ে একেবারে বাড়বাড়ন্ত দশা। একবার চাটুজ্জেপাড়ার ভেতর ঢুকে পাক দিয়ে আসতে প্রায় একবেলা কাবার হয়ে যাবে। প্রতি বাড়িতেই বড়-বড় উঠোন, কারও বাড়িতে দোলমঞ্চ কিংবা শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। কারও বাড়িতে আবার বড় বড় মরাই। তাতে ভর-বচ্ছরের ধান-চাল ভরা থাকে।

তিরিশ-চল্লিশ ঘর, সবাই পাশাপাশি থাকে, দেখা হলে কথাবার্তাও হয়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তেমন হৃদ্যতার সম্পর্ক কারও মধ্যে নেই। বরং একজনের ছেলে ব্যবসায়ে লাভ করলে অন্যদের চোখ টাটায়। কারও ছেলে চাকরি পেলে জ্বলেপুড়ে মরে অন্যেরা। কারও জমিতে

ধানের ফলন ভালো হলে অন্যদের জিব শুকিয়ে ওঠে।

চাটুজ্জেপাড়ার ভেতর দেড়বিঘের মস্ত উঠোনটায় অবশ্য সব পরিবারের সমান অধিকার। তাতে কেউ হয়তো কোনওদিন যাত্রার পালাগান বসালো। কেউ বা বরাদ্দ করল নাম সংকীর্তনের। কেউবা দোল-উৎসবে কাঙালীভোজন করালো হৈ-হৈ করে। পাড়ার ছেলে-ছোকরারা মিলেজুলে হয়তো একটা নাটক করল কোনও দিন। ঘটা করে সরস্বতীপুজো তো হয়ই। গেলবারে দুর্গোৎসব করার কথাও তুলেছিলেন কেউ-কেউ, কিন্তু শেষপর্যন্ত অনেকে কিন্তু-কিন্তু করায় হয়ে ওঠেনি শেষপর্যন্ত।

এহেন চাটুজ্জেপাড়ায় হঠাৎ সামিয়ানা টাঙিয়ে নবনীপ্রসাদ চান্দ্রায়নব্রত করছে শুনে নড়েচড়ে বসলেন অনেকেই। খালি গায়ে ফর্সা ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে উঠোনের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে আকিঞ্চন চাটুজ্জে হঠাৎ বললেন, তা ইয়ে, নবনী, তুমি হঠাৎ এ কী যাগযজ্ঞ শুরু করে দিলে বলো তো? ওই যে কী বলে ইয়ে চান্দ্রায়নব্রত না কী যেন—। তা অন্তত একবার আমাদের সঙ্গে পরামর্শটর্শ করলে পারতে—

নবনীপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন, এতে আর পরামর্শ করার কী আছে নকাকা, বাবার বয়স তো আর কম হল না। নব্বই পার হতে চলল।

—তাই বলে একটা জ্যান্তমানুষকে এভাবে যাগযজ্ঞ করে মেরে ফেলতে হবে?

নবনীপ্রসাদ একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, বাবা প্রায় দশবচ্ছর হল এরকম পড়ুটে হয়ে রয়েছেন। এই দশবচ্ছরের মধ্যে আপনারা কেউ কিন্তু বাবার খোঁজও নেননি। সব ঝক্কি ঝামিলি আমাদের ঘাড়েই পড়েছে এতকাল।

—তা তোমরা তো সাত-সাতটা ভাই। সবাই ভাগযোগ করে নিলে তো আর তোমার একলার ঘাড়ে এত ঝক্কি পড়ে না।

নবনীপ্রসাদ এতক্ষণে শুকনো হাসি হেসে বললেন, এতকাল দাদারা ভাইরা কেউ আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলতো না, পাছে বাবাকে রাখার প্রশ্ন ওঠে। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, একবার সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন গে—

ওদিকে ভট্‌চায্যিমশাই তখন বলছেন, কই হে, বেলকাঠ কোথায়, যজ্ঞির সময় হয়ে এল যে—

নবনীপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন পুজোর জায়গার দিকে, এই তো ঠাকুরমশাই, এই যে।

শুধু আকিঞ্চন চাটুজ্জেই নয়, একে একে সামিয়ানার আশেপাশে ঘুরঘুর করে গেলেন তাঁদের অন্য ভাইরাও—দয়ালদাস, কিশোরীমোহন, এমনকি আনন্দ চাটুজ্জেও। দয়ালদাসের এখন আশি চলছে, কিশোরীমোহনের বাহাত্তরের কাছাকাছি, তাঁরা দুজনে ঘুরেঘেরে গেলেও কিছু আর মন্তব্য করেননি। কেবল আনন্দ চাটুজ্জে একবার বললেন, তা খরচখর্চা যা হচ্চে, তা সব তুমি একাই করছ নাকি, নবনী?

নবনী ঘাড় নেড়ে বললেন, আজ্ঞে, বাবা তো আমার একারই যখন—

তা পুজোর যাবতীয় গোছগাছ সব নবনীপ্রসাদ আর তাঁর স্ত্রী রানিবালা দুজনে মিলেই করেছেন। কখনও দরকর পড়লে তাঁদের ছেলেমেয়েরা এটা-ওটা গুছিয়ে দিয়েছে। আল্‌পনাও দিয়েছে বাড়ির মেয়েরা। অন্যসময় ব্রতের কথা উঠলেই পাড়ার মেয়ে-বৌরা একেবারে হুড়িয়ে আসে। কিন্তু চান্দ্রায়নব্রতের নাম শুনে গোটা চাটুজ্জেপাড়ার সবাই দ্বিধাগ্রস্ত। আসতে ইচ্ছেও আছে, অথচ ইতস্তত করছে বাড়ির কর্তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে।

যারা এসে ভিড় করছে তারা সবাই দক্ষিণপাড়ার অন্য এলাকার লোকজন। ওপাশে অধিকারীপাড়া, ভটচায্যিপাড়া, মিত্তিরপাড়া থেকে এসে ভিড় জমাচ্ছে, এসেছে জেলেপাড়ার কেউ-কেউ। এমনকি উত্তরপাড়া থেকে মুখুজ্জেবাড়ি, চক্কোত্তিবাড়ি, দত্তবাড়ির অনেকেই। সবাই এসেছে কৌতূহলে। কিছুটা মজা দেখতেও। চাটুজ্জেপাড়ার বাচ্চারা অবশ্য যথারীতি সামিয়ানার বাইরে একটু-আধটু খেলছিল, হৈ-চৈ করছিল, যেমন সব পুজোমন্ডপেই করে থাকে, কিন্তু নবনীপ্রসাদের ধমক খেতে তারাও পালিয়ে পথ পায না।

চান্দ্রায়ন ব্রত অবশ্য বেশ দীর্ঘমেয়াদী ব্রত। ভটচায্যিমশাই বলেছেন, মাসাধিককাল ধরে চলবে। পুজোও করছেন বেশ জাঁকজমক করে। দিন চার-পাঁচ ধরে তাঁর জলদগম্ভীরস্বরে মন্ত্র-উচ্চারণ, ঘনঘন ঘন্টাধ্বনি, রানিবালার উলু-দেওয়া, তাঁর মেয়ে অলকার পাড়া-মাতানো শাঁখের শব্দ—শুনতে শুনতে একসময় বিচলিত হয়ে পড়ল চাটুজ্জেপাড়ার মেয়ে বৌরা। একজন-দু'জন করে ভিড় করতে লাগল যজ্ঞের চারপাশে। সেজতরফের ছেলে যতীন চাটুজ্জের রাঙা টুকটুকে বৌ যাকে পাড়ার সবাই রাঙাবৌ বলে ডাকে, এগিয়ে এসে রানিবালাকে বলল, বৌদি, কোনও দরকার-টরকার লাগলে বোলো—

নবনীপ্রসাদের দুই দাদা অমিয়প্রসাদ আর নকুলপ্রসাদ শেষে থাকতে না পেরে এসে বললেন, তা এমন একটা কান্ড বাধিয়ে বসলি, একবার তো বলতে পারতি আমাদের!

নবনীপ্রসাদ তেমনই গম্ভীর হয়ে বললেন, এতে আর বলাবলির কী আছে। ভট্চায্যিমশাই যেরকম বিধান দিয়েছেন, তেমনই কাজ করেছি। বাবার দিকে তোমরা কখনও ফিরেও তাকাওনি।

—তা কদ্দিন ধরে এ সব চলবে?

অখিল ভটচায্যি তখন হোমকাঠ সাজিয়ে যজ্ঞের তোড়জোড় করছিলেন। প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ ধরে হোম হচ্ছে। তিনিই উত্তর দিলেন, এটি মাসসাধ্য ব্রত। এই ব্রতে চন্দ্রের অয়নের অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধিরূপ গতির ন্যায় অয়ন। এই ব্রত পিপীলিকামধ্য, যবমধ্য, যতিচান্দ্রায়ন ও শিশুচান্দ্রায়নভেদে চতুর্বিধ। পিপীলিকা মধ্যে, পূর্ণিমায় পঞ্চদশ পিন্ড বা গ্রাস খাইয়া ও কৃষ্ণপ্রতিপদাদিক্রমে এক এক পিন্ড কমাইয়া চতুর্দশীতে একটি পিন্ড খাইতে হয় এবং অমাবস্যায় উপবাস করিয়া শুক্লপ্রতিপদাদিক্রমে এক এক পিন্ড বাড়াইয়া পূর্ণিমায় পঞ্চদশ পিন্ড খাইতে হয়। যবমধ্যে, শুক্লপ্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এক এক পিন্ড পূর্ববৎ বাড়াইয়া খাইতে হয় এবং কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে পূর্ববৎ এক এক পিন্ড কমাইয়া অমাবস্যায় উপবাস করিতে হয়—

এহেন শাস্ত্রবাক্য শুনে অমিয়প্রসাদ নকুলপ্রসাদ দু'জনেই চুপ করে রইলেন। বাবা বেঁচে থাকতেও এই পিন্ড খাওয়ার গল্প তাঁদের শুনতে পছন্দ হচ্ছিল না। কোনও প্রতিবাদ জানাবেন সে সাহসও তাঁদের আপাতত নেই। এদিকে দিনে দিনে প্রচুর লোকের জমায়েত হতে লাগল সামিয়ানার চারদিকে। পাড়ার মেয়ে-বৌরাও আস্তে আস্তে পুজোর গোছগাছে সাহায্য করতে শুরু করল। আত্মীয় পরিজন সবাই যে মুহূর্তে আড়ষ্টভাব কাটিয়ে উঠেছে সেসময় হঠাৎ একটা হকচকিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে গেল।

অনন্তদাসের ছোটছেলে কৃষ্ণপ্রসাদের এ ক'দিন কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরকম দু-দশদিন নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অভ্যাস তার অনেকদিনের। ইতিমধ্যে জোর করে তাকে বিয়েও দেওয়া হয়েছিল, যদি তাতে তার নেশাভাঙের অভ্যাস বা উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যামোটা কমে। বিয়ের পর বছর দেড়েকের মধ্যে তার একটা ছেলেও হয়েছে। সে ছেলেরও বয়সও

এখন চার-পাঁচবছরের মতো। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদ যেমনকে তেমন রয়ে গেছে। চান্দ্রায়নব্রত শুরু হওয়ার দিনআটেকের মাথায় হঠাৎ সে কোথা থেকে উদয় হল পাড়ায়। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, যে এ ক'দিন কোনও নিষিদ্ধপল্লীতে পড়ে ছিল। আজও সে দিনেদুপুরে একপেট মদ খেয়ে টলতে টলতে ফিরছে। হঠাৎ পাড়ার উঠোনে সামিয়ানা টাঙিয়ে পিন্ডদান, হোমযজ্ঞ—এসব দেখে কিছুক্ষণ তার লালচোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে ডাক ছেড়ে শুরু করল, ও বাবা গো, তুমি কোথায় গেলে গো। আমি ক'দিন বাড়িমুখো হইনি বলে তুমি আমার ওপর রাগ করে চলে গেলে গো। আমারে তুমি কার কাছে রেখে গেলে গো—

প্রাথমিক হকচকানি কেটে যাওয়ার পর ছুটে এলেন নবনীপ্রসাদ। কৃষ্ণপ্রসাদকে থামাতে চেষ্টা করলেন বকেঝকে, অ্যাই কেষ্ট, কী যা তা শুরু করেছিস! বাবা ওই তো বসে আছেন দাওয়ায়। বাবার কিছু হয়নি তো—

এ সব কথা কৃষ্ণপ্রসাদের ভেতরে ঠিক সেঁধুচ্ছে না। মদের ঝোঁকে একবার কান্না শুরু করলে সে কান্না থামানো ভারী মুশকিল। আরও অনেকে এসে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল দাওয়ার দিকে—যেখানে অনন্তদাস চোখে শূন্যদৃষ্টি নিয়ে বসে আছেন। কৃষ্ণপ্রসাদ তার বাবাকে জলজ্যান্ত বসে থাকতে দেখেও তার কান্না থামাতে পারলো না। তখনও হা-হুতাশ করে কেঁদেই চলেছে, ও বাবা গো, তুমি কোথায় গেলে গো—

দীর্ঘক্ষণ পর অনেক কষ্টে তার কান্না থামিয়ে যখন তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, সে দড়াম করে শুয়ে পড়ল তার বিছানায়। তারপর নিবিড় ঘুমের ভেতর মিশে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

অনন্তদাস গোটা দিনমান দাওয়ায় বসে ঝাপ্‌সা চোখে দেখতে থাকেন সামিয়ানা-টাঙানো উঠোনের মাঝখানে চান্দ্রায়নব্রতের আয়োজন। কিছু বুঝতে পারছিলেন কি না তা বোঝা যাচ্ছিল না। তবে ছোটছেলে কৃষ্ণপ্রসাদের কান্না দেখে হঠাৎ তাঁর কী মনে হতে গলা উঁচিয়ে ডাকলেন ভাঙা ভাঙা গলায়, গোবিন্দ, অ গোবিন্দ, তোর বাবা ওটা কী করতে লেগেছে? ওখানে কি আমার শ্রাদ্ধ লেগেছে নাকি?

গোবিন্দ বিব্রতমুখে চুপচাপ বসে রইল অন্যদিকে তাকিয়ে। কী উত্তর দেবে ঠিক করতে পারল না।

অনন্তদাস আড়িয়ে-যাওয়া জিভে ভেঙে ভেঙে আবার বললেন, মরণের পরে আমারে কোথায় লইয়া যাবে রে? সেটা কি এখেনকার চেয়ে ভালো, না খারাপ?

আশপাশের দু'-পাঁচটা পাড়ার মানুষ যেমন হুড়িয়ে দেখতে এসেছে চান্দ্রায়নব্রতের ঘটা, শঙ্খও ইস্কুলে যাওয়া-আসার পথে দু-চারবার তার চারপাশে ঘুরঘুর করেনি তা নয়। যত না সামিয়ানার দিকে তার নজর রেখেছে, তার চেয়েও বেশি তাকিয়েছে বুড়ো অনন্তদাসের দিকে।

একসময় চন্দ্রের যোলোকলা পূর্ণ হয়, আবার হ্রাসও ঘনিয়ে আসে প্রকৃতিক নিয়মে। মাসসাধ্য ব্রত একসময় শেষ, হওয়ার মুখে পৌঁছয়। শঙ্খ সভয়ে লক্ষ করতে থাকে, অনন্তদাস ক্রমশ মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছেন, না কি জীবনের দিকে। তিনি কি ক্ষীণকায় হচ্ছেন দিনদিন, না কি ফিরে পাচ্ছেন তাঁর পায়ের সাড়!

পাড়াগাঁর এমন অদ্ভুত সব নিয়ম দেখে সে আশ্চর্য হয়। পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী বুড়ো অনন্তদাসের কথাটা মুখে-মুখে বেশ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে দু-চারখানা গাঁয়ে। শঙ্খও দু-চারবার মনে-মনে ঢালা-উপুড় করেছে সেই অমোঘ বাক্যটি, মরণের পরে আমাবে কোথায় লইয়া যাবে রে?

সত্যিই তো, মৃত্যুর পর কোথায় চলে যায় মানুষ।

অর্ঘদা কিন্তু এ ক'দিনের ভেতর একবারও চান্দ্রায়নব্রতের ওখানে দেখতে যায়নি। তার কাছে ঘটনাটা ফলাও করে বলার জন্য সে উথালপাথাল হচ্ছিল। বিকেলে খুঁজতে খুঁজতে তাকে আবিষ্কার করল ইছামতীর ধারে সেই কদমগাছটার নীচে। গাঙের পাড়ে পা ঝুলিয়ে খুব গভীরভাবে দেখছে কী যেন। তার নজর অনুসরণ করে শঙ্খও দেখল, দু'জন অদ্ভুতদর্শনের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে অদূরে লঙ্কাশিরে আর বাজবরণ ঝোপের পাশে। যেন ওঁত পেতে রয়েছে দু'জনে। তাদের মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। সে চুলে একজনের লাল তো অন্যজনের সবুজ ফেট্টি বাঁধা। কোমরে একচিলতে কানি। বাকি শরীর যেন কালো পাথরে খোদাই করে তৈরি। তাদের উদোম পিঠে মস্ত একটা তূন থেকে মাথা উঁচিয়ে উঁকি মারছে নীল-মেরুন-কালো পালক-লাগানো একগুচ্ছ তীর। হাতে মস্ত ধনুক। শঙ্খর নিঃশ্বাস ঘন হয়ে এল, ওরা কারা অর্ঘদা?

অর্ঘদা নজর না সরিয়ে বলল, ওরা বুনো। জঙ্গলে থাকে। জঙ্গলেই ঘরবাড়ি। সাঁওতাল।

—কী করতি এয়েচে এখেনে?

—নিশ্চয় গোহাড়কেল খুঁজতি।

—গোহাড়কেল নে কী করবে ওরা?

—গোহাড়কেলের চামড়ার মেলা দাম। গোহাড়কেল পেলি চামড়াটা ছাড়িয়ে নেবে। আর তার মাংসটা আগুনে ঝলসে নে জম্পিস করি খাবে।

শঙ্খ মুখ বিকৃত করল, তাই?

গোহাড়কেল মানে গোসাপ। এহেন অদ্ভুত জীবটিকে বেশ ভয়ই করে পাড়াগাঁর মানুষ। কার কাছে যেন শুনেছিল শঙ্খ, গোহাড়কেল কামড়ালে সহজে ছাড়ান্ পাওয়া যায় না, যতক্ষণ না আকাশ ডাকবে। আর ছাড়লেও রেহাই নেই, একমাত্র ঘোড়ার পেচ্ছাপ খেলে নাকি তার বিষ নামে। এহেন গোহাড়কেল যারা খায়, তাদের মাহাত্ম্য কম নয়!

শঙ্খ সন্ত্রস্ত চোখে তাকাল লোকদুটোর দিকে। বিচিত্র চেহারার মানুষদুটোর চোখে এক তীব্র চাহনি। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তো আছেই। কিন্তু একটু পরেই হতাশ হল তারা। এতক্ষণ ওঁত পেতে যা খুঁজছিল তা নিশ্চয় গা-ঢাকা দিয়েছে লঙ্কাশিরের ঘনঝোপের কোনও নিবিড় আড়ালে। একে-অপরকে কী যেন বিড়বিড় করে বলে রওনা দিল শীতলাতলার দিকে।

এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে অর্ঘদার দিকে তাকলো শঙ্খ। যা-কিছু নতুন, যা কিছু অদ্ভুত তা শঙ্খর ভেতরে দাগ কেটে বসে যায়। বুনো মানুষদুটোর পাথর-কোঁদা চেহারা আর তাদের চোখের দৃষ্টিও যেন তার বুকের কোথাও বড়-বড় দুটো আঁচড় কেটে চলে গেল। বুকের ভেতরটায়

এখনও গুরগুর করে জানান দিচ্ছে সে আঁচড়ের গভীরতা। অর্ঘদার নজর ততক্ষণে থির হয়ে আছে জলের ওপর একটা মাছরাঙা পাখির ওড়াউড়ির দিকে। কী চমৎকার নীল পাখ্না, তাতে এখানে-ওখানে বাদামি ছিট-ছিট দাগ। ঠোঁটের লাল-হলুদ রঙে কী অদ্ভুত কারুকাজ। জলের সমান্তরাল উড়ে যেতে-যেতে হঠাৎ এক-একবার জলে ঠোঁট ছুঁইয়েই ফের খানিকটা ওপরে উঠে আসছিল। নিশ্চয় সাঁতার দিতে দিতে ভেসে ওঠা কোনও সরপুঁটি, ল্যাটা কিংবা ট্যাংরা ধরার তালে আছে মাছরাঙাটার ঠোঁট। ধরতে পারছে কি না তা এত দূরেবসে ওরা বুঝে উঠতে পারছিল না। কিন্তু দেখতে দেখতে লীন হয়ে যাচ্ছিল দৃশ্যটার ভেতর।

বিকেল তখন শেষ হওয়ার মুখে। দু'জনে ইছামতীর দিকে মুখ করে আছে বলে তাদের ঠিক পেছনেই সূর্যাস্তের দৃশ্য। তার লাল আভার সামান্য কিছুটা এসে পড়েছে গাঙের জলে। তাতে জলে লাল-লাল ঢেউ। পাশেই খেয়াঘাটে কলোমানিক তার খেয়ানৌকো নিয়ে এপার-ওপার করছিল। তার হালের ঘূর্ণনে সে লালরং ভেঙেচুরে একাকার।

সেইমুহূর্তে চমৎকার একঝলক দখ্নে হাওয়া জলের বুক ছুঁয়ে আরও মিঠেন হয়ে শঙ্খর গায়ে ঝাপট মারতেই তার মনে পড়ে গেল, এটা ফাল্গুনমাস। হিমালয়ের ওপার থেকে যে উত্তুরে-হাওয়া তার দাঁত বুলোচ্ছিল, সে হঠাৎ এ-বচ্ছরকার মতো জিরেন নিয়েছে। এখন তার বদলে দখ্নে-হাওয়ায় সমুদ্দুরের গন্ধ। সেই গন্ধে ওতপ্রোত হয়ে হঠাৎ শঙ্খ চান্দ্রায়নব্রতের কথা বলতে লাগল অর্ঘদার কাছে, তুমি তো একবারও গেলে না চাটুজ্জেপাড়ায়। সে যে কী এক মহাপ্রলয় কান্ড—

হাসি-হাসি মুখ করে শুনছিল অর্ঘদা, কিন্তু ক্রমশ গম্ভীর হয়ে গেল। যেন ঠিক পছন্দ হচ্ছে না এ-সব। শঙ্খ যখন বলল, আচ্ছা অর্ঘদা, মৃত্যুর পর কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে, তক্ষুনি ঘাসের ওপর থেকে উঠে দাঁড়াল অর্ঘদা, বলল, চা, ঘরের দিকি যাই।

নদীর কিনার থেকে অমন মিঠেন হাওয়ার স্পর্শ ছেড়ে শঙ্খর উঠতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু অর্ঘদার মুখে অস্বস্তি ঘনিয়ে এসেছে দেখে উঠে পড়ল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ক'দিন আগেই অর্ঘদা বলেছিল, মৃত্যুর দৃশ্য সে একদম সহ্য করতে পারে না। মৃত্যু নিয়ে কোনও কথাও। আজও সেই মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠতে চমৎকার সমুদ্র-হাওয়ার দাপাদাপি ছেড়ে ঘরের পথে পা বাড়াল। শঙ্খর কথার জবাব না দিয়ে বলল, কাল ইস্কুল থে ফেরার পথে আমার জন্যি ক'টা আর্টপেপার নে আসিস তো।

অর্ঘদাকে সত্যিই অদ্ভুত লাগে শঙ্খর। সেই যে উমনো-ঝুমনোদের বাড়িতে দেড়-দু'মাস আগে এসে উঠেছে, আর কোথাও সে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। যা একটু বেরোয় তা এই ইছামতীর ধারে। খেয়াঘাটের পাশে এই কদমতলায় বসে থাকে চুপচাপ। কখনও মরাসোঁতার ওপর বাঁশের পোল পার হয়ে চলে যায় তিন্তিড়িপাড়ার দিকে, সেখানে কোনও নির্জন গাছতলা পেলে বসে থাকে। আর কী যেন ভাবে দিনরাত। ভাবতেই থাকে। তবে বেশিরভাগ সময়ই সে কাটায় তার বরাদ্দ ছোট্ট কামরাটিতে। কখনও ছবি আঁকে, কখনও কিছু যেন লেখেও, কী লেখে তা শঙ্খকে দেখতে দেয় না। বলে, ও তুই বুঝবি নে।

এমনকি ঈশ্বরীপুরের গঞ্জে গিয়ে নিজের জন্য আর্টপেপারও কিনে আনতে যায়নি কখনও। কেন যায় না তা শঙ্খ বুঝতে পারে না। তাহলে ঠাকুর্দা সেদিন যা বলেছিলেন, তাইই কি ঠিক! অর্ঘদা কোনও কারণে পালিয়ে এসে রয়েছে এখানে! শঙ্খ হঠাৎ বলল, পল্টন আর আমি কাল শিকারে যাব। তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো না—

অর্ঘদা চমকে উঠে বলল, কোথায়?

—অশথদহের বাঁওড়ে। পল্টন কত সব নতুন নতুন জায়গায় ঘোরে। অনেক অনেক দূরে। দু-একবার ওর সঙ্গে গিয়ে দেখেছি, কী সুন্দর সব জায়গা। কী সুন্দর সুন্দর সব দৃশ্য।

অর্ঘদা প্রথমটা খুব উৎসাহিত হয়েছিল, পরক্ষণেই দপ্ করে নিভে গিয়ে বলল, নাহ্, আমার ভালো লাগে না।

শঙ্খর মুখটা কালো হয়ে গেল, বলল, গুলতি দিয়ে শিকার করতে পল্টন ভারী ওস্তাদ। ওর হাতে যা টিপ্ ভাবতে পারবে না।

তবুও ঘাড় নাড়ল অর্ঘদা, না, না—

কাল বিকেলেই পল্টনের সঙ্গে দেখা হয়েছে শঙ্খর। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে ধুলো উড়িয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ কোত্থেকে শর্টকাট পথে তাকে এসে ধরেছিল পল্টন, অ্যাই শঙ্খ, শিকারে যাবি?

—শিকার! লাফিয়ে উঠেছিল শঙ্খ। সাধারণত পল্টন একাই শিকারে যায়। জঙ্গল থেকে, নদীর কিনার থেকে, বাঁওড়ের ধার থেকে এটা-ওটা মেরে আনে। কখনও ঘুঘু, কখনও বগারি, কখনও ডাকপাখি। কোনও কিছু না ভেবেই শঙ্খ রাজি হয়ে গিয়েছিল তৎক্ষনাৎ, যাব। পরক্ষণেই মনে হল, শিকারে গেলে ঠাকুর্দা বকবে না তো? হয়তো বলবে, পড়া কি শিকেয় উঠেছে?

—তাহলে শনিবারে। ইস্কুল থেকে ফেরার পর।

শঙ্খ নিজেকে প্রবোধ দিতে চাইল, বিকেলবেলা শিকারে গেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না পড়াশুনোর। বিকেলে সে তো কখনই পড়ে না। বিকেল তো মাথাটাকে জিরেন দেবার সময়।

শিকারের প্রসঙ্গ শোনার পর থেকেই তার শরীরে রক্তের গতিবেগ বেড়ে গেছে। উত্তেজনায় কাল রাতে ঘুমই হয়নি বললে চলে। আজও সারাদিন সেই শিহরণ বুকের ভেতর থরথর করছে। কিন্তু অর্ঘদার কথা শুনে খুব মনঃক্ষুন্ন হয়ে রইল। খুবই ঘরকুনো অর্ঘদা। বাইরের কারোর সঙ্গে যেন মিশতেই চায় না।

নিঃশব্দে খানিকদূর হাঁটার পর অর্ঘদা হঠাৎ মুখ খুলল, তোরা দু'জনে ঘুরে আয়। আমার আবার রক্তটক্ত দেখলে শরীরের ভেতরটা কেমন করে।

এতক্ষণে শঙ্খ বুঝল, কেন অর্ঘদা শিকারে যেতে চাইছে না। রক্তের দৃশ্য একদম সহ্য করতে পারে না অর্ঘদা। ওর মনটা এমন নরম, এক অসম্ভব ভালোবাসায় ভরা—

সেদিন শনিবার থাকায় শঙ্খদের ছুটি হয়ে গিয়েছিল বেলা একটা তিরিশ মিনিটে। ইস্কুল থেকে তাদের বাড়ি ফিরতে পাক্কা চল্লিশমিনিটের পথ। প্রথমে পঁচিশ মিনিটের পাকারাস্তা। নামে পাকা হলেও আসলে খোয়া-ওঠা হাড়জিরজিরে চেহারা। তবে বাস চলাচল করে। বসিরহাট থেকে হাবড়া। বাসের কন্ডাকটর হঠাৎ তাদের গাঁয়ের কাছে এসে হাঁক পাড়ে, ঈশ্বরীপুর, ঈশ্বরীপুর এসে গেছে।

বাস চললেও এই পথটুকু হেঁটেই যাতায়াত করে ইস্কুল-পড়ুয়ার দল। লম্বা-লম্বা পা ফেলে প্রায় পলক ফুরোতেই পার হয়ে যায় পাকা রাস্তাটুকু। তারপর খানিকটা মেটে পথ। সারাবছর সে পথ ধুলো ছেটাতে ছেটাতে হাঁটে। কেবল বর্ষাবাদ্‌লার দিনে হাঁটুসোর কাদা।

শেষ-ফাল্গুনের দুপুরে রোদের নরম তাপ গায়ে শুষতে শুষতে মেটেপথে বড় বড় পা ফেলছিল শঙ্খ। ঠিক রক্ষেকালীতলা পেরুবার পর যে মস্ত শিরীষগাছটা পথে ছায়া ফেলে

দাঁড়িয়ে থাকে, তার কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ দ্যাখে একটা মৌমাছি। ফালুকফুলুক নজর চালিয়ে দেখল, ঠিকই ধরেছে সে। শিরীষগাছের মগডালে বিশাল একটা মৌচাক থম্ হয়ে রয়েছে। মধুতে টইটম্বুর। কিন্তু শিকারে যাওয়ার উত্তেজনায় সে এমন টঙ্ হয়ে আছে যে দু'দন্ড দাঁড়িয়ে মৌচাকটাকে পরখ্ করতেও ইচ্ছে হল না আজ। জেলেপাড়া, শীতলাতলা পার হয়ে বাড়ির কাছাকাছি আসতে হঠাৎ কোত্থেকে এসে তাকে ধরে ফেলল পল্টন, কী রে যাবি তো?

—বাহ্, যাব বলেই তো আজ ফেরার পথে কোথাও দাঁড়াইনি। এমনকি রানিশায়রের কাছে রোজ একটু করে থামি। আজ তাও নয়। একটা কী দারুণ পদ্ম ফুটে ছিল কিনারের কাছে। তোলব-তোলব ভাবছিলাম, তাও তুলিনি দেরি হয়ে যাবে বলে। রক্ষেকালীতলার পাশে শিরীষগাছে একটা মৌচাক দেখেও নয়। মৌচাকের কথা শুনে পল্টনও লাফালো, তাই! তা'লি ওর একটা ব্যবস্থা করতি হবে'খন। কালকে যেতি হবে। এখন পা চালিয়ে চল্, বাড়িতে বইখাতা রেখেই বেরিয়ে আসবি। আমি একটা নতুন গুলতি বানিয়েছি—

পল্টনের কথা শুনে শঙ্খর পায়ের গতি যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়। শিকারে যাবার নাম শুনে তার শিরার ভেতরে বেড়ে যায় রক্তের গতি। শরীরটা চনমন করতে থাকে। একটা অন্যরকম উত্তেজনা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। উত্তেজনায় হলুদরঙের রোদ ক্রমশ সোনালি হয়ে দেখা দেয় তার চোখের সামনে।

পল্টন তাদের একটা বাড়ি পরেই থাকে। শঙ্খর চেয়ে সে বয়সে বেশ ক'মাসের ছোট, অথচ তার শরীরটা এমন তাগড়াই ধরনের যে শঙ্খ তার পাশে দাঁড়ালে লজ্জায় রোজই খানিকটা কুঁকড়ে যায়। শঙ্খর রোগা, ছোটখাটো শরীর। পল্টনের পাশে তার ছোট শরীর আরো ছোট্ট দেখায়। শুধু শরীরটা যে তাগড়াই তা শুধু নয়, পল্টনের বুকে বেশ একবল্গা সাহস। হুটহাট গুলতি নিয়ে সেঁধিয়ে যায় কড়াইমন্ডির জঙ্গলে, একা-একা ঘুরে বেড়ায় ঘুরঘুট্টি বিলের ধারে। আজ অশথদহের বাঁওড়ে যাবে, বলল, ওখানে যা সরাল্ উড়ে বেড়ায় না—

অশথদহের বাঁওড়! সে তোমরা তাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর। সোঁতার বাঁশের পোল পার হয়ে অনেক পথ হেঁটে যেতে হয়। অশথদহের বাঁওড়ের কথা কতোবার এর ওর মুখে শঙ্খ শুনেছে, কিন্তু কখনো যাওয়া হয়নি। নতুন জায়গায় যাবার নাম শুনলেই সে জায়গা সম্পর্কে সে অনেককিছু ভেবে নেয় মনে-মনে। নতুন সব দৃশ্য ঘাই দিয়ে ওঠে তার মাথার ভেতরে। অশথদহের বাঁওড়ও তেমনি নতুন সব ছবি হয়ে পাক খেতে থাকে তার চোখের সামনে। বাঁওড়ের কিনারে নিশ্চয় বসে থাকবে সার-সার একঠেঙে বক। লম্বা হলুদ ঠোঁট তাক্ করে অপেক্ষা করবে মাছের আশায়। কিন্তু সে তো অনেক দূর!

পল্টন হেসে উড়িয়ে দ্যায় শঙ্খর কথা। কত আর দূর হবে। দু-ক্রোশও হবে না বোধহয়—

পল্টনের বাবা বেশ স্বাস্থ্যবান মানুষ। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা তাঁর। রোজ ডন-বৈঠক করান পল্টনকে। তার দেখাদেখি শঙ্খও ক'দিন বুক-ডন দিয়েছিল। পনেরটা ডন, তিরিশটা বৈঠক। কিন্তু শঙ্খ সেই একইরকম রোগাভোগাই রয়ে গেল। ডন-বৈঠক দেয়াও বন্ধ করে দিয়েছে ক'দিন পরেই। পল্টন শুনে হেসেছিল, শুধু ডন-বৈঠক দিলে হবে! বেশি করে ভাত খেতে হবে, তার সঙ্গে ভাতের ফ্যান। এক-গামলা ভাতের ফ্যান একচুমুকে সাব্ড়ে দিবি তবেই না স্বাস্থ্য! তবেই না সাহস বাড়বে।

ভাতের ফ্যানের গল্পে আবারও পিছিয়ে গিয়েছিল শঙ্খ, নাহ্, মরে গেলেও সে ভাতের

ফ্যান পল্টনের মতো চোঁ চোঁ করে গিলতে পারবে না। তার থেকে রোগা থাকাই ভালো।

ইস্কুলের বইখাতা গুছিয়ে রেখে বাড়ি থেকে প্রায় চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে শঙ্খ। ঠাক্মার চোখে পড়ে গেলে তাকে আবার শতেকখান করে ব্যাখ্যানা শোনাতে হবে, কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। শঙ্খর নিশ্চিত ধারণা, অশথদহের বাঁওড়ের নাম শুনলেই ঠাকুমা তাকে কিছুতেই শিকারে যেতে দেবে না। অতএব—

পল্টন তার জন্যে অপেক্ষা করছিল রাস্তায়। তার দু'হাতে দুটো গুলতি। তাঁর মধ্যে একটা নতুন। নতুনটা শঙ্খর হাতে তুলে দিয়ে বলল, দ্যাখ্, কী ফাস্‌কেলাস্ চাম্ জোগাড় করেছি!

পল্টনের দু'পকেটে একরাশ করে বাঁটুল উঁচু হয়ে আছে। তার থেকে দু'মুঠো বাঁটুল শঙ্খর পকেটে চালান হয়ে গেল। মাটির তাল থেকে লেচি কেটে হাতের তালুতে পাকিয়ে গোল গোল করেছে। তাকে রোদ্দুরে শুকিয়ে আঁচের ভিতর রেখে লাল-লাল করে পুড়িয়ে তোয়ের করতে হয় বাঁটুলগুলো। এ বাঁটুল বাঘের গায়ে লাগলেও তার দফা রফা।

নতুন গুলতিটা হাতে পেতে সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল সে। চমৎকার ওয়াই-শেপের দেখতে গুলতির বাঁটামুটা। এরকম ওয়াই-শেপের গাছের ডাল খুঁজে অনেক মেহনতে তৈরি করতে হয় বাটাম্। ওয়াই-এর দু'বাহুতে দু'টো লম্বা রবার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা। রবার দুটোর অন্যপ্রান্তে গোল একটা চাম্ বেশ কায়দা করে বাঁধা। চামের ভিতর বাঁটুল রেখে তবে যোজনা করতে হয় গুলতি।

গুল্তিটা ঠিক কীরকম তা পরখ করার জন্য শঙ্খ চামের ভিতর রাখল তার তর্জনীর ডগাটা। বাকি আঙুলগুলো দিয়ে রবারে টান লাগালো। নতুন রবার, বেশ শক্তই লাগলো তার কাছে। অনেকবার টানতে টানতে তবে রবারটা বেশ নরম হয়ে আসবে। রবার নরম হলে তবেই টেনে অনেকটা লম্বা করা যায়। তাতে শিকারের নিশানাও হয় নির্ভুল। পল্টন তার পুরোনো গুলতিটা না দিয়ে কেন যে নতুন গুলতিটা তাকে দিল তা বুঝতে পারল না শঙ্খ। পুরানোটা হলেই তার পক্ষে সুবিধে হতো। পুরনো গুলতির রবার বেশ নরম হয়।

পল্টনের হাতের পুরানো গুলতিটার দিকে তাকাতে তাকাতে দু'জনে মরাসোঁতার বাঁশের পোলের কাছে এসে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে শঙ্খ আনমনে বাঁহাতে তার গুলতির বাটাম ধরে ডান হাতে রবারটা টানছে বারবার। নতুন রবার দিয়ে ঠিকমতো নিশানা করতে পারবে কি না তাই ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল বাঁশের পোলের উপর। পায়ের নীচে তিনটে বাঁশ লম্বালম্বি শুয়ে আছে মরাসোঁতার খালের উপর। আগে পল্টন, পিছে শঙ্খ, বড় বড় পা ফেলে পল্টন প্রায় দৌড়ে পার হয়ে গেল পোলটা, তার দৌড়ুনোর ভঙ্গিতে টালমাটাল হয়ে দুলছে বাঁশগুলো, আর তাতেই পা কেঁপে গেল শঙ্খর। হাতে একটা লম্বা বাঁশ ধরাট্ হিসেবে বাঁধা আছে বটে, কিন্তু পা কেঁপে গেলে অবশ হয়ে আসে হাত দুটোও। ভয়ে পোলের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল শঙ্খ, বাঁশের দুলুনিটা আগে কমুক, তারপর পার হবে।

ওপার থেকে পল্টন বিস্ময়ের শব্দ ঝরালো, কী রে, এখনো পার হতে পারলি নে?

পল্টন ডাকাবুকো ছেলে, ও চট্ করে পার হয়ে যায়, শঙ্খ পারে না। কাঁপা গলায় বলল, তুই এমন দৌড় দিলি,....

পল্টন ফিকফিক করে হাসে, এর'ম দৌড়েই তো পার হতে হয়, তাতে ব্যালান্স থাকে। পোলের উপর দাঁড়িয়ে পড়লেই তো মুশকিল। নে, আমার হাত ধর—

আবার এক দৌড়ে পল্টন পোলের মধ্যিখানে চলে এল, হাত বাড়িয়ে দিল শঙ্খর দিকে।

তাতে আবারো থরথর করে কাঁপতে থাকল শঙ্খর পায়ের নীচে বাঁশগুলো। পল্টনের দিকে হাত বাড়াতে তবু দ্বিধা করল শঙ্খ। পল্টন ওর থেকে বয়সে ছোটই, তার হাত ধরেই কিনা পোল পেরুতে হবে শঙ্খকে! ভয় ঝেড়ে ফেলে সহসা ও বলল, ধরতে হবে না, চল্—

পল্টনের পিছু পিছু শঙ্খ চোখ বুজে এবার একটা দৌড় দিল, একেবারে কিনারের কাছে এসে তার গা-টা প্রায় টলে গিয়েছিল। আর একটু হলেই সে পড়ে যেত নীচে পা ফসকে। খুব সামলে নিয়েছে শেষ সময়ে। নীচে মরাসোঁতার জল এখন প্রায় তলানিতে। ভাঁটার লগন চলছে। হয়তো আর একটু পরেই জোয়ার এসে পড়বে। পা ফসকে পড়ে গেলে কি যে হতো!

মরাসোঁতার খাল পার হয়ে রাস্তা একটু পরেই দু'দিকে বেঁকে গেছে, একটা পথ তিন্তিড়ি পাড়ার মোল্লার ঠেকের দিকে। অন্য পথ দিয়ে ইছামতীর কোল বরাবর সোজা অশথদহের বাঁওড়। শঙ্খ যায়নি কখনো, তবু এর ওর মুখে শুনে রাস্তাটা সে ঠাহর করে ফেলেছে এর মধ্যে। সেই ইছামতীর পাড়ে একটা উঁচু বাঁধ বরাবর দু'জনে পা চালিয়ে হাটছে। নদীতে এখন ভাঁটা হওয়ায় অনেকটা চর জেগে উঠেছে দু'পারেই। থিক-থিক করছে কাদা, তার মধ্যে ঠ্যাং ফেলে ঘুরছে কয়েকটা বক। শাদা ধবধব করছে তাদের শরীর। হঠাৎ হঠাৎ ছোঁ মারার ভঙ্গি তে জল-কাদার মধ্যে হলুদ ঠোঁট ডুবিয়ে দিচ্ছে মাছের খোঁজে। ভাঁটার লগনে এমন দৃশ্য প্রায়শই দেখতে পায় তারা।

সূর্য এখন অনেকটা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। ডাইনে নদী, বাঁয়ে সুয্যিদেব এই নিয়ে তারা এখন বাঁধের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে উত্তরমুখো। আগে আগে পল্টন চলেছে হনহন করে। তার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে শঙ্খর প্রাণান্ত। পল্টন এমন দুদ্দাড় করে এগুচ্ছে যেন বাঁওড়ের সমস্ত পাখি একটু দেরি হলেই উড়ে চলে যাবে। শঙ্খ ছুটছে, তার সঙ্গে ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা। শিরশির করছে শরীরটা। বাঁধের উপর তাদের দু'জনের চার-পা এমন ধুলো ওড়াচ্ছে যেন তা ঘোড়ার চার খুর থেকে ছিটোচ্ছে। টগ্‌বগ্ টগবগ্ শব্দ নেই তবু শঙ্খর মনে হচ্ছে তারা একটা ঘোড়ায় চড়েই ছুটছে। হাতে গুলতির বদলে একটা করে খাপখোলা তরোয়াল। রোদ্দুর লেগে এখুনি ঝিকিয়ে উঠবে তার চকচকে ফলা। এরকম টগ্‌বগ্ করে তারা কতক্ষণ হেঁটেছে তা খেয়াল করেনি, হঠাৎ দেখল মাজা দুম্‌ড়ে পশ্চিমের দিকে একটা বাঁক নিয়েছে ইছামতী। আর এই অর্ধ বৃত্তাকার নদীর কোলে, বাঁধের এপারে মস্ত ধু ধু মাঠ। পল্টন চট্ করে বাঁধ ছেড়ে নেমে পড়ল মাঠের পথ ধরে।

এমন সরু মেঠোপথ দিয়ে শঙ্খ এর আগেও কতবার হেঁটেছে, তবু এ মাঠটা যেন অন্যরকম। মনে হচ্ছে এ পথ দিয়ে হাঁটলে সরাসরি পৌঁছানো যাবে দিগন্তে। এখন যেখানে লাল কমলালেবুর মতো মস্ত সূর্যটা খুব ধীরে ছুঁতে চাইছে ধরিত্রীর বুক। একটু চোখ রাখলেই মনে হয় কমলালেবুটা ঘুরছে লাট্টুর মতো। এমন একটা মন-কেমন-করা পরিবেশে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ শিরশির করে উঠল শঙ্খর শরীর। যেন তারা হাঁটছে আর কোথাও নয়, তেপান্তরের মাঠ দিয়ে।

ঠিক এমন একটি ধু ধু মাঠের বর্ণনাই তো সে রোজ রাতে ঠাকুমার কাছ থেকে শোনে। রাজপুত্র তার শাদা কেশরওলা ঘোড়ার পিঠে বসে ধুলো ছোটাতে ছোটাতে চলতে থাকে তার রাজকন্যার খোঁজে।

পল্টন তা শুনে বলল, ধুর, তেপান্তর এখানে কোথায়, সে তো অনেক দূরে, অন্তত এখান থেকে সাতদিন সাতরাতের হাঁটা পথ। এ তো অশথদহের বাঁওড়।

অশ্বথদহের বাঁওড়! কোথায় বা অশথ গাছ, আর কোথায় বা বাঁওড়ের জল?

—এখানে আবার অশথগাছ কোত্থেকে আসবে। অশথদহ নাম হলেই কি অশথ গাছ থাকতে হবে? চিংড়িপোতায় কি শুধু চিংড়িমাছ থাকে নাকি? ঈশ্বরীপুরেই বা ঈশ্বর কোথায় রে?

শেষ কথাটাই ধক করে বাজল শঙ্খর বুকে। তাই তো, ঈশ্বরীপুরে যে ঈশ্বর থাকবেন এমন কথা তো কখনো ভাবা হয়নি। ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন তাদের এই ঈশ্বরীপুরে! কিছুক্ষণ চুপচাপ ভেবে তার মনে হল, আছেনই তো। এই বিস্তীর্ণ চরাচর, এই মাটি, ঘাস, এই ধু ধু বাঁওড়, এই ইছামতী, নীল আকাশ, এত সবুজ গাছপালা-এই সব মিলিয়েই তো ঈশ্বর। শঙ্খ যেদিকে তাকায় তার মনে হয় এর সবখানেই ঈশ্বর জড়িয়ে আছেন ওতপ্রোত হয়ে। নইলে এই জনমনিষ্যিহীন ধু ধু মাঠে এত সবুজ ঘাসই বা এল কী করে। এত নীলই বা হল কেন আকাশ! লাল গোল সুয্যিটাই বা লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে কীভাবে ছুঁতে চলেছে দিগন্ত! একটু পরেই টুপ করে হারিয়ে যাবে কোন গহন অন্ধকারে। তারপর সারাটা রাত চুপিচুপি পাড়ি দেবে অন্য এক পৃথিবী। একসময় আবার ভোরবেলা এরকম লাট্টুর মতোই টপ্ করে লাফিয়ে উঠবে আকাশের পুবকোণে। ইছামতীর ভরা শরীর থেকে যেন ফুঁড়ে উঠবে ম্যাজিকের মতো।

পল্টন ততক্ষণে বলে চলেছে, এ বাঁওড়ের জল এখন এই এতটুকুনি, কিন্তু বর্ষার জল পেলে দেখবি এর কেমন হাত-পা গজায়। তখন থইথই করবে জল, এখন যেখান দিয়ে তরতর করে হাঁটছিস, তখন এখান দিয়ে তোকে সাঁতার কাটতে হবে।

শঙ্খ অবাক হয়ে যায়, এই এতসব সবুজ ঘাস, ধু ধু মাঠ, সব জলের তলায় চলে যাবে!

—হুঁ, এখন ওই দ্যাখ, দুরে যে বাঁওড় দেখা যাচ্ছে তার জল কতটুকুনি। তখন এই বাঁওড় প্রায় রাক্ষসের মতো ফুলে একশা হয়ে যাবে।

শঙ্খ একবুক হিম নিয়ে এই কথা শোনে। রাক্ষসের কথায় তার পায়ে একলহমা কাঁপ ধরে যায়, এই তেপান্তরের মতো ধু ধু মাঠ পেরিয়ে কাল্পনিক ঘোড়ার পিঠে চড়ে টগবগ টগবগ শব্দে ধুলো ছোটাতে ছোটাতে যাবার সময় যদি হঠাৎ রাক্ষসের গল্প এসে পড়ে তাহলে কোন সে বীরপুরুষের পায়ে কাঁপন না ধরে। বোধহয় এক পল্টনেরই ধরে না। ওর বুকে বোধহয় এক সমুদ্দুর সাহস।

ততক্ষনে শঙ্খর চোখে পড়েছে, দূরের একটুকরো জলরাশির দিকে, দেখে এইটুকুনি মনে হয়, কিন্তু সে জল বোধ হয় সেঁধিয়ে গেছে দিগন্ত বরাবর। যা মনে হচ্ছিল ধুলোর আস্তরণ, এখন বোঝা যাচ্ছে আসলে তা জলই। তাতে অস্তগামী সূর্যের লাল সিঁদুর চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে পড়ে রাঙা করে তুলেছে সমস্ত জল। কী যে চমৎকার আর অদ্ভুত লাগছে বাঁওড়টিকে! তৎক্ষনাৎ শরীরের ভেতর একটা তুমুল আনন্দোৎসব কুলকুল করে বয়ে যেতে থাকে দ্রুতলয়ে। রক্তের ভেতর একটা আলাদা দাপাদাপি যা এতক্ষণের ভয়তরাস, কাঁপন, শিরানি সব ছাপিয়ে একরাশ ভালো লাগার মুহূর্ত একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল মনের সমস্ত আনাচে-কানাচে। এ এক অন্যরকম উত্তেজনা যা শঙ্খ আগে কখনও অনুভব করেনি। এ এক অদ্ভুত মুহূর্ত যা কখনও আসেনি তার জীবনে।

পল্টন তখন বাঁওড় দেখছে না, সূর্যাস্ত দেখছে না, পট করে শঙ্খর হাত ধরে দাঁড় করালো, দ্যা—খ্!

শঙ্খ তাকিয়ে দ্যাখে, একটা বড়সড় পাখি, ধূসর রং, গায়ে ছিট-ছিট।

—কী বড় ঘুঘুটা, মার দেখি, হাতে কেমন টিপ হয়েছে তোর।

শঙ্খ একলহমা থতমত খেয়ে যায়। সম্বিত ফিরতে তার বুকের ভেতর একশ ঘোড়ার দাপানি। এতক্ষণ পলকবিহীন হয়ে অশথদহের বাঁওড়ের রক্তিম সৌন্দর্য দেখছিল, অথচ তারা তো এই বিশাল চরাচরের সৌন্দর্য দেখতে আসেনি, এসেছে শিকার করতে। চারদিকে আরও কয়েকটা পাখি ইতস্তত সঞ্চারমান। কোনটা ঘুঘু, কোনটা শালিক, কোনটা দোয়েল। আর ওটা কী পাখি, ওই হলুদরঙের, কালো আঁচড় দিয়েছে গায়ে!

—তুই আগে ঘুঘুটাকে টিপ্ কর্ তো—

শঙ্খর নজর পড়ে তার হাতের গুলতিটার দিকে, এতক্ষণ এজন্যেই তো বয়ে-বয়ে নিয়ে এসেছে এটা, পকেটে ঢিব্ হয়ে রয়েছে লালচে বাঁটুলগুলো, তার থেকেই একটা বাঁটুল পলকে বার করে গুলতির চামের ভেতর ফিট্ করল সে, কিন্তু নতুন কেনা রবার, বেশ শক্তপোক্ত আর আঁট ধবনের, শঙ্খ রবার টানতে গিয়ে দেখল, তার গায়ের জোরে কুলোচ্ছে না। তবু অনেক দম নিয়ে আরও জোরে টান লাগাল সে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ফুরিয়ে আসছে দম, তার মধ্যে চামের ভেতর থেকে ছিটকে বেরুল বাঁটুলটা, আর আশ্চর্য, ঘুঘুটা যেখানে বসে ছিল, সে পর্যন্ত পৌঁছুলই না, তার থেকে অনেকটা আগে গিয়ে পড়ল তার বাঁটুল, ঘুঘুটা সতর্ক হয়ে গিয়ে উড়তে উড়তে চলে গেল আরও অনেক দূরে।

পল্টন হাঁ করে তাকিয়ে ছিল শঙ্খর দিকে, কী রে তুই! ভালো করে টানবি তো চামটা—

শঙ্খ ঢোঁক গিলে বলল, বড্ড শক্ত যে নতুন রবার।

—নতুন তাতে কী হয়েছে? দেখি আমার হাতে দে তো—

পল্টন বাটামটা বাঁ হাতে ধরে অনায়াসে দ্বিগুণ শক্তিতে টানল রবারটা, খুবই সহজ ভাবে অনেকদূর বিস্তৃত হল সেটা, শঙ্খ যা টেনেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। শঙ্খ মুখ কালো করে দেখল পল্টনের অনায়াস ভঙ্গি।

—দ্যাখ, ওখানে একটা সরাল্ বসেছে, ঠিক করে টিপ কর্ তো, মাথায় লাগাতে পারলেই—

পল্টনের চোখ অনুসরণ করে শঙ্খর নজরে পড়ল ঠিক জলের কিনারের দিকে আরও একটা ধূসররঙের পাখি, লম্বাটে গড়ন, ভাবলেশহীন হয়ে বসে আছে বাঁওড়ের জলের দিকে তাকিয়ে। তৎক্ষণাৎ শঙ্খ আরও একটা বাঁটুল চামের ভিতর ভরে ফেলল কাঁপা-কাঁপা হাতে। এবার সেও দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করতে চাইলো গুলতিতে। জোরে, আরো জোরে, কিন্তু আশ্চর্য সরালটা থেকে অনেক কাছে টাল খেয়ে গিয়ে পড়ল বাঁটুলটা। শঙ্খ আরও একবার হতাশ হয়ে তাকিয়ে রইল পল্টনের দিকে।

পল্টন গম্ভীর ভাবে বলল, তোকে না কতদিন বলেছি ভাতের ফ্যান খাবি রোজ, গায়ে একটুকু জোর নেই তোর—

ততক্ষণে তার নজরে পড়েছে একটা বড় ডাকপাখির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় বড় বড় হয়ে উঠল তার চোখ, ঠোঁটে আঙুল রেখে স্-স্স্স্ শব্দ করে চুপ করতে বলল শঙ্খকে, তারপর হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে, ফিসফিস করে বলল, বুকে ভর দিয়ে কাছে এগিয়ে চল, একেবারে কাছে গিয়ে টিপ করবি।

উত্তেজনায় শঙ্খও তখন উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে। পল্টনের দেখাদেখি সেও বুকে ভর করে এগুতে লাগল। বুকের নীচে ঘাস, পুরোনো শ্যাওলা, বুনো গুল্মলতা, দু-জনে মিলে সেই সবুজ উদ্ভিদের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। শঙ্খর নাকে তার সোঁদাঘ্রাণ ভরে যেতে থাকে ক্রমশ। এগুতে এগুতে তার জামা ভিজে ওঠে উদ্ভিদের সবুজ রসে। বুকের নীচে থেঁতলে

যাচ্ছে ঘাস, শ্যাওলা, বুনো গুল্মলতা। ডাকপাখিটা তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জলের কিনারে।

বেশ অনেকটা কাছে এগিয়ে গিয়ে শঙ্খ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে। ডাকপাখিটা এবার তার নাগালের মধ্যেই। মাথাটা সামান্য তুলে দেখল, ডাকপাখিটা চোখ বুজে কী যেন ভাবছে মনে হয়। পাশ থেকে পল্টন তার পিঠে চিমটি কেটে ইশারা করল, টিপ কর—

শঙ্খর আঙ্গুলগুলো আরো কাঁপতে শুরু করে। পকেট থেকে হাঁচড়পাঁচড় করে আধার করল বাঁটুল, তারপর কাঁপা হাতে নিশানা করল ডাকপাখিটার দিকে। আশ্চর্য, ডাকপাখিটা বুঝতেও পারছে না তার এত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে গুলতি-হাতে দুই শিকারি। ওটা হয়তো তখন বিভোর হয়ে আছে সবুজ উদ্ভিদ, বাঁওড়ের জল থেকে ভেসে আসা সৌদাঘ্রাণের অপরূপ রহস্যের ভেতর।

শঙ্খ তার চাম্ ধরে খুব জোরে টানার চেষ্টা করল। কিন্তু দাঁড়িয়ে যতটা শক্তি দিয়ে সে টানতে পারে, বুকে ভর দিয়ে শুয়ে সেটুকুও পারছে না। তবু দাঁতে দাঁত চেপে সে টানতে চেষ্টা করছে চাম্‌টা। পল্টন চোখ দিয়ে ইশারা করছে, আরো জোরে, আরো—। শঙ্খর কপালে ক্রমশ ঘাম জমছে। পল্টনের কাছে তখন থেকে ক্রমাগত পরাজিত হয়ে একটা হীনমন্যতা জেগে উঠেছে তার ভেতরে। দু'দুবার পারেনি সে, এবার পারতেই হবে তাকে।

সেইমুহূর্তে প্রবল শক্তিতে সে তার যোজনা নিক্ষেপ করল, আর আশ্চর্য, এবারও তার নিশানা ব্যর্থ হল আগের দু'বারের মতো। ডাকপাখিটা থেকে কিছুটা দূরে বাঁটুলটা টুপ করে পড়তে সে উড়ে গিয়ে বসে পড়লো খানিকটা দূরে—শঙ্খদের নাগালের বাইরে।

পল্টন কপাল চাপড়ে বলল, তোর দ্বারা কিছু হবে না, দাঁড়া এবার আমিই টিপ করি। এত বড় ডাক্ কিছুতে ফসকে যেতে দেয়া যায় না।

বলেই সে মুহূর্তে বুক আঁকড়ে পড়ে থাকা অবস্থায়ই চামের ভেতর বাঁটুল ভরে নিয়ে নিশানা করল। ডাকপাখিটা বেশ খানিকটা দূরেই আছে এবার, তবু পল্টন আর এগোল না। তার চওড়া কব্জি দিয়ে সজোরে টেনে ধরল চামটা, তারপর চামের ভেতর থেকে তীব্রগতিতে ছুটে গেল একটা লালচে সুতোর রেখা। তক্ষুনি একটা আঁক-আঁক শব্দ। ঝটপট ডানার শব্দ তুলে উল্টে পড়ে গেছে ডাকপাখিটা। শব্দ শুনে পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকে চোখের নিমেষে ছুটে গেলো পল্টন।

ডাকপাখিটা হাতে তুলে নিতেই তার চোখে বিজয়ীর হাসি। তার আঙ্গুলের ফাঁকে তখনো আঁক-আঁক শব্দ তুলে আর্তনাদ করছে সেটা, নিরুপায় হয়ে ঝাপটাচ্ছে তার ডানা। কাছে গিয়ে শঙ্খ দেখল পাখিটার চোখের কাছ দিয়ে বেরিয়ে আসছে টাটকা রক্ত। শঙ্খ আবার রক্ত দেখতে পারোনা, সে বন্ধ করে ফেলল তার চোখ, তবু সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখ বুজেও দেখতে পেল গড়িয়ে নেমে আসছে লাল রক্তের রেখা।

ঘাড় ঝাঁকাল শঙ্খ, একমুহূর্ত আগেও বেঁচে ছিল পাখিটা, কী চমৎকার লাগছিল অহঙ্কারে চুর হয়ে তার বসে থাকার দৃশ্যটি, এখন ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে থামিয়ে ফেলেছে তার ডানা ঝাপটানি। দৃশ্যটিকে এই মুহূর্তে বড় ভীষণ আর ভয়ঙ্কর মনে হল তার কাছে। এবং সম্ভবত এই নিষ্ঠুর দৃশ্যটি মনে মনে কল্পনা করেই সে এতক্ষণ তার নিশানা স্থির করতে পারছিল না।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে আস্তে আস্তে পল্টনকে বলল, চ, পল্টন এবার ফিরে যাই, এরপর সন্ধে হয়ে যাবে।

বাড়ি ফেরার অনেকক্ষণ পরও শঙ্খ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না। বই নিয়ে বসেও

অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। যতবার বইএর পৃষ্ঠায় চোখ রাখে ততবারই পাখিটার কথা মনে পড়ছিল তার। এমনকি রাতে ঘুমের গভীরেও আঁ-আঁ করে ডেকে চলেছিল সেই নধর সুন্দর ডাকপাখিটা। অবশেষে কাকভোরে ঘরের বাইরে চলে এসে ভুলতে চাইল সমস্ত ব্যাপারটা। হন হন করে হেঁটে চলে এল উঠোন পেরিয়ে। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল অস্বস্তিকর দৃশ্যটা। তার বাড়ির দক্ষিণে বিঘেখানেকের ফালি জমিটার চারপাশে হাঁটতে হাঁটতে দেখল, এই ভোরেই জমিতে নিড়েন দিতে এসেছে মৈনুদ্দির ছেলে সোলেমান।

পাটের গোড়া একনাগাড়ে নিড়িয়ে একটু জিরেন নেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো সোলেমান। বর্ষার আগে-আগে তার বাপ মৈনুদ্দি পাট বুনে দিয়েছে। এটা ম্যাস্তা-পাট, এ পাটের ফেঁসো লালচে ধরনের হয়। ঈশ্বরীপুরের হাটে এই লালফেঁসোর পাট বিকোয়ও বেশ ভালোদামে।

উঠে দাঁড়িয়ে ভালো করেন নিরিখ্ করে সোলেমান বুঝল, ম্যাস্তার বাড়ন এবার একদম ভালো নয়। এ সময় এক-আধ পশ্‌লা বৃষ্টি হলে হয়তো দ্যাখ্-দ্যাখ্ করে বেড়ে উঠত গাছগুলো। কিন্তু আকাশ নির্মেঘ। নীল আকাশে এখন কেবল বিন্দু বিন্দু চিলের কাটাকুটি খেলা। চিলটা কেবলই চক্কর মারছে ঘুরে-ঘুরে।

সোলেমানের বয়স উনিশের ওপর, কালো গুঁটধরনের চেহারা, ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। পরনে নীল চেককাটা লুঙি, কাজের সুবিধের জন্য হাঁটু-বরাবর তুলে ফেরতা দিয়ে পরেছে লুঙিটা, খালিগায়ে ঘাম গড়াচ্ছে, রোদ্দুর লেগে আরও চিকচিক করছে সেই ঘাম। বেশ অনেকক্ষণ একনাগাড়ে নিড়িয়েছে সে, কিন্তু এখনও একরশিও এগোতে পারেনি। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাজের মাপ নিরিখ করে বেশ হতাশ হল। তারপর এগিয়ে গিয়ে জমিনের আলে গা এলিয়ে জিরেন নিতে বসল।

তার বাপ বলেছে, জমিনের ঠিক আদ্দেকটা নিড়িয়ে তবে ঘরে ফেরা চাই। আদ্দেক কেন, সিকির সিকি, তার সিকিও সে পারবে না আজ। সুয্যি এখন পুবকোণ থেকে ধাঁ ধাঁ করে উঠে আসছে আকাশের মাঝ-বরাবর। এখনও ঠিক মাথার ওপর ওঠেনি, তাতেই রোদ্দুর ফিনিক দিয়ে হাওয়ায় আগুন ছোটাচ্ছে। জমিতে ভালো করে নিড়েন দেওয়ার জন্য অবশ্য চেষ্টার অন্ত নেই সোলেমানের, কিন্তু হাত চলতেই চাইছে না যেন। একটা করে ঘাস তোলে তো তার গোড়া থেকে যায়। গোড়া তুলতে গিয়ে তার জান লবেজান। মাটিটাই শক্ত, না কি তার মন, সে বুঝতে পারছে না।

পারবেই বা কী করে। আজ দু'বছর ধরে তার বাপ্ বিয়ে দেবে বলে তাকে ঘোরাচ্ছে। বে'র নাম গন্ধ তো নেইই, উপরন্তু তার কানে এসেছে নিজে আর এট্টা বে করবে বলে তাল করেছে।

সোলেমানের নিজের মা নেই। তার যখন দু'বছর বয়স, তখন আর একটা ছেলে বিয়োতে

গিয়ে তার মা মরে যায়। তারপর তার বাপ আর একটা বিয়ে করেছে সেও অনেককাল হল। সেই মা'র চারটে ছেলেমেয়ে। তারাও দেখতে দেখতে সেয়ানা হয়ে উঠেছে। সেই মা তাকে আর তার বাপকে দিনরাত হদ্দমুদ্দ গাল পাড়ে। গালের চোটে তাদের ঘরের পাশের নিমগাছটা ইস্তক কাঁপতে থাকে। তাদের তিন্তিড়িপাড়ার লোকে বলে, জাঁহাবাজ মেয়েছেলে।

জাঁহাবাজ শব্দটা বেশ পছন্দ হয় সোলেমানের। এই মা'টার গলায় সত্যি যেন বাজ ডাকে। শরীরস্বাস্থ্যও খুব শক্তপোক্ত, চট করে মরবে বলে মনে হয় না। তবু তার বাপ্‌—

বাপের কল্‌জেয় অবিশ্যি বেশ জোর আছে। প্রায় লোহার মতো পেটানো চেহারা। বুকের ছাতি নয় তো একটা মাদার-গাছের গুঁড়ি। বুকের পাটাও বেশ শক্ত, নইলে অমন জাঁহাবাজ বৌ থাকতে কেউ আবার বিয়ের তাল করে!

সোলেমান এতদিন জানতো, বাপ্ মেয়ে খুঁজছে সোলেমানের জন্যেই। বাপ তাকে বলতো, যা তো সোলেমান, কাশিমের চরে, কার্তিকেরাঙি ধানের গোছাগুলো রুয়ে আয় তো, আমি এট্টা মেয়ে দেখে আসি। কখনও বলতো, যা তো সোলেমান, আনন্দবাবুর বাগানে খেজুরগাছগুলো ঝুড়ে আয় তো, আমি চক্‌মোল্লারপুরে এট্টা মেয়ে দেখে আসি। কখনও—

সোলেমান মনের হরুষে কাশিমের চরে ধান রুয়ে আসে, আনন্দবাবুর খেজুরবাগান ঝুড়ে তাতে নলি বসিয়ে আসে, পাটের ক্ষেতে নিড়েন দিয়ে সাফসুফ করে ফেলে। তখন তার হাত চলতো আখ্-মাড়াইএর কলের মতো। এক-এক বেলায় সিকিবিঘে, আধবিঘে জমি নিড়েন দিতে পিছপা হতো না। বাপ মেয়ে দেখে এলে ঠারেঠোরে খোঁজ-নিয়েও দেখেছে, কেমন মেয়ে, কেমনধারা সহবত্ তার—এইসব। বাপ্ কেবল ঠোঁট উল্টে বলতো, তেমন সুবিধের নয়।

সুবিধের নয় শুনে সোলেমানের মুখ শুকোত। তার পছন্দ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হবে মেয়েটা। বেশ ফোলা-ফোলা হবে গালদুটো। গায়ের রং তার মতো কালোকষ্টি না হয়ে একটু শামলা-শামলা হলেই ভালো হয়। আর কেবল ফিকফিক করে হাসবে। এমন দেখনহাসি মেয়েই তো তার ভারী পছন্দের।

কিছুক্ষণ সেই দেখনহাসি মেয়ের স্বপ্নে লীন হয়ে থাকে সোলেমান। যেন আস্‌মান থেকে এক চমৎকার ফেরেস্তা হয়ে নেমে আসে তার ভাবী বৌ। বিয়ের দিন কী অপরূপ সাজেই না সাজবে সেই সোন্দরপানা মেয়েটা। নাকে পরবে ফাঁদিনথ, দুল্‌দুল্ দুই ঝুমকো পরবে দু-কানে, কোমরে ঝকমক করবে মস্ত এক বিছেহার, পৈঁছি-গোট-হাঁসুলিতে হেসে উঠবে তার লোভন শরীর। সিঁথি থেকে নেমে আসবে চমৎকার সিঁথেপটিটি। আঙুলে আঙুল-চুটকি. বাহুতে তাগা-তাবিজ। আর ঝম্‌ঝম্ করে উঠবে দু'পায়ের মল।

লৌক্‌তায় কি কম সামগ্রী পাবে সোলেমান। মস্ত এক পিলসুজ পাবে। পাবে ডাবর, গোলাপদান। সঙ্গে থাকবে লোটা, জগ, ছিলিমচি, থাকবে বিছানা-বালিশ-মাদুর। এমন আরও কত কি!

আর সোলেমান ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, মাথায় টুপি, কানে আতর দিয়ে, সপ্ মাদুর ঘাড়ে করে তখন নামাজ পড়বে মন দিয়ে, তারপর নওশা বেশে সেজে—

ভাবতে ভাবতে সোলেমানের কানে ভেসে আসে সেই অমোঘ শব্দ — এজেন?

অর্থাৎ রাজি? এমন তিনবার এজেন হাঁক হবে, ওদিক থেকে সেই দেখনহাসি মেয়ে তখন ফিক ফিক করে হাসবে, আর ঘাড় নাড়বে তিনবার। হ্যাঁ, রাজি। রাজি, রাজিই তো। রাজি শুনে সোলেমানের সমস্ত শরীর জুড়ে নামবে শিহরণ। সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। তখন বরকে

কলেমা পড়ে শোনাবেন মাথায় উঁচু জালিটুপি পরা মৌলভীসাহেব। বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়বে সোলেমান, আর সেই অপরূপা ফেরেস্তার শরীরখানা চোখ বুজে ভাবতে থাকবে। ভাবতেই থাকবে কেবল, ভাবতে ভাবতে কেঁপে উঠবে হঠাৎ। তারপর বৌ নিয়ে ফিরবে বাহারি পাল্কিতে চড়ে, সে পাল্কির চারপাশে ঘিরে থাকবে ফুল-চড়ানি শাড়ি। এমন ভাবাভাবির মধ্যে কখন যেন চট্‌কা ভেঙে থে হয়ে বসে সোলেমান। তার বাপের আর কিছুতে মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না। বাপ্ যখন বলছে সুবিধের নয়, তখন কী আর করা! এখন শুধু অপিক্ষে। পছন্দসই মেয়ে না পেলে অপিক্ষে তো কবতেই হবে।

তা কাল বিহানবেলাতেও উঠে বাপ মৈনুদ্দি যখন বলল, ভালোপানা এট্টা মেয়ের খোঁজ পেয়েছি, খোকা, সুলতানপুরে। আমি সকাল-সকাল দুটো খেয়িদেয়ি মেয়ে দেখতি যাব। তুই চট্ করে গাঙের পাড়ের জমিনটুকুনি নাঙল দে আয় তো। দু-এক পশলা বাদ্‌লা হলি বীজতলা রুয়ে দেবানে। ও জমিন্‌টায় বাঁশফুলি ধান ভালো হয়।

শুনে সোলেমানের শরীর জুড়ে আহলাদের আর অন্ত ছিল না। সে গোয়াল থেকে হেলেগরুদুটো বার করে কাঁধে লাঙল ঝুলিয়ে রোদ ওঠার আগেই চলে গিয়েছিল গাঙপাড়ে। ইছামতীর জল তখন কানায়-কানায়। এমন পুরুনি তখন সোলেমানের মনেও। ভালোপানা মেয়েটা যদি বাপ পছন্দ করে আসে, তাহলে সামনের মাসেই—

মনের হুরুযে সোলেমান হৈ-চৈ করে গাঙ্‌পাড়ের জমিটুকুনিতে লাঙল দিতে থাকে। লাঙলের ফলায় জমির বুক চিরে দু'ফাল করে। গ্রীষ্মের দাবদাহে পাথর হয়ে ওঠা জমিও তখন সোলেমানের শক্তপোক্ত কল্‌জের চাপে ভেঙে চুরচুর হয়। তিনবেলার কাজ একবেলায় শেষ করে সে তখন ঘেমেনেয়ে একাকার। তবু সে কষ্ট যেন কষ্টই নয়। তার পাহাড়ের মতো শরীরের কাছে হৃষ্টপুষ্ট একটা মেয়ে দাঁড়ালে কেমন মানাবে সেই ভাবনাতেই তখন সে মশগুল।

বিকেলে তার বাপ্ ঘরে ফিরলে দ্যাখে কী, বাপের মনে আহলাদ আর ধরে না। সে আহলাদ তখন সোলেমানের শরীরেও। তক্ষুনি একবার গোটা পাড়ায় পাক্ দিয়ে আসতে বেরুল। কথাটা একবার কারও কাছে না বললে আমোদটা যেন ঠিক তারিয়ে ওঠা যায় না।

পাক দিতে বেরিয়েই তার সঙ্গে মস্‌জিদের সামনে দেখা হল গহরমিঞার সঙ্গে। গহরমিঞা বেশ রগড়ের মানুষ। ঈশ্বরীপুর গঞ্জে তার সাইকেল সারাইএর দোকান আছে। সোলেমান কখনও অব্‌সর পেলে পায়ে-পায়ে গঞ্জে গিয়ে গহরমিঞার দোকানে গিয়ে বসে থাকে দু'দন্ড। ভারী ফক্কুড়ে গপ্পো জানে গহরমিঞা। সাইকেলের লিক্ হয়ে যাওয়া টিউব সারাতে সারাতে, কিংবা টাল হয়ে যাওয়া হ্যান্ডেল ঠিক করতে করতে খদ্দেরদের কাছে সেইসব গপ্পো জমিয়ে বলতে থাকে গহরমিঞা, তাতে খদ্দেরদেরও সময়টা কাটে ভালো, গহরমিঞাও কাজে বেশ তাগদ পায় শরীরে। সেই গপ্পের টানে-টানে আরও মেলা খদ্দের জুটে যায় তার দোকানে। দোকানের একপাশে টুলে বসে থাকা সোলেমানের কানদুটোও ছুঁয়ে থাকে গহরমিঞা গলার আওয়াজের দিকে। কখনও কখনও সেসব গপ্পো শুনতে শুনতে তার শরীলটা কেমন শিরশির করে। গরম হয়ে ওঠে কানের লতি। সেই গহরমিঞার সঙ্গেই তিন্তিড়িপাড়ার মসজিদের কাছে দেখা হতেই মনের উল্লাস আর চেপে রাখতে পারলো না সোলেমান, বলল, শুনিছ গহরভাই, বাপ আজ সুলতানপুর গিইছিল—

গহরমিঞা তখন সবে ঈশ্বরীপুরের গঞ্জ থেকে ফিরে এসেছে ঘরে, কানে গুঁজে রাখা একটা আধপোড়া বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল, তাই নাকি? কিসির লগে?

সোলেমান হাসি-হাসি মুখে বলল, এট্রা মেয়ে দেখতি। বেশ ভালোপানা মেয়ে।

গহরমিএগ বিড়িতে ফুক্‌ফুক্ করে দুটো টান দিয়ে তার দিকে চোখ ছোট করে তাকায়, তাতে তোর কী?

এবার লজ্জা-লজ্জা মুখ করল সোলেমান, বাপ্ আমার শাদি দিবে এবার।

—ধুর, মেয়ে কি তোর জন্যি দেখতিছে নাকি! গহরমিএগ এককথায় নস্যাৎ করে দেয় সোলেমানকে, মৈনুদ্দি তো নিজিই আর এট্রা নিকে করবানে বলে মন করিছে।

সোলেমান একদম তাজ্জব। তার মুখে আর রা সরে না। ততক্ষণে তার সামনে একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেন তার বাপের মুখে অমনধারা আহ্লাদ দেখে এল। কেন বাপ তার মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে একদিনও শলা করে না। তার মুখখানা হাকুচ-তিতো হয়ে গেল তক্ষুনি।

বাড়ি ফিরতেই শুনল বাপের গলা, কাল ভোর-ভোর উঠি আনন্দবাবুর জমিনে নিড়েন দে আসবি, খোকা। বড্ড ঘাস হয়িছে ম্যাস্তা ক্ষেতটায়।

সোলেমান গুম হয়ে শোনে কথাগুলো, কিন্তু জবাব দিতে পারে না। ভোরে উঠে আনন্দবাবুর জমিনে নিড়েন দিতে হাত ওঠে না তার। কেবল কেবল থম্ মেরে যায় ম্যাস্তাক্ষেতে বসে। গলগল করে ঘাম গড়াতে থাকে তার শরীর বেয়ে। রোদের তাপে শরীর যেন ঝিমঝিম করছে। খানিক জিবেন নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ম্যাস্তা মাড়াতে মাড়াতে চলল সামনের গোলপাতায় ছাওয়া বাড়িটার দিকে, দাওয়ার কাছে গিয়ে বলল, এক গেলাস পানি দেবা?

ভোরের এই কুয়াশারং মুহূর্তটুকুই দিনের শ্রেষ্ঠ সময় বলে মনে হয় শঙ্খর। এ সময় কেমন অদ্ভুত মায়াবী হয়ে ওঠে সমস্ত পৃথিবী। মন ও শরীর জুড়ে কী এক অপরিসীম শুদ্ধতা। তারপর পুব আকাশে লালরং ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর এক আশ্চর্য উল্লাস।

তার ক্লাস সিক্সের দ্রুতপঠনের বইটি খুলে বেশ চেঁচিয়ে পড়ছিল শঙ্খ। পড়ছিল, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই...। ভোরের বেলা পড়ার বইএ কী চমৎকার নিবিষ্ট হয়ে যায় মন। তবু পড়তে পড়তে হঠাৎই আজ তার চোখ পড়ে যায় সামনের মাঠ-ক্ষেতের দিকে। একরাশ সবুজের ভেতর উঁবু হয়ে বসে ওপার গাঁয়ের সোলেমান নিড়েন দিচ্ছে।

শঙ্খদের বাড়ির ঠিক দক্ষিণে একবিঘের এই ফালি জমি। জমিটা আনন্দ চাটুজ্জের, কিন্তু চাষ করে মৈনুদ্দি। শীতের নরম দিনে সে জমিতে কখনও মসুর, কখনও সর্ষে, কখনও আলুর চাষ দেয়। যত জাঁকিয়ে পড়ে শীত, ততই ডাগরডোগর হয়ে ওঠে সে ক্ষেতের ফলন। সে বরং ভালো, কিন্তু বর্ষার সম-সম সময়ে মৈনুদ্দি পাট বুনে দেয় প্রতি বছর। এবারও লাঙলে জমির বুক ফেঁড়ে তার মধ্যে ম্যাস্তা পাট চাষ করেছে। বর্ষা হামলে পড়েনি এখনও, তবু এর

মধ্যেই দ্যাখ্ দ্যাখ্ করে হাঁটুসোর হয়ে উঠেছে পাটচারা।

সেই চারাগাছের ভেতর শরীর ডুবিয়ে ভোর থেকে নিড়েন দিতে এসেছে মৈনুদ্দি নয়,তারই জোয়ান ছেলে সোলেমান। অনেকক্ষণ নিড়েন দিতে দিতে হঠাৎ একলহমা সে উঠে দাঁড়ায়।

পুব-আকাশের লাল রং কেটে গিয়ে এখন জ্বলজ্বল করছে আস্ত একখানা সূর্য। তার ধবধবে আলোয় চকচক করে ওঠে সোলেমানের ঋজু পেশল শরীর। শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে সেদিকে দেখতে থাকে। সোলেমানের চোখদুটো কেমন উদাস উদাস।

পড়তে বসার আগে, ভোরের প্রথম বেলায়ই শঙ্খ একবার প্রতিদিনকার মতো চক্কর দিয়ে এসেছে পাটক্ষেতের আল বরাবর। সোলেমান নিড়েন হাতে নিয়ে তখন সবে ঢুকেছে জমিতে। কিন্তু তখন থেকে হাতে নিড়েন নিয়ে সে বসে আছে তো আছেই। কেন যেন নিড়েনে মন নেই তার। ক্রমে বেলা বেড়ে উঠেছে, ঘাম গড়াচ্ছে তার গা বেয়ে। রোদ্দুর উঠতে চিকচিক করছে সেই ঘাম। এখন নিড়েন হাতে দাঁড়িয়ে সেই ঘর্মাক্ত কালো পেটানো শরীর কী যেন অবাক হয়ে ভাবছে আরও দূরের মাঠক্ষেতের দিকে তাকিয়ে।

একমুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে শঙ্খ আবার মনোনিবেশ করে তার দ্রুতপঠনের বইতে। আজ ইস্কুলে যাওয়ার তাড়া নেই তার। হঠাৎই আজকের দিনটা তারা ছুটি পেয়ে গেছে। গতকাল তাদের ইস্কুলে ফাদার ডি'সুজা এসেছিলেন। তাদের ইস্কুলটা মিশনারি, এরকম হঠাৎ-হঠাৎ কলকাতা থেকে গাড়ি করে কোনও ফাদার এসেপড়েন এই ইস্কুলে। শাদারঙের লম্বা আলখাল্লা পরনে, কোমরে নীল কোমরবন্ধ, রিমলেশ সোনালি ফ্রেমের চশমায় ভারী চমৎকার দেখায় ফাদারদের। কেবল তাদের ক্লাসেই ঢুকেছিলেন ফাদার। দু-একটা প্রশ্নও করেছিলেন ইংরেজিতে। ক্লাসটিচার একলব্যবাবু তার বাংলা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন শঙ্খদের। প্রশ্নোত্তর শেষ হলে তারা সবাই মিলে একদিনের ছুটি প্রার্থনা করেছিল। এ কায়দাটা অবশ্য তাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন ক্লাসটিচারই। তারা সমস্বরে প্রার্থনা জানাতেই অল্পবয়স্ক ফাদার হেসে হাত নাড়লেন, ইয়েস গ্রান্টেড্। কেবল তাদের ক্লাস সিক্সের জন্যই। এমন পড়ে-পাওয়া ছুটি অবশ্য মাঝে মধ্যেই পেয়ে যায় তারা। তাই শঙ্খ সকাল থেকে একনাগাড়ে পড়ে যাচ্ছে তার দ্রুতপঠনের বইটি। সামনেই হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা—

ক্রমে সূর্য ঠিক মাথার উপর যায় যায়। রোদ্দুর ফিনিক দিয়ে আগুন ছোটাতে থাকে। শঙ্খ নজর করে দ্যাখে, সোলেমানের হাত যেন চলতেই চাইছে না আর। বারবার নিড়েন ফেলে জিরেন নিচ্ছে। উঠে দাঁড়াচ্ছে এক-একবার। কখনো ক্ষেতের পাশে আলের উপর বসে থাকছে হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পাটক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সোজা চলে এল গোলপাতায় ছাওয়া মেটে ঘরখানার দিকে। দাওয়ার উপর বই পেতে পড়তে থাকা শঙ্খর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, এক গেলাস পানি দেবা? বড্ড তেষ্টা পেইছে—

বেশ চেঁচিয়েই পড়ছিল শঙ্খ। যখন সে পড়ার মধ্যে থাকে, তখন বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার প্রায় সম্বিত থাকে না। হঠাৎ এক অন্যরকম গলার আওয়াজ পেতে বই-এর পাতা থেকে চোখ তুলে দেখল, সোলেমান। তার হাতে ধুলো-মাটি মাখা নিড়েনিটা, বাইরের রোদ্দুরের তাপে ঘেমেচুমে একশা। ঠিক নাকের ডগায় বড় একটা ঘামের ফোঁটা। কপালে, গালে সর্বত্র ঘামের স্রোত।

জল! শঙ্খ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, তুমি দাওয়ার উপর এই চাটাইতে বোসো সোলেমানদা, আমি জল নিয়ে আসি—

সোলেমানেরা থাকে তাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, তিন্তিড়িপাড়ার মোল্লার ঠেকে। শঙ্খদের বাস্তুর ঠিক পাশ বরাবর যে ছোট্ট খাল বয়ে গেছে পুব থেকে পশ্চিমমুখো, শঙ্খর ঠাকুর্দা সেই কবে যেন বলেছিলেন এটা মরাসোঁতা, সেই মরাসোঁতা পেরিয়ে মাইলটাক্ উত্তরে।

মোল্লার ঠেক সম্পর্কে শঙ্খর কোন ধারণাই থাকত না যদি না মৈনুদ্দি তাদের বাড়ির সামনের জমিনে চাষ দিতে আসত। তাদের ঈশ্বরীপুরে তবু একটা গঞ্জ আছে, অনেক লোকসমাগম হয় এখানকার হাটে, অনেক পাকা দালান আছে। কিন্তু সোলেমানদের গাঁয়ে নিতান্তই গরীব-গুর্বোদের বাস। কেবল গাঁয়ে ঢুকতে একখানা দোতলা দালান বাড়ি। সেটা আজিজ মিঞার। ঈশ্বরীপুর গঞ্জে ডাক্তারি করেন তিনি। কোয়াক্ ডাক্তার, তাতেই দোতলা বাহারি বাড়ি। রোজ সকাল বিকেল নতুন একখানা ঝকঝকে সাইকেলে গঞ্জে যাতায়াত করেন।

পুরো গাঁ-টাই মুসলমানদের বাস। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে শঙ্খ শুনতে পায় মোল্লার ঠেক থেকে ভেসে আসা আজানের সুর। মিঠেন হাওয়ার সঙ্গে আল্লা-হো-আকবর শুনতে ভারী অদ্ভুত লাগে তার। রোজ ভোরে আজান হয় গাঁয়ের মসজিদে। সোলেমানদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই মসজিদটা। মসজিদের ছোট্ট পাকাবাড়িটার ভেতর লালশালুতে ঘেরা থাকে এক পবিত্র থান। খুব ভোরে গাঁয়ের থুত্থুড়ে বুড়ো শাদাচুলের রহমান গাজী মসজিদে গিয়ে আজানের ডাক দেয়। এমন একদিনও যায় না যেদিন আজানের আওয়াজ যায়নি শঙ্খর কানে। ওই ডাক শুনেই নাকি ঘুম ভেঙে যায় গোটা মোল্লারঠেক গাঁয়ের।

ভাবতে ভাবতে শোয়ার ঘর পেরিয়ে বাড়ির পেছনদিকে এসে শঙ্খ দেখল, ঠাক্মার রান্না এতক্ষণে সারা। গোবর দিয়ে উনুনের চারপাশ রোজকার মতোই নিকোচ্ছেন। আপাতত বাড়িতে সে আর ঠাক্মা ছাড়া কেউই নেই। ঠাকুর্দা গেছেন বসিরহাট কোর্টে তাঁর মুহুরিগিরি করতে। কাকারা সব বাইরে। এমন একটা ছুটির দিনে খাঁ খাঁ বাড়িতে বেশ মজাই লাগে তার। ঠাক্মার চোখ এড়িয়ে দিব্যি লাগামহীন হয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে পারে আগানে বাগানে। কিন্তু সামনে পরীক্ষা বলেই যা অনাছিষ্টি। সে রান্নাঘরের দরজা ধরে ঝুঁকে পড়ে বলল, ঠাম্মা, সোলেমানদা জল চাইছে। ঠান্ডা জল দাও দিকিনি এক গেলাস—

—কে জল চাইছে বললি? উনুনে ন্যাতা বুলোতে বুলোতে ঠাকমা ঘুরে বসলেন।

—সোলেমানদা। ওই যে সামনের মাঠে নিড়েন দিচ্ছে।

—ও, ঠাক্মাকে একটু যেন বিপন্ন দেখায়। তাঁর কপালের কোঁচকানো চমড়ায় যেন আরও একটু কোঁচ পড়ে, তা কলে গেলে পারত তো। পাম্ করলিই তো হুড়হুড় করে জল পড়ে। এখন কীসে করে জল খেতি দি!

শঙ্খ আর দাঁড়াল না, কীসে করে দেবে আবার। গেলাসে করে দাও। শিগগির শিগগির নিয়ে এসো। যা ঘেমেছে না—

দাওয়ায় ফিরে এসে শঙ্খ দেখল, সোলেমান চাটাই-এর উপর বসে আছে, নীচে পা ঝুলিয়ে। ঘাড় নিচু করে পড়বার চেষ্টাকরছে তার দ্রুতপঠনের বইটা।

—তুমি এই বইটা পড়েছ, সোলেমানদা?

প্রশ্ন শুনে সোলেমানের চোখেমুখে লাজুক হাসি। বইএর পাতা থেকে চোখ তুলে বলল, পড়তে পারি নে তো। দু'কেলাস পজ্জন্ত পড়িছিলাম। অক্ষয় মাস্টারের পাঠশালে। তারপর বাপ আর পড়াল না। বলল, পড়ে কী হবে। চাষের কাজ কর্।

শঙ্খ লজ্জা পেয়ে যায়, কথা ঘোরাবার জন্য চলে গেল অন্য প্রসঙ্গে,আচ্ছা সোলেমানদা,

তোমরা এ জমিটায় পাট বোনো কেন বল তো। বাড়ির সামনেটায় কীরকম জঙ্গল হয়ে থাকে—

সোলেমান চোখ বড় বড় করে তাকায়, পাট বুনব না তো কী বুনব! পাটে যে খুব লাভ। টাকায় টাকা আনে। গাঁয়ের হাটে দ্যাখোনি? কত ফড়ে আর দালাল পাট কিনতি আসে হাটবারে।

দ্যাখেনি আবার শঙ্খ, খুব দেখেছে। ঈশ্বরীপুরের সোম-শুক্রর হাটে চারপাশে কত কত আড়তের সামনে পাটের গাঁটি পাহাড় হয়ে জমে থাকে। লরীর পর লরী ভর্তি হয় সেই গাঁটি সাজিয়ে. সাজিয়ে। সে লরী চলে যায় কলকাতা।

—কিন্তু সোলেমানদা, পাটে ভীষণ মশা হয় যে। সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসা যায় না মশার জন্য।

সোলেমানের কোন ভাবান্তর হয় না, বলল, তোমাদের বাড়ির তবু একদিকি পাট, আর আমাদেব ঘরেব তিনদিকি পাট। মশা নয় তো এক-একখান ডাঁশ। ধরলি আর ছাড়তি চায় না।

শঙ্খ সোলেমানের গা-হাত-পায়ের দিকে তাকায়। তার কালো তেলালো গায়ে-পিঠে কোথাও মশাব কামড়ের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে বলে, কই, মশার কামড়ের দাগ হয়নি তো। এই দ্যাখো, আমার কনুই-এর কাছটায় কেমন লাল-লাল বুটি। রাতে মশারির গায়ে হাত লেগে গিয়ে—

সোলেমানেব চোখে কৌতূহল, লাজুক হেসে নিরীক্ষণ করে শঙ্খর গা, বলে,—তোমার রাঙাপানা গা বলে অমন দাগ দেখা যায়। আমার তো কালোকষ্টি শরীল, তারপর রোদে পুড়ে চামড়া এমন ভাজা-ভাজা হয়ি গেছে যে মশা কি ডাঁশ হুল বসাতিই পারে না, হুল ভেঙে যায়।

শঙ্খ সোলেমানের ঘাম-চকচকে শরীরটার দিকে তাকায়। তার চোখেমুখে কিছুটা বিস্ময় কিছু কৌতুকও, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই সোলেমান একটা হাই তুলে বলল, কই, পানি দেলে না তো?

মশার গল্পে ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল শঙ্খ, ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় সে, একদৌড়ে চলে গেল ভেতরে। সত্যিই তো, ঠাক্‌মাকে সেই কখন বলে এসেছে এক গেলাস জল দেবার জন্য, আর ঠাক্‌মা কিনা—,খুব রাগ হয়ে গেল তার ঠাক্‌মার উপর। রান্নাঘরে ঢুকে দ্যাখে, ঠাকমা সেখানে নেই। পাশের কামরার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে কী যেন আঁতিপাতি করে খুঁজছেন। একবার কুলুঙ্গিতে, একবার তক্তপোষের নীচে, একবার ঘরের কোণে তন্নতন্ন হাঁটকে দেখছেন। কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন কে জানে। তর সইতে না পেরে বলল, কই ঠাম্মা, জল চেয়ে গেলাম যে—

ঠাক্‌মা পেছন ফিরে বললেন, জল তো দেব, কীসে করে দিই তাই তো ভেবে পাচ্ছিনে।

—কীসে করে মানে? গেলাসে করে দেবে—, শঙ্খ অবাক হয়ে যায়।

ঠাক্‌মা তখনো খুঁজে চলেছেন, গেলাসই তো খুঁজে পাচ্ছিনে। কোন্ পাত্তরে করে যে দিই—

—কেন, রান্নাঘরে কত তো গেলাস রয়েছে। দাঁড়াও আমিই পুরে নিচ্ছি।

শঙ্খ রান্নাঘরে যাবার উদ্যোগ করতেই ঠাকমা প্রায় হামড়ে পড়লেন, দাঁড়া দাঁড়া, আমাদের গেলাসে জল দেব কী করে। ওরা তো অন্য জাত—

ঠাক্‌মার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল শঙ্খ, তারপর স্তম্ভিতের

মতো। বলল, তাতে কী হয়েছে?

—ও তুই বুঝবি নে। দাঁড়া, আর বচ্ছর তোর ঠাকুর্দার সঙ্গে একজন ওদের জাতের লোক এয়েছিল। তাকে একটা ঘটিতে করে জল দিইছিলাম। সেই ঘটিটা খুঁজে পেলে—। কোথায় রেখিছিলাম, খুঁজে পাচ্ছি নে। বোধ হয় চৌকির নীচে—। তুই যা, আমি দিচ্ছি।

খানিক ইতস্তত করে শঙ্খ ফের চলে এল বাইরে, তার ভেতরে তখন আবর্তিত হচ্ছে একটা দোলায়িত রহস্য। মৈনুদ্দিকে সে দেখে আসছে তার জন্মাবধি। এই ক্ষেতেই তার দিনমানের অনেকখানি সময় কাটে। সোলেমানও তার সঙ্গে প্রায়ই আসে। কখনও একাও। যেমন আজ এসেছে। শঙ্খ কত গল্প জুড়েছে, কখনও মৈনুদ্দি কখনও সোলেমানের সঙ্গে।

সোলেমান তখন তার হাতের নিড়ানিটা দিয়ে মুখ নিচু করে চেষ্টা করছিল বাঁ হাতের নখগুলো কাটবার। তার হাত ও পায়ের আঙুলে বড় বড় নখ। ক'দিন আগে রাতে ঘুমের ঘোরে বাঁ পা দিয়ে তার ডান পায়ের গোড়ালি চুলকোবার সময় এই এত্তখানি ছুলে গিয়েছে। ছোলা জায়গাটা বেশ ফুলেও ছিল। কয়েকদিন দপ্‌দপ্ করেছিল। তারপর কীভবে যেন আপনা আপনি সেরে গিয়েছে।

শঙ্খকে ঘরের ভেতর থেকে দাওয়ায় বেরুতে দেখে সে উৎসুক হয়ে তার হাতের দিকে তাকায়। শঙ্খর দু'হাত খালি, জল নেই দেখে হতাশ হয়ে আবার নিড়ানি দিয়ে খুঁড়তে লাগল নখের গোড়া।

শঙ্খ ভয়ত্রস্ত হয়ে বলল, ওটা কী করছ সোলেমানদা, নখ উপড়ে আসবে যে—

সোলেমান শুকনোমুখে হাসল, নাহ্ নখগুলো বড্ড বেয়াড়া ধরনের হয়ে গিইছে। পাথুরে-নখ, নরুনে শানায় না।

বলতে বলতে হঠাৎ নিড়ানির ডগাটা পিঠের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘস্‌ঘস্ করে চুলকোতে শুরু করল। এমন জোরে ঘষছে যে মনে হচ্ছে ছাল-চামড়া সব খুব্‌লে তুলে নিয়ে আসবে। শঙ্খ সভয়ে সেদিকে তাকায়। একটু আগেই সোলেমান বলেছে, তার চামড়া রোদে পুড়ে ভাজা-ভাজা হয়ে গেছে। মশা কি ডাঁশ কিছুই সেঁধাতে পারে না তার চামড়ায়। হয়তো অমন শক্তপোক্ত চামড়ায় নিড়ানিও তার দাঁত ফোটাতে পারবে না, তবু কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় শঙ্খ একা একা কেঁপে ওঠে।

পিঠ ছুব্‌লোতে ছুব্‌লোতে সোলেমান হঠাৎ বলল, তুমি যে বলছিলে না, পাটে বড্ড মশা হয়, এবার আর হবে না।

শঙ্খ ভুরু কুঁচকোয়, সোলেমানের কথায় তার প্রত্যয় জন্মায় না, বলল, হবে না! কেন?

—বললাম, হবে না, দেখে নিও—

—কেন, এর মধ্যেই তো দু-চারটে চুঁটকে মশা হয়েছে। সন্ধেবেলা পড়তে বসলেই ভোঁ ভোঁ করে ওড়ে। সবে তো হাঁটুতক চারা, তাতেই যা জ্বালাচ্ছে—

সোলেমান চোখে কেমন এক ধরনের অদ্ভুত ভঙ্গি করে, এবারে আর পাটই হবে না, তো মশা।

শঙ্খ চোখ বিস্ফারিত করে, পাট হবে না? সেকি, কেন!

—দেখছ না বাদ্‌লা নেই আস্‌মানে। জল না পেলি পাটের বাড়ন হবে ক্যাম্‌নে? তাছাড়া, বাপ্ আমারে বলেছে নিড়েন দিতি। এবারে ভর্‌সা করি আছে আমার উপর। তা আম্মো নিড়েন দিতিছি সের'ম। যেমনকে ঘাস তেমনি রয়ি যাতিছে।

পাট হবে না শুনে শঙ্খর ভেতরে এক ধরনের উল্লাস হয়। মশার দাপট থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে অন্তত তিন চার মাস। সে একরকম মন্দ নয়। কিন্তু—

হঠাৎ এক অন্যরকমের ভাবনাও তাকে পেয়ে বসে। এক মানুষ সমান পাট হলে তার ভেতর সহসা লুকিয়ে পড়া যায় ছুটির দিনে। দিব্যি চোর-পুলিশ খেলা যায়। পাশের বাড়ির উমনো, ঝুমনো, টুপুর কিংবা পল্টনের সঙ্গে পাটবনে লুকিয়ে পড়ে টু-উ-উ, টু-উ-কিং। কে জানে, পাটবনের কোন দুরূহ কোণে বসে লুকিয়ে আছে কোনজন। সে এক ভারী মজার খেলা। পাট বড় না হলে এবছর তো আর—

শঙ্খর মনে সহসা আর এক প্রশ্ন ঘাই দিয়ে ওঠে, কেন, নিড়েন দিচ্ছ না কেন?

হঠাৎ উদাস হয়ে যায় সোলেমান, ফিনিক দেয়া রোদ্দুরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, তার দু'চোখে চিকচিক করে ওঠে বিষণ্ণতা, বলে, বাপ্ আরেট্টা বে করবে ব-অ-ল্‌ছে।

শঙ্খর শরীর মুহূর্তে টাল খেয়ে যায়। সে জানে, সোলেমানের নিজের মা না থাকলেও তার এক সৎ মা আছে বাড়িতে। খুব নাকি মুখরা। সারাক্ষণ বাড়িতে চিল-চিৎকার। মায়ের গাল খেয়ে সোলেমান প্রায়ই বাড়ি ফেরে না। এখানে ওখানে রাত কাটায়, তার উপর যদি আর একটা মা ঘরে আসে—

কথা বলতে বলতে সোলেমান বার দুই জিব দিয়ে ভিজিয়ে নেয় তার ঠোঁট। শঙ্খ বেশ বুঝতে পরে, সোলেমানের ঠোঁট, গলা, শরীর সব কাঠ হয়ে আছে শুকিয়ে। এবার আব মুখে কিছু বলল না, কিন্তু স্পষ্টতই সে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে তেষ্টায়। তার সেই কষ্ট অনুভব করে শঙ্খ নীল হয়ে যায়। বিবর্ণমুখে সে উঠে দাঁড়ায় আবার। দ্রুত ছুটে যায় রান্নাঘরের দিকে, উষ্মা মিশিয়ে বলে, কই ঠাম্মা, জল দিলে না। সেই ক-খন জল চেয়েছে—

ঠাক্‌মার হাতে তখন টোল খাওয়া একটা পুরানো ঘটি। সেই কবে থেকে ঘরের কুলুঙ্গি তে পড়ে ছিল অবহেলায়, এতদিন পরে আবার প্রয়োজন পড়েছে তার। ঠাক্‌মা বারবার জল দিয়ে ধোয়ার চেষ্টা করছেন। এতকাল অচ্ছুত হয়ে থাকার ফলে ধুলো জমে গেছে তার ভেতরে-বাইরে। অনেকক্ষণ ধুয়েও তাই ঠাক্‌মার মন উঠছে না। শঙ্খকে দেখে বললেন, একটু মাজতে পারলে ভালো হতো।

ভেতরে ভেতরে শঙ্খ তখন ভীষণ আহত। সামান্য তেষ্টার জল, তাও ভরে দিতে কেন যে এত দেরি হয়। হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠে বলে, এ ঘটি তো কত কালের পুরোনো, গেলাসে করে দাও না। আমার গেলাসটা এনে দেব?

ঠাক্‌মা প্রায় আঁতকে উঠে বলেন, না, না, তোর গেলাসটা তাহলে এঁটো হয়ে যাবে যে। এই ঘটিটা তো প্রায় নতুনই। হাত থেকে পড়ে গিয়ে তুব্‌ড়ে গিয়েছে এই যা। তুই গিয়ে বোস। আমি নিয়ে যাচ্ছি—

অবাক হয়ে ঠাকমার মুখের দিকে শঙ্খ তাকিয়ে থাকে। আবার খালি হাতে তাকে দাওয়ায় ফিরে যেতে হবে। কথাটা ভাবতেই তার শরীরের ভেতব রি রি করে ওঠে এক বিপন্নতাবোধ। ফিরে গেলেই তো সোলেমান এক আকাশ প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে তাকাবে। তার হাত শূন্য দেখে আবারও জিব দিয়ে ভেজাতে থাকবে শুকনো ঠোঁট। ম্লান হয়ে যাবে খরায় ক্লান্ত তার মুখখানি। অথচ খুবই সামান্য ব্যাপার, সেই সামান্যটুকু ঠাক্‌মা কী অবলীলায় অ-সামান্য করে তুলেছেন তাঁর দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব মিশিয়ে। অথচ এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের কোন কিছুই বুঝতে পারে না শঙ্খ। তারা যখন ইস্কুলের টিউকলে জল খেতে যায় তখন তো সেখানে একটাই গেলাস থাকে। সেই একই গেলাসে করে টিউকলে জল খায় সে কিংবা হারুণ, অশোক অথবা রশীদ। কই,

তখন তো গেলাস এঁটো হয় না—

এই বিচিত্র টানাপোড়েনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শঙ্খর শরীরে বিস্ময় ভরে আসে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় আর এক অদ্ভুত দৃশ্যের কথা। এমনই একটি ঘটনার মুখোমুখি হয়ে সেদিনও সে বোধ করেছিল এরকম বিপন্নতা। মোল্লার ঠেক গাঁ থেকে সেদিন দুপুর করে সে ফিরে আসছিল তাদের বাড়ির দিকে। পথে টিউকল পেতে হঠাৎ পিপাসা পেয়ে যায় খুব। টিউকলে তখন পাম্প দিয়ে জল ভরছে সে গাঁয়ের কোনও বৌ। কলসিতে জল ভরে উঠতেই শঙ্খ উঠে দাঁড়ায় টিউকলের চাতালের ওপর। আর—

আর তৎক্ষণাৎ বৌটি কর্কশভাবে বলে উঠেছিল, দিলে তো জলটা নষ্ট করে?

শঙ্খ কিন্তু বুঝতেই পারেনি কী ভাবে নষ্ট হয়ে গেল তার জল। সে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যাল করে। বৌটি বলে চলেছে তখনো, এখনও তো কলতলা থেকে নামিনি আমি. তার আগেই চাতালে উঠে পড়লে যে বড়ো? হিঁদুর ছেলে না তুমি? নামো,নামো শিগগির—

শঙ্খ নেমে দাঁড়াতেই সে তার ভরা কলসের জল উল্টে ফেলে দেয় হুড়মুড় করে। পাম্প করে ফের জল ভরে নেয়। কলসি কাঁখে তুলে শঙ্খর বিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সে আবারও ছুড়ে দেয় তার ভৎর্সনার চোখ। তারপর হনহন করে হাঁটা দেয় ঘরের দিকে।

হতভম্ব হয়ে সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল শঙ্খ। তার ছায়াটুকুও তো পড়েনি কলসির ওপর, তবুও বউটি কেন যে এমন অদ্ভুত ব্যবহার করেছিল তা বুঝতে পারেনি সেদিন। আজ যেন তা একটু একটু অনুভব করতে পারছে। ঠাক্‌মার এই দুর্বোধ্য আচরণের মুখোমুখি হয়ে সে বুঝতে পারছে, সেদিনকার বিপন্নতার সঙ্গে আজকের এই বিপন্ন সময়ের কোথাও একটা মিল আছে। অনেক গভীরে তার শিকড়। এই শিকড় কিভাবে টেনে তোলা যাবে তা সে বুঝতে পারে না।

ততক্ষণে ঘটি মেজেঘষে পরিষ্কার করে তাতে জল ভরে দিয়েছেন ঠাক্‌মা, যা, দিয়ে আয়—

জলভরা ঘটিটা শঙ্খ হাতে নেয়, সেই অদ্ভুত বিপন্ন সময়ের ভেতর দিয়ে সে পার হয়ে আসে ঘর, ঘর পেরিয়ে দাওয়ায়। কিন্তু ততক্ষণে খাঁ খাঁ করছে দাওয়া। একটু আগেও সোলেমান বসেছিল সেখানে, এখন নেই। ততক্ষণে সে তার নিড়ানি হাতে নিয়ে ফিরে যাচ্ছে ক্ষেতের দিকে। তার হাঁটার গতি শ্লথ, যেন চলতেই পারছে না। খরায় তেষ্টায় টা টা করতে থাকা তার শরীরটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অনড় হয়ে গেল শঙ্খর পা। হাতে ঘটি ভরা জল নিয়ে সে ডাক দিল, সোলেমানদা, শোনো—

কিন্তু সোলেমান শুনতেই পেল না।

ডা-ডা দুপুর রোদ মাথায় করে সোলেমান পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়াল খানিকদূরের কলতলায়। নতুন টিউকলটা এ পাড়ায় হয়েছে মাসছয়েক। এর আগে চাটুজ্জেপাড়া থেকে কাঁখে করে বয়ে নিয়ে আসতে হতো খাবার জল। সে অনেকটা হাঁটাপথ। কলসির ভারে নুয়ে পড়ত এ পাড়ার মেয়ে-বৌরা। টিউকলটা হতে তাই ভারী সুবিধে হয়েছে নতুন পত্তনীদের।

কিন্তু সেখানেও সোলেমানের জলখাওয়ার সুবিধে হল না। তার আলটাগ্রা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে এখন। হাত-পা ইস্তক সেঁধিয়ে যেতে চাইছে পেটের ভেতর। টিউকলের গোড়ায় গিয়ে দেখল, জেলেপাড়ার এক আধাফর্সা মেয়ে পাম্ করে করে উপুড়ঝুপুড় চান করছে। আর চান করছে তো করছেই। তার গা উদোম। সবুজ ডুরেশাড়িখান বুকের ওপর দিয়ে পেঁচিয়ে গাছ-কোমর করে বাঁধা। ততে তার বুকদুটো বেঢপভাবে উঁচু হয়ে রয়েছে। খোঁপা ভেঙে পিঠে খসে পড়েছে তার চুলের রাশ। দুপুর-রোদের তাতে গায়ের জ্বালা জুড়োতে সে পাম করেই যাচ্ছে ক্রমাগত। সোলেমান একগলা তেষ্টা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে কলের গোড়ায় তাতেও তার হুঁশ ফিরল না।

আকাশে এমন কড়া তাত যে তাতে মাথা-গা-হাত-পা ভাজা-ভাজা হওয়ার জোগাড়। এখান থেকে নদীর কিনার ক'রশিই বা আর হবে। গাঁয়ের মেয়েছেলেরা কত সময়ই তো গাঙের জলে গা জুড়িয়ে চান করে আসে। নদীতে গা ডুবোলে কত্ব আরাম। কিন্তু জেলে পাড়ার মেয়ে টগরের যেন তাতে টান নেই। নতুন টিউকলে পাম করে হাত ব্যথা করে ফেলছে। কলের মুখ ডান-হাত দিয়ে চেপে বাঁ-হাতে পাম করে জল ছাপিয়ে গেলেই বসে পড়ছে কলের মুখটার নীচে। আর হুডুস হুডুস করে জলে ভিজে যাচ্ছে তার গা। এক-একবার জলে ভেজে, আর মুখে আরামের শব্দ, আহ্।

এমন কতক্ষণ আরাম করে চান করার পর টগরের বোধহয় হুঁশ ফেরে, সোলেমান নিড়েন হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাতাল থেকে খানিক দূরে। কালো গুঁট চেহারার সোলেমানকে টগর চেনে। মৈনুদ্দির ছেলে সোলেমানকে সে ছোটকাল থেকেই দেখছে। এই সেদিন ছোট্টপানা ছিল, এখন ছট্ করে কখন যেন বড় হয়ে গেছে. সে হয়তোবা টগরেরই বয়সী। টগর নিজেও যে এরমধ্যে ডাগর হয়ে উঠেছে, বাড়-বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে তার শরীর, সে খেয়াল তার নেই। হঠাৎ একলহমা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, কী রে, সোলেমান, হাত-পা ধুবি নাকি?

সোলেমান একবুক তেষ্টা নিয়ে তাকিয়ে ছিল জলে ভেজা টগরের পুরুষ্ট শরীরটার দিকে, ঘাড় নেড়ে বলল, না, খাব।

—তালি এট্টু দাঁড়া।

বলে টগর আবার তার ডাঁটালো হাতে ঝপ্ঝপ্ করে কলের ডাঁটি ধরে পাম্ করে। পাম্প করতে করতে জলে ভরে উঠলে আবার ঝুপ করে বসে পড়ে কলের মুখটার নীচে। জলে ভিজে উপুড়ঝুপুড় হয়। তারপর আবার উঠে দাঁড়িয়ে পাম্ করতে থাকে।

রোদে পুড়তে পুড়তে সোলেমান তার হাতের নিড়েন দিয়ে ঘস্ঘস্ করে পিঠ চুলকোতে থাকে। পিঠ চুলকোনোর একট অদ্ভুত আরাম আছে এমন মনে হয় তার। আধাফর্সা টগরের উদোম গা-পিঠ দেখতে-দেখতে সে হঠাৎ চোখদুটো উদাসীন করে ফেলে। মেয়েদের গা কী সোন্দর করে গড়ে তোলেন খোদাতাল্লা। তার তো কতদিনের ইচ্ছে এমন একটা মেয়েকে বে করতে। খুব কাছে পেতে তাকে। তার বাপ তাকে বে দেবে বলে কতদিন ধরে কেবল

ঘোরাচ্ছে। এখন তার বিয়ে না দিয়ে বাপ নিজেই যদি আর একটা বিয়ে করে নেয়, তা'লে সোলেমানের কপাল ফোঁপরা। তাদের মোল্লার ঠেকের দামড়া ছেলে কাশেম ক'দিন আগেই নিকে করে নিয়ে এসেছে কচি-কচি চেহারার একটা মেয়েকে। খুব ধুমধাম করে নিকে হয়েছে তার। সে বিয়ের ভোজে সোলেমানও গিয়েছিল। ভোজের চেয়েও তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল কাশেমের কচি-বৌটার চটক। বেশ শামলা রং। কেমন-কেমন একটা চাউনি তার দু'চোখ জুড়ে। কিন্তু দেখনহাসি নয়। সোলেমানের আবার ভারি পছন্দ দেখনহাসি। কশেমের কচি-বৌটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে তখন ভাবছিল, অমন কচি-মেয়ে দেখন-হাসি হবেই বা কি করে। কাশেমের বয়স তো প্রায় তিরিশ হতে চলল। এর আগে সে আর একটা বে করেছিল। তাকে দু'বছরের ভেতর তালাক্ দিয়েছে। তালাক-দেয়া এহেন দামড়া বরকে কি আর চোদ্দ-পনের বছরের কচি-বৌএর মনে ধরে!হ্যাঁ, যদি সে হতো সোলেমানের বৌ, তাহলে নির্ঘাত মনে ধরত তাকে।

কাশেমের বিয়ের পর কতদিন সোলেমান তার বৌটাকে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখেছে। কখনও তাদের রাংচিতা গাছের বেড়ার ফাঁকে ধান শুকুতে, কখনও চুলের রাশ পিঠের ওপর এলিয়ে চুল আঁচড়াতে, কখনও উঠোনে খেজুরপাতার চাটই বিছিয়ে একা বসে পান চিবুতে।

শামলারঙের মেয়েটির দীঘল গড়ন, আয়ত চোখ, ডিমের মতো লম্বাটে মুখ, তার শরীরভরা যৌবন দেখতে দেখতে সোলেমানের শরীরে এক আশ্চর্য শিহর জেগে ওঠে। সাবাক্ষণ তার চোখের সামনে চল্‌কে ওঠে সেই ফেরেস্তার রূপ। বেহেস্ত্ থেকে আসা এক রহস্যময় পরীই যেন সে। এখন টগরের চান করা দেখতে দেখতে তার রোমকূপ জুড়ে তেমনি শিহর।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদের ভেতর সম্বিতবিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে সোলেমানের মনে হয়, তার টাগ্‌রায় এখন যেন তেমন পিপাসা আর নেই। তার রক্তের ভেতর এখন এক কেশর-অলা ঘোড়ার হাজার দাপানি। বুকের ভেতর সেই পেশল ঘোড়ার একনাগাড় খুরের শব্দ জেগে উঠছে। খট্ খট্ খট্ খট্ খট্ খট্। সে ক্রমশ উধাও হয়ে যাচ্ছে টগরের ফর্সা শরীরের ভেতর। অপলক চেয়ে দেখছে, খোদাতালার এক অপরূপ সৃষ্টি। টগরের শরীর থেকে ক্রমশ তার স্বপ্নিল চোখ ধাবমান হয় কাশেমভায়ের কচি বৌটার শরীরে। রাতের আঁধারে, বিছানায় একলা-একা শুয়ে সে কতবার কাশেমভায়ের বৌএর কথা ভেবেছে। ভাবতে ভাবতে ছটফটানি জেগেছে। কচি দীঘল বৌটা অবশ্য টগরের মতো ফর্সা নয়। আসলে তাদের মোল্লার ঠেকে ফর্সা মেয়ের তেমন চল নেই। যা এক ফর্সা আছে, ওই আজিজডাক্তারের মেয়ে। তাদের তিন্তিড়িপাড়ায় সবচেয়ে বড় দোতলা বাড়িটা যার সেই আজিজডাক্তারের মেয়ে শিরিনের গা যেমন ফর্সা তেমনি চোখদুটো কটা। চোখ কটা বলেই তাকে পাড়ার লোকে মেমবিবি বলে ডাকে। বাদবাকি সব মেয়েই হয় কালোকিষ্টি, নয় শামলা-শামলা।

এমন একটা শামলামেয়ের জন্যেই তো সোলেমানের বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। যেদিন মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে গহরমিঞা তাকে বলল, 'মেয়ে কি আর তোর জন্যি দেখছে মৈনুদ্দি, ও তো নিজিই আর এট্টা বে করার তালে আছে,' সেদিন থেকেই সোলেমানের ভেতরটা এমন মরুভূঁই, মরাসোঁতার জল সারভাঁটায় যেমন হয়ে যায় তেমনি ডা-ডা। কখনও কাশেমভায়ের কচিবৌটাকে লুকিয়েচুরিয়ে দেখে সে তার এহেন তেষ্টা মেটায়। এখন যেমন টগরের ডাগর শরীরখানা দেখে তার টাগ্‌রাভর প্রবল পিপাসা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

আসলে তেষ্টা শুধু শরীরের হয় না, মনেরও হয়। উদোম গায়ে টগরকে চান করতে দেখে

আশ্চর্য হয়ে সোলেমান অনুভব করে, এতক্ষণ যে একগলা তেষ্টা নিয়ে সে গিয়েছিল শঙ্খদের বাড়ি, যে তেষ্টা নিয়ে সে ডা-ডা রোদে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন পত্তনীদের কলতলায়, এখন সেই তেষ্টা যেন আর নেই। এখন তার শরীরে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে একটা ঠান্ডা প্রবাহ। ইছামতীর নদীর জলে গা ডুবোলে যেমন অনুভব করে, হঠাৎ বাদ্‌লা এলে তার ঝিরঝিরে ফোঁটার ভেতর দিয়ে হেঁটে গেলে যেমনটি মনে হয়, ভাসানবিলের চর বর্ষায় ডুবে গেলে তার ভেতর একউরত জলে দাঁড়িয়ে ধান কাঁটতে গেলে যেরকম লাগে, এখন যেন ঠিক তেমনটি। এখন তার আর যেন খাবার জলের দরকার নেই। সে এই মুহূর্তে ভাসানবিলের জলে গা ডুবিয়ে সাঁত্‌রে পার হয়ে যাচ্ছে এক কিনার থেকে অন্য কিনারে।

ততক্ষণে টিউকলের চাতাল ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে টগর। তার চোখমুখ স্নানের হুল্লোড়ে পরিতৃপ্ত। সুখী-সুখী দেখাচ্ছে তার শরীরটা। পিঠের ওপর ভেঙে পড়া ভিজে চুল দু-হাত তুলে গুছিয়ে খোঁপা বেঁধে নিচ্ছে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে। তারপর খোলা গা ভিজে কাপড় দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে বলল, নে, জল খেয়ে নে সোলেমান।

সোলেমান অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল, যেন তার আর জল খাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবু নিড়েনখান মাটিতে শুইতে রেখে সে এগিয়ে গেল টিউকলের দিকে, কলের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে পাম করে করে উপছিয়ে তুলল নরম, ঠান্ডা জল। তারপর কলের মুখের কাছে তার মুখ নিয়ে গিয়ে আশ মিটিয়ে জল খেতে শুরু করল। জল নয়, হয়তো টগরের কিংবা কাশেমভায়ের কচি বৌটার শরীরখানাই।

শঙ্খদের বাড়ির জলের চেয়ে এ জল যেন ঢের মিঠে।
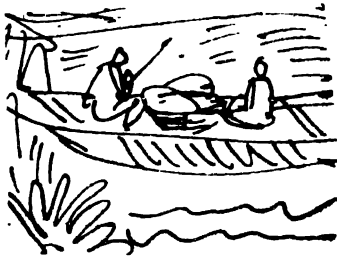
আনন্দ চাটুজ্জের মস্ত তিনতলা বাড়ির সামনে যে ছোট্ট একটুকরো সবুজ মাঠ, তাতে খেলতে এসে আজ তার সবুজ রং দেখে মোহিত হয়ে গেল শঙ্খ। মাঠ নয় তো, সবুজরঙের ভেলভেটই যেনবা। বর্ষার জল লেগে বোধহয় আরও সবুজ হয়ে উঠেছে.

আসলে রঙের ব্যাপারটাই শঙ্খর মনে বরাবর দাগ কেটে যায়। কোনও দিন খুব ভোরে উঠে পুবদিগন্তে লাল টকটকে আবির ছড়িয়ে পড়ার দৃশ্য লক্ষ করে সে। চমৎকার সূর্যোদয় দেখতে দেখতেই তার জীবনের রং শুরু হয়। তারপর সেই লাল আবির কোন্ অলীক মুহূর্তে হঠাৎ সোনালি রং ধারণ করে সেটাই সে পরম আগ্রহে দেখতে চেষ্টা করে। সে দেখাটা খুব সহজ নয়, তবু তার উৎসুক চোখ সেই আশ্চর্য ভোরবেলায় তাকিয়ে থাকে ইছামতীর ওপর চিতিয়ে থাকা নীল আকাশটার দিকে। নদীতে ভর জোয়ার থাকলে মনে হয়, নদীর জল থেকেই লাফিয়ে উঠল সূর্যটা। ভাঁটা হলে অবশ্য অন্যরকম। তখন নদীর ওপারে চিংড়িপোতার ভেড়ি. তার পেছনে সবুজ গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সুয্যিদবকে উঁকি মারতে দেখা যায়। ভেড়ির ওপারে কিছু বাঁশঝাড় থে হয়ে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি করে রেখেছে এক অপার রহস্যের।

চিংড়িপোতা গাঁয়ে ঢুকতেই মেটেপথের দুপাশে দু'দুটো অশথগাছ। তারা শতেক ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের পাহারাদার হয়ে। যে-কেউই গাঁয়ে ঢুকতে যাক না কেন, ঝুঁকে পড়া ঝুরির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে মাথা নিচু করে তবে ঢুকতে হবে চিংড়িপোতায়। চিংড়িপোতা পেরিয়ে নাচিন্দা, কুসুমপুর, মাচদহ—এই পুরো তল্লাটেরই তো অশথগাছদুটো হল গেট।

নদী আর গাঁয়ের মাঝখানে, চিংড়িপোতা যাওয়ার গোটা পথের ডানদিক জুড়ে যে মস্ত ভেড়ি সেটা নাচিন্দার শিখরবাবুর। শিখরবাবুর মতোই বড়মাপের ভেড়ি। তাতে কাচের মতো স্বচ্ছজল। সেই জলার মাঝখানে বাঁশের চার-চারটে পা। সেই চার পায়ের ওপর বাঁশেব একটা মাচান, মাচানের ওপর খড়ে ছাওয়া ছোট্ট টঙের ভেতর একা-একা বাস করে অবনবুড়ো। কী ভাবে এহেন নির্জনে থাকে তা ভেবে পায় না শঙ্খ। শুধু জানে বুড়োমানুষটার বয়সের কোনও গাছপাথর নেই। একা-একা চৌকি দেয় মস্ত জলাটা। জলার ভেতর ঘাই মারে এক-একখানা প্রমাণসাইজের ভাঙন কি ভেটকি, ইয়াবড় ট্যাংরা কিংবা কালবোস। কখনও গলদা-বাগ্‌দাও। কুচোমাছও কিছু কম যায় না।

অবনবুড়ো ভারী রগড়ের মানুষ। কেবল আঙুলের কড় গোনে, আর বিড়বিড় করে কী যেন বলে। কখনও আকাশের নীল শামিয়ানার দিকে আঙুল ছুড়ে দেয়। যেন খোঁচা দিয়ে ছিঁড়ে দেবে অতবড় দিগন্তবিস্তৃত নীল শামিয়ানাটা।

অবনবুড়ো কে, তা একদিন কালোমানিককে জিজ্ঞাসা করেছিল। কালোমানিক হেসে ঠোঁট ওল্টায়, কি জানি, কে। তারপর ওপরদিকে অবনবুড়োর মতো আঙুল ছোড়ে, ওই যে, উনি।

ওপরে নীল আকাশ। শঙ্খ ওপরের দিকে তাকিয়ে কালোমানিকের উত্তরের অর্থ খুঁজে বেড়ায়। আকাশে তখন হয়তো একচিলতে শাদা মেঘ। বর্ষার লগনে সেই মেঘে আবার কেউ কালি ঢেলে দেয়। কখনও ওড়াউড়ি করে ছোট্ট বিন্দুর মতো একটা চিল।

সেই মস্ত ভেড়ির কাচরং জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মুখ দ্যাখে অত বড় নীল আকাশখানা। কাশফুলের মতো শাদা মেঘ ঝিরঝির করে নড়াচড়া করতে থাকে জলের ছোট-ছোট ঢেউ-এ। সে-ঢেউ ওঠে কখনও মাছেদের খেয়ালখুশিতে, কখনও একটা হেলেসাপ তার হলদে-কালোয় আঁজি-কাটা হিলহিলে শরীর নিয়ে এঁকে বেঁকে সাঁতার কাটতে কাটতে যখন টুপ্ করে ডুবে যায় শাপলাপাতার আড়ালে, কখনও বা একটা শাদাপেট বোড়া হঠাৎ যখন মুখ বাড়ায় জলঝাঁঝির আড়াল সরিয়ে। অথবা নীল পালকের মাছরাঙা পাখিটা দুষ্টুমি করে কোনও ল্যাটা বা শোলের দিকে হঠাৎ নিচু হয়ে ছোঁ দিলে।

শঙ্খ অনেকবার অবাক হয়ে ভেবেছে, মাছরাঙাটা এত নীল রং পেলই বা কোথায়। নীলের সঙ্গে সবুজের একটা মেশামেশি আছে যেন কোথাও। কী উজ্জ্বল আর আশ্চর্য দ্যুতি তার নীল-সবুজে মেশা পালকের! নীল আকাশটাও যেন হার মেনে যায় মাছরাঙাটার কাছে। বিলের জলে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে যায় হয়তো।

এমন হাজারো রঙের খেলা ছড়ানো গোটা বিশ্বময়। রকমারি ফুলের কথা তো সে ছেড়েই দিল। এমনকি যে ঘাস তারা রোজ দু'পায়ে মাড়িয়ে যায় তাই বা রঙে-রঙে কম কিসের। বর্ষার দু-এক পশলা জল পেয়ে এখন চারপাশে তারা কি সবুজ কি সবুজ! জংলাঘাসগুলো বেড়ে উঠেছে দ্যাখ্‌দ্যাখ করে। দুব্বোঘাসগুলো আরও জমাটি হয়ে বেড়ে উঠছে শরীরে নতুন রং মেখে। নধর হয়ে উঠছে সেঁয়াফুলের কাঁটাঝোপ, গাঢ় হয়ে আসছে বৌচির শরীর, প্রায় তুঁতেবর্ণ ধারণ করছে বাজবরণের সবুজ ফণা। সেদিন অর্ঘদাই বলছিল, বর্ষায় গাছেরা রং বদলায়। আরও ডাঁটো, আরও ঘন সবুজ হয়ে ওঠে। ঘাসেদের শরীরেও নতুন রং। বর্ষায় তাদের শরীরে নতুন

প্রাণরস আরও ফেটে বেরোয়, সেই উচ্ছলতা আরও বেশি করে চোখে পড়েছিল শঙ্খর। সবুজ মানেই প্রাণ, যেখানে যত সবুজের ঢেলখেল, সেখানে প্রাণপ্রাচুর্যের তত উচ্ছলতা।

সেদিন বিকেলে হঠাৎ করে চাটুজ্জেপাড়ার ভেতর এসে পড়তেই আনন্দ চাটুজ্জের বিশাল তিনতলা বাড়ির সামনে ছোট্ট একটুকরো মাঠ। সে মাঠের ঘাস আজ একেবারেই অন্যরকম লাগছিল। এ সবুজ যেন কচিকলাপাতার রং। চাটুজ্জেপাড়ার কুচোকাচা ছেলেরা বলাবলি করছিল, এই ঘাস নাকি এ দেশের ঘাস নয়। আনন্দ চাটুজ্জে কলকাতা থেকে অনেক দাম দিয়ে কিনে এনে লাগিয়েছিলেন তাঁর বাড়ির সামনে। চীনদেশ না কি কোরিয়া কোথাকার ঘাস যেন। তাই এমন মিহি, এমন কচিকলাপাতা রং। হঠাৎ পা দিলে ভেলভেট বলে মনে হয় এমন নরম।

এমন সবুজ ভেলভেটের মাঠে সেদিন বিকেলে আর এক চমক দিয়েছিল আনন্দ চাটুজ্জের ছোটছেলে রোগাভোগা পনি। বিরাট বড়লোকের ছেলে বলে পনির ভারী দেমাক। সে কথায়-কথায় অন্যদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। আবার খেলার সঙ্গি পেলে কখনও দু-চার দণ্ড খেলেও বা। কিন্তু বেশিক্ষণ খেলতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই তার হাত-পা ফোলা, গায়ের রং হল্‌দেটে, চোখের রংও হলদে। সবাই বলাবলি করে, তার নাকি জন্ম-ন্যাবা। অনেক ডাক্তার-কোব্‌রেজ করেছেন আনন্দ চাটুজ্জে, কিন্তু তাঁর ছোট ছেলেটির কাম্‌লারোগ সারাতে পারেননি। প্রতিমাসের বেশ ক'টা দিন সে শুয়ে থাকে বিছানায়। ওষুধের পর ওষুধ খেয়ে যায়, কিন্তু দোতলার খাট থেকে মেঝেয়ও নামতে পারে না। ক্বচিৎ-কদাচিৎ ভালো থাকলে একতলায় নেমে আসে। তখন তার হাতে থাকে কলকাতা থেকে তার বাবার কিনে আনা কোনও নতুন খেলার সরঞ্জাম। সেদিন সে খেলার দোসর খোঁজে। কখনও একজন সঙ্গি পেলেই বর্তে যায়। কিন্তু প্রায় সময়ই সে কাউকে পায় না। পায় না তার কারণ হল, অতি অল্পেই পনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। রেগে গেলে তার মুখ দিয়ে নানারকম অশ্রাব্য গালি বেরোয়। কখনও দু-চারটে চড়-থাপ্পড়ও না কষায় এমন নয়।

আজ পনি কিন্তু এক-দু'জন নয়, অনেক সঙ্গির খোঁজে নেমে এসেছিল একতলার সিঁড়ি বেয়ে নীচের মাঠে। এখন তার হাতে এক আশ্চর্য ম্যাজিক। ক'দিন আগে তার বাবা কিনে এনেছেন নীলরঙের একটা ফুটবল। সত্যিকারের চামড়ার ফুটবলই। তবে তিননম্বর। ছোট-আকারের কেননা তাতে পনির পক্ষে খেলতে সুবিধে। পনি অবশ্য শঙ্খদের চেয়ে বয়সে ঢের বড়। অন্তত ছ'আট বছরের বড় তো হবেই। কিন্তু জন্ম-ন্যাবা বলে তার শরীরটা ছোট্টখাট্টো। কথাও বলে আদো-আদো ধরনের, তার খেলার সঙ্গি তাই পাড়ার ছোটরাই।

সেই নীলরঙের ফুটবল আজ কচিকলাপাতারঙের ঘাসে পড়তেই গোটা মাঠের চেহারা গেল বদলে। চাটুজ্জেপাড়ার কচিকাঁচাদের কেউ আজ বাদ নেই। সবাইকে নিয়ে ভাগাভাগি করে দুটো টিম হচ্ছে।

দুই যমজভাই বিমল আর বিকাশ এসেছে। দু'জনকে দেখতে হুবহু একরকম। কে বিমল কে বিকাশ তা একমাত্র ওদের বাড়ির লোকই বলতে পারে। শঙ্খরা ওদের কারও সঙ্গে দেখা হলেই আগে জিজ্ঞাসা করে নিত, তুই বিমল না বিকাশ? নাম জেনে তারপর কথা শুরু করতো। এদানী বিকাশ তার কপালের বাঁদিকে একটা কাটার দাগ করে ফেলেছে। ঢিলিয়ে আম পাড়তে গিয়ে ফেরতা ঢিল তার কপালে এসে পড়ে। তাতে শঙ্খদের সুবিধেই হয়েছে। এখন তাদের কারও সঙ্গে দেখা হলে, আগে দেখে নেয়, কপালের বাঁ-দিকে কাটা দাগ আছে, না নেই। দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলে। ওদের দু'জনকে আজ দু'দিকের টিমে রাখা হয়েছে, নইলে বল পাস দিতে অসুবিধে হয় খুব। বিমল্ আবার ফুটবলটা বিকাশের চেয়ে বেশি ভালো খেলে কিনা।

খেলতে এসেছে মোটা অমূল্য। তের বছরের অমূল্যর ওজন নাকি দু'মণের কাছাকাছি। শঙ্খ রাতে তিনখানা রুটি খায়, অমূল্য খায় চব্বিশখানা। ও বলে, আরও খেতে পারে ও, কিন্তু মা দেয় না। শঙ্খ তিনখানা খায় শুনে ও চোখ কপালে তুলে বলে, সে কি রে! তিনখানা রুটি তো আমি নস্যির মতো নাকে টেনে নিতি পারি।

তালপাতার সেপাই প্রলয়ও এসেছে একটু আগে। শঙ্খরই বয়সী, কিন্তু লম্বায় ওর দেড়গুণ। দেখতে অনেকটা একলব্যস্যারের হাতের ছপ্‌টির মতো। ল্যাকপ্যাক করতে করতে যখন বল নিয়ে দৌড়োয়, ভারী অদ্ভুত লাগে। আর এসেছে সীতেশ। সীতেশের নাম ওরা রেখেছে বকবক খাঁ। সারাক্ষণ বকতে পারে একনাগাড়ে। বল পায়ে নিয়েও বকবক করতে করতে ছোটে, বিমল, তুই পেনাল্টিবক্সের ভেতর ঢুকে যা। বিশ্বদেব, রাইট-আউটের পজিশন ছেড়ে নড়িস নে। আরও এসেছে সহদেব, সুখেন অনেকেই। কে কোনদিকে যাবে তাই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

শঙ্খ হঠাৎ চাটুজ্জেপাড়ায় ঢুকে এতসব আয়োজন দেখে চমৎকৃত। তারা সাধারণত একটা রবারের বল দিয়ে খেলে। রবারের বল আকারে ছোট হয়। সবচেয়ে বড়-আকারের বলও তিননম্বর ফুটবলের প্রায় অর্ধেক। আজ তাই একখানা আস্ত ফুটবলের আকস্মিক প্রাপ্তিতে চাটুজ্জেপাড়ার ছেলেদের মনে মহা উল্লাস। ভেলভেট ঘাসের ওপর নীলরঙের ফুটবলটা সজোরে আঁচড় কাটছিল মাঠের একদিক থেকে আর একদিকে। শঙ্খ মাঠে পৌঁছুবার একটু পরেই এসে পৌঁছুল পল্টন আর টুপুর। তারপর সাতজন-সাতজন করে দু'দলে ভাগ হয়ে শুরু হল তুমুল খেলা।

নতুন ফুটবল পেতে কচিদের গায়ে হঠাৎ যেন জোরও বেড়ে গেল। বিমল, সহদেবের কিকে বরাবর দারুণ জোর। বিপক্ষকে ভালো ট্যাক্‌ল করতে পারে বিকাশ। ক্ষিতীশ গোল্‌কি হিসেবে তুখোড়। সেন্টারে সুখেনের তুলনা নেই। তাদের সম্মিলিত দৌরাত্মে পনি খুব বিরক্ত হচ্ছিল। ফোলা অথচ শীর্ণ শরীরে সে বেশি দৌড়তে পারে না। আজ অনেকক্ষণ দৌড়োদৌড়ি করেও একবারও বল ধরতে পারেনি। বারবার বল তার আশপাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বুলেটের মতো। কেবল টলতে টলতে ঘোরাঘুরিই সার হচ্ছিল পনির। তাই কেবলই ক্ষীণকণ্ঠে চেঁচাচ্ছিল, আমার বল, আমার বল। আমাকে বল দাও।

তাতে অবশ্য অন্য খেলোয়াড়রা ভ্রূক্ষেপ করছিল না। একট আস্ত চামড়ার বল পাওয়ায় তাদের যাবতীয় ক্রীড়াদক্ষতা দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কে একজন বলল, এই, পনিমামাকে একবার বল দে।

তাতে বিশ্বদেব দয়াপরবশ হয়ে একবার বলটা ঠেলে দিল তার দিকে। আস্তেই দিয়েছিল, কিন্তু পনি নিচু হয়ে বল কুড়োনোর আগেই সেটা তার পাশ দিয়ে চলে গেল অমূল্যর দিকে, অমূল্য ঠেলে দিল বিকাশের দিকে, বিকাশ গোলে শট নিতেই প্রায় গোল হয়েছিল আর কী। তাতে বিকাশ কপাল চাপড়াচ্ছিল, কিন্তু পনি ওদিকে তখন তাকে লক্ষ করে একটা ঢিল ছুড়েছে। যেন বিকাশই তাকে বল না দেওয়ার জন্য দায়ি।

শুধু ঢিলই ছুড়ল না পনি, গালাগাল দিতেও শুরু করেছিল। তার অশ্রাব্য ভাষা শুনে বিব্রত হয়ে পড়ছিল শঙ্খ। তার পায়ে হঠাৎ বলটা এসে যাওয়ায় সে টুক করে ঠেলে দিল পনির দিকে। পনি এবার সহজেই পেয়ে গেল বলটা। আর পেতেই সেটা বগলদাবা করে সোজা উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। তারপর সেঁধিয়ে গেল তাদের ঘরের ভেতর।

সুখেন ভুরু কুঁচকে তেড়ে এল শঙ্খর দিকে, তুই বলটা পনির দিকে দিলি কেন?

শঙ্খ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল বেশ। সে বুঝতেই পারেনি, বলটা হাতে পেতে পনি ওভাবে

সেঁধিয়ে যাবে ঘরের ভেতর। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সুখেনের দিকে।

খেলাটা মাঝপথে এভাবে ভেঙে যেতে কেউই খুশি হয়নি। সবে জমে উঠেছিল ম্যাচটা। অনেকেই শঙ্খর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন খেলাটা ভেঙে যাওয়ার সমস্ত দায়ভাগ তারই।

সত্যিই খুব অপ্রস্তুত লাগছিল শঙ্খর। অমন চমৎকার সবুজ মাঠে এতক্ষণ যেন একটা নীল রং মাখানো তুলি দিয়ে আঁচড় কাটছিল তারা। সে আঁচড়ে আঁচড়ে কত না ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, সরলরেখা, বক্ররেখা আঁকা হচ্ছিল মনের সুখে। এখন কেউ নীল তুলিটা তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ায় নিঃস্ব হয়ে গেছে সকলে মিলে। সবুজ মাঠটা অসহায়ভাবে শুয়ে আছে, সেও তাদের মতো ফতুর, একা, নিঃসঙ্গ।

খেলোয়াড়রা ছোট-ছোট দলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফিসফাস করছে, আর রাগত চোখে তাকিয়ে আছে বিশাল তিনতলা বাড়িটার দিকে। এ বাড়ির ভেতর তারা কেউ কখনও ঢোকেনি। ঢোকার হুকুম নেই, নইলে হয়তো তারা পনির হাত থেকে কেড়ে আনত বলটা।

ততক্ষণে বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে নেমে আসছে ক্রমশ। একজন একজন করে খেলোয়াড়রা ফিরে যাচ্ছে যে-যার ঘরের দিকে। শঙ্খও রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিল মনমরার মতো। হঠাৎ রাস্তা দিয়ে কে যেন যেতে যেতে তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, গম্ভীর গলায় বলল, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে?

শঙ্খ চমকে উঠেছিল প্রথমটায়। হুঁশ ফিরলে দেখল, তার ঠাকুর্দা ফিরছেন কোর্ট থেকে। বাস থেকে নেমে অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছেন। এতখানি পরিশ্রমে ভীষণ ক্লান্ত, শ্রান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। শঙ্খকে দেখে বললেন, সন্ধে হয়ে আসছে, তুই এখনও বাড়ি গিয়ে পড়তে বসিসনি!

শঙ্খ বিব্রত, ভয়ও পেয়ে গেল একটুখানি। ঠাকুর্দা তাকে ভালোবাসেন খুবই, কিন্তু সন্ধের পর বাড়ির বাইরে থাকাটা একদম পছন্দ করেন না। তাঁর ছেলেদের ওপরও কড়া নির্দেশ জারি করা আছে, যেখানেই যাও, সন্ধের মধ্যে ঘরে ফিরতে হবে। কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে বাড়ির সবাইকে ঠিক-ঠিক জায়গায় দেখতে না পেলে ভীষণ রেগে যান।

শঙ্খ ভয়ে আধখানা হয়ে গেল, কোনও উত্তর করতে সাহস পেল না।

ঠাকুর্দা তেমনই গম্ভীরস্বরে বললেন, চল্—

ঠাকুর্দার পাশে-পাশে শঙ্খ হাঁটা শুরু করল বাড়ির দিকে। সন্ধে তখন ছুঁই-ছুঁই করছে ঈশ্বরীপুরের মাটি। এব্ড়ো-খেব্ড়ো পথ চোখে ঠিকমতো ঠাহর না হলে ঠাকুর্দার চলতে খুব অসুবিধে হয়। তা ছাড়া ঠাকুর্দার দিকে তাকালে শঙ্খ আজকাল বুঝতে পারে, তাঁর শরীরটা ঠিক ভালো যাচ্ছে না। একটুখান চলার পরেই হাঁপাতে থাকেন মনে হয়। আনন্দ চাটুজ্জের পাঁচিল পেরোলেই জেলেপাড়া শুরু। কোনও কোনও বাড়িতে এর মধ্যে লম্প জ্বলে উঠেছে। এমনিতে সারা পাড়া সন্ধের পর সুনসান হয়ে যায়। আজ অবশ্য গল্পগুজব হচ্ছে। পবনকে বাঘে নিয়ে যাওয়ার গল্প সাতকাহন হতে হতে একসময় সব আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আর পুণ্যিবৌএর শরীরে উঠেছে শাদা ধবধবে থান কাপড়।

জেলেপাড়ার ঠিক মাঝামাঝি যতনখুড়োর ঘর। ঘরের উঠোনে দাঁড়িয়ে তকলিতে সুতো কাটছিল রামী-বৌ। সমস্ত জেলেবাড়িতেই সারাবছর ধরে তকলিতে সুতো কাটে মেয়ে-বৌরা। সেই সুতোয় মাঞ্জা দিয়ে, তা শুকিয়ে খরখরে করে জাল বোনে তারা। রামী-বৌ তখন সবে তার কাপড় সরিয়ে তকলি ঘুরোতে যাচ্ছে উরুতে ঘষে, অমনি ঠাকুর্দাকে দেখে ঢেকে ফেলল

তার কালোকষ্টি উরত। ঠাকুর্দাও অপ্রস্তুত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে।

সেসময় যতনখুড়ো ঘর থেকে জামাজুতো পরে বেরিয়ে আসছিল। কোথাও যেন যাচ্ছে হন্তদন্ত হয়ে। ষাট বছর বয়সে যতনখুঁড়ো হঠাৎ ছেলের বাপ হতে পাড়াময় ক'দিন খুব হাসাহাসি হয়েছিল। সেই যতনখুড়ো ঠাকুর্দাকে অন্ধকারে ঠাহর করে বলল, ঠাকুরমশাই নাকি?

ঠাকুর্দা ঘাড় ঘোরাতেই সে হেসে বলল, পেন্নাম হই, ঠাকুরমশাই। বলে শরীর ঝুঁকিয়ে দু'হাত দিয়ে ঠাকুর্দার দু'পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকাল, ভালো আছেন ঠাকুরমশাই?

—হ্যাঁ, তোমরা?

যতনখুড়োর হঠাৎ নজরে পড়ল শঙ্খর ছোট্ট চেহারাখানা, বলল, এটি আপনার নাতি নাকি, ঠাকুরমশাই?

ঠাকুর্দা হ্যাঁ বলতেই সেইমুহূর্তে এক আশ্চর্য কাণ্ড করে ফেলল যতনখুড়ো। ঠাকুর্দাকে ঠিক যেভাবে প্রণাম করেছিল, সেভাবেই শরীর ঝুঁকিয়ে শঙ্খর দু'পায়ে হাত ছুঁইয়ে প্রণাম করল। শঙ্খ আশ্চর্য হল, সসংকোচে পিছিয়ে এল দু'পা। কিন্তু ততক্ষণে তার পা ছুঁয়ে মাথায় হাত রাখছে যতনখুড়ো। ঠাকুর্দা ব্যস্ত হয়ে বললেন, আহাহা থাক থাক। ওকে আবার কেন?

যতনখুড়ো হেসে বলল, তাতে কী হয়েছে ঠাকুরমশাই, বামুনের ছেলে তো বামুনই।

ঠাকুর্দা তখন ঘাড় নাড়ছেন, না হে যতন। কাজটা তুমি ঠিক করলে না—

শঙ্খও তখন হতচকিত হয়ে আছে এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া কাণ্ডটিতে। তার চেয়ে ঢের বড় একজন মানুষ যে এমন একটা কাজ করতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সে। কেনই বা এমন করবে সে প্রশ্নের উত্তরও তার মাথায় সেঁধায় না। পৃথিবীর এমন অনেক কিছুই অবশ্য তার জানার বাইরে। যেমন সে বুঝতে পারে না কেন সেদিন ঠাক্‌মা সোলেমানকে জল খেতে দিয়েছিল তাদের ব্যবহার-না-করা একটি পাত্রে। একদিন ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞাসা করবে সে এইসব, তার মাথায় জমে থাকা এমন হাজারো সব প্রশ্নের জবাব চাইবে।

ঠাকুর্দা তখন জিজ্ঞাসা করছেন, তা যতন, সমুদ্দুরে এবার মাছ কেমন পড়ল? নৌকো তো সব ফিরে এসেছে শোনলাম।

যতনখুড়ো হাত কচ্‌লে বলল, আজ্ঞে ঠাকুরমশাই, আমি ইবার মাছ মারতে যেতি পারিনি। বাড়ির সামনে, রাস্তার ধারে একটা দোকান দেব ঠিক করিছি। তারই জোগাড়যন্তরে ব্যস্ত ছেলাম। যারা গিইছিল, তারা ভালোই পাতি রোজগার করে এনেছে।

যতন দোকান দেবে শুনে ঠাকুর্দা অবাক হলেন, তাই নাকি? দোকান দিচ্ছে? তা ভালো কথা তো—

—আজ্ঞে, আমার বড়ছেলেটা ইবার ছ'কেলাসে পাস দে উঠেছে। আমার ইচ্ছে, ওরে আর মাছের ব্যবসায় দেব না। লেখাপড়া শিখি ম্যাট্রিক পাস করলি যদি এট্টা চাকরি পায়—

ঠাকুর্দা খুব আশ্চর্য হলেন। বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন যতনের দিকে। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, তা ভালো, তা ভালো। বেশ বেশ। তা এখন সন্ধেবেলা চললে কোথায়?

—আজ্ঞে, ভাসানের সময় এয়ে গেল যে। তার পুজোর জোগাড় করতি একবার যেতি হবে গঞ্জের বাজারে। সিই বিকেল থে যাব-যাব করতিছি—

—ও, ঠাকুর্দা থমকালেন একলহমা, মনসার ভাসান এসে গেল নাকি? তা গানটান হবে তো এ বছর।

—আজ্ঞে ঠাকুরমশাই, হবে বলিই তো এত তোড়জোড়। শুধু পবনটা অপঘাতে মরলো বলে যা একটু দুর্যোগ। পুণ্যিবৌ বলতিছে, ইবার আবার গান গাইতি পারবে না। কিন্তু ওর গলাটা এত ভালো—

মনসার ভাসান শুরু হয় শ্রাবনমাসের এক মঙ্গলবারে। জেলেপাড়ার ঠিক মাঝখানে এক মস্ত ফণীমনসার গাছ। কাঁটাওলা গাছটি ভারী অদ্ভুত দর্শনের। চারদিক থেকে তার হাত-পা-মুণ্ডু গজিয়েছে প্রকৃতির নিয়ম না মেনেই। অদ্ভুত বলেই এই ফণীমনসাটি নাকি ভারী জাগ্রত, তার মাহাত্ম্যের কথা ছড়িয়ে গিয়েছে দূর-দূরান্তর দেশে। দুধ-কলা সাজিয়ে বেশ ঘটা করে পুজো হয় প্রতিবছর। কিন্তু পুজোটাই এ পাড়ার সব নয়। যা কিছু আকর্ষণ তা হল ভাসানের গান। টানা তিনদিন তিনরাত ধরে সুর করে গানের মজলিস বসায় পুণ্যি-মঙ্গলারা।

গোটা আষাঢ়-শ্রাবন ধরেই এ বছর ঘোর বর্ষণ চলছে। এমনকি দশহরার দিনও সকাল থেকে কালো মেঘ করে এসেছে দেখে মহাদেব খুড়ো জানান্ দিয়েছিল, ওরে, মা মনসার কী কিরপা। শাঁখ বাজা, উলু দে।

সারা জেলে পাড়ায় তখন শাঁখ আর উলুর শব্দে মুখরিত। প্রকৃতি তখন সারা আকাশে তুমুল করে সেজে এসেছে। আঁধার হয়ে এসেছে পৃথিবীর শরীর। সকাল না গড়াতে প্রথমে টিপ টিপ করে, তারপর দুপুর নাগাদ ভন্না নেমে এল হু-হু করে। মহাদেব খুড়ো তখন দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাচ্ছে, মা মনসার কী কিরপা। এমন ভন্না হলে মনসার জীবেরা আর বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না। দশহরার দিন বৃষ্টি হলে সাপের ডিম ভেঙে যায়।

সারাটা বচ্ছর জলে-জলে ঘুরতে হয় যাদের, নদীর খাঁড়িতে, সমুদ্দুরের ধারে জঙ্গলে জঙ্গলে যাদের জীবনের অনেকখানি সময় কেটে যায়, সাপ নিয়ে তাদের ভয়-ভীরতি একটা থেকেই যায় মনে। দশহরার দিন ঘোর বর্ষণ হতে তাই ভাসানের গান এ বচ্ছর আরও জেল্লায় হবে এমনই মন করেছিল সবাই, কিন্তু তাতে বাদ সেধেছে পুণ্যি-বৌ।

পুণ্যি আর মঙ্গলা পিঠোপিঠি দুই বোন। দু'জনেরই বিয়ে হয়েছিল এই ঈশ্বরীপুরের জেলে পাড়ায়। বিয়ে হয়ে আসা ইস্তক তারাই ভাসানের গান ধরার দুই প্রধান জুড়ি। আগে গানের দুই জুড়িদার ছিল জটাইপিসি আর পদ্মমাসি, দু'জনেই এখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়তে পুণ্যি মঙ্গলাই তাদের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে।

বড়বোন মঙ্গলা বিধবা হয়েছিল ক'বছর আগেই, সে বছরেও মনসার ভাসানে তাকে গান গাওয়াতে বড় বেগ পেতে হয়েছিল। ইছামতীর গাঙে খ্যাপ্‌লা জাল ফেলে মাছ ধরতে গিয়ে বাজ পড়ে অপঘাতে মারা গিয়েছিল তার স্বামী প্রহ্লাদ। সেই বাজ পড়েছিল মঙ্গলার মাথায়ও। তারপর ক'মাস ধরে নানান নাটাঝামটার ভেতর দিয়ে তার দিন কেটেছিল। সংসারে তখন নিত্যি টানাটানি। নৌকোর হালের মাঝিই যদি চোখ বোজে, তাহলে নৌকোর গতিক যে ঠিক থাকবে

না তা তো সবাই জানে।

তারপর থেকে মঙ্গলা বামুনপাড়ায় কেবল দুধ দুয়ে বেড়ায়। চাটুজ্জেদের মস্ত পাড়ায় এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি সে সারা সকাল হনফন করে ছোটে। মঙ্গলার হন্তদন্ত ছোটাছুটিতে তটস্থ হয়ে থাকে পাড়ার লোকজন থেকে গাই গরু অবধি। কারণ সে ভারি কারোয়ান। তার মুখের চোটে দিগরে কাক চিল বসে না। তাকে দেখলেই দুধেল গরুগুলো কেবল হাম্বা হাম্বা রব তুলে ডাকতে থাকে। তাদের শরীরে ছটফটানি বেড়ে যায়। কিন্তু মঙ্গলা কাছে এসে তাদের গায়ে হাত দিলেই তারা বশ মেনে যায় কী আশ্চর্যভাবে। হয়তো ভয়তরাসেই। কিংবা ভালোবেসে কি না তাই বা কে জানে। সে তখন যন্ত্রের মতো দূরে বেঁধে রাখা সারারাত উপোসী বাছুরটাকে খুলে নিয়ে এসে তার মুখে ঠুসে দেয় মায়ের বাঁট। দু-চারবার টানটোন দিতেই মায়ের বাঁটে ভরে আসে ঘন দুধ। তখন বাছুরটাকে ধমক দিয়ে টেনে সরিয়ে বেঁধে রাখে পাশে। দু-হাঁটুর ফাঁকে বালতি ধরে চারটে বাঁটে ক্রমান্বয়ে টান দিতে দিতে বটের আঠার মতো দুধে ভরিয়ে তোলে বালতি। বামুনরা বলে, মঙ্গলার ধমকে গরুর বাঁটে দুধ বেশি করে ভরে আসে।

বামুনপাড়ায় অন্তত খান তিরিশ-চল্লিশ ঘর। সব ঘরেই একটা দুটো করে গরু, কোনও সম্পন্ন ঘরে চার-পাঁচটাও। মঙ্গলা একা হাতে সামাল দিয়ে পেরে উঠছিল না। পুণ্যি বিধবা হতে মঙ্গলা তাকেও লাগিয়ে দিল দুধ দুইবার কাজে।

পুণ্যি অবশ্য মঙ্গলার মতো অত চটপটে নয়, সে একবাড়ি থেকে আর একবাড়ি যাওয়ার সময় উদাসীন হয়ে যায় হঠাৎ-হঠাৎ। পবনের কথা মনে পড়ে যায় তার। পবন সমুদ্দুরে যাওয়ার আগের দিনও তার শরীরটা নিয়ে খেলা কবতে করতে বলেছিল, এবাব মাছ মেরে কড়কড়ে কিছু পাতি পেলে পুণ্যির জন্যে নতুন কাপড় কিনে নিয়ে আসবে, পারলে দু-চারখান রূপোর গয়নাও।

এখন দুধ দুইতে যাওয়ার সময় তার ন্যাড়া হাত দু'খানার দিকে নজর পড়লে চোখ ফেটে জল আসে। হঠাৎ অবশ হয়ে আসে শরীরখান। পা-দুটো ভেরে আসে যেন, চলতে চায় না পথ। দুধ দুইতে বসে কখনও চুপচাপ তাকিয়ে থাকে মাটিব দিকে। তাতে অস্থির হয়ে কোনও গরু হয়তো চাটি মেরে বসল—

তাতে দুধের ভরা বালতি উল্টে গেল কোনও দিন। কোনও সময় তার হাঁটুতে কিংবা ঊরতে নুনছাল উঠে গেল সহসা। সেদিন হয়তো দুধ দুইতেই পারল না পুণ্যি।

পবনকে বাঘে ধরে নিয়ে যাওয়ার গল্প তখন সাতপাঁচ হয়ে ঘুরছে ঈশ্বরীপুরের পাড়ায় পাড়ায়। মাছমারাদের বাঘে নেওয়ার খবর তো এই প্রথম নয়। এর আগেও জঙ্গলে জ্বালানির জোগাড় করতে গিয়ে ফেরেনি কেউ-কেউ। কেউবা বনঝাউগাছে মধু চুব্-চুব্ চাক দেখতে পেয়ে তার সন্ধানে হামড়ে পড়ে আর ফিরতে পারেনি। কেউবা নিখোঁজ হয়ে গেছে নৌকোর পাটাতন থেকে ঘুমন্ত অবস্থায়। বছর-বছর সমুদ্দুরে মাছ মারতে যায় মাছমারারা। হঠাৎ এক-এক বছর সার দিয়ে পাল-তোলা নৌকো ফিরে এলে দেখা যায়, কোনও একটা ঘরের মানুষ ফিরে আসেনি। আর ফিরবেও না কোনও দিন।

তখন জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে আলাপ-আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। কেউবা হয়তো ফুট কেটে বসল, অনাচার, অনাচার, অনাচার না হলে এমন হয়!

কী অনাচার, কে অনাচার করেছে তা হয়তো মুখ ফুটে বলল না, কিন্তু ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিল, দু'জনের কেউ একজন সমুদ্দুরে মাছমারার রীতিনীতি লঙ্ঘন করেছে।

কখনও একলা-একা হলে পুণ্যি-বৌও হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তাকে দেখে পাড়ার

মেয়ে-বৌরা হয়তো সরে দাঁড়াল, কি হয়তো ফিসফিস করল নিজেদের মধ্যে। কিংবা তাকালো এক অন্যরকম চাউনি দিয়ে।

সে চাউনি দেখে ভেতরটা কেঁপে ওঠে পুণ্যিবৌ-এর। এবার মেয়েমহলে আলাপ-আলোচনার আসরে সে থাকেনি। না থাকলেও অনুমান করে নেয়, নিশ্চয় অন্য-অন্যবারের মতো এ বচ্ছর তাকে নিয়েও আলোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ওবা সবাই বলাবলি করছে, সে কিংবা পবন, কেউ কোনও অনাচার করেছে।

ভেতরে ভেতরে থরথর করে কেঁপে ওঠে পুণ্যি-বৌ। তাহলে কি তাদের কারও অনাচারের জন্য মা বনবিবি এ বছর কর নিয়েছে পবনকে? পবন কি কোনও অনাচার করেছিল! মাছ মারতে গিয়ে মাছমারার রীতি-নিয়ম মেনে চলেনি! না কি ভুল করে কপালে-সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে ফেলেছিল পুণ্যি-বৌ?

যারা সমুদ্দুর থেকে ঘরে ফিরে এসেছে, তারা সবাই সেসব কথা ভেবে শিউরে ওঠে। যারা সমুদ্রে যায়নি—তিনমাস ধরে তাদের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় ছিল, তারাও আতঙ্কিত হয়, রাতে ঘুমোতে পারে না। কে কখন কী অনাচার করে বসে তার ঠিক কী। আবার তো পরের বছর নৌকো ভাসাতে হবে জলে। সমুদ্দুরে মাছ মেরে না এলে গেঁজেয় কড়কড়ে পাতি আসবে কোত্থেকে? ঈশ্বরীপুরে ঘরের ভাত খেয়ে ক'মাস মাছ ধরে যা পয়সা আসে তার তিনগুণ পাতি আসে তিন-চার মাসের সমুদ্দুর ছেঁচা মাছ থেকে। সমুদ্দুর ছেঁচে মাছ তো নয়, যেন মুক্তোই উঠে আসে নাইলন জালের খাঁজে খাঁজে।

পুণ্যিবৌ সেসব কথা ভাবতে ভাবতে একা আঁধাররাতে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। সে কান্নার সুর বাতাসে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে যায় গোটা জেলেপাড়ায়। জেলেপাড়ার চৌহদ্দি পেরিয়ে বামুনপাড়া ইস্তক। পবনের কথা ভেবে গোটা গাঁয়ে নেমে আসে হাড়হিম কাঁপ। সেসব রাতে কারুরই চোখে ঘুম আসে না।

কখনও পুণ্যি-বৌ তার ধব্‌ধবে হয়ে আসা সিঁথির দিকে তাকিয়ে থাকে ঘরের আধভাঙা ঘষা আয়নাটার ভেতর। সে কি কখনও ভুল করে সিঁদুর দিয়ে ফেলেছিল তার সিঁথিতে? তাতেই অনাচার হল?

কথাগুলো যতবার মনে পড়ে পুণ্যি-বৌএর, ততই গা-হাত-পা অবশ হয়ে আসে তার। কাজে মন বসে না। যে কাজ করতে যায় তাতেই বেব্‌ভুল। নবনী-বৌ যেদিন তার বাচ্চাটা কোলে নিয়ে এসে বলতে গেল, কী রে, পুণ্যি, সামনের মঙ্গলবার ভাসানের গান হবে সে বাকিা মনে আছে তো তোর?

পুণ্যির যেন সাড় ফিরে এল তাতে। এ বছর সে সত্যিই ভুলে গিয়েছিল কথাটা। চমক ভেঙে বলল, তাই! তারপর বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ইবারে আর গলায় গান উঠবে না, দিদি, আমারে ইবার ছাড়ান্ দ্যাও।

নবনী-বৌ তার মুখে থাবা দিয়ে বলে উঠল, সি লোকটার কতা ভেবি ভেবি আর কত্‌কাল কাটাবি বল্? যে গেচে সে গেচে। তুই কেঁদি কেঁদি সারা হলি তো সি মানুষটা ঘরে ফেরবে না।

পুণ্যি উদাস হয়ে মাথা নাড়ল, না দিদি, এ বচ্ছর আর নয়। আমারে তুমরা ছাড়ান্ দ্যাও।

নবনী-বৌ অনেক অনুনয়-বিনয় করে ব্যর্থ হল। পুণ্যি কেবলই মাথা নাড়ে, না এ বচ্ছর আর নয়। সে চলে যাওয়ার পর এল জটাই-পিসি। জটাই পিসিই এককালে মূল গায়েন ছিল বলে তার উৎসাহের সীমা নেই। এখনও পালা করে গায়েনের দলের সঙ্গে সে গলা মেলায়,

কখনও কখনও সারারাত জেগেও ধুয়ো তোলে। সেই জটাই পিসিও হার মেনে গেল যখন মহাদেবখুড়ো নিজেই নির্দেশ পাঠাল পুণ্যিকে। মহদেবখুড়োর কথাই এ পাড়ার শেষ কথা। কিন্তু তাতেও টলল না পুন্যি, বরং মহাদেব খুড়োর নাম শুনে জ্বলে উঠে বলল, যে লোকটা আমার স্বামীরে নে গে আর ফেরত আনতি পারে না, তার কথা আমি শুনতি যাব কোন দুঃখি?

মহাদেব খুড়োর কথাও পুণ্যি অমান্যি করল দেখে পাড়ায় পুণ্যির নামে ছিছিক্কার পড়ে গেল। পাড়ার মাথা মহাদেবখুড়ো, জেলেপাড়ার সুখে-দুঃখে সুবিধে-অসুবিধেয় মহাদেবখুড়োই সব্বার পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই মহাদেবখুড়োকেও কিনা—

শেষে পুণ্যিকে এসে ধরল মঙ্গলা। দুই পিঠোপিঠি বোন একে অপরকে সবচেয়ে ভালো চেনে। ভিনগাঁ থেকে দুই বোনে পর-পর বিয়ে হয়ে এসেছিল ঈশ্বরীপুরে। একে-একে বিধবা হয়েছে দু'জনেই। মঙ্গলা নিজে বিধবা হয়েছিল, সে তবু সইয়ে নিয়েছিল ক্রমে ক্রমে। কিন্তু পুণ্যির দিকে এদানী সে যেন আর চাইতে পারে না। পুণ্যি ভাসানের গান গাইতে রাজি হচ্ছে না দেখে সে এল বোঝাতে, আমিও তো বেধবা হইছি, পুণ্যি, তা বলে আমি কি গান ছেড়ি দিইছি। ঠাকুর দেব্‌তা বলি কথা। অমন অমান্যি করতি নেই।

পুণ্যি চোখের জলে ভেসে বলল, দিদি, দেব্‌তা যখন তারে কেড়ে নেয়, তখন দেব্‌তা তো আমার কথা ভাবেনি।

মঙ্গলাও কেঁদে ফেলল, দেব্‌তার জিনিষ দেব্‌তা কেড়ে নিইছে, ভেবি আর কী করবি বল্। মা মন্‌সাবে পুজো দে, বল্, তোর স্বামীরে ফিরাই দিতি। বেহুলাও তো স্বামীরে ফিরাই নে আসাব জন্যি ভেলা ভাসাই দিছিল সমুদ্দুরে—

দিদির মুখের দিকে পুণ্যি হাঁ করে তাকিয়ে রইল কান্না ভুলে। দিদির মতো করে এমন সহজ বাক্যটা তাকে তো এ ক'দিন কেউ বলেনি। সে তো বছর-বছর রাত জেগে, গলা চিরে মনসার ভাসান গেয়েছে। সতী বেহুলা কীভাবে সমস্ত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করে ভেলা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল তার মৃত স্বামী লখীন্দরকে ফিরিয়ে আনতে, তা গানে গানে গেয়ে শুনিয়েছে প্রতিবার। বেহুলা স্বর্গে হাজির হয়ে নাচে-গানে খুশি করেছিল স্বয়ং মহাদেবকে, ফিরে পেয়েছিল লখীন্দরের জীবন। সে এক আশ্চর্য কাহিনী। তাহলে আজ সে-ই বা মা মনসাকে গান গেয়ে তুষ্ট করবে না কেন!

দুই বোনে অনেকক্ষণ ধরে চোখের জলে সারা হল। পুণ্যি আর না করতে পারল না মঙ্গলাকে। কেঁদে একশা হয়ে বলল, তা'লে তুই উদের বলে দে, আমি যাবানে—

মনসাপুজোর দিন থেকে টানা তিনদিন তিনরাত ভাসানের গান হয়। জেলেপাড়ার মেয়ে-বৌরা মস্ত মস্ত খেজুরপাতার চাটাই বিছিয়ে দল বেঁধে গোল হয়ে ঘিরে বসে কোনও বাড়ির দাওয়ায়। তাদের সামনে উঠোন পর্যন্ত থইথই করতে থাকে এ-পাড়া বে-পাড়া থেকে গান শুনতে আসা মানুষজন। মঙ্গলাই এখন ভাসানের মূল গায়েন। সে স্বভাবে কারোয়ান বলে তার গলার স্বরও চড়া। তার গানের সুর পৌঁছে যায় অনেক দূর অবধি। সারা জেলেপাড়া তো বটেই, গভীর রাতের দিকে সে গানের রেশ শুনতে পাওয়া যায় বামুনপাড়া পর্যন্ত। এমনকি গাঙের পাড়ে, খেয়াঘাটে হাল বাইতে থাকা কালোমানিকের কানেও। খেয়াঘাটের পাশে ঝুপড়ি-ঘরের মধ্যে থাকে যে লাবনি-বৌ তার দাওয়ায় ইস্তক।

মঙ্গলা দু'কলি গান সপ্তমে তুলে ছেড়ে দেয়, তার ধুয়োর রেশ টেনে গাইতে থাকে বাকি

গায়েনরা। তারা কলিদুটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার গায়। তাদের গান শেষ হলে মঙ্গলা ফের শুরু করে তার পরের দু'কলি। বেহুলা-লখীন্দরের গল্পের ভেতর ক্রমশ ওতপ্রোত হতে থাকে। ভাসানের গানের মধ্যে জমা হয়ে থাকে এক আশ্চর্য শিহরণ। সে সুর কানে ঠোনা দিলে গাঁ-গেরামের মানুষ যেন শরীরে আলাদা বল পায়, চাঙ্গা হয়ে ওঠে তদের ঝিমিয়ে আসা মন। গানের সুরের সঙ্গে তারাও ওতপ্রোত হতে থাকে, গানের সঙ্গে তারাও ভেসে যেতে থাকে কখনও বাতাসের সঙ্গে, কখনও সামনের ইছামতী নদীর ঢেউএ ঢেউএ বহুদূরের কোনও অচিন পটভূমিকায়।

টানা তিন-চার ঘণ্টা গাওয়ার পর মঙ্গলা খানিক জিরেন নেয়। তার দম ফুরিয়ে আসে, শুকিয়ে ওঠে গলা, দু-চার ঢোক জল খেয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে থাকে। তখন মূল গায়েন হয়ে গাইতে শুরু করে পুণ্যি। পুণ্যির গলা মঙ্গলার মতো অতটা চড়ায় ওঠে না। কিন্তু তার গলাটি ভারী মিষ্টি। ক'মাস পবনের জন্য কেঁদে কেঁদে আরও যেন চিকন আরও সুরেলা হয়ে উঠেছে তার গলা। বিশেষ করে লখীন্দরের প্রসঙ্গ গানের ভেতর এলেই তার গলায় একটা অদ্ভুত নিবেদনে ভরে ওঠে। যেন সে তখন গানেব ঘোরে পবনের কথাই ভেবে চলেছে একমনে। গাইতে গাইতে তার ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে, চোখের তারায় একধরনের তিরতির কাঁপ ধরে, গানের সুরের সঙ্গে মিশেল হয়ে যায় কান্না। যখন সে গাইতে শুরু করে ঃ

শ্রাবনমাসের ববিবারে মনসাপঞ্চমী।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় স্বামী।

তখন সহসা তাব মনে পড়ে যায়, বিছানা জুড়ে পবনের জোয়ান শরীরটা ঘুমিয়ে বিভোর হয়ে থাকত, সেই দৃশ্যের কথা। হঠাৎ ঘুম ভাঙলে তাকে নিয়ে যে দস্যিপনা করত, তার কথা। ভাবতে ভাবতে একলহমা সে পরের কলি গাইতে ভুলে যায়। তার অন্য গায়েনরা বারবার ধুয়ো তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কলি গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। তখন হয়তো পেছন থেকে সদ্যযুবতী চাঁপা মৃদু ঠেলা দিয়ে বলে ওঠে, কী গো, থামলে কেন, গাও—

সম্বিত ফিরে পেয়ে তখন ফেব পরের দু'কলি গেয়ে ওঠে পুণ্যি-বৌ। গাইতে গাইতে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হয়ে আসে। গায়েনের দল একজন-দুজন করে বদল হয়। কেউ ভাসানের আসর ছেড়ে চট করে ঘরে গিয়ে হাতের কাজগুলো টপাটপ সেরে আসে। কেউবা তড়িঘড়ি রান্না সেরে নেয়। আবার একটু অবসর পেলে এসে বসে যায় অন্য গায়েনদের পাশে। আবার গান ধরে।

এপাড়া বেপাডার লোক মনসাব ভাসান শুনতে ভেঙে পড়েছে এ-বছরও। জেলেপাড়া, বামুনপাড়া, নতুন পত্তনীদের ঘর থেকে মেয়ে-বৌরা তো এসেছেই, দু-চার জন পুরুষমানুষও পায়ে-পায়ে চলে এসে দাঁড়িয়ে থাকে দূবে। এসেছে জেলারো আপিসের ওপাশে উত্তরপাড়ার মানুষজনও। আরও দূর-দূর গাঁ থেকে মানুষজন। যারা কুটুমবাড়ি বেড়াতে এসেছে, তারাও একবার পাক দিতে আসে ভাসানের গান শুনতে। ভাসানের গানের এমনই টান যে আসর ছেড়ে উঠতে মন চায় না। কারও হয়তো বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল, তার আর ফেরার কথা মনে থাকে না, উঠতে দেরি হয়ে যায়। কারও হয়তো সন্ধের পর রান্না চড়ানো হয়ে ওঠে না! গান শুনতে শুনতে রাত হয়ে যায় কতজনের। কেউ হাঁই তুলতে তুলতেও আসনে সেঁটে বসে থাকে। উঠি-উঠি করেও মনে হয়, আর একটু শুনে যাই, এর পর কী হল। হয়তো আগের বছর শুনেছে, তার আগের বছরও, তবু আবারও মনে হয়, দেখি এ বছর কেমন গাইছে। পুণ্যি-বৌয়ের গলায়

যেন এবছর আরও মিষ্টি সুর ভর করেছে। আহা, কী দরদ দিয়েই না গাইছে পুণ্যি!

সত্যিই পুণ্যি-বৌ এবার গাইতে গাইতে ডুবে গেছে বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনীর ভেতর। কখন যেন নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে বেহুলা বলে। ভাবছে, আর গান গাইতে গাইতে হু-হু করে কাঁদছে। বেহুলার কথা ভেবে তো কাঁদছেই, আবার ছেলে হারিয়ে যেখানে চাঁদসদাগর বিলাপ করছে গম্ভীর ভঙ্গিতে, সান্ত্বনা দিচ্ছে সনকাকে, সেখানেও হু-হু করে জল আসছে তার চোখে ঃ

শীতল চন্দন যেন আভের ছায়া
কার জন্য কান্দ প্রিয়া সকল মিছা মায়া
মিছামিছি বলি কেন ডোকর আমার
যে দিছিল লখীন্দর সে নিল আরবার ॥

কলিগুলো গাইতে গাইতেও অঝোরধারায় কেঁদে চলেছে পুণ্যি-বৌ। তার দেখাদেখি অন্যেরাও কাঁদতে শুরু করেছে। গায়েনরা তো কাঁদছেই, যারা সামনে দল বেঁধে শুনতে এসেছে তারাও পুণ্যি-বৌয়ের কপালের কথা ভেবে, তার গান শুনে হাউহাউ করে কাঁদছে।

কাঁদতে কাঁদতে একসময় রাত ভোর হয়ে আসে। এক-একজন করে গায়েন বদলায়, শ্রোতাও বদলায়। যারা সারারাত ধরে শুনেছে, তারা বাড়িমুখো রওনা দেয়, আবার একদল এসে জোটে। চারদিকে পুণ্যি-বৌএর গানের প্রশংসায় তখন ছয়লাপ। সবাই কানাকানি, ফিসফাস করে, এ কী গলা পুণ্যি-বৌএর। পুণ্যি-বৌ এবার গান গেয়েই মহাদেবের কাছে তার স্বামীর প্রাণভিক্ষা করছে। পুণ্যি-বৌয়ের গলায় এমন জাদু আছে তাই বা কে কবে জেনেছে!

তিনদিন তিনরাত একনাগাড়ে গান। এর মধ্যে কখনও আকাশ কালো করে মেঘ আসে, দু-এক পশলা ঝিরঝির করে বৃষ্টিও হয়। বৃষ্টি এলে উঠোন ছেড়ে দাওয়ায় উঠে বসে অনেকে। কেউ কেউ আবার বসেই থাকে ভিজতে ভিজতে। ভিজে কাপড়েই হাত জোড় করে প্রণাম করে মা মনসার উদ্দেশে। হয়তো ভাবে, বৃষ্টিতে ভিজে গান শুনলে বোধহয় বেশি পুণ্য হবে। তারা ভিজতে থাকে, ভিজতেই থাকে।
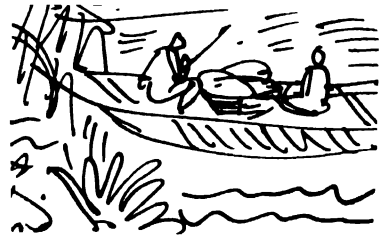
হলদেটে, মলিন, প্রায়-ছিন্ন এক তাড়া দলিল-দস্তাবেজের ভেতর চোখ ডুবিয়ে বসেছিলেন জীবেন্দ্রনাথ। যথারীতি চৌকির উপর উবু হয়ে আছেন। দু-আঙুলের ফাঁকে নীল সুতোর জ্বলন্ত বিড়ি। শুধু পরিবর্তনের মধ্যে তাঁর চোখে তারের ফ্রেমে-আঁটা একটা চশমা, তার ডাঁটি নেই। ফ্রেমের দু-দিক থেকে কালো কারের সুতো বেরিয়ে এসে পেঁচিয়ে রয়েছে দু'কানের সঙ্গে।

এতকাল চোখটা ভালোই ছিল তাঁর। দূরের কোনও জিনিয দেখতে এই আটান্ন বছর বয়সেও কোনও অসুবিধে হয় না। শুধু পড়া লেখা করতে গেলে গত ক'মাস ধরে কেবলই মনে হচ্ছিল,

কেমন ঝাপসা ঠেকছে অক্ষরগুলো। চশমাটা তাঁদের কোর্টেরই এক উকিলবাবুর বাতিল করা জিনিষ। তিনি ফেলেই দিতেন চশমাটা, হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে চোখে লাগিয়ে জীবেন্দ্রনাথ দেখেছেন, ঝাপসা অক্ষরগুলো দিব্যি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ছিঁড়ে আসা দলিলগুলোয় আজ চোখ বোলাতে গিয়ে যেমন আরাম পাচ্ছিলেন চোখে, তেমনি দলিলের বর্ণিত বিষয় অধিগত হতে মনে-মনে ধাক্কাও খাচ্ছিলেন। দলিলটা এক বেনাম জমির। আতারপুরের কেনারাম গোলদার এইসব গন্ডগোলের জমি কেনাবেচা করেই বড়লোক হয়েছে। সে-ই কাল সন্ধেবেলা এই দলিল-দস্তাবেজের তাবড়াটা তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, দেখুন তো জীবেনবাবু, তাহেরহাটের এই জমিটা কেনা যায় কি না—। কাল সকালে গিয়ে আপনের সঙ্গে একটু শলা করব—

কেনারাম গোলদারের শরীরটা দশাসই। কালো মহিষের মতো মোটাসোটা চেহারা, গায়ের রংও কালোকষ্টি, তার সঙ্গে মাথার চুল শাদা ধবধবে হওয়াতে ভারী অদ্ভুত দেখতে লাগে তাকে। লোকটা টাকার কুমীর, আবার হাড়কেপ্পনও। কিন্তু জীবেন্দ্রনাথকে বলেছে, জমিটা যদি আপনে ঝামেলামুক্ত করে দিতে পারেন, তাইলে—

বেশ মোটা টাকার আমদানি হবে তা বুঝতে পারছেন জীবেন্দ্রনাথ, কিন্তু তাতে হ্যাঁপাও অনেক। খুবই গোলমেলে জমি কিনা।

কিন্তু আপাতত জীবেন্দ্রনাথের খুবই টাকার দরকার। বাজারে অনেক টাকা ধারদেনা করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে, সংসার চালানোও একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছে গত ক'মাস ধরে। তিনি যে খুবই আতান্তরে পড়েছেন, তা তাঁর দশ-এগার বছরের নাতি শঙ্খও বুঝে গেছে। কাল সন্ধের পর যখন তাঁর কাছে এসে মাথাটা নিচু করে মিনেমিনে গলায় বলল, দাদু, আমার ইস্কুলে যাবার প্যান্টটা একদম ছিঁড়ে গেছে, তখন তার মুখ দেখে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কোনও জবাব দেননি তখন, কিন্তু সে সামনে থেকে চলে গেলে বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। একবার ইচ্ছে হয়েছিল বলেন, ওরে, দেশভাগ হয়ে গেছে বলেই এমন আতান্তর। নইলে আমরা তো এমন গরীব ছিলাম না কখনও। যা ধেনোজমি ছিল, বছরের ধান চাল হয়েও ফি-বছর বিক্রি করতে হতো। কিন্তু বলতে পারেননি। বলে লাভই বা কী হতো। ভাবতে ভাবতে জীবেন্দ্রনাথ একবার তাকালেন দাওয়ার অন্যকোণে পড়তে থাকা শঙ্খর দিকে।

হঠাৎ দেশভাগ হতে তাঁদের মাথায় যে বাজ ভেঙে পড়েছিল, তার জের আজ দশ-এগার বছর পরেও মেটেনি। কোনও দিন মিটবে কি না তাও আর জোর দিয়ে বলতে পারেন না। মনে পড়ে, দেশ স্বাধীন হবে শুনে কী উল্লাসই না ছড়িয়ে পড়েছিল সাতক্ষীরায়। উল্লাসের কারণও ছিল। কারণ তখন কেউই ভাবতে পারেনি, খুলনা জেলা পাকিস্থানের অন্তর্গত হবে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুসলিম-প্রধান রাজ্যগুলো আপাতত যুক্তরাস্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্গত থাকবে। দশবছর যুক্তরাস্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় থাকার পর তারা ঠিক করবে, তারা কেন্দ্রের সঙ্গে থাকবে কি না। জিন্না প্রথমে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, মৌলানা আজাদও সমর্থন জানিয়েছিলেন এ প্রস্তাবে। পরে শোনা গিয়েছিল, জিন্নাসাহেব বেঁকে বসেছেন। প্রস্তাবের নানা ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে কংগ্রেস আর লীগের মধ্যে। তার পরেই শোনা গেল, বাংলাদেশ দুভাগ হবে। যে-সব জেলায় হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি, সেগুলো হিন্দুস্থানের সঙ্গে রয়ে যাবে। তাতে খুলনার হিন্দুস্থানেই থাকার কথা। কিন্তু—

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। হঠাৎ পনেরই আগস্ট শোনা গেল, খুলনা পাকিস্থানেই—

এতকাল স্বাধীনতা চাওয়ার পর, স্বাধীনতা পাওয়ার উল্লাসে যখন সবাই মত্ত হয়ে আছেন, তখন এই ছোট্ট একটি খবরে বেঁচে থাকার ভিত ধসে পড়েছিল জীবেন্দ্রনাথের। স্বাধীন ভারতবর্ষে নয়, বাকি জীবন পাকিস্থানে বসবাস করতে হবে তাঁদের!

ভারত দু'ভাগ হবে এই প্রস্তাব শুনে তখনই কেন যেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠেছিলেন জীবেন্দ্রনাথ। মুসলিমরা পাকিস্থান চেয়েছিল, জিন্নার সেই দাবী স্বয়ং জওহরলাল নেহরুই মেনে নিয়েছেন শুনে চমকে উঠেছিল সবাই। নেহ্রু নাকি বলেছিলেন, তিনি গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করেছিলেন, তাইই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব। যে দেশগুলো তখন ভাগাভাগি হতে চলেছিল, সেখানকার মুসলিম অধিবাসীরাও তখন ভাগাভাগি চাইছিলেন, তাইই নেহ্রু—। তারপর র‍্যাড্‌ক্লিফের হাতে যখন কাঁচি তুলে দিয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন, তখন প্রবল আর্তনাদ করে উঠেছিল ভারতবর্ষের অগণিত মানুষ।

ভারতবর্ষের মানুষ কেউই এই ভাগাভাগি মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। পনেরই আগস্ট ঘোষিত হল মুক্তির দিন। জীবেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, তাঁদের হাতেপায়ে অন্য এক বেড়ি পরানো হল। সে দিনটা অনশনে কাটিয়েছিলেন গান্ধীজী। সারাদিন শুধু চরকা কেটেছিলেন। আর মাঝেমাঝে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, হায় রাম!

আসলে ইংরেজরা তাঁদের সেই বিখ্যাত নীতি—ডিভাইড অ্যান্ড রুল, তারই পাকাপাকি রূপায়ণ করে গেলেন এ দেশ থেকে চিরতরে বিদায় নেবার আগে।

তাঁর নাতি শঙ্খ সেদিন একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁকে, দাদু, আমরা যে গেলাসে জল খাই, সেই গেলাসে সোলেমানদাকে জল খেতে দেয়া যায় না কেন?

প্রশ্নটা শুনে বেশ কিছুক্ষণ থম্ হয়ে ছিলেন জীবেন্দ্রনাথ। এই ভাগাভাগি, বিভেদ তো এতকাল অবিভক্ত বাংলাদেশে তাঁরা তেমনভাবে আমল দেননি। এই বিষবৃক্ষে জলসেচন করে লালনপালন করেছেন ঔপনিবেশিক সাহেবরাই। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি থেকেই একসময় জন্ম নিয়েছে হিংসা, দ্বেষ। তার থেকেই জন্ম হয়েছে ছেচল্লিশের দাঙ্গা। তারই ফলস্বরূপ পাকিস্থানের সৃষ্টি।

একটা দেশ ভেঙে দুটো দেশের সৃষ্টি হল বটে, তাতে কিছু নেতার সাময়িকভাবে লাভ হল, কিন্তু নেতারা উপলব্ধি করতে পারলেন না, দেশভাগের পরেও কোটি-কোটি হিন্দু থেকে গেল পাকিস্থানে। তেমনি পাকিস্থানের জন্ম হলেও কোটি-কোটি মুসলমান যেতে পারল না সে দেশে। এই কোটি-কোটি হিন্দু, কিংবা কোটি-কোটি মুসলমান না পারল নিজের ধর্মকে ভুলে যেতে, না পারল তাদের পুরনো বসতবাড়িতে প্রাণভরে বেঁচে থাকতে। দ্বিজাতিতত্ত্ব এভাবেই বেড়া তুলে দিল হিন্দু-আর মুসলমানের মধ্যে। সে বেড়া ভেঙে ফেলা ভারী শক্ত কাজ। কী জানি কোনও দিন ভাঙবে কি না—

এত সব ভাবনার অবসরে, জীবেন্দ্রনাথের হাতের নীলসুতোর বিড়ি হঠাৎ নিভে গিয়েছে কখন। দলিলের অক্ষরগুলোও ঠিক-ঠিক যেন তার মগজে সেঁধুচ্ছিল না। সম্বিত ফিরতেই আবার দেশলাইএ ফস্ করে আগুন জ্বেলে বিড়িটা ধরালেন। তারপর আবার মনোনিবেশ করলেন তাঁর হাতের হলদেটে দলিল-দস্তাবেজের ছেঁড়া পৃষ্ঠায়।

একলপ্তে আঠারো বিঘের মতো জমি। ছ'একর তেইশশতক, গোটাটাই ধেনোজমি।

তাহেরহাটের কস্যচিৎ শম্ভুনাথ ঘোষের কাছ থেকে তিন-চারহাত বদল হয়ে বর্তমান মালিকানা কোনও এক শ্রীমতী আঙুরবালা দাসীর। তবে এতসব হাতবদলের মধ্যে অনেক 'কিন্তু' জড়িয়ে আছে জমিটার আসল মালিকানায়। জমিটা আসলে শম্ভুনাথ ঘোষের বেনামে কেনা। প্রকৃত মালিক অন্য। তাছাড়া অনেক শরিকানা গোলমালও জড়িয়ে রয়েছে এই বিবর্ণ কড়কড়ে হয়ে যাওয়া দলিলের পাতায় পাতায়। এ জমি কেনা কি ঠিক হবে!

এতসব ভাবনার মধ্যে হঠাৎ তাঁদের বেড়ায় শব্দ হতে চোখ তুলে তাকালেন জীবেন্দ্রনাথ। সকালেই আসার কথা ছিল কেনারাম গোলদারের। ঠিক সময় বুঝে এসেওছে। হাতে একটা শতচ্ছিন্ন ছাতি, পরনে হাঁটুসোর আটহাতি ধুতি, গায়ে সবুজ হাফশার্ট। কেনারাম গোলদার বেড়া পার হয়ে এসে ধপ্ করে বসল তাঁর জলচৌকির পাশেই পাতা একটা চাটাইএর ওপব। ঘড়ঘড়ে গলায় জিজ্ঞাসা করল, দলিলটা পড়লেন?

জীবেন্দ্রনাথ তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়লেন, দ্যাখলাম খানিক।

জীবেন্দ্রনাথ আর কিছু বলেন কি না শোনার জন্য গভীর কৌতূহল নিয়ে তাঁর মুখের দিকে কিয়ৎকাল তাকিয়ে রইল কেনারাম গোলদার। কিন্তু জীবেন্দ্রনাথ ফুকফুক করে বিড়ি টানছেন আর চোখ বুজে কী যেন ভাবছেন। চট করে কেনারামকে কিছু পরামর্শ দেবেন কি না বোধহয় তাইই চিন্তা করছেন একমনে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর কেনারাম আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, কিছু বুঝতি পালেন, জীবেনবাবু?

জীবেন্দ্রনাথ চোখদুটো খুলে আবার তাকালেন কেনারামের দিকে। জমিজমা কেনার ব্যাপারে লোকটার খুব সুনাম নেই। ভীষণ ধূর্ত আর চশমখোর বলেই এ তল্লাটে পরিচিত। বহু লোকের সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে কিনে তার এখন মেলাই জমিজমা, সম্পত্তি। তাহেরহাটের সম্পত্তিটাও যে ভারী গোলমেলে তা দলিলগুলো ঘেঁটেঘুটে এরমধ্যেই উপলব্ধি করেছেন তিনি। বিড়িতে মস্ত একটা টান দিয়ে বললেন, জমিটা খুব একটা পোষ্কার নয়, এটুকুন বুঝতি পারছি।

কেনারাম গোলদার সাগ্রহে বলে উঠল, এঁজ্ঞে, সেইজন্যিই তো আপনের লগে এইছি, জীবেনবাবু, এ দিগরে আপনের মতো জমিজমার রকম আর কেউ বোঝে না, তা সন্নলে বলে।

ঠিক এই সময় বিড়ির ধোঁয়া বুকে বেধে যাওয়ায় কাশির একটা দমক লেগে গেল জীবেন্দ্রনাথের। মিনিট কয়েকের চেষ্টায় তা সামলে নিয়ে বললেন, বেনাম জমি তো। সমিস্যেটা তাই নিয়েই। তিপ্পান্নসালে 'জমিদারি দখল আইন' পাশ হয়েছে। পঞ্চান্নতে আবার 'ভূমি সংস্কার আইন' পাশ করেছে গভর্ণমেন্ট। জমিদারি দখল আইনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটিয়েছেন সরকার। তাতে সমস্ত জমিদারি, মধ্যস্বত্ব ও খাজনাভোগী স্বত্ব নিয়ে সরকার জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবে। এইসব বেনামি জমি মানেই সেই জমিদারদেব জমি। সুতরাং চট করে কিছু বলা যাবে না। আর একটু খোঁজখবর নিতে হবে, গোলদার।

কেনারাম গেলদার বোধহয় একটু হতাশ হল, বলল, সে তো আমিও বুঝিছি, জীবেনবাবু। এ জমি কিনলি মামলা টামলা হবেই সেও জানি। তার জন্যি তো আপনেই আছেন। সেইজন্যিই তো আপনের কাছে আসা—

জীবেন্দ্রনাথ আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে ভাবলেন। এ মামলা দায়ের করলে তাঁর মক্কেলের কতদূর জেতার আশা আছে বোধহয় তাইই ভাবলেন নিবিষ্ট হয়ে। ফের চোখ খুলে বললেন, ঠিক আছে, তাইলে আমার উকিলবাবুর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে নিই, কী বলো?

--সে আপনে যা ভালো মনে করেন, জীবেনবাবু। তবে মামলায় জিতাই দিলি আপনেরে খুশি করে দেবানে, তা আপনেরে কথা দিতি পারি।

দু-আঙুলের ফাঁকে ধরা বিড়িটা ততক্ষণে শেষ হয়ে এসেছিল। আর একবার টান দিতে গিয়ে বুঝলেন, বিড়ির আগুন নিভে এসেছে। বুঝতে পেরে বিড়িটার শেষটুকু ছুড়ে দিলেন উঠোনের কোণের দিকে। নতুন ভিতটার ঠিক কাছেই পড়ল সেটা। তৎক্ষণাৎ তাঁর নজর গিয়ে ঠেক খেল নতুন ভিতের ওপর বাঁশের ফ্রেম লাগানো আটচালা ঘরখানার দিকে। মাত্র কয়েকশো টালি লাগাতে পারলেই মাথার উপর নীল আকাশটা ঢাকা পড়ে যায়। তারপর কঞ্চির বেড়া দিয়ে তার ওপর মাটি লেপে দিলেই আস্ত একখানা ঘর হয়ে যাবে। মাত্র কয়েকশো টালি। তাই এখনও তাঁর কাছে অনেক দূরের পথ। বেশ কয়েকমাস ধরে একটু-একটু করে তৈয়ের করছেন ঘরখানা। সেই শীতের গোড়ায় ভিতে মাটি-ফেলার পর সাত-আট মাস হতে চলল। এখনও ঘরখানা বাসযোগ্য করে উঠতে পারেননি। অথচ এই গোলপাতার চালের ঘরখানায় একটু বৃষ্টি হলেই ঘরের ভেতর জল ঢেলখেল যাচ্ছে। মাসখানেক আগে ঘরামি ডাকিয়ে দু'পণ খড় গুঁজে-গেজে কোনও ক্রমে ঠেকা দিয়েছেন। কিন্তু ভন্নার জল তাতে শানাচ্ছে না। এই তো গত পরশুই মাঝরাতে ভন্না আসতে বাড়িসুদ্ধ লোক রাতভর জেগে কাটাতে হল। স্নেহবাসিনী সারাবাড়িতে কত আর বাটি-ডেকচি-গামলা বসিয়ে ঠেকা দেবে। গোটা চালটাই তো ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

কেনারাম গোলদারের শেষ কথাটা শুনে মনে একটু বলভরসা পেলেন জীবেন্দ্রনাথ। যদি তাকে মামলায় সত্যিই জিতিয়ে দিতে পারেন, তাহলে হয়তো নতুন ঘরের চালে বর্ষায় না হোক পুজোর আগেই টালি বসিয়ে দিতে পারবেন।

দলিল-দস্তাবেজগুলো একটা লাল-শাদায় মেশানো দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাধতে জীবেন্দ্রনাথ বললেন, তইলে তুমি সামনের সপ্তায় এসো, গোলদার। আমি খোঁজখবরগুলো এর মধ্যে জোগাড় করে রাখি।

কেনারাম গোলদার অবশ্য চাটাই ছেড়ে ওঠার লক্ষণ দেখালো না। তার শার্টের ঝুল পকেট থেকে দুটো বিড়ি বার করে তার একটা জীবেন্দ্রনাথের হাতে দিয়ে অন্যটা নিজের ঠোঁটে গুঁজে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে হঠাৎ বলল, হীরালালবাবু তাহলে হেরে গেলেন?

হীরালালের প্রসঙ্গ উঠতেই জীবেন্দ্রনাথ সহসা বিমর্ষ হয়ে গেলেন। প্রায় দু-তিন মাস ধরে ভোটের কাজে খুবই ছোটাছুটি করেছিলেন। এখানে-ওখানে মিটিংএ যাওয়া, হীরালালের হয়ে প্রচার করা, তার সঙ্গে পায়ে হেঁটে বিভিন্ন গাঁয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ভোটারদের কাছে অনুরোধ জানানো, কোথায় মিটিং হবে, কোথায় পোস্টার লাগানো হবে, এ সবই ওদের পার্টি-অফিসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে করেছেন। এমনকি ভোটের দিন তাঁর নাতি শঙ্খকে নিয়ে একটা বুথ-অফিসে যাবতীয় কাজের দায়িত্বে ছিলেন। মনে মনে একটাই আশা ছিল, যদি হীরালাল জেতে, এম.এল.এ হয়, তাহলে তাঁর কোনও একটা ছেলের হয়তো চাকরি হতে পারে।

কিন্তু ভোটের ফলাফল হয়েছে খুবই হতাশাব্যঞ্জক। যেখানে কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছে চব্বিশ হাজারের ওপর ভোট, কম্যুনিস্টপ্রার্থী অনিল আইন পেয়েছে বারো হাজারের কিছু বেশি, সেখানে কংগ্রেস কর্মী পরিষদের হয়ে লড়ে হীরালাল অধিকারী পেয়েছে মাত্র তিন হাজার দুশো বাইশটি ভোট। যাকে গো-হারান বলে তাই, অথচ ভোটের আগেরদিন পর্যন্ত এমন বিশ্রী ফলাফল হবে তা কেউ অনুমানও করতে পারেননি। যে গাঁয়েই গিয়েছেন, সব ভোটাররাই

একবাক্যে বলেছে, হীরালাল অধিকারীকেই তারা ভোট দেবে।

ভাবতে ভাবতে জীবেন্দ্রনাথের চোয়ালটা হঠাৎ শক্ত হয়ে এল, যতসব মিথ্যেবাদীর দল।

পরক্ষণেই তাঁর শীর্ণ মুখখানার চামড়া নরম হয়ে এল। গোলদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, হয়তো কম্যুনিস্টপার্টির হয়ে দাঁড়ালে হীরালাল জিতে যেত। কিন্তু চিরকাল কংগ্রেস করে এসেছে, হঠাৎ রাতারাতি কম্যুনিস্ট হয়ই বা কী করে, বলো। ওদিকে দ্যাখো না, স্বয়ং চিফ মিনিস্টার বিধান রায়ই তো হারতে হারতে বেঁচে গেলেন এবার। কম্যুস্টিদলের মহম্মদ ইসমাইলের সঙ্গে ভোটে দাঁড়িয়ে মাত্র চারশো চল্লিশ ভোটে জিতলেন। একে কি জেতা বলে? মুখ্যমন্ত্রী বলে কথা!

কেনারাম গোলদার তার পাকা তালের মতো মস্ত মাথাটা নাড়তে নাড়তে বলল, যা বলেছেন, জীবেনবাবু, এ তো প্রায় হারা-ই।

জীবেন্দ্রনাথ তখনও বেশ উত্তেজিত হয়ে আছেন ভেতরে ভেতরে। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন, এও একরকম হারা-ই বলতে পারো। আর হারবেন না-ই বা কেন? গত দেড় দু'বছর ধরে আর কিছুই তো করতে পারছেন না বাংলার জন্যে। এই ধরো, গতবছর সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট হঠাৎ 'মাসুল সমীকরণ নীতি' চালু করে দিল। তাতে ভারতের সর্বত্র লোহা আর ইস্পাতের রেল-পরিবহন খরচ এক করে দেওয়া হল, এতে লাভ কী হল? তাতে মার খেলো একমাত্র আমাদের রাজ্যই। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প থেকে আয় করা মুনাফা অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ করার সুযোগ করে দেওয়া হল। তাতে লাভবান হল পশ্চিম আর উত্তরভারতের রাজ্যগুলো। সেখানে সব বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠেছে। আর আমাদের রাজ্যে? ওই এক দুর্গাপুরের পত্তন। ব্যস্। আর কোনও শিল্পই গড়ে উঠল না। এখন ঘরে ঘরে বেকার। সব পুঁজি চলে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে।

বলতে বলতে আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন জীবেন্দ্রনাথ, বিড়িতে পর-পর কয়েকবার ফুক-ফুক করে টান দিয়ে বললেন, আর উদ্বাস্তুদের জন্যিই বা উনি কী করেছেন? ওদিকে পাঞ্জাবে যখন উদ্বাস্তু সমস্যা প্রায় সমাধান হয়ে এসেছে, তখন আমাদের রাজ্যের উদ্বাস্তুরা সামান্য থাকা-খাওয়ার সংস্থানটুকুও করে উঠতি পারছে না। এতগুলো লোক এ-দেশে এসে স্রেফ ভিখিরি হয়ে গেল। ভাবা যায়!

একটু থেমে আবার বললেন, চারদিকে কী অভাব চলছে ভাবতি পারো? গতবচ্ছর এক-এক মণ চালে চারটাকা করে দাম বেড়েছে। গাঁয়ে গাঁয়ে দুর্ভিক্ষ হয়ি গেল, অথচ সরকারের টনক নড়ছে না। ফাটকাবাজ, মুনাফাখোররা দু'হাতে পয়সা লুটছে। তার জন্যিই বা সরকার কী করেছে? এখন শুনতি পারছি, আংশিক নিয়ন্ত্রণ চালু করতি চাইছেন ওঁরা।

একদমে অনেকগুলো কথা বলে এবার হাঁপাতে লাগলেন জীবেন্দ্রনাথ। উত্তেজনায়, ক্রোধে ক্ষোভে মুখের শিরাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এত বড় একটা সংসার চালাতে গিয়ে কীই যে হিমশিম খাচ্ছেন তা আর কে-ই বা বুঝতে পারছে। দাম বেড়ে যাচ্ছে প্রতিটি জিনিষের। বাজারে গেলে যা-কিছু কিনতে যান, সবই আক্রা। দু-তিনটে ছেলে চাকরি খুঁজে খুঁজে হদ্দ হয়ে গেল, কেউ কোনও আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না। বাবা হয়ে জীবেন্দ্রনাথ যে কী পরিমাণ অশান্তি ভোগ করছেন—

এর মধ্যে রনোর পরীক্ষার ফল বের হয়ে গেছে। স্কুল ফাইনাল পাশ দিয়েছে বেশ ভালোভাবেই, কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার খবর নিতে গিয়ে শুনে এসেছে, মেলাই টাকা না

জোগাড় না করতে পারলে ভর্তি হওয়া যাবে না। তার ওপর মাস-মাস একগাদা টাকা বেতন দিতে হবে। এতদিন রিফিউজি হওয়ার সুবাদে স্কুলে মাইনে দিতে হত না মণির কিংবা নাতি শঙ্খর। এখন শুনতে পাচ্ছেন, সরকার তাও তুলে দিচ্ছে।

কেনারাম গোলদার বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল জীবেন্দ্রনাথকে এতখানি উত্তেজিত হতে দেখে, মাথা নেড়ে বলল, যা বলিছেন, জীবেনবাবু, চারদিকে বড় অভাব।

জীবেন্দ্রনাথ তখনও হাঁপাচ্ছিলেন। দরজার কাছে স্নেহবাসিনীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, এক গেলাস জল দাও তো। গলাটা যেন শুকিয়ে এসেছে।

স্নেহবাসিনী জল এনে দিতে তা ঢকঢক করে খেলেন অনেকখানি। তারপর কেনারামের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাইলে ওই কথাই রইল, গোলদার। সামনের সপ্তায়—

কেনারাম গোলদার এবার চাটাই থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর যাওয়ার আগে হঠাৎ গলাটা নামিয়ে বলল, মামলাটা জিতাই দ্যান, জীবেনবাবু। বেধবার জমি তো। বেশি লড়বার খ্যামতা নেই। যদি জিততি পারি, আপনেরেও দু-চারবিঘে জমি লিখে দেবানে। বচ্ছরে অন্তত ক'মাস স্বচ্ছন্দে খেয়ে-পরে বাঁচবেন।

এতক্ষণ অন্য একটা ঘোরের ভেতর ছিলেন জীবেন্দ্রনাথ। হঠাৎ কেনারামের কথায় চমক ভেঙে বললেন, বিধবার জমি?

—হ্যাঁ, জীবেনবাবু, ওই যে আঙুরবালা দাসী, ওই মাগী তো বেধবা হয়িছে ক'মাস আগে।

জীবেন্দ্রনাথ চমকে উঠে বললেন, সে কি? এ জমি যে এক বিধবার তা তো এতক্ষণ বলোনি আমাকে? বিধবার জমি, তাকে ঠকিয়ে তুমি কিনবে, আর আমি মামলা লড়ে তোমাকে জিতিয়ে দেব তা ভাবলে কী করে, হ্যাঁ?

বলে হঠাৎ তাঁর জলচৌকির ওপর রাখা দলিলের তাব্‌ড়া কেনারামের দিকে সজোরে ছুড়ে দিয়ে রুক্ষস্বরে বললেন, যাও, যাও, অন্য মুহুরি দ্যাখোগে যাও। এই জীবেন চাটুজ্জে কখনও বিধবার জমি ঠকিয়ে কিনতে দেবে না, বুঝলে? এর'ম দুর্মতি কখনও আমার হয়নি, হবেও না—।

কেনারাম ভয়ে-ভয়ে দলিলের তাব্‌ড়া কুড়িয়ে নিয়ে হাঁটা দিল রাস্তার দিকে। সেদিকে কিছুক্ষণ ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে হঠাৎ চোখ ফেরালেন শঙ্খর দিকে, তোর বাবা একখান পত্তর দেছে না কাল? তাতে কী লিখেছে?

গরমের ছুটির ঠিক আগেই শঙ্খর বাবা ব্রজনাথের একখানা চিঠি এসেছিল। চিঠিতে লিখেছিলেন, শঙ্খকে তিনি সাগরদহে রাখতে চান ছুটির সময়ে। শঙ্খর মা অনেকদিন ছেলেকে দেখেননি বলে মন খারাপ করে আছে। ঠাকুর্দা অবশ্য পত্রপাঠ উত্তর দিয়ে দিয়েছেন, সামার ভেকেশনের পরই শঙ্খর হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা। এসময় বেড়াতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং পুজোর ছুটিতে—

সাগরদ'য় যেতে পারেনি বলে শঙ্খর আফসোস হয়নি তা নয়। এর মধ্যে সে জানতে পেরেছে তার আরও একটি নতুন বোন হয়েছে। নতুন বোনটি কেমন দেখতে হয়েছে, সে ফিকফিক করে হাসে কি না, খুব ফর্সা হয়েছে কি না, এ সব জানতে ভারী ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু ঠাকুর্দা বলেছেন, আগে পড়াশুনো, পরীক্ষা তারপর আনন্দ করতে যাওয়া।

ইতিমধ্যে গরমের ছুটি শেষ হয়ে ইস্কুল খুলে গেছে। একরাশ উত্তেজনার মধ্যে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষাও একসময় শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষার পর কয়েকদিন কারও দিকে ভালো করে তাকাতে পারল না। কেমন পরীক্ষা দিয়েছে কে জানে!

পরীক্ষার পর আবার যথারীতি ক্লাস শুরু হয়ে গেল। ততদিনে পুরো বর্ষার মরসুম শুরু হয়ে গেছে ঈশ্বরীপুরে। জুলাই পেরিয়ে আগস্টের মাঝামাঝি দুর্দান্ত বৃষ্টি হল পর পর কয়েকদিন। ইস্কুলে যাওয়া আসার পথে দু-একদিন বেশ জব্বর ভিজে গেল তারা। তবু ভাগ্যি, অসুখবিসুখ করেনি। রাস্তাঘাট কাদায় কাদা। বিশেষ করে জেলারো-আপিস থেকে তাদের বাড়ি পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটুকু হাঁটুতক কাদা। সে কাদা ভেঙে ইস্কুলে যাওয়া-আসা এক কঠিন ব্যায়াম। কয়েকদিন মাঝরাত্তিরে গোলপাতার চাল ফুঁড়ে এমন জল পড়তে শুরু করল যে জেগে বসে থাকতে হল বাকি রাত।

মাঝরাতে উঠে জেগে বসে থাকাটাও শঙ্খর কাছে এক আশ্চর্য অনুভূতি। কড়কড় করে ডেকে ওঠা বিদ্যুতের আলোয় তখন দেখতে পায়, হু-হু ভন্নায় ভিজে যাচ্ছে ঘুমিয়ে থাকা বিশাল পৃথিবী। ভিজছে সামনের একফালি খেত, আমবাগান, সজনের নিরীহ ডাল। ভিজছে শঙ্খরা সবাই। শঙ্খ মেঝেময় ছুটে ছুটে বাটি পাতছে এখানে-ওখানে। জল ভরে এলে ফেলে দিয়ে আসছে বাইরের উঠোনে। সেও তার কাছে যেন এক চমৎকার খেলা।

এর মধ্যে তাদের ইস্কুলে একটা সাড়া-জাগানো ঘটনা ঘটে গেল। নতুন একজন ইংরেজির মাস্টারমশাই এসে যোগ দিলেন মাদারিপুর হাইস্কুলে। খুব গম্ভীর আর ভারিক্কি স্বভাবের মানুষ এই রাসবিহারীবাবু। বয়সে মোটেই নবীন নন। বরং মাথায় মস্ত একখানা টাক পড়েছে। যেক'টি চুল আছে তাও কাঁচায়-পাকায় মেশানো। লম্বা, সুগঠিত চেহারা, ফর্সা টকটকে গায়ের রং, চোখে রুপোলি ফ্রেমের চশমা। ইস্কুলে যোগ দিয়েই কিন্তু বেশ হৈ-চৈ ফেলে দিলেন কয়েকদিনের মধ্যে।

এর আগে আরও অনেকগুলি ইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন রাসবিহারীবাবু। শেষ যে ইস্কুলে ছিলেন, সেটি হুগলি জেলার কোনও মফস্বল শহরে। সেখানে শিক্ষকদের সঙ্গে ঠিক বনিবনা না হওয়ায় আচমকা চাকরি ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছেন নিজের গাঁয়ে। অবসর নিতে নাকি আরও দশবছরের মতো বাকি ছিল।

রাসবিহারীবাবু গাঁয়ে ফিরে এসে বসবাস করছেন শুনে ইস্কুলের সম্পাদক স্বয়ং তাঁর বাড়িতে যোগাযোগ করেছিলেন। গিয়ে বলেছেন, মাদারিপুর হাইস্কুলে একজন ইংরেজির টিচারের ভারী দরকার। আপনার তো রিটায়ারমেন্টের বয়সের এখনও দেরি আছে। যদি এ ক'বছর আপনি গাঁয়ের স্কুলের উপকার করেন তো ছেলেগুলো বর্তে যায়। ভালো করে ইংরেজি শিখতে পারে। একা হেডমাস্টারমশাই আর সামাল দিয়ে উঠতে পারছেন না।

দোনামোনা করে শেষপর্যন্ত রাজি হয়ে গিয়েছেন রাসবিহারীবাবু। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেতে যেদিন যোগদান করলেন, সেদিনই হেডমাস্টারমশাইকে বলেছেন, আমি চাকরির ব্যাপারে ভীষণ পাঙ্কুয়াল। আমি চাই, অন্য টিচাররাও যেন পাঙ্কুয়ালিটি বজায় রাখে।

হেডমাস্টারমশাই অবশ্য গম্ভীরভাবে বলেছেন, আমার স্কুলের সব টিচাররাই পাঙ্কুয়াল। শুধু পাঙ্কুয়াল নন, সিনসিয়ারও। সবাই মন দিয়ে পড়ান।

কিন্তু পাঙ্কুয়ালিটি বলতে রাসবিহারীবাবু ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন তা বোধহয় কেউই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি।

ঠিক বেলা এগারটায় ইস্কুলের মস্ত বারান্দায় প্রেয়ার হয় শঙ্খদের। ক্লাসে বইখাতা রেখে সব ছাত্ররাই একে-একে জড়ো হয় বারান্দায়। হেডমাস্টারমশাই এসে দাঁড়ান সামনে। তাঁর দু'পাশে অন্য সমস্ত শিক্ষকরা। সবাই এসে দাঁড়াতে হেডমাস্টারমশাই তাঁর তীক্ষ্ণ চাউনি ছুড়ে একলহমা জরিপ করেন উপস্থিতির পরিমাণকে। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বলে ওঠেন, সাইলেন্স প্লিজ—

সবাই চুপ করতেই তিনি মাথাটা সামনের দিকে অনেকটা নিচু করে, হাতদুটো পেছনে ন্যস্ত করে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে থাকেন, ওহ্ গড্, গিভ আস দাউ ব্লেজিংস...।

মাত্র সাত-আটটি পংক্তি। তবু সামান্য কয়েকটি পংক্তির মধ্যেই যেন লুকানো রয়েছে নিজেকে সারাদিন পবিত্র রাখার, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার এক অমোঘ শক্তি। তাঁর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয় ছাত্রদের। বিড়বিড় করে নড়তে থাকে প্রত্যেকের ঠোঁট। তারপর 'আমেন' বলতেই ছাত্ররা 'আমেন' বলে ঢুকে যায় যে-যার ক্লাস-ঘরে। টিচাররা ক্লাসে ঢোকেন আরও অন্তত পাঁচ-দশমিনিট পর।

রাসবিহারীবাবু কিন্তু ক্লাসে ঢুকলেন প্রেয়ার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট না করে। ক্লাস এইটের ছাত্ররা তখনও সবাই ক্লাসে ঢুকতে পারেনি। ফাঁকা ক্লাসেই পড়ানো শুরু করে দিয়েছেন। অন্য ছেলেরা একে-একে 'মে আই কাম ইন স্যার' বলে ঢোকার পর পড়াতে পড়াতে একলহমা থমকে দাঁড়িয়ে রাসবিহারীবাবু বলেছেন, ইউ সি, আই মিন বিজনেস। এগারটা পাঁচের ক্লাস মানে আমি এগারটা পাঁচেই ঢুকব। একমিনিট আগেও নয়, একমিনিট পরেও নয়।

ঠিক এগারটা পঁয়তাল্লিশে প্রথম ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীবাবু ঠিক যে-পর্যন্ত পড়াতে পেরেছিলেন, সেখানেই থেমে গিয়ে বললেন, আজ এই পর্যন্ত থাক। আবার নেক্সট্ ডে। ক্লাস থেকে বেরিয়ে অন্য টিচাররা তাঁদের টিচার্সরুমে ফিরে যান দু-চারমিনিট বিশ্রাম নিতে। কেউ-কেউ দশ-বারো মিনিটও বসে থাকেন সেখানে। রাসবিহারীবাবু কিন্তু একদণ্ডও বিশ্রাম নেওয়ার কথা ভাবলেন না। তাঁর দ্বিতীয় ক্লাসটা ছিল ক্লাস সিক্সে। সেখানে তখন মনোযোগ দিয়ে অঙ্ক পড়াচ্ছিলেন হরিসাধনবাবু। ঘণ্টা পড়ে গেছে, অথচ হরিসাধনবাবু তখনও পড়াচ্ছেন দেখে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন রাসবিহারীবাবু। তারপর প্রথমে একবার গলা খাঁকারি দিলেন। তাতেও হরিসাধনবাবুর টনক নড়ল না দেখে সোজা ঢুকে গেলেন ক্লাসের

ভেতর। গিয়ে বললেন, আপনি বোধহয় শুনতে পাননি হরিসাধনবাবু, ঘণ্টা অনেকক্ষণ আগেই পড়ে গেছে।

হরিসাধনবাবু একটু অবাক হলেন, বললেন, ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমার পড়ানো শেষ হয়নি এখনও।

রাসবিহারীবাবু মুচকি হেসে বললেন, কিন্তু আমার ক্লাস সিক্সে এগারটা পঁয়তাল্লিশে ক্লাস। এখন আমার ঘড়িতে এগারটা উনপঞ্চাশ হয়ে গেছে।

হরিসাধনবাবু ঠিক প্রসন্ন হলেন না, ভুরুতে সামান্য কোঁচ ফেলে বললেন, সে তো প্রথম ক্লাসের পর টিচার্সরুমে পাঁচ-দশমিনিট বিশ্রাম নিয়ে আসতে পারতেন। সবাই তো টিচার্সরুম ঘুরে ক্লাসে আসে।

ঘাড় নেড়ে রাসবিহারীবাবু বললেন, তা কী করে হয়। রুটিনে লেখা আছে এগারটা পয়ঁতাল্লিশে ক্লাস। আমি এগারটা পঞ্চাশ-পঞ্চান্নতে ক্লাসে ঢুকব, লেট করে, সে হয় না। ববং আপনারা অভ্যাস বদল করুন।

হরিসাধনবাবু বিরক্তিভরে বললেন, কীসের অভ্যাস বদল করব?

—আমি লক্ষ করলাম, সব টিচারই পাঁচমিনিট দশমিনিট পর ক্লাসে ঢুকছেন। পাঁচ-দশমিনিট লেটে ক্লাসে ঢোকেন, অথচ ক্লাসের শেষে ঘণ্টা পড়ার পব অতিরিক্ত পাঁচ-দশমিনিট পড়ান' তা না পড়িয়ে ঠিক-ঠিক সময়ে ক্লাসে ঢুকে ঠিক-ঠিক সময়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো নয় কি? তাতে রুটিনের সময় মেনে চলা যায়। তাতে নিয়মানুবর্তিতা বজায় থাকে। তা থেকে ছাত্ররাও শিক্ষা পায়।

হরিসাধনবাবুর গৌরবর্ণ মুখ রাগে, অপমানে লাল টকটকে হয়ে উঠল। তাঁরও বাইশ-তেইশ বছর চাকরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই ইস্কুলে পদমর্যাদায়ও তিনি যথেষ্ট সিনিয়র। একজন নতুন টিচার, যিনি মাত্র আজই যোগদান করেছেন স্কুলে, তাঁর কাছ থেকে নিয়মানুবর্তিতা শিখতে হবে এ তিনি ভাবতেও পারেন না। বিশেষ করে ক্লাসের মধ্যেই, এতগুলো ছাত্রের সামনে। তৎক্ষণাৎ টেবিলের ওপর থেকে চক, ডাস্টার, রোলকলের খাতা তুলে নিয়ে রক্তবর্ণ মুখে বেরিয়ে গেলেন হন হন করে।

রাসবিহারীবাবু যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে ছাত্রদের দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের আজ কী পড়া আছে? প্রোজ অর পোয়েট্রি?

'পোয়েট্রি' শুনে বললেন, ঠিক আছে, শেলীর এই ছোট্ট কবিতাটা দিয়েই আমাদের পড়া শুরু করি আজ। আমি প্রথম প্রথম বাংলাতেই কথা বলব তোমাদের সঙ্গে। তারপর কিছুটা বাংলায় কিছুটা ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করব, কিছুদিন পর তোমরা সড়োগড়ো হয়ে গেলে ইংরেজিতেই পুরো সময়টা কথা বলব। তোমরাও চেষ্টা করবে ইংরেজিতে কথা বলতে। বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুল, প্রথম প্রথম হয়তো তোমরা ঠিক পারবে না। ছ'মাস কি আটমাস পরে দেখবে, অনেকেই ইংরেজিতে কথা বলতে পারছ। বড় হয়ে বুঝতে পারবে ইংরেজিতে কথা বলাটা কতটা জরুরি।

শঙ্খরা সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছিল নতুন মাস্টারমশাইএর কথাবার্তা, হাবভাব। ইস্কুলে যে-কোনও নতুন টিচার এলেই ছাত্রদের ভেতরে জড়ো হয় একধরনের কৌতূহল। কিছুটা ত্রাসও। নতুন টিচার কতটা রাগী, কেমন পড়ান, বেত নিয়ে ক্লাসে আসেন কি না, এইসব কূটপ্রশ্ন ঘোরাফেরা করে ছাত্রদের আলোচনার মধ্যে। রাসবিহারীবাবু প্রথমদিন ইস্কুলে এসেই এমন

সোরগোল বাধিয়ে দেবেন তা কেউই বুঝতে পারেননি। কিন্তু ইংরেজি বইটা খুলে যখন পড়াতে শুরু করলেন, তখন তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট ইংরেজি উচ্চারণ, কবিতা পড়ার চমৎকার ভঙ্গি সবাইকে মুগ্ধ করার মতো। প্রতিটি পংক্তি ধরে-ধরে ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনীসহ এমন প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে শঙ্খরা চমৎকৃত, বিস্মিত। এর আগে নীচের ক্লাসে যিনি ইংরেজি পড়াতেন সেই মণিবাবু দীর্ঘমেয়াদী ছুটিতে গেছেন। মণিবাবু ছিলেন ভীষণ খিটখিটে, বদরাগী ধরনের। একটুতেই মেজাজ হারিয়ে ফেলতেন ক্লাসে। অসুস্থতার জন্যে প্রায়ই ইস্কুলে আসতে পারতেন না। তাঁর পরিবর্তে রাসবিহারীবাবুকে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে পেয়ে শঙ্খরা বর্তে গেল।

ছাত্ররা রাসবিহারীবাবুকে পেয়ে খুশি হলেও তীব্র আলোড়ন শুরু হয়ে গেল শিক্ষকদের মধ্যে। আগে টিচার্সরুমে শিক্ষকরা দুই পিরিয়ডের ফাঁকে ফাঁকে দু'দণ্ড বসে আড্ডা মারতেন, তর্ক বিতর্ক করতেন নানা বিষয়ে। কেউ একটু জিরিয়ে নিতেন হাতপাখা নেড়ে। এখন রাসবিহারীবাবু আসার পর থেকে সবাই একটু সন্ত্রস্ত। ইচ্ছে না থাকলেও ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে ঢুকতে হয়, পরের ঘণ্টা বাজতেই ক্লাস ছাড়তে হয়। বিশেষ করে আগে বা পরে রাসবিহারীবাবুর ক্লাস থাকলে। আড্ডা মারার ব্যাপারটাও কমে এল বেশ। ছাত্ররাও দু'টো ক্লাসের মাঝখানে, যতক্ষণ শিক্ষক না আসতেন, চুটিয়ে চেঁচামেচি, হৈ-চৈ করত ক্লাসের ভেতর। এখন তারাও বেশ জব্দ হয়ে গেল নতুন মাস্টারমশাইএর কল্যাণে।

বলতে গেলে কয়েকদিনের মধ্যে ইস্কুলে এক অন্যধরনের নিয়মানুবর্তিতা চালু হয়ে গেল। শুধু তাইই নয়, অফ্-পিরিয়ডে, অথবা টিফিনের সময়ও রাসবিহারীবাবু চুপচাপ বসে থাকেন না। হয়তো হেড্‌মাস্টারমশাইএর কোনও জরুরি রিপোর্ট তৈরি করার দরকার, কিংবা অফিস-ক্লার্কের হাতে অনেক কাজ জমে গেছে, অমনি রাসবিহারীবাবু তাঁদের সঙ্গে সমান তালে হাত লাগাবেন। অথবা রোল-কলের রেজিস্টারগুলো ছিঁড়ে গেছে, কিংবা আল্‌গা হয়ে এসেছে ভেতরের পৃষ্ঠাগুলো, তাতে আঠা লাগিয়ে, মলাট দিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে তুলছেন প্রতিনিয়ত। বলতেন, চুপচাপ বসে আড্ডা না মেরে হাতের কাজগুলো সেরে ফেললে আমাদেরই সুবিধে।

অন্য টিচাররা সেসব দেখেশুনে গজগজ করতেন মনে মনে। তাঁদের অনেকেরই বয়স কম। স্কুলের অবসর সময়টুকু দু'দণ্ড আলোচনা, তর্কবিতর্কে মেতে থাকার মধ্যে একটা আলাদা আরাম আছে। যে-কাজ অন্যের করা উচিত, সে-কাজ আগ্ বাড়িয়ে করাটা তাঁরা মোটেই পছন্দ করলেন না। কখনও নিজেদের মধ্যে তাঁরা ফিসফিস করতেন, একেই তো স্কুলে চাকরির কোনও মর্যাদা নেই, তার ওপর কেরানি কি দফতরির কাজও যদি করতে হয়- -

এর মধ্যে রাসবিহারীবাবু আরও একটি গুরুতর কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। অঙ্ক তৈরি না করে আসার জন্যে ক্লাস সেভেনের একটি ছাত্রকে ভীষণ বকাবকি করছিলেন হরিসাধনবাবু। ছেলেটিকে ধমক দিতে দিতে বললেন, পরের দিন পড়া তৈরি করে না এলে একচড়ে তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।

সেসময় পাশের ক্লাসে ইংরেজি পড়াচ্ছিলেন রাসবিহারীবাবু। রাশভারী হরিসাধনবাবুর চিৎকারে এমনিতেই ইংরেজির মতোন একটি জটিল বিষয় পড়াতে রাসবিহারীবাবুর খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। তার উপর শেষ কথাটি কানে যেতে বিচলিত হয়ে পড়লেন হঠাৎ। চট্ করে তাঁর পড়ানো থামিয়ে চলে গেলেন হরিসাধনবাবুর ক্লাসে, বললেন, পরদিন ছেলেটি যদি সত্যিই পড়া তৈরি করে না আসে, তাহলে একচড়ে ওর মুণ্ডুটা কি আপনি ঘুরিয়ে দিতে পারবেন?

হরিসাধনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, কী বলতে চাইছেন আপনি?

—আমি বলতে চাইছি, একচড়ে সত্যিই ওর মুণ্ডু আপনি ঘুরিয়ে দিতে পারবেন না। ঘোরানো সম্ভবও নয়, কারণ মুণ্ডু ঘোরাতে গেলে ওর ঘাড়টা ভাঙতে হবে আপনাকে। ফিজিক্যালি সেটাও করতে পারবেন না।

হরিসাধনবাবুর মুখখানা রাগে লাল হয়ে উঠল। রাসবিহারীবাবু আবার বললেন, ক'দিন আগে আমি শুনছিলাম, আপনি আর একটি ছাত্রকে বলছেন, পড়া না পারলে এক চড়ে তার সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবেন। সে কোনও দিনই ক্লাসে পড়া করে আসে না। তার দাঁত আপনি আজও ফেলতে পারেননি। তার মানে, আপনি জেনেশুনে ছাত্রদের কাছে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করছেন। যে শাস্তি আপনি দিতে পারবেন না কোনও দিন, সেরকম কথা কেন বলবেন রোজ রোজ?

হরিসাধনবাবু রাগে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। তিনি কিছু বলার আগেই তাঁর ক্লাস থেকে শান্ত, গম্ভীর মেজাজে বেরিয়ে এলেন রাসবিহারীবাবু। তারপর যে ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন, সে ক্লাসে ঢুকে যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে ফের পড়াতে শুরু করলেন।

ব্যাপারটা হরিসাধনবাবু খুব সহজে হজম করে নিলেন না। সেদিন স্কুলের পর দীর্ঘক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন হেডমাস্টারমশাইএর সঙ্গে। তিনি হেডমাস্টারমশাইএর খুবই প্রিয়পাত্র। সব শুনে হেডমাস্টারমশাইও খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। একসময় বললেনও, কেন উনি বারবার এক স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যেতেন তার কারণ এবার পরিষ্কার হচ্ছে আমার কাছে। চাকরি করার ব্যাপারে রাসবিহারীবাবু নিতান্তই মিস্‌ফিট। কিন্তু কী করা যাবে এখন?

নীলকান্তস্যার অবশ্য রাসবিহারীবাবুকে বললেন, মিথ্যেবাদীকে মিথ্যেবাদী বলার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, রাসবিহারীদা।

আসলে নীলকান্তস্যারের সঙ্গে হীরসাধনবাবুর মনোমালিন্য দিন দিন জটিল আকার ধারণ করছিল। ঘটনাটা স্কুলের বাইরের, বলা যায় তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কের জের হিসেবে তাঁদের ভেতর মন-কষাকষি বাড়ছিল, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ প্রায়শ ঘটে যাচ্ছিল স্কুল-কম্পাউন্ডের ভেতরে। এখানে সারাদিন একই ঘরে বসতে হয় তাঁদের, ক্লাসে যাতায়াতের সময়ও বারবার দেখা হয়ে যায়, ফলে তাতে সম্পর্ক আরও তিক্ত হচ্ছিল ক্রমশ।

কী সেই কলহের হেতু, তা শঙ্খরা কেউ জানে না। সে জানে একমাত্র তাদের ক্লাসের পার্থ। পার্থদের বাড়ি যেহেতু ওঁদের বাড়ির খুব কাছেই, রথতলায়। পার্থর বাবা-মা প্রায়ই নাকি আলোচনা করেন দুই টিচারের বাড়ির সম্পর্ক নিয়ে, তাই পার্থর পক্ষেই এইসব খুঁটিনাটি জানা সম্ভব। পার্থ অবশ্য মাথা নেড়ে বলে, সব তো আমিও জানি নে। মা বলে, ওসব শালাভগ্নিপতির ব্যাপার। তা ছাড়া, আমাদের জানার কী দরকার!

শঙ্খ নিজের মনেই মাথা নাড়ে, ঠিক কথাই বলেছে পার্থ। তাঁদের ভেতরকার সম্পর্ক নিয়ে ছাত্রদের মাথা ঘামানো মোটেই সাজে না। তাদের ব্যস্ত থাকার কথা লেখাপড়া নিয়ে।

এর মধ্যে একদিন হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। খুবই উত্তেজনার ভেতর ছিল শঙ্খ। কিন্তু খাতা হাতে পেয়ে দেখল নেহাৎ খারাপ ফল হয়নি এবার। সেকেণ্ডবয় মহাদেব মল্লিকের সঙ্গে হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই হয়েছে তার। টোটালে মহাদেব তার চেয়ে মাত্র একনম্বর বেশি পেয়েছে। থার্ডবয় পার্থ তাদের চেয়ে অনেক কম। সুবোধ কত পেয়েছে তা কেবল জানা গেল না, কারণ সুবোধ তার নম্বর গোপন করে যাচ্ছে। কে যেন বলল, খুব খারাপ নম্বর পেয়েছে বলেই সে চেপে যাচ্ছে সবার কাছে।

তবে সবাই জানে, সুবোধ এখনও পর্যন্ত সব বই কিনতে পারেনি। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন আগে সে ইতিহাস-বই হাতে পেয়েছিল। আর এই এতদিনে শেষ যে বইটি বাকি ছিল, সেই দ্রুত-পঠনের বইটি কেনার পর সে বলেছে, অ্যানুয়ালে ফাটিয়ে দেবে। অ্যানুয়ালে ফার্স্ট হতেই হবে তাকে। ফার্স্ট হয় বলেই তাকে ইস্কুলে মাইনে দিতে হয় না। মাইনে দিতে হলে তার হয়তো পড়াই হবে না আর।

রাসবিহারীবাবু এর মধ্যে আর এক কাণ্ড করে বসলেন। ইস্কুলে পৌঁছতে একদিন এগারটা বেজে দুই হয়ে যাওয়াতে আর ঢুকলেনই না টিচার্সরুমে। তখনও প্রেয়ার শেষ হয়নি। প্রেয়ারের শেষে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখে হেডমাস্টারমশাইএর হাতে দিয়ে বললেন, লেট হয়ে গেছে যখন, আজ ছুটি নিয়ে নিলাম।

হেডমাস্টারমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেন, তাতে কী হয়েছে। মোটে দু'মিনিট তো—

—উঁহু, ঘাড় নাড়লেন রাসবিহারীবাবু, লেট ইজ লেট। দু'মিনিট হোক, আর কুড়ি মিনিটই হোক।

—তা হঠাৎ লেট হল কেন আপনার ? কখনও তো হয় না। বরাবরই তো দশ-পনেরমিনিট আগে এসে বসে থাকেন।

—আর দেখুন না, বেরিয়েছিলাম ঠিক সময়মতো। হঠাৎ চাটুজ্জেপাড়ার কেষ্টবাবু এসে ধরলেন পথে। মস্ত এক গল্প ফেঁদে বসলেন। বললেন, তার বাবার নাকি চান্দ্রায়নব্রত করে আয়ু বেড়ে গেছে। নতুন যৌবন ফিরে পাচ্ছেন যযাতির মতো। তারপর হঠাৎ বললেন, পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারেন, হঠাৎ খুব অসুবিধেয় পড়ে গেছি। আমার কাছে তখন ভাঙানি ছিল না। একটা দশটাকার ভাঙাতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল।

হেডমাস্টারমশাই চুকচুক শব্দ করলেন জিবে, এহ্, আপনি কেষ্টবাবুকে টাকা ধার দিলেন!
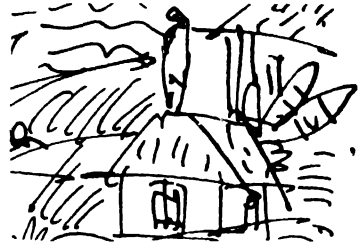
বেশ কয়েকদিন ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ মাঝরাত্তিরে ভরপেট মদ খেয়ে এসে গোটা চাটুজ্জেপাড়া মাথায় করে তুলছিলো। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে চেঁচাচ্ছিলো, ও বাবা, বাবা গো, আমাদের ফেলে রেখে তুমি কোথায় চলে গেলে গো—

চাটুজ্জেপাড়ার কোনও কোনও তরফের ছেলে-ছোকরারা ইদানীং মদ-খাওয়াটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। বড়ঘরের ছেলে মাতাল হতে না পারলে বনেদিয়ানার আভিজাত্যটুকু ঠিক যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না এহেন তত্ত্ব মাথায় রেখে অনেকেই মাঝরাত্তিরে ঈশ্বরীপুর গঞ্জ থেকে টলতে টলতে ঘরে ফেরে। তার মধ্যে বড়তরফের ছোটছেলে কৃষ্ণপ্রসাদ একটু অন্যরকম। সে কোনও কাজকর্ম করে না, ছেঁড়া শার্ট আর মোটা ধুতির বহর দেখলেই তার অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই নজর কাড়ে। তাই তার মদ-খাওয়াটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি ধরনের। প্রায়ই অন্যের পয়সায় মদ খায়। সেরকম সঙ্গি জোটাতে না পারলে চেনা-অচেনা কাউকে

দেখতে পেলেই ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলবে, পাঁচটা টাকা ধার দিতি পারো। কাল সকালেই ফেরত দিয়ে দেব।

পাঁচটাকার বদলে দু-তিনটাকা পেলেও সে খুশি। তাতে এক পাত্তর পেটে পড়লেও শরীর মন দুটোই দিব্যি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যেদিন একটু বেশি খায়, সেদিন মনে বেশ ফুর্তি হয়। প্রাণ ভরে কথা বলতে ইচ্ছে হয়। বহুক্ষণ একনাগাড় বকবক করতে করতে কখনও পথের ওপর বমি করে ভাসিয়ে দেয়, কখনও রাস্তার ধারে ড্রেনের পাশে বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে থাকে সারারাত। যেদিন তার বাড়ি ফেরার মতো হুঁশজ্ঞান থাকে, সেদিন এক-একদিন এক-একটা দুঃখ খুঁজে বার করে তার কাঁদতে ইচ্ছে করে খুব। আগে তার বিয়ে হল না বলে খুব দুঃখ হতো, তারপর বিয়ে হওয়ায় এখন তার দুঃখ অন্য। বিয়ে দিয়ে আত্মীয়স্বজনরা তার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে বলে কাঁদতে কাঁদতে গাল পাড়তো সবাইকে। কখনও তার একটা চাকরি হল না বলে এন্তার চেঁচামেচি করে। ইদানীং চিৎকার করছে, তার বাবা তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে কোথায় চলে গেল তাই মনে করে।

তার বাবা অনন্তদাস অবশ্য কোথাও যাননি। নাতি গোবিন্দ তাকে প্রতিদিন নিয়ম করে শোওয়ার ঘর থেকে দাওয়ায় এনে বসিয়ে দেয়, সময় হিসেব করে খাইয়ে দিয়ে যায় নিজের হাতে। পায়খানা, পেচ্ছাব পেলে তাও কখনও নিজেই এগিয়ে দেয় প্যান। আজকাল সে তার মা-বাবাকেও এর জন্য বিরক্ত করতে চায় না।

চান্দ্রায়নব্রত হওয়ার পর তিন-চারমাস কেটে গেছে। অনন্তদাসের ভবলীলা সাঙ্গ হওয়ার কোনও চিহ্ন তো নেইই, উপরন্তু দেখা যাচ্ছে, আরও স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। আগে ঘনঘন হাঁকডাক করতেন, ও গো-বি-ন্দ, গো-বি-ন্দ, এক-বা-র শু-নে-যা—, আজকাল তাও আর সবসময় ডাকেন না। বরং একদিন বললেন, দ্যা-খ তো গো-বি-ন্দ, আমার হাতখানা ধরে। উঠতি পাবি কি না—। বড্ড পেচ্ছাব পেয়েছে।

গোবিন্দ প্রথমে তাঁকে প্যান দিতে চাইল, কিন্তু অনন্তদাস তখন চেষ্টা করছেন, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে। তাঁর হাত-পা দুইই আজ বেশ ক'বছর ধরে অবশ। কতদিন হয়ে গেল কোমরের নিচ থেকে কোনও সাড় খুঁজে পান না। তবু গোবিন্দর শরীরের ওপর ভর করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন।

নব্বই পেরিয়েও অনন্তদাসের শরীরটা এখন বেশ ভারী। হয়তো পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় আরও ওজন বেড়ে গেছে তার ঠাকুর্দার এমন মনে হয় গোবিন্দর। তাঁর চোখে মুখে তখন উঠে দাঁড়নোর প্রবল চেষ্টা। সমস্ত শরীর গোবিন্দর দুইবাহুর ওপর ভর করে খে হয়ে ওঠবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন দাঁতে দাঁত চেপে। তাতে মুখের শিরাগুলো টানটান হয়ে উঠছে, চেপে বসছে চোয়ালদুটো। এরকম বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করে অবশেষে ঝপ করে ছেড়ে দিলেন শরীরটা। তাতে গোবিন্দ টাল খেয়ে পড়তে পড়তেও নিজেকে সামলে নিল। অনন্তদাস হতাশ হয়ে নিজের পা-দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ, চোখদুটোয় করুণ চাউনি। গোবিন্দ তাঁকে জুতজাত করে বসিয়ে দিয়ে বলল, ও হবে না, দাদু।

অনন্তদাস ক্লান্ত, হতাশভাবে বললেন, হবে না? অথচ অনন্তদাসের প্রতিদিনই মনে হয়, তাঁর শরীরে আবার আগের মতো বল ফিরে আসবে, সাড় জেগে উঠবে পা-দুটোয়, হাত-দুটোয়। আবার দাঁড়াতে পারবেন, চলতে-ফিরতে পারবেন আগেকার দিনের মতো। এককালে দশাসই শরীর ছিল তাঁর। গলায় হাঁক-ডাক ছিল বাঘের মতো। এমনই প্রতাপ ছিল তাঁর যে, চাটুজ্জেপাড়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক হাঁকাড় দিলে গোটা পাড়ার লোকজন ছুটে আসত।

তিনি পথ দিয়ে হেঁটে গেলে ছেলেছোকরারা সরে পালাবার পথ খুঁজে পেত না।

কিছুক্ষণ পর গোবিন্দর দিকে করুণচোখে তাকিয়ে বললেন, আমি আর দাঁড়াতে পারব না। তাই না?

গোবিন্দ বিব্রতভাবে বলল, আগের চেয়ে তুমি অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছ তো, দাদু।

ঘাড় নাড়তে লাগলেন অনন্তদাস, আস্তে আস্তে টেনে টেনে বললেন, আমাকে নিয়ে তোদের খুব কষ্ট, তাই না?

গোবিন্দ হাসার চেষ্টা করল, বলল, জানো দাদু, আমাদের রাঙাকাকা একটা বাস কিনছে, ঝকঝকে নতুন বাস। ঈশ্বরীপুর থেকে বসিরহাট চলবে।

অনন্তদাস বড় বড় চোখ করে তাকালেন, তাই নাকি।

দক্ষিণপাড়ায় বেশ কিছু অর্থবান মানুষের বাস। আনন্দ চাটুজ্জের একখানা বাস অনেকদিন ধরেই চলাচল করছে, চাটুজ্জেপাড়ার ঠিক লাগোয়া হরমোহন চক্রবর্তীর বিশাল দোতলা বাড়ি, তাঁরাও একখানা বাস কিনেছেন বছর দুয়েক হল, বাস কিনেছেন আকিঞ্চন চাটুজ্জে। তাঁর ছোটছেলে বিশ্বনাথ চাটুজ্জে একখানা প্রাইভেট গাড়ি কিনবেন এমনও শোনা যাচ্ছে ক'মাস ধরে। বিশ্বনাথ ভারী শৌখিন মানুষ, তাঁর চশমার ফ্রেমে নাকি সোনা লাগানো আছে। তাতে রোদ্দুর পড়লে কেমন চকচকে দেখায়।

—বুঝলে দাদু, উত্তরপাড়ার লোকদের একখানাও বাস নেই, ওদের ভট্টচাযি্যপাড়ার লোকরা একদম ফোঁপরা। আমাদের দক্ষিণপাড়ায় তিনখানা বাস। আমাদের পাড়াটা বেশ বড়লোক, না দাদু?

অবসর সময় থাকলে গোবিন্দ একটা-একটা করে এলাকার খবরাখবর শোনাতে থাকে তার ঠাকুর্দাকে। মাথাটা এখন আর ঠিকঠাক কাজ করে না অনন্তদাসের, সব কথা মনেও রাখতে পারেন না, তবু কিছু-কিছু খবরে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখদুটো বড়-বড় হয়ে ওঠে আনন্দে, উল্লাসে। আবার কখনও ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে কোন দুঃসংবাদে, জড়ানো গলায় বলেন, তাই নাকি?

গোবিন্দ কখনও বলে, বুঝলে দাদু, এবছর শীতকালে নাকি হাই-ইস্কুলের মাঠে কলকাতার সার্কাস আসবে। কিংবা, আতাবপুরে নাকি একজনের যমজ ছেলে-মেয়ে হয়েছে। ছেলে-মেয়ে দুটো একসঙ্গে কোমরের কাছে জোড়া। কলকাতায় নিয়ে যাবে অপারেশন করে ছাড়িয়ে আনতে। অথবা, এ-পাড়ার বিশে-কাকু নাকি সিনেমায় চান্স পেয়েছে। শিগগির কলকাতায় যাবে নতুন ধুতি-পাঞ্জাবি তোয়ের করতে।

গোবিন্দর ঝুলিতে এমন নানান গল্প। সে-সব কাহিনী যেমন এ-পাড়া ও-পাড়া গিয়ে সে আগ্রহভরে শুনে আসে, তেমনি আগ্রহ নিয়ে নিত্যিদিন তার ঠাকুর্দার কাছে সাতকাহন করে বলে।

এতসব শুনতে শুনতে অনন্তদাস কখনও বড়ো করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। নিজের অবশ হয়ে যাওয়া হাত-পা-গুলোর দিকে করুণচোখে তাকান। মাঝেমধ্যে চেষ্টা করতে থাকেন নাড়ানোর। কখনও গোবিন্দকে বলেন, একটু টিপে দিবি পা দুটো? খানিক মালিশ করে দিলি বোধহয় সাড় ফিরে পাবানে।

গোবিন্দ তখন তার ঠাকুর্দার পায়ে মালিশ করতে থাকে। অবশ হয়ে গেলেও অনন্তদাসের পা-দুটো এখনও বেশ ভারী আর মাংসল। এই পা-দুটো নিয়ে এককালে দশক্রোশ বিশক্রোশ পথ কথা বলতে বলতে ফুরিয়ে ফেলেছেন। এখন সে পা নাড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁর নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা-দুটো মাঝে-মধ্যে সোজা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পা-দুটো অসম্ভব ভার বলে মনে হয়। কেউ যেন একশমনী পাথর বেঁধে রেখেছে পা-দুটোর সঙ্গে।

ক'দিন পর আবার একদিন ডাকলেন গোবিন্দকে, গো-বি-ন্দ, অ গো-বি-ন্দ।

গোবিন্দ তখন তার বইখাতা ছড়িয়ে সবে পড়তে বসার উদ্যোগ করছে। উঠে এসে বলল, কী বলছ?

—ক'দিন রাতের বেলা কে যেন আমার ঘরখানার সামনে এসে কাঁদে। খুব কাঁদে।

গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলে বলল, ও তো ছোট্‌কা। তোমার ছোট ছেলে। কেষ্ট।

—কাঁদে কেন রে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গোবিন্দ হঠাৎ বলল, ছোট্‌কার ধারণা, তুমি বোধহয় মরে গেছ। রাতে কী সব ছাইপাঁশ খেয়ে আসে। তারপর বাড়ি ফিরে চেঁচামেচি করে, হাউমাউ করে কাঁদে।

অনন্তদাস ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, আমি মরে গেছি?

গোবিন্দ হেসে বলল, তুমি তো মরনি। কিন্তু ছোট্‌কা ওইরকম ভাবে।

অনন্তদাস বেশ অনেকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। বাইরের নরম রোদের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখদুটো কিছুটা কুঁকড়ে এল যেন, আস্তে আস্তে বললেন, আমার মরতি এখনও অনেক দেরি আছে, তাই না?

গোবিন্দ তার ঠাকুর্দাকে দেখল ভালো করে। তাদের পাড়ার অনেকেই বলে, তোর দাদু একশ বছর পুরোবে দেখিস। ঠাকুর্দার গলার হাঁকডাক ইদানীং আরও যেন বেড়েছে। সে-সব দেখেশুনে তারও মনে হয়, আরও কিছুকাল বাঁচবেন অনন্তদাস। তার বাবা খুব ঘটা করে যাগযজ্ঞ করিয়েছেন চান্দ্রায়নব্রতের সময়। এ নিয়ে প্রায়ই কটূক্তি করছে অনেকে। বলে, কী রে, তোরা যজ্ঞ করে ঠাকুর্দারে মেরে ফেলতে চেয়েছিলি!

কিন্তু তাতে মরে না গিয়ে ঠাকুর্দার আয়ু যে আরও বেড়ে গেল সে কথা কেউ বলে না।

অনন্তদাস আবার বললেন, আমার জন্যি তোদের বড় কষ্ট, তাই না? তুই দ্যাখ্ না, তোর বড়জ্যাঠাকে বলে, যদি আমারে নেয়?

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল, বড়জ্যাঠা নেবে না।

—তাইলে অন্য কাকাদের বলে দ্যাখ্ না, যদি কেউ নেয়।

—কেউ নেবে না তোমারে। তুমি হাঁটতি পার না, দাঁড়াতি পার না, কোনও কাজ করতি পার না, কে নেবে তোমারে?

অনন্তদাস চোখে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকালেন বাইরের চিকনরোদের দিকে। চারদিকে এখন শরতের রোদ, কিন্তু তা থেকে একটুও সোনা ছিটোল না তাঁর চোখেমুখে। হতাশ হয়ে বললেন, কেউ নেবে না?

গোবিন্দ একটু অনুতপ্ত হল। শেষ কথাগুলো সে বেশ ঝোঁকে উঠে বলে ফেলেছে। অনেকক্ষণ বকবক করার পর ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। তার ইস্কুলের পড়া তৈরি অনেক বাকি এখনও, তাইই—

হঠাৎ নরম হয়ে বলল, শুনেছ দাদু, সেজ তরফের বাড়ি রাঙাবৌকে ভূতে ধরেছে কাল।

—কাকে ভূতে ধরেছে?

—ওই যে যতীনদার বৌকে। যতীনদার মা ক'দিন আগে যতীনদার বৌকে বেধড়ক পিটিয়েছিল। উনুনের পাশে চ্যালাকাঠ ছিল, তাই টেনে নে—

অনন্তদাসের চোখমুখ হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল, কেন রে?

—যতীনদার মা'র কথা নাকি রাঙা-বৌ শোনেনি।

—তাই বলে চ্যালাকাঠ দে মারবে? তুই যতীনকে বলিস তো, আমার সঙ্গে দেখা করতি।

গোবিন্দ হেসে বলল, তুমি ডেকে পাঠালি কি যতীনদা আসবে মনে কর? আর এলিই বা তুমি কী করবা? যতীনদা তো তার মা'র ভয়েই অস্থির।

—তবু বলিস, দেখা করতি।

—এখন দেখা করেই বা আর কী করবে? বাড়িতে ভূতের ভয়ে এখন মা-ছেলে অস্থির। কাল জেলেপাড়ার টুনি এসে বলে গেল, ক'দিন আগেই সে নাকি সেজতরফের বাড়ির সামনে শিরীষ গাছের ডালে একটা ভূতকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতি দেখেছে। তার এক-একখানা পা নাকি বাঁশের মতো ঠ্যাংঠেঙে লম্বা—
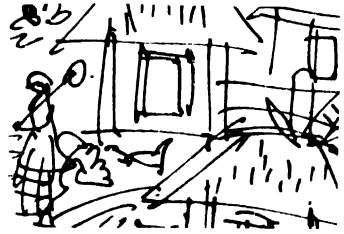
ঈশ্বরীপুরে ভূতের উপদ্রব বরাবর একটু বেশিই। শঙ্খদের বাড়ির ঠিক পশ্চিমে বিশাল বাঁশবাগান। ঘোর দুপুরেও বাঁশপাতার আড়াল পেরিয়ে রোদ গলতে পারে না মাটিতে। গ্রীষ্মের ভ্যাপসা গরমে যখন ডা-ডা করতে থাকে ধরণী, তখন বাঁশবনের ছায়ায় ঘুরে বেড়ালে কেমন নিথর ঠাণ্ডা। কেবল বর্ষার সময় যা প্যাচপেচে। বাঁশপাতা পচে কাদা-কাদা হয়ে যায় নীচেটা। বছরের বাদবাকি সময় বাঁশবনে ঘুরে বেড়ানোর যা মজা—

তাদের পাশের বাড়ির দুই মেয়ে উমনো-ঝুমনো বলেছে, অ্যাই শঙ্খ, দুপুর রোদ্দুরে অমন টো-টো করে বাঁশবনে ঘুরিস কেন রে। যখন ভূতে ধরবে তখন বুঝতে পারবি।

দুপুরে ভূতের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু সন্ধে নেমে এলে চারপাশে ঘনিয়ে আসে মিশ-আঁধার। যখন চাঁদের আলো থাকে না, সে সময় পশ্চিম-সীমানার ধারে শঙ্খ নজর করে দেখেছে, ঝুপসি ছায়া কেমন গাঢ় হয়ে বাঁশবনের ভেতর দুলছে যেন, অন্ধকারে চিরিবিরি খেলছে লক্ষ বাঁশপাতা, আর হাওয়া উঠলে একটা মিঠেন সুর ভেসে আসতে থাকে। বাশঁপাতায় বাতাস ছুঁয়ে গেলে অমনি শব্দ বাঁশির সুর হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ পাখির ডানার শব্দ শোনা যায় কোনও গহন আড়ালে। কখনও মনে হয় একটা অশরীরী ছায়া নড়ে গেল এদিক থেকে ওদিকে। ঘাড়ের কাছে কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলেই সরে যায়।

কিন্তু চাঁদের আলোছায়ায় ভূতের ব্যাপারটা জমে ওঠে আরও। বাঁশপাতার আড়ালে জোৎস্নার কাটাকুটি খেলা চলে সারা রাত। ভূতের নাকি দশ-বিশটা হাত, প্রতি হাতে হাজার আঙুল। কয়েক হাজার আঙুল জোৎস্নার আলো চিরে নেমে আসে মগডাল থেকে মাটি অবধি। বাতাসে বাঁশপাতা যত নড়াচড়া করে, ততই আঙুলের চিরিবিরি খেলা চলে বাঁশঝাড়ের ভিতর।

জেলেপাড়ার টুনি বলে, বাঁশগাছের ডগায় বসে ভূতেরা তাদের পা ঝুলিয়ে রাখে নীচে। সে নাকি একদিন সন্ধের পর বাঁশবনে পাতালকোঁড় খুঁজতে গিয়ে এমন ঠোক্কর খেয়েছিল

যে ঝাড়া একদিন জ্ঞানহীন। মুখে গাঁজা তুলে শুয়েছিল সারারাত। ভোর হতে তার বাড়ির লোক খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করে সে বাঁশবাগানে ঘুমিয়ে আছে বেঘোরে।

এহেন বাঁশঝাড়ের পাশে শঙ্খদের বাড়ি, সন্ধে হলে গা-শিরশির তো করবেই। সে অনেকদিন বাঁশঝাড়ের কাছে গিয়ে একবুক শিরশিরানি নিয়ে উঁকি দিয়ে দেখেছে কোথাও ভূতদের লম্বমান পাগুলো ঝুলে থাকতে দেখা যায় কি না। অন্ধকার পক্ষ হলে তো গোটা বাঁশবনকেই মনে হয় একটা ঝুপসি ভূত। তার মধ্যে আলাদা করে ভূতের চোখ-মুখ-পা বেছে নেয়া মুশকিল। কিন্তু শুক্লপক্ষে চাঁদের মায়াবী আলোয় অসংখ্য ভূতের আনাগোনা ভেবে নেয়া যায়। তেমন হাওয়া উঠলে তো মনে হয় লক্ষ ভূত তা-তা থই-থই তা-তা থই-থই করে দু-হাত তুলে নৃত্য করতে লেগেছে।

তখন উমনো-ঝুমনোর শাসনবাণী স্মরণ করে গায়ের ভেতর একটা ছমছমে ভাব। দুপুরে টইটই করে ঘুরতে গিয়ে মনে পড়ে, ঠিক দুক্কুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা।

গা-ছমছম করার কারণ একটাই। আজকাল তাদের ঈশ্বরীপুর গ্রামে মেয়ে-পুরুষদের যখন-তখন ভূতে পাচ্ছে। ভূত তাদের তল্লাটে বরাবরই ছিল, কিন্তু ইদানীং তেনাদের উপদ্রব আরও বেড়েছে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এসে কারও ঘাড়ে চেপে বসছে পট করে। আর তক্ষুণি শুরু হয়ে যায় তুলকালাম। চিৎকার আর দাপাদাপি শোনা যায় ভূতের।

গাঁয়ের জোয়ান ছেলে ছিরের ঘাড়ে পর-পর দু'দফায় ভূত চেপেছিল। একবার চাপলে দশ-পনেরোদিনের আগে নড়ে না। তাও কি আর এমনি নড়ে। ওঝা ফোজা ডাকতে হয়, ঝাড়ফুঁক করতে হয়। সে অনেক ঝামেলির ব্যাপার। ভূত ছেড়ে গেলেও ছিরের হাবভাব এমন বদলে গেছে যে গাঁয়ের লোক এখন তাকে ছিরে-পাগলা বলে ডাকে।

কিন্তু পুরুষমানুষকে তেমন নয়, ভূতেরা বেছে-বেছে ধরছে গাঁয়ের মেয়ে-বৌদেরই। কোথায় তাঁতিপাড়ায় কাদের বাড়ির বৌ এলোচুলে হেঁটে গিয়েছিল নিমতলা দিয়ে, অমনি বাড়ি ফিরে সে তুলকালাম করে তুলল । কোথায় কলুপাড়ার ভরা বয়সের মেয়ে সন্ধের পর আঁচল দুলিয়ে হেঁটে গেছে বেলগাছের পাশ দিয়ে, অমনি বাড়ি ফিরে নাকিসুরে শুরু করে দিয়েছে সাতকাহন।

এসব শুনে শঙ্খ উমনোকে বলে, কক্ষনও চুল এলো করে ঘুরবিনে। শুনেছিস কাণ্ড।

উমনো শঙ্খর চেয়ে এক বছরের বড়, ঝুমনো শঙ্খর চেয়ে এক বছরের ছোট। তবু দু'জনেই শঙ্খর উপর খবরদাবি করতে ছাড়ে না। মেয়ে বলে যেন ওদের কর্তৃত্ব করার একটা জন্মগত দাবি। তাই শঙ্খও মাঝেমধ্যে তার নাক দেখায়, অ্যাই, তোরা মেয়েছেলে, অমন করে ছুটবিনে। ফ্রক উড়ছে। ফ্রক বেয়ে কখন ভূতে ধরে নেয় তার ঠিক আছে কি।

সেবার ধরল চাটুজ্জেপাড়ার ভরা বয়সের মেয়ে লেখাকে। ধরল তো ধরল, কিছুতে ছাড়ে না। আর পেয়েছে তার ঠাক্‌মায়। ছিল নাকি নদীর ধারে শান বাঁধানো ঘাটের ঠিক পাশটায়, চাঁপাগাছের ডালে। লেখা গেছে স্নান করতে, একদম একা। স্নানের পর চাঁপাগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভিজে-কাপড় বদলে শুকনো কাপড় গায়ে দিয়েছে, অমনি—। শুকনো কাপড়টা নাকি টাঙিয়ে রেখেছিল চাঁপাগাছের ডালেই, তার সঙ্গে বেয়ে উঠেছে লেখার গায়ে।

বাড়ি ফেরা ইস্তক ভীষণ মুখ চোখ করে সে তার শাসনের তর্জনী ঘোরাচ্ছে গোটা চাটুজ্জেপাড়ার ওপর। কাউকে বলছে, এই ধনু, তুই আজকাল বড় রাত করে বাড়ি ফিরছিস। হাতির পাঁচ পা দেখেছিস মনে হয়। আমি বেঁচে নেই বলে যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছিস!

ধনু হল লেখার সেজকাকা। রোজ নাকি রাত করে মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। ফিরে এসে বৌকে ধরে মারে। চাটুজ্জেপাড়ার অনেকেই তার বৌ-এর কান্না শুনতে পায়। এখন লেখার তড়পানি শুনে পাড়ায় বেশ হইচই পড়ে গেছে। লেখা অবশ্য তখন পড়েছে তার ছোটকাকা কেষ্টকে নিয়ে। কেষ্ট, কাজকম্ম না করে ধাড়ি ছেলে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিস টনটন করে। বসে খেতে লজ্জা করে না। আমি বেঁচে থাকলে দিতাম চাবকে সোজা করে।

এমনকি একদিন লেখা বলে বসল, কুটু! অ্যাই কুটু, তুই নাকি বেপাড়ায় যাওয়া আসা করছিস। বাড়িতে সতীলক্ষ্মী বউ, আর—

ছি, ছি, লেখার মা লেখার মুখ চাপা দিতে চাইছে জোর করে, কিন্তু লেখার গায়ে তখন দশ মানুষের জোর, তাকে রোখে কার সাধ্যি! ওদিকে পাড়ার সবাই মুখ টেপাটেপি করে হাসছে। কুটু তো লেখারই বাবা। ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে আসতে চারপাশে টিটিক্কার পড়ে গেল। কুটুবাবুর চলন বলন পাড়ার সবাই একটু-আধটু জানত। কিন্তু সে হল গিয়ে আড়ালে-আবডালে। লেখা এখন ঘরের হাঁড়ি ভেঙে দিতে চারদিকে চাপা আলোচনা, গুজগুজ-ফুসফুস। পাড়ার সবাই বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। লেখা এখন কার হাঁড়ি কী ভাবে ভাঙে তাই নিয়ে সবাই ভয়ে কাঠ। লেখার তো মুখের রাখঢাক নেই। সে সমানে তড়পে চলেছে এর ওপর ওর ওপর। বলছে, ভেবেছিস আমি কিছুই জানিনে শুনিনে। সব খবরই আমি রাখি ওই চাঁপাগাছের ডালে বসে।

লেখার বাবা কুটুবাবু তখন গম্ভীর হয়ে সেঁধিয়ে গেছেন ঘরের ভিতর। লেখার মা অন্য ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন। ওঝা এসেছে সেই দূর লক্ষ্মীনারায়ণপুর থেকে। কী ভীষণ দেখতে ওঝাকে। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, কপালে লাল সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে একটা লোমের ঝাড়ন। গলায় রুদ্রাক্ষের একগোছ মালা, চোখের তারা গিয়ে ঠেকেছে কপালে। বিড়বিড় করে কী যেন বকছে, আর ঝাড়ন বোলাচ্ছে লেখার গায়ে পিঠে। কখনও হাতের তেলোয় সরষে নিয়ে তাতে চাপড় মারছে শব্দ করে, আর হাঁকছে, আয় শালা—

লেখার দাপটও কম নয়। অমন নিরীহ শান্তশিষ্ট মেয়েটা চুল এলো করে চোখ রক্তবর্ণ করে শাসাচ্ছে, দ্যাখ, একদম কাছে আসবিনে। অমন ওঝা ঢের-ঢের দেখিছি। ভাল হবে না বলছি।

বলছে বটে, কিন্তু হাতের তেলোয় যখন সরষে নিয়ে মন্ত্র পড়ছে ওঝা, অমনি ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে লেখা।

উমনো বলে, লেখা কোথায় রে, ও তো ঠাক্‌মার ভূত। বুড়িটা কী অলপ্পেয়ে দ্যাখ্‌। ঘাপটি মেরে বসেছিল চাঁপাগাছের ডালে।

পাড়ার সবাই ভেঙে পড়েছে ধনু চাটুজ্জের বাড়ির সামনে। হাঁ করে দেখছে লেখার কাণ্ডভাণ্ড। মাঝেমধ্যে লাফানিঝাঁপানিতে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে লেখার শাড়ি, তার মা আবার ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন আর চোখের জল মুছছেন আঁচলে। ক'দিনেই লেখার চেহারাও হয়ে গেছে অদ্ভুত ধরনের, ভয়-পাওয়ার মতোই।

ওঝা যখন কোনওকিছুতে তাকে বাগ মানাতে পারছে না, তখন শুরু করল মার। ছিপছিপে একটা বেতের লাঠি নিয়ে লেখার পিঠে মারতে শুরু করল দুমদাম। সে বড় করুণ দৃশ্য। কিন্তু ভূতটারও ভারী জেদ, সে লেখাকে ছেড়ে নড়বে না। বেতের মার খাচ্ছে, আর চেঁচাচ্ছে, না, কিছুতেই যাব না আমি। বাড়ির লোকগুলো সাপের পাঁচ পা দেখেছে, এর একটা বিহিত না

করে যাচ্ছি নে।

পাড়ার লোক যখন ভূত-খেদানো দেখার জন্য ভিড় করে রয়েছে সেখানে, তখন শঙ্খই কেবল যায়নি। সে রোজ ভূতের রকমারকম গল্প শুনছে উমনো-ঝুমনোর মুখে। তাদের রোজ একবার না একবার যাওয়া চাইই লেখাদির বাড়ি। লেখাদি ওদের দু'জনকে কত ভালবাসত। গরমকালের দুপুরে আমজারানো, তেঁতুল-আচার, কয়েতবেল খাওয়ার সঙ্গি ছিল তারা ক'জন। আর কী সুন্দর দেখতে ছিল লেখাদিকে। তার কোঁকড়া একমাথা চুল, সে চুলে এখন জট পড়ে একেবারে জটাবুড়ি হয়ে গেছে। পরশু নাকি লেখাদির চোখ হঠাৎ ঝুমনোর উপর পড়তে এমন কটমট করে তাকিয়েছে যে উমনো-ঝুমনো ভয়ে পালিয়ে এসেছে সেখান থেকে।

সেই ভয়ে শঙ্খ কিছুতেই যেতে চাইছে না লেখাদিদের বাড়ি। সে কতবার চাটুজ্জেপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে নদীর ওই শান-বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসে থেকেছে, চাঁপাগাছের ডালে উঠে টুকি-টুকি খেলেছে। দোল খেয়েছে চাঁপাগাছের নিচু-ডালটায় ঝুলে। ঠিক যে ডালটায় বসে থাকত ওই ঠাক্‌মা-ভূতটা। ভাবলেও বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে শঙ্খর। ভয়ে কাউকে বলতেও পারছে না কথাটা, এমনকি উমনো-ঝুমনোকেও।

তার বদলে শঙ্খ গিয়ে বসে থাকে চাটুজ্জেপাড়ার রাঙাবৌদির বাড়িতে। চাটুজ্জেপাড়ায় সব ঘরের মধ্যে শঙ্খর যত ভাব সব ওই রাঙা-বৌদির সঙ্গেই। ওদের সেজতরফের ছোট ছেলে যতীনদা হল রাঙা-বৌদির বর। যতীনদা বেশ ভাল মানুষ, কিন্তু যতীনদার মা খুব দুর্দান্ত ঝগড়ুটে। যা অত্যাচার করে রাঙা বৌদির ওপর! সে কথা এক শঙ্খকেই বলে রাঙাবৌদি। আর বলবে না-ই বা কেন! রাঙা বৌদির তো আর নিজের বলতে কেউ নেই। তার বাপ-মা তো ছোটবেলা থেকেই নেই। মানুষ হয়েছে মামার বাড়িতে। তারপর একটু বড় হতে মামারা কোনরকমে তার বিয়ে দিয়ে পার পেয়ে গেছে। কেউ আর এ মুখো হয় না। তখন কত আর বয়স ছিল রাঙাবৌদির, চোদ্দো-পনেরো হবে। তারপর ন'দশ বছর হয়ে গেছে, কোনও ছেলেপুলেও হয়নি তার। মাঝে মধ্যে শঙ্খকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাঙাবৌদি বলে, ইস্ যদি আমার একটা ছেলে হত, তাহলে তোরই মতো বড় হত এতদিনে, বুঝলি।

শঙ্খর তখন ভারী লজ্জা করে, ছটফট করে রাঙাবৌদির বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। কী একটা চমৎকার গন্ধ রাঙাবৌদির শরীরে। নিশ্চয় কোনও সেন্টটেন্ট মাখে। আর কী নরম তার শরীরটা। কিন্তু শঙ্খ ক্লাস সিক্সে পড়ে তাও কয়েক মাস হয়ে গেল। এখন হঠাৎ যদি রাঙাবৌদি এমনভাবে কাছে টেনে নেয়—

তবু কী ভেবে শঙ্খ বেরিয়ে আসতে পারে না রাঙাবৌদির কাছ থেকে। বড় দুঃখী সে। একেই তো বাপ-মা মরা, তার উপর শাশুড়ি-ঠাককণ রাতদিন গঞ্জনা দেয়। হাভাগির বেটি, অলক্ষুণে বউ, বাঁজা বউ, এইসব বলে উঠতে বসতে গাল দেয়। রাঙাবৌদি এইসব শোনে, আর হাপুস নয়নে কাঁদে। মাঝে মাঝে বলে, অন্য বৌরা তবু দু'দণ্ড বাপের বাড়ি গিয়ে কষ্ট ভুলে আসতে পারে। আমার তো তাও নেই রে—

শঙ্খ বুঝতে পারে না, এইসব সময়ে কী ভাবে সান্ত্বনা দেবে রাঙাবৌদিকে। হয়তো একা ঘরে বসে কাঁদছে, কেঁদে কেঁদে ফুলিয়ে ফেলেছে চোখ, ভিজে চুবচুব্ করছে আঁচলের কোণ, ঠিক এমন মুহূর্তে তাদের বাড়ি গিয়ে পড়েছে শঙ্খ। কিন্তু তাকে দেখে কখনও লজ্জা পায় না রাঙাবৌদি, বরং লাল জবাফুলের মতো চোখে হঠাৎ হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে তার। আয়—

শঙ্খ জানে, এ সব সময় কথার স্রোত ঘুরিয়ে দিতে হয় অন্যদিকে। যাতে রাঙাবৌদির কষ্ট একটু লাঘব হয়। বলে, বুঝলে বৌদি, কাল না ইস্কুলে একটা কাণ্ড হয়েছে—

—কী কাণ্ড রে, শঙ্খ? রাঙাবৌদির ফুলো চোখে অমনি জেগে ওঠে কৌতূহল।

—আমাদের পড়া দিয়ে দিয়ে ক্লাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন অমিয়স্যার।

—সে কি রে, ক্লাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল মাস্টারমশাই?

—হ্যাঁ, শোনোই না। অমিয়স্যার ঘুমোলে নাকের মধ্যে একটা ফরফর শব্দ হয়। মনে হয় ডাকঘুড়ি উড়ছে আকাশে। আর তারপর—

—তারপর কী?

—তারপর জানলা দিয়ে হঠাৎ উড়ে এল একটা প্রজাপতি, আর বসল কিনা গিয়ে স্যারের পাঞ্জাবির ওপর। ঠিক যে জায়গায় ওঁর মস্ত ভুঁড়িটা জেগে থাকে পাঞ্জাবি ফুঁড়ে। আর লক্ষ্মণটা অমনি হেসে ফেলল খিক খিক করে। তার হাসি শুনে অমিয়স্যার ধড়মড় করে জেগে বললেন, কে হাসল? স্ট্যান্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ। স্ট্যান্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ। লক্ষ্মণ তো মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে বই-এর দিকে। অমিয়স্যার আবার বললেন, মনিটর, মনিটর, তুমি বলবে, কে হেসেছে। মনিটর বিদ্যুৎ বলল, কেউ হাসেনি স্যার। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করেছে, এই বিদ্যুৎ, গায়ে প্রজাপতি বসলে বিয়ে হয় না কি? শুনে অমিয়স্যার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, রাস্কেল, দাঁড়া, বেঞ্চের উপর দাঁড়া। আর অমনি প্রজাপতিটা পাঞ্জাবির ওপর থেকে উড়ে বসল স্যারের ঠিক মাথায়, টাকের মধ্যিখানে। আর ক্লাস সুদ্ধ ছেলের কী হাসি—

শুনতে শুনতে হেসে গড়িয়ে পড়ে রাঙাবৌদিও। একটুক্ষণের মধ্যে কোথায় গেল তার কান্না-কান্না চাউনি। শঙ্খ তো এইটেই চাইছিল। রাঙাবৌদিকে কাঁদতে দেখলে তার যে ভীষণ কষ্ট হয়। লেখাদিকে ভূতে পাওয়ার পর থেকে তাদের আলোচনার খেই বদলে এখন এসে ঠেকেছে ভূত পেত্নির খপ্পরে। শঙ্খ বলে, ইস, ভূতটা আর লোক পেল না বৌদি, শেষে লেখাদির ঘাড়ে। তার চেয়ে তোমার শাশুড়ির ঘাড়েই চাপতে পারত।

রাঙাবৌদি হেসে বলে, সে ভাগ্য কি আর আমার হবে। অমন দজ্জাল মেয়েছেলে দেখলে ভূত অমনি পালিয়ে বাঁচবে—

শঙ্খ হাসতে থাকে, তাহলে এক কাজ করো বউদি, ওঝা যখন ভূত তাড়াতে পারছে না, তখন তোমার শাশুড়িকে পাঠিয়ে দাও না কেন?

এক-একদিন শঙ্খ বলে, লেখাদিকে তুমি রোজ দেখতে যাও, বৌদি?

—হুঁ, যাইই তো—

—তোমার ভয় করে না?

রাঙাবৌদি মুখ ম্লান করে হাসে, আমার আবার ভয়। শাশুড়ি বলেছে, এবার উনুন থেকে জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ তুলে এনে মারবে।

শঙ্খর চোখে তরাস ঘনিয়ে আসে। যতীনদার মাকে সেও রীতিমত ভয় খায়। হঠাৎ শঙ্খকে তাঁদের বাড়িতে আসতে দেখলে বলেন, ওই যে আসছেন সোহাগী। এখন বৌদির গলায় গলা জড়িয়ে গল্প হবে।

তার খুব খারাপ লাগে কথাগুলো শুনতে। প্রায়ই ভাবে, আর আসবে না এদের বাড়িতে। দু-চারদিন আসেও না। তারপর ক'দিন পরে সে নিজেই হাঁপিয়ে ওঠে। রাঙাবৌদিকে না দেখতে পেলে তার নিজেরই মন খারাপ লাগে। সে আবার চুপিচুপি ওদের খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে রাঙাবৌদির ঘরে। রাঙাবৌদিও ক'দিন তাকে না দেখে অস্থির হয়ে পড়েছিল, বলে, কী রে ছেলে, তুই কি আমাকে ভুলে গিয়েছিলি?

শঙ্খ মুখ নিচু করে থাকে। রাঙাবৌদিকে কি সে ভুলতে পারে! রাঙাবৌদির মুখখানা যে

কী সুন্দর, একটু তাকিয়ে থাকলেই মন ভাল হয়ে যায়।

কখনও শঙ্খ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, যতীনদা কিছু বলে না তার মাকে?

রাঙাবৌদি অমনি গম্ভীর হয়ে যায়, কী করে বলবে? যা মাইনে পায় তাতে সংসার চলে? যদি ওদের জমি-জিরেতের ধান না আসে? জমিজমা তো সব ওর মায়ের নামে।

শঙ্খ আবার চুপ করে যায়। সংসারের এতসব জটিল অঙ্কের উত্তর মেলানো তার সাধ্য নয়। রাঙাবৌদি তার নিজের কেউ হয় না, কী করে যেন এ বাড়ির সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র তৈরি হয়ে গেছে। রাঙাবৌদি কষ্ট পেলে তার নিজের কেন যেন কষ্ট হয়। উমনো-ঝুমনো তাকে প্রায়ই খেপায়, কী রে, শঙ্খ, তুই এত রাঙাবৌদির কাছে গিয়ে পড়ে থাকিস কেন? তোকে রাঙাবৌদি পোষ্যপুত্তুর করে নেবে নাকি?

শঙ্খ ঠোঁট ওল্টায়, কেন, পোষ্যপুত্তুর না হলে কারুর বাড়ি যেতি নেই নাকি?

একদিন রাঙাবৌদি বলল, রেখার ঘাড় থেকে ভূত নেমেছে, শঙ্খ, কিন্তু এবার বোধহয় আমাকে ধরবে।

শঙ্খ আঁতকে উঠে বলল, ওমা, কেন?

তিনদিন অবিশ্রাম মার খাওয়ার পর লেখার কাছ থেকে তার ঠাক্‌মার ভূত বিদায় নিয়েছে। উমনো এসে কালই সে খবর দিয়েছে তাকে। বলেছে, জানিস, শেষ পর্যন্ত ভূতটা ওঝার জুতো মুখে করে নিয়ে তবে এলাকা ছেড়েছে। জুতো দাঁত দিয়ে তুলে এক দুই তিন... ঠিক সাত পা হেঁটে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। ব্যস, পড়েই লেখাদি অজ্ঞান। তারপর কত জলধাবানি করে তবে তার জ্ঞান ফেরে। জেগে উঠে, কী, আশ্চয্যি, লেখাদি একদম অন্য মানুষ। যেন কী হয়েছে জানেই না। চারদিকে চেয়ে বলে, এ কী, এত লোক কেন? কী হয়েছে আমার! আমার কি অসুখ করেছিল?

শুনতে শুনতে শঙ্খর চোখ বড় হয়ে যায়! কী করে যে চাঁপাগাছের ডালে সবার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে লুকিয়ে থাকে ভূতটা তা জানতে ভারি ইচ্ছে যায় তার। আর যেখানেই যাক শঙ্খ, শান-বাঁধানো ঘাটে সে আর ভুলেও যাবে না।

দিনকয়েক আর চাটুজ্জেপাড়ায় যায়নি সে। হঠাৎ তার মধ্যেই ঘটে গেল সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, ঠিক চাটুজ্জেপাড়ার পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেল শোরগোল, কে যেন বলল, আবার ভূতে পেয়েছে।

শঙ্খ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কাকে আবার ভূতে ধরল? লেখাদিকে নাকি?

কিন্তু গোলমালের শব্দটা আসছে সেদিক থেকে নয়। বুকে একরাশ শঙ্কা আর কাঁপ নিয়ে শঙ্খ ছুটল চাটুজ্জেপাড়ার ভিতরে। আর সে যা আশঙ্কা করেছিল, তাইই ঘটেছে। ভূতে ধরেছে রাঙাবৌদিকেই। সেদিন যা হাসতে হাসতে বলেছিল, তাই ফলে গেছে শেষ পর্যন্ত। সাধে কি আর বলে, ভূত নিয়ে হাসাহাসি করতে নেই। ওরা তক্কে-তক্কে থাকে। সুযোগ পেলেই ছোঁ মেরে ঘাড়ে চাপবে। আশঙ্কা সত্যি হতেই ছটফট করতে থাকে শঙ্খ, কী করে ভূতে পেল রাঙাবৌদিকে? কে পেল? হঠাৎ এত লোক থাকতে রাঙাবৌদিকেই বা কেন? রাঙাবৌদির অমন সুন্দর চেহারা তো তাহলে ভূতে আঁচড়ে-কামড়ে একাকার করে দেবে? ইস্‌, কী হবে?

সেজতরফের বাড়ির সামনে তখন অনেক মেয়ে-বৌ জুটেছে। তাদের আড়াল পেরিয়ে এখন বাড়ির ভিতরে যাবার কোনও প্রশ্নই নেই। রাঙাবৌদিকে নাকি ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখতে হয়েছে। ভীষণ চেঁচাচ্ছে, আর ছটফট করছে। যতীনদা গিয়েছিল সামলাতে, তাকেই

নাকি সপাটে একটা চড় মেরে দিয়েছে। এখনও লাল হয়ে আছে যতীনদার গাল। ভূত বলেছে, তুই একটা বংশের কুলাঙ্গার— .

তাদের বাড়ির সামনের আমগাছে লুকিয়ে ছিল ভূতটা। ক'বছর ধরেই তক্কে তক্কে ছিল, কারও ঘাড়ে চেপে বসবে সে। এতদিন পরে—। কাল নাকি সন্ধের পর চুল এলো করে রাঙাবৌদি গিয়েছিল আমগাছের তলায়, সেই অবসরে—

রাঙাবৌদি নাকি চেঁচাতে চেঁচাতে বলেছে, ইচ্ছে ছিল বুড়ির ঘাড়ে চাপব, বুড়ি খুব জ্বালিয়েছে এতদিন।

শঙ্খ মনে মনে আফসোস করল, ইস, কেন তাই চাপল না ভূতটা, তাহলে তো খুব জব্দ হত বুড়ি। তার ঘাড়ে না চেপে শেযমেশ কিনা চাপলো অমন সুন্দর বৌটার ঘাড়ে!

যতীনদা একপাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আর ক্রমশ ভিড় বাড়ছে দেখে যতীনদার সেই দজ্জাল মা হঠাৎ এসে হামলে পড়ল তাদের উপর, এই যে ভালমানুষের ছেলেমেয়েরা, তোমরা এখেনে কী দেখতে এয়েছ। এখেনে কি ঠাকুর উঠেছে না কি? যাও, সব যে যার ঘরে যাও। আমরা বলে কিনা নিজের জ্বালায় বাঁচছিনে—

বুড়ির গলা এমন ক্যারক্যার করছে যে ভয়ে সবাই কেটে পড়ল সেখান থেকে।

শঙ্খর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না চলে আসার, কিন্তু বুড়ির যা সর্বনেশে মূর্তি, তাতে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানেই হয় না। ভূতে পেলেও মানুষের মুখ বোধহয় খারাপ দেখায় না অত। কিন্তু রাঙাবৌদির সুন্দর মুখখানা কি এখন অমনই খারাপ আর বিশ্রী দেখাচ্ছে!

মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এল শঙ্খ। রাঙাবৌদিকে একবার দেখার ইচ্ছে থাকলেও তা আর হয়ে উঠল না। রাঙাবৌদি তো আর এখন রাঙাবৌদি নেই, ভূত হয়ে গেছে। মাগো। কী বিশ্রী!

বাড়ি এসে ভাবতে বসল শঙ্খ, ভূতগুলোর যে সত্যিই কোনও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই তা উপলব্ধি হল তার। নইলে অমন জাঁহাবাজ শাশুড়িকে ছেড়ে কেউ সুন্দর বৌকে চেপে ধরে। তবে একটা কথা ভেবে আশ্বস্ত হতে চেষ্টা করে, ওই ঝগড়ুটে বুড়ি যখন সামনে আছে, তখন ভূত খুব বেশিক্ষণ তিষ্ঠোতে পারবে না ও বাড়িতে।

দিনদুয়েক আর ওমুখো পা বাড়াল না শঙ্খ। উমনো-ঝুমনোর কাছে শুনল, সেই ওঝাটা আবার এসেছে। সরষে-বাণ ছাড়ছে ভূতের চোখ মুখ লক্ষ করে। তাতে রাঙাবৌদি আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে, বলছে, ওঝা, তোর একদিন কি আমার একদিন। আজ তুই বাড়ি ফেরার আগেই তোর ঘাড় মটকে দেব আমি।

শঙ্খ থির হয়ে কথাগুলো শোনে, তার বুকে হাতুড়ির শব্দ হয়, মোচড় দিয়ে ওঠে শরীরের ভেতরটা। কত কষ্টই না পাচ্ছে রাঙাবৌদি। যেতে ইচ্ছে করলেও আর যেতে পারছে না সে। কিন্তু দু'দিন পরে আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। শুনল, ওঝার সমস্ত কারিকুরি ব্যর্থ হয়ে যাওয়াতে সে এখন বেদম মারছে ভূতটাকে। তাতে রাঙাবৌদির পিঠ কেটে নাকি রক্ত পড়ছে।

ছুটে গিয়ে দেখল, যথারীতি লোকে লোকারণ্য। এ সব সময় যা হয়, অধিকাংশ লোকই বেশ মজা উপভোগ করছে। ওঝাটা সেই আগের মতোই ভীষণ মুখ করে শাসাচ্ছে রাঙাবৌদিকে। দাওয়ার এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাঙাবৌদি, গায়ের কাপড় এলোমেলো, চুল এলো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে বুকে, পিঠে, মুখের ওপর। কপালের সিঁদুর থেবড়ে গিয়ে কী বিশ্রী দেখাচ্ছে। আর রাগ ফেটে বেরুচ্ছে দু'চোখ দিয়ে। বলছে, ভাল হবে না বলছি, খবর্দার,

ওই বুড়িকে না নিয়ে এবার আর এ বাড়ি থেকে নড়ছি নে।

যতীনদা সেই একইভাবে দাওয়ার এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভয় ভয় চোখে। সবচেয়ে দেখার মতো হল, যতীনদার মার মুখখানা। সেই জাঁহাবাজ বুড়ি এই দু-তিনদিনে কেমন সিঁটিয়ে গিয়েছে। ভূতটার সবচেয়ে রাগ তারই ওপর কি না। ওঝা বেতটা উঁচিয়ে ধরতেই ভূত আবার তার তর্জনী তুলে বলল, বুড়ি সবাইকে অনেক জ্বালিয়েছে, কাউকে এক মুহূর্ত স্বস্তি দেয়নি, এবার তার শোধ না তুলে ছাড়ছি নে। আজ রাতের মধ্যেই ঘাড় মটকে দেব ওর। একটা রাত সবুর কর।

শুনতে শুনতে বেশ উল্লাস হল শঙ্খর মনে। বাঃ, ভূতটা তো জবর চেপে ধরেছে রাঙাবৌদির শাশুড়িকে। হে ভগবান, ভূতটা যেন আজ রাতের মধ্যেই ঘাড় মটকে দিয়ে চলে যায়।

ভূত তখনও ওড়পাচ্ছে, বুড়ির সব কীর্তি আমি এবার ফাঁস করে দেব। এতদিন কাউকে কিছু বলিনি, বেঁচে থাকতে সব চেপে-চেপে ছিলাম। সারা জীবন কম কিছু করেছে ও, এই বুড়ি বয়সেও পর্যন্ত ঘরের বৌটাকে একটু শান্তি দেয় না।

বলতে বলতে বাঙাবৌদির মুখখানা ভীষণ হয়ে উঠল আরও, যেন এখনই বুড়ির ঘাড় মটকে দেবে লাফিয়ে পড়ে। এ রাঙাবৌদিকে যেন চিনতেই পারছে না শঙ্খ। চিনবে কী করে! ভূত যে—

দাওয়ার ওপরেও দু-তিনজন উঠে পড়েছে। শঙ্খর খুব ইচ্ছে হল দাওয়ার ওপর উঠে রাঙাবৌদিকে খুব কাছ থেকে দ্যাখে। সে টিপে-টিপে চলে গেল এমন জায়গায় যেখান থেকে রাঙাবৌদির মুখোমুখি হওয়া যায়।

ভিড়ের মধ্যে তখন গুঞ্জন চলছে। সবাই বলাবলি করছে, কী ভয়ানক বুড়ি রে বাবা। এবার ভূতই এসেছে বুড়ির কেলেঙ্কারি শেষ করতে।

ঠিক এ সময় হঠাৎ রাঙাবৌদির নজর পড়ল শঙ্খর দিকেই। শঙ্খও হাঁ করে দেখছে বীভৎস চেহারার ভূতে পাওয়া রাঙাবৌদিকে। আর এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, রাঙাবৌদির চোখের ভয়ঙ্কর ভাবটা কমে এল লহমার জন্য, প্রায় সেটা আগের মতো সুন্দর আর নরম, বিস্মিত হয়ে সে যেন দেখল, একটুকরো চিলতে হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল তার ঠোঁটের গোড়ায়। যেন ভূত নয়, সেই রাঙাবৌদিই। পরমুহূর্তে আবার মুখখানা ভয়ঙ্কর করে চেঁচিয়ে উঠল, ছাড়ব না ওকে। কিছুতেই ছাড়ব না। একটা দিন সময় দে, ওঝা, ওর ঘাড়টা আগে মটকে দি। এতও জ্বালাতে পারে সবাইকে—

শঙ্খর বুকটা এতক্ষণ ভারী হয়ে ছিল, হঠাৎ মনে হল হালকা ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে। যেমন ভেবেছিল, ভূতগুলো তাহলে তেমন খারাপ নয়। লেখাদির ঘাড়ে চেপেছিল যে ভূত, সে ভালো করে কড়কে দিয়ে গেছে তার পাজি, বখাটে ছেলেগুলোকে। যে ভূত রাঙাবউদির শরীরে ভর করেছে, সে দিব্যি টিট করে দিচ্ছে দজ্জাল বুড়িটাকে। এরকম ভূতটুত কিছু থাকা দরকার। গৃহপালিত প্রাণীর মতো ভূত পোষাও খুব প্রয়োজনীয়।

একটা তীব্র উল্লাস সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল শঙ্খর। এতক্ষণে একটা স্বস্তির শ্বাস বুকে ভরে নিতে পারল ও।

যাক্, শরৎকাল এসে গেল। এবার পুজোটা বেশ ভালোই কাটবে তার। রাঙাবৌদিরও।

দেখতে দেখতে কখন বর্ষা পেরিয়ে শরৎ এসে গেল তা মনে করতে পারে না শঙ্খ। হঠাৎ একদিন ঠাক্‌মা ডেকে বললেন, পুকুরে যাবি নে? চাপড়া ভাসাতি যাচ্ছি—

ভাদ্রমাস পড়লেই চাপড়া-ষষ্ঠীর ব্রত করে ঠাক্‌মা। ঘোল্‌সাপুকুরে গিয়ে হাঁটুতক জলে দাঁড়িয়ে পিটুলির পুতুল আর চাপড়া ভাসায় সব মেয়ে-বৌরা। তার সঙ্গে শাঁখ আর উলুধ্বনি। বেশ জমজম করে ওঠে ঘোল্‌সাপুকুরের পাড়। চাপড়ার কথা শুনেই শঙ্খর মন আন্‌চান করে ওঠে। তার লোভ ওই কাঁঠালপাতার খিলির ভেতর আটা, চিনি আর কাঁঠালিকলা দিয়ে মাখা সিন্নির দিকে। উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে ওদের মা-ও এসেছে, এসেছে ছোটঠাক্‌মা, খুসিপিসি, রোহিনীমাসি। সবাই চাপ্‌ড়া ভাসাবে আর বলবে, চাপড়া গেল ভেসে, ষষ্ঠী এল হেসে।

কিন্তু শঙ্খ এখন ঢের বড় হয়ে উঠেছে। তাকে ঘোল্‌সাপুকুরের পাড়ে দেখলেই উমনো-ঝুমনো নিশ্চয় ঠোঁট টিপে হাসবে। উমনো বলবে, কী রে, শঙ্খ, তুই ব্যাটাছেলে হয়ে চাপড়া ভাসাবি? ঝুমনো হয়তো বলবে, ব্যাটাছেলে কোথায়, মেয়েছেলেই তো। ওর গোঁফ উঠেছে এখনও?

শঙ্খ লাজুক হেসে ঘাড় নাড়ল, না ঠাম্মা, যাব না। তোমরা যাও।

ঠাক্‌মা পিছু ফিরতেই সে লজ্জা-লজ্জা গলায় ফের বলল, ফিরে এসে দু'খান্ চাপড়া দিও কিন্তু। ভেতরে বেশি করে সিন্নি দেবা—

ঈশ্বরীপুরের বুকে তখন জাঁকিয়ে বসছে শরৎকাল। শরৎ মানেই আকাশের কোলে শাদা তুলো-পেঁজা মেঘ। রানির দ'য়ের কিনার ঘেঁষে শাদা কাশফুলের সমাহার। এক ঋতু থেকে আর এক ঋতুর পরিক্রমা শঙ্খর কাছে সবসময়েই এমন বিস্ময়ের। শরৎকাল এলে এহেন অপার বিস্ময়ের সঙ্গে মিলমিশ হয়ে থাকে এক-টুকরো ভালো-লাগা। এ সময়টা রোদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে চমৎকার ঝলমলে সোনালি রং। ইস্কুলে যাওয়া-আসার পথে সে প্রতিদিন এই সোনার জাফরি কুড়োতে কুড়োতে যায়। সেই সোনা সারাক্ষণ জড়িয়ে থাকে তার বুকের আনাচে-কানাচে।

এর মধ্যে সাগরদ' থেকে তার বাবা ব্রজনাথ ক'দিন আগে আবার চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন ঠাকুর্দাকে, ভাবিতেছি পুজোর ছুটিতে শঙ্খকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখিব। ওর মা অনেকদিন যাবৎ শঙ্খকে দেখে নাই। আমি পঞ্চমী অথবা ষষ্ঠীর দিন ঈশ্বরীপুরে গিয়া পৌঁছিব। পরদিন সকালের বাসে উহাকে লইয়া সাগরদ'র পথে রওনা দিব। আমরা সকলে একপ্রকার কুশল। ইতি ব্রজনাথ।

শঙ্খর ঠাকুর্দা চিঠিখানি উল্টেপাল্টে কয়েকবার পড়েছেন। তিনি যে ঘর-ছাওয়ার জন্য কিছু টাকার কথা লিখেছিলেন, তার কোনও উচ্চবাচ্য নেই দেখে হতাশ হয়ে চিঠিখানা গুঁজে রেখেছেন চালের বাতায়। জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে মনে মনে বিড়বিড় করেছেন কী সব। একসময় স্নেহবাসিনীকে ডেকে বলেছেন, এ বচ্ছর বোধহয় আর ঘরের চালে টালি

বসানো হল না।

বাবার চিঠি আসায় শঙ্খর আনন্দ হয়েছে কম নয়, কিন্তু মুষড়েও পড়েছে এই ভেবে যে ঈশ্বরীপুরের পুজো বোধহয় তার আব দেখা হল না। ঈশ্বরীপুরের দুর্গাপুজোর সঙ্গে তার ছোটবেলা থেকে একটা আলাদা টান। আশ্বিনমাস পড়ার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে খড়-বাঁশ-মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ। একটু একটু করে গড়ে ওঠে কাঠামো, তার ওপর খড়, খড়ের ওপর মাটি,তারপর দোমেটোম, তারপর খড়ি। একেবারে শেষকালে রং—

প্রাচীন এক সুবিশাল অশত্থগাছের একপাশে কালীতলা, অন্যপাশে দুর্গামণ্ডপ। মণ্ডপে কাঠামোর সামনে কুমোরকাকা তার দুই ছেলেকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে ভোর থেকে গভীররাত পর্যন্ত। একমেটোম পার হয়ে দোমেটোমের সময় আরও গাঢ় হয়ে আসে তার চাউনি। নিখুঁত করে মাটি লেপে আরও চমৎকার করে তুলতে চায় প্রতিমার শরীর। দোমেটোম হওয়ার পর ক'দিন ধরে শুকোয় মূর্তিগুলো। তারপার শাদা খড়ি দেওয়ার সময় থেকে একটু-একটু করে জেগে ওঠেন দেবী। তারপর রং দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে কুমোরকাকার দু'চোখে ঘনিয়ে আসে শিল্পীর ঘোর।

এহেন দুর্গাপজো ছেড়ে এখন কি সাগরদ'য় যাওয়া যায়!

শঙ্খ বলল ঠাকুর্দাকে, তুমি চিঠি লিখে দাও বাবাকে। এখন যাব না। পুজোর পর এসে যেন আমাকে নিয়ে যায়।

ঠাকুর্দা খুশি হয়ে বললেন, তাই লিখে দিই, কী বল্। তুই পাশে না শুলে আমার আবার চোখে ঘুম আসে না।

সেই ছোট্টবেলা থেকে, একপাশে ঠাকুর্দা, অন্য পাশে ঠাকমা না শুলে শঙ্খর চোখেও ঘুম আসতে চায়না। ঘুম না এলে এখনও ঠাক্‌মার কাছে আব্‌দার ধরে, একটা গল্প বলো না ঠাম্মা, সেই লালকমল নীলকমলের গল্প—

ইস্কুলে যাওয়া-আসার পথে সব ভুলে গিয়ে শঙ্খ দুদণ্ড দাঁড়িয়ে পড়ে দুর্গামণ্ডপের সামনে। পলকা খড় আর মাটির কারুকাজ কী করে প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে কুমোরকাকার তুলির ছোঁয়ায় সেটাই তার কাছে ভারী আশ্চর্যের। কী পরম যত্নে কুমোরকাকা একটু একটু করে চালচিত্রে ছড়িয়ে দেন তাঁর সমস্ত সত্বা। বিশেষ করে, দেবীদুর্গার চোখদুটো আঁকার সময় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। যেন নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও কানে গেলে কেঁপে যেতে পারে কুমোরকাকার হাত।

টুপুর সেদিন বলল, এবার আমরা আরও দূর-দূর পাড়ায় যাব ঠাকুর দেখতি, কী বলো, শঙ্খদা?

শঙ্খ ঘাড় নাড়ল, ঠিক বলেছিস। আমরা তো এখন আরু এট্টু বড় হযে গেছি—

—এবার তো অর্ঘদা আছে, অর্ঘদাও যদি সঙ্গে যায় তাইলে মসলন্দপুর হয়ে হাবড়া চলে যাব, কিংবা আরু দূরে, বসিরহাট হয়ে টাকিতে। ওখানকার জমিদারবাড়িতে মহিষবলি হয়—

শঙ্খ অমনি বলে উঠল, রনোকাকা বসিরহাট যাবে বলেছে। আমি বলে দেখি, যদি নে যায়—

এমনতর কত সব ভাবনা শঙ্খদের মাথায়। ভাবতে ভাবতে কুমোরকাকার প্রতিমা গড়া দেখে। কী চমৎকার করে জরি-বসানো শাড়ি পরিয়েছে মা দুর্গার শরীরে। মা সরস্বতীর গায়ে শাদা শাড়ি তো মা লক্ষ্মীর গায়ে লাল। কী সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল বুকের দু'পাশ

দিয়ে নেমে এসেছে। কার্তিকের মাথায় কী দারুণ মুকুট। তার ময়ূরটাও কী বড়ো আর মনোহারী।

তুলির শেষ আঁচড় দেওয়ার পর যখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছু ঠিকঠাক হল কি না ঠাওর করার চেষ্টা করছে কুমোরকাকা, অমনি শঙ্খ বলে উঠল, নাহ্, কুমোরকাকা, এবারের অসুর যেন আগেরবারের মতো তেমন সাংঘাতিক বলে মনে হচ্ছে না।

—তাই! বলে কুমোরকাকা খানিকক্ষণ অসুরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। তারপর লহমায় তার বাহুতে-উরুতে-চিবুকে দু-চারটে হালকা ধরনের কালচে আঁচড় দিতেই দ্বিগুণ বিক্রমে ফুঁসে উঠল অসুর। চোখের কোণে একটু কারিকুরি করতে আরও হিংস্র হয়ে উঠল তার চোখদুটো।

চাটুজ্জেপাড়ার সুখেন বলে ওঠে, এবার দুর্গার মুখ কিন্তু গতবারের মতো মিষ্টি হয়নি, কুমোরকাকা।

অমনি কুমোরকাকা, 'ওই যাহ্, একদম ভুলে গেছি' বলে দুর্গার আধখানা চাঁদের মতো গোলাপি কপালের ঠিক মাঝখানে একবিন্দু লালটিপ একটু বড় করে এঁকে দিতেই 'ইস, কী দারুণ' বলে লাফিয়ে উঠেছে শঙ্খ।

পরদিন সকালে ইস্কুলে যাওয়ার পথে শঙ্খ হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। কখন রাত্তির বেলা সবার অলক্ষে এমন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল কেউ জানতেই পারেনি। গর্জনতেলে চাপুড়চুপুড় হয়ে ঝকঝক করছে দেবীপ্রতিমার মুখ। মা দুর্গার মিষ্টিমুখে দুর্গতিনাশিনীর মতো বরাভয় ঝলমল করছে দু'পাশে ঝোলানো চাঁদমালা। এক আশ্চর্য দ্যুতি তখন ছড়িয়ে পড়ছে গোটা প্রতিমার শরীরে।

শঙ্খর ভেতরে তখন থইথই উল্লাস। কিন্তু তখনও প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি, চক্ষুদান হয়নি প্রতিমার, তাই সেই চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। চক্ষুদান করতে আসেন গায়ে নামাবলী জড়ানো বৃদ্ধ পুরোহিত অখিল ভটচাযমশাই। তাঁর যেমন নামডাক, তেমনি গম্ভীর চেহারা। পঞ্চমীর দিন থেকেই তাঁর উপস্থিতি পুজোর মণ্ডপে একটা অন্য গাম্ভীর্য এনে দেয়। তাঁর চাউনির ভেতর থেকে উপচে পড়ছে এক অদ্ভুত পবিত্রতা।

শঙ্খরা তখন দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মণ্ডপ ঘিরে। কেউ কালীপটকা ফোটানো শুরু করেছে। কারও হাতে পিস্তল। হরদম টোটা পুরছে, আর ফাটাচ্ছে। নতুন জামা-প্যান্ট পরেছে অনেকে। কারও কারও জামা আবার বেশি ঝলমলে। ঢাকিরা ওদিকে নাচতে নাচতে বকমারি অঙ্গভঙ্গি করে ঢাক পিটোচ্ছে মনের সুখে। কাঁসিও বাজছে কাঁইনানা কাঁইনানা। তার মধ্যেই হঠাৎ পুরোহিতমশাইএর গর্জন শোনা গেল, অ্যাই, সব চুপ করো, দেবীর চক্ষুদান হচ্ছে -

অমনি কয়েকমুহূর্ত এক নিথর নৈঃশব্দ। চারপাশে নির্বাক উত্তেজনা থম হয়ে থাকে। টুলের ওপর উঠে পুরোহিত মশাই তখন তাঁর লম্বা হাত বাড়িয়ে একটা আঙুল ছুঁইয়ে রেখেছেন দেবী দুর্গার চোখে, আর মন্ত্রোচ্চারণ করছেন বজ্রগম্ভীর স্বরে। এতদিন তো দেবীর শরীরটাই গড়া হচ্ছিল, মন নয়, এখন চক্ষুষ্মান হচ্ছেন দেবী, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে তাঁর শরীরে। এইবার চক্ষুষ্মান হয়ে দেবী দেখতে পাবেন শঙ্খদের এমন একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে তাদের শরীরে।

মন্ত্রপড়া শেষ হলে পুরোহিতমশাই নেমে এলেন টুল থেকে। শঙ্খ তখন অবাক হয়ে দেখছে, দেবী ঠিক তারই দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁর গর্জনতেল মাখা চকচকে চোখে, আর

যেন বলছেন, কী রে, তোরা ভালো ছিলিস তো সব।

শঙ্খ ঘাড় নাড়ল, সে ভালো আছে।

ষষ্ঠীর দিনে দেবীর বোধন থেকেই পুজোর আসল উল্লাস। ঠিক সেদিনই সন্ধের পর কলকাতা থেকে অনেকদিন পর এসে পৌঁছলেন অচিনকাকা। লম্বা, ফর্সা, রোগাটে গড়ন অচিনকাকার। সঙ্গে তাঁর এক বন্ধু, মনমোহনকাকা। খুব বড়লোক নাকি অচিনকাকার এই বন্ধুটি। সোনার বোতাম পরানো সিল্কের ঝলমলে পাঞ্জাবি তার গায়ে, পরনে ফিনফিনে ধুতি, তার সরু পাড়ে চমৎকার কারুকাজ। মুখে সবসময়েই একটা হাসির রেখ্।

অচিনকাকা কলকাতায় টুকটাক এটা-ওটা করে কোনও ক্রমে নিজের থাকা-খাওয়া চালিয়ে নিচ্ছিলেন। আজ বাড়ি ফিরে হাসি-হাসি মুখে প্রণাম করলেন প্রথমে জীবেন্দ্রনাথকে, তারপর মা স্নেহবাসিনীকে। তারপর জীবেন্দ্রনাথের হাতে একশোটা টাকা দিয়ে বললেন, একটা চাকরি পেয়েছি।

-চাকরি? জীবেন্দ্রনাথ প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারলেন না যেন। তার ওপর আচম্‌কা একশোটা কড়কড়ে টাকা হাতে পেতে থ হয়ে গেলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ ফেটে জল এল। বারবার বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, তুই চাকরি পেয়েছিস, অ্যাঁ? কী কাণ্ড। এ যে লটারির টিকিট পাওয়ার মতো। সত্যি নাকি মনমোহন?

মনমোহন লাজুক-লাজুক মুখে বললেন, হ্যাঁ, আমাদের অফিসেই। সরকারি চাকরি। মাইনে অবশ্য কমই।

সরকারি চাকরি শুনে আরও তাজ্জব হয়ে গেলেন জীবেন্দ্রনাথ। সরকারি চাকরি পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। একদম পার্মানেন্ট চাকরি। বছর-বছর মাইনে বাড়বে। চাকরি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আজীবন পেনশন।

আনন্দে, উল্লাসে হাঁকডাক বাড়িয়ে দিলেন জীবেন্দ্রনাথ, অচিন, তুই কালই গিয়ে পুজোর মণ্ডপে পুজো দিয়ে আয়। অবনী,তুই কাল সকালে গিয়ে টালিখোলায় টালির অর্ডার দিয়ে আসবি, বলবি, কাল বিকেলেই যেন দু'গাড়ি টালি ফেলে দিয়ে যায় আমার উঠোনে। রনো, তুই বাজারে গিয়ে ভালো করে বাজার করে নিয়ে আসবি। আর নবমীর দিন মাংস হবে। মণি, তুই—

মণিকে শঙ্খকে কী কাজ দেবেন তা আর ভেবে পেলেন না ঠাকুর্দা। কেবলই হাঁকডাক করতে লাগলেন, ইস, আর ক'টা দিন আগে কেন টাকাগুলো হাতে দিলি নে। তাইলে তো পুজোর আগেই ঘরখানা ছাইতি পারতাম। যাক গে, পুজোর পর-পরই নতুন ঘরে গৃহপ্রবেশ হবে। অচিন, অচিন—

অচিনকাকার সঙ্গে গভীররাত পর্যন্ত বসে ক'খানা ঘর হবে, কে কোন ঘরখানা নেবে, তাই নিয়ে মহা উল্লাসে আলোচনা করলেন ঠাকুর্দা। এই পুজোর সম-সম সময়ে এমন একটা আনন্দের সংবাদ এসে পৌঁছবে তা কেউ অনুমান করতে পারেনি। অচিনকাকাও যে দেড়মাস হয়ে গেল চাকরি পেয়েছেন তা ঘুণাক্ষরেও জানাননি এতদিন, হঠাৎ একেবারে একশো টাকা কড়কড়ে ঠাকুর্দার হাতে দিয়ে—

শঙ্খরও সে রাতে উত্তেজনায় ঘুম আসতে বেশ দেরি হল। টাকার চিন্তায়, সংসার কীভাবে চালাবেন তার ভাবনা ভেবে ভেবে ঠাকুর্দা দিন দিন কৃশ আর ম্লান হয়ে যাচ্ছেন। তার ওপর শঙ্খর কিংবা মণিকাকার নতুন বই কেনার দরকার হলে ঠাকুর্দার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ে।

এমনকি মাত্র দেড়টাকা পরীক্ষার ফিজ্ দিতে গিয়েও ঠাকুর্দাকে হিমশিম খেতে হয়। তবু ভাগ্য এই যে, তারা উদ্বাস্তু বলে কারোরই ইস্কুলে মাইনে দিতে হয় না। এই সুযোগটুকুও কতদিন পাওয়া যাবে তাও জানা নেই তাদের। ঠিক এরকম মুহূর্তে অচিনকাকা একটা চাকরি পাওয়ায় নিশ্চয়ই তাদের সুসার হবে।

পরদিন সপ্তমীর পুজো শঙ্খর জীবনে এক নতুন উল্লাসে ধরা দিল। সকাল হতেই তারা দল বেঁধে গিয়ে হাজির হল দুর্গামণ্ডপে। অধিকারীপাড়ার দুলুকাকা পুরোহিতমশাই-এর সঙ্গে একযোগে বসে পুজোর উপাচার গোছাচ্ছেন, চারকোণে চারটে কঞ্চি পুঁতে তাতে লালসুতো বেঁধে প্রতিমার চারদিকে ঘেরা হয়েছে পুজোপাচারের অঙ্গ হিসেবে। প্রতিমার সামনেই পুরোহিতের আসন, তার পাশে পেতলের বিশাল রেকাবের ওপর ভোজ্যদ্রব্য, ফলমূল, আতপচাল, পঞ্চবর্ণের গুঁড়ো, মধুপর্কের বাটি, ফুল-তুলসী-বিল্বপত্র, দধি, খই, চিনি, তেল, হলুদ, যজ্ঞকাঠ, আরও কত কী।

সেই বর্ণাঢ্য উপকরণের সামনে দাঁড়িয়ে শঙ্খ শুনছে উদাত্তকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ। পুজো শেষ হতে হতে বেলা দুপুর গড়িয়ে যায়। তারপর শুরু হয় দেবীর আরতি। পঞ্চপ্রদীপ, চামর, শঙ্খ, নববস্ত্র, পুষ্প-বিল্বপত্র ঘুরিয়ে দেবীর আরতি করতে থাকেন পুরোহিত মশাই, আরতির সময় পুজো যেন একটা অন্য মাত্রা পায়। ততক্ষণে ঢাকের বাদ্যি আরও তুমুল হয়েছে, আরও জোরে বাজছে ঘণ্টা-কাঁসর, চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে সমবেত মেয়ে-বৌদের উলুর আওয়াজ। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ায় আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে পরিবেশ। একজন কুমারী মেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে প্রতিমার গায়ে চামর দুলিয়ে বাতাস করে যাচ্ছে অন্তহীনভাবে।

এর মধ্যে পল্টন, টুপুর আর চাটুজ্জেপাড়ার অমলের সঙ্গে দল বেঁধে শঙ্খ ঘুরে এল উত্তরপাড়ার ঠাকুর দেখে। ওদের পাড়ায় এবার ডাকের সাজের ঠাকুর। সে প্রতিমা দেখলেও চোখ ঝলসে যায়, তবে তাদের দক্ষিণপাড়ার মতো হয়নি। পরদিন মিউনিসিপ্যালিটির মাঠে গিয়েও মনে হল, নাহ্, এবারও দক্ষিণপাড়াই ফার্স্ট, ওরা দুটো সিংহ করলে কী হবে, দক্ষিণপাড়ার একটা সিংহ একাই একশ।

দুর্গাপুজোর সবচেয়ে ত্রাসসঞ্চারকারী ব্যাপার, যা শঙ্খর মনে হয়, তা হল অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজো। প্রতিবারই দুলুকাকা বজ্রগম্ভীর গলায় হেঁকে বলেন, এই সরে যাও, সরে যাও সবাই, সন্ধিপুজোর সময় কেউ প্রতিমার সামনে দাঁড়াবে না। তখন ধুনোর ধোঁয়া বৃত্তাকারে ভরে ওঠে চারপাশে। একটানা অন্য এক গম্ভীরশব্দে বেজে চলে ঢাক-ঢোল-কাঁসর। পুরোহিত অখিল ভট্‌চায্যির চোখেমুখে ফুটে উঠেছে এক তীক্ষ্ণ চাউনি। সেসময় গোটা দক্ষিণপাড়ার সব দিক থেকে মানুষজন এসে ভেঙে পড়েছে মণ্ডপে। চাটুজ্জেপাড়া, অধিকারীপাড়া, সরখেলপাড়া, মুখুজ্জেপাড়া, ঘোষপাড়া থেকে নারী-পুরুষ-বাচ্চারা সবাই এসে ভক্তিভরে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমার দিকে তাকিয়ে।

শঙ্খও একবুক ত্রাস নিয়ে প্রতিমার চালচিত্রের কোণাকুনি দাঁড়িয়ে অপলক তাকাচ্ছে মা দুর্গার চোখদুটোর দিকে। দেবীর চোখে যেন এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা, যেন সেই মুহূর্তে তিনি সত্যিই দুর্গতিনাশিনী।

টুপুর একসময় ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, সন্ধিপুজোর সময় প্রতিমার সামনে দাঁড়ালে কী হয়, শঙ্খদা?

শঙ্খ ঘাড় নাড়ল, সে জানে না। শুধু একরাশ ভয় এসে ভিড় করে তার বুকের ভেতর,

এইটুকুই জানে।

সেদিন সন্ধেবেলা সবাইকে অবাক করে অচিনকাকা গিয়ে বলল পুজোমণ্ডপের এক মাতব্বর খেতু চাটুজ্জেকে, খেতুদা, আমার এক বন্ধু কলকাতা থেকে এসেচে, ও মণ্ডপের সামনে ধুনুচি-নাচ করতে চায়।

ধুনুচি-নাচ! খেতু চাটুজ্জে অবাক, সে তো কলকাতায় হয় শুনিচি। ঠিক আছে, তবে হোক। এ গাঁয়ে তো কখনও হয়নি। সবাই দেখবে'খন।

মনমোহনকাকা ততক্ষণে তাঁর সোনার বোতাম লাগানো সিল্কের পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছেন গা থেকে। ভেতরে ধবধবে চমৎকার স্যান্ডো গেঞ্জি। ফিনফিনে ধুতি গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তুলে মালকোচার মতো করে পরলেন। তাঁর কালো রোমশ উরুতে স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে, তেমনই পেশল বুকের ছাতি। ধনুচি নাচের জন্য প্রস্তুত হয়ে প্রথমে কয়েকমুহূর্ত চোখ বুজে মনে হল দেবীর আরাধনা করলেন। তারপর দুই হাতে দুই বিশাল জ্বলন্ত ধুনুচি নিয়ে শুরু করলেন এক উদ্দাম-নৃত্য। সে নাচ সত্যিই দেখবার মতো। সন্ধিপুজোর মতোই ধুনুচি-নাচ দেখতে সে রাতে ভেঙে পড়ল পাড়াধ লোকজন। নাচের ঝোঁকে ধুনুচির ভেতরকার গনগনে ছোবড়ার আগুন বাতাসে উড়ে উড়ে ভারী দৃশ্যময় করে তুলল গোটা পরিবেশ।

মনমোহনকাকার খুব নাম হয়ে গেল ঈশ্বরীপুরে। তার সঙ্গে অচিনকাকা তাঁকে নিয়ে এসেছে বলে অচিনকাকারও।

শঙ্খরও মনে হল, তারও বুকটা হঠাৎ যেন ফুলে উঠেছে গর্বে। এ-পাড়া বে-পাড়ার কুচোকাচারা তাকেও জিজ্ঞাসা করতে শুরু করল মনমোহনকাকা সম্পর্কে। কে লোকটা, কোথায় থাকে, আবার পরের বছর আসবে কি না।

অর্ঘদা কিন্তু একদিনও পুজো দেখতে বেরুল না তাদের সঙ্গে। সে তাদের নতুন পত্তন ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। বারবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, না রে, আমার ওসব পুজোটুজো দেখতি একদম ইচ্ছে করে না।

অর্ঘ মুখ ভার করে বলল, বেশ লোক তুমি যা-হোক।

ক'দিন পুজো দেখে, এ-পাড়া সে-পাড়া ঘুরে শঙ্খরা তখন ক্লান্ত। চারদিন মোটে পুজো, তার প্রতিটি মুহূর্তই তাদের উপভোগ করে নেওয়া চাই। শরতের এই সোনা-ঝলমল চারটে দিন তো আবার সেই এক বছর পরে আসবে।

কিন্তু বাসে করে দূরে কোথাও ঠাকুর দেখতে যেতে পারল না, ঈশ্বরীপুরেই কেটে গেল পুজোর চার-চারটে দিন। বসিরহাট, হাবড়া কিংবা টাকি কোথাও না। টাকির জমিদারবাড়িতে মহিষবলির কত গল্প রূপকথা হয়ে তাদের আলোচনায় ঘুরেফিরে আসে। আগে নাকি একশো আটটা মহিষবলি হত। তাতে এত রক্ত বয়ে যেত যে ছোট একটা খাল কেটে রাখা হতো যাতে সে রক্ত বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে চলে যেতে পারে বাইরে। একেবারে বিশাল ইছামতীর জলে মিশে যেত সেই রক্তধারা। এখন একশো আটটা-র দিন আর নেই, তবুও নাকি বেশ কয়েকটা—

অর্ঘদার কাছে ভুল করে সেই গল্প করতে গিয়ে সেদিন আবার এক ধমক খেয়েছে শঙ্খ। অর্ঘদা চোখমুখ কুঁচকে ফেলে আতঙ্কে পাংশু হয়ে বলেছে, তোকে কত বার না বলেছি, রক্তের গল্প আমার কাছে বলবি নে—

ধমক খেয়ে শঙ্খও মুখ কাঁচুমাচু করে উঠে এসেছে। সে সত্যিই বারবার ভুলে যাচ্ছে।

আসলে অর্ঘদাকে সে এত ভালোবাসে যে, নতুন কোনও অভিজ্ঞতার কথা শুনলেই আগে অর্ঘদাকে বলে আসতে ইচ্ছে হয় তার। অর্ঘদার সঙ্গে আলোচনা হলে, ভাবনার লেনদেন হলে তার শরীরে এক অন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সে কথা অর্ঘদাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না। পুজোর প্রত্যেকটা দিনের খুঁটিনাটি বলতে ইচ্ছে হয়। এমনকি দশমীর দিন সকালে পুজোমণ্ডপে সারারাত কুচোকাচাদের সঙ্গে তারা পাত্ পেড়ে বসেছিল, তাও। কলাপাতা থেকে অসুর-পুজোর সেই অদ্ভুত স্বাদের পান্তাভাত আর তালবড়া খাওয়াও কি কম রোমাঞ্চের! কী করে পান্তাভাতের এমন আশ্চর্য স্বাদ হয় তা অনেক ভেবেও তারা কূল করতে পারেনি। মর্নিং-স্কুলে যাওয়ার সময় ভোরবেলাকার পান্তাভাত যত চমৎকারই হোক না কেন, দশমীর ভোরের মতো কখনোই নয়।

তার সঙ্গে বিসর্জনের সেই বুকের ভেতর কান্না-উথলে-ওঠা বাজনা, ঠাকুব আসবে কতক্ষণ, ঠাকুর যাবে কতক্ষণ—

এত রাগ হয়েছিল সেদিন অর্ঘদার ওপর যে ভেবেছিল কয়েকদিন অর্ঘদার সঙ্গে কথাই বলবে না সে। কিন্তু বলতে হল, কারণ বিসর্জনের বাজনা শেষ হতে না হতেই সেদিন রাতের বেলা শঙ্খর বাবা এসে হাজির হলেন তাকে সাগরদ'য় নিয়ে যাবেন বলে। অর্ঘদাদের বাড়ি তো সাগরদ'র লাগোয়া গাঁ কাঁকিদহে।

ঈশ্বরীপুর থেকে সাগরদ' প্রায় একদিনের পথ। প্রথমে বাসে করে বসিরহাট, সেখান থেকে ইছামতী পার হয়ে ওপারে আর একটা বাস, সে বাসে করে যেখানে নামতে হয় সে জায়গাটার নাম তেঁতুলিয়া। তেঁতুলিয়া লক-গেটের পাশেই সার-সার গয়নার নৌকো দাঁড়িয়ে। সে নদীর পাটাতনে পা দিলেই বুকের ভেতর সোনাই নদীর একরাশ মিঠেন হাওয়া।

সোনাই ইছামতীর মতো দশাসই নদী নয়, হঠাৎ দেখলে মনে হয় টুনটুনি পাখির মতো ছোট্ট, অদূরে এক চমৎকার জলরেখা। মাঝেমধ্যে এমন সরু যে দু'পাশের বাঁশ কিংবা জিউলিগাছ ঝুঁকে পড়ে ধনুকের মতো হয়ে আছে মাথার ওপর। তার জ্যা-এর নীচে দিয়ে গলে যাচ্ছে গয়নার নৌকো। এমন গা-ছমছমে সবুজের ভেতর দিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চই অন্যরকম।

সাগরদ'য় রওনা দেওয়ার আগে শঙ্খ গিয়েছিল অর্ঘদার কাছে, তোমার গাঁ কাঁকিদহ তো সাগরদ'র লাগোয়া। যাবে নাকি, অর্ঘদা, আবার দু'জনে ফিরে আসব একসঙ্গে। অর্ঘদার মুখখানা কেমন শুকনো দেখাচ্ছিল, ম্লান হেসে বলেছে, নাহ্, কাঁকিদহকে এখন আমি ভুলে গেছি।

শঙ্খর বাবা ব্রজনাথ হঠাৎ অর্ঘদাকে ঈশ্বরীপুরে দেখে চমকে উঠেছিলেন, ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন, ও ছেলেটা কি এখেনে এসে রয়েছে নাকি? শঙ্খ গলায় ঔৎসুক্য ফুটিয়ে বলেছিল, তুমি ওকে চেন নাকি, বাবা? ব্রজনাথের মুখখানা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, ও এখেনে কী করে? শঙ্খ উত্তর দিয়েছিল, অর্ঘদা এখেনে পড়বে বলে এয়েছে। এ বচ্ছর দেরি হয়ে গিইছিল বলে আর ভর্তি হতি পারেনি, সামনের বচ্ছর ভর্তি হবে, ক্লাস টেনে। ব্রজনাথ অবশ্য আর কিছু বলেননি।

সোনাইনদীর দু'পাশের পাড়, গাছগাছালি, গুল্মলতা, ঘাস দেখতে দেখতে শঙ্খ আনমনা হয়ে ভাবছিল তার বাবার কথা। অর্ঘদাকে দেখে অমন গম্ভীর আর চুপচাপ হয়ে গেলেন কেন! এমন স্বরে কথা বলছিলেন যেন অর্ঘদা খুবই খারাপ ছেলে। চায়ের দোকানে দিনরাত বিড়ি

কিংবা সিগারেট খেতে খেতে আড্ডা দেয়, খারাপ খারাপ কথা বলে যারা, তাদের মতো। কিন্তু শঙ্খ তো জানে, অর্ঘদা মোটেও সেরকম নয়। অর্ঘদা বিড়ি সিগারেট তো খায়ই না, বরং বলে, ওসব তো লোফার ছেলেরা খায়। বখে যাওয়া ছেলেরা ওরকম নেশাভাঙ করে। বরং অর্ঘদার মনটা ঠিক একেবারে উলটো। তার ভেতরটা খুব নরম, ঠাণ্ডাধরনের। তার চোখদুটোয় একটা অদ্ভুত স্বপ্ন জড়িয়ে থাকে যেন। সেই স্বপ্নিল চোখদুটো দিয়ে সে তাকিয়ে থাকে শাদা তুলো পেঁজা-পেঁজা মেঘগুলোর দিকে, তার চারপাশের নীল আকাশের দিকে। কখনও সম্মোহিত হয়ে তাকিয়ে থাকে ইছামতীর তীরে বসে থাকা শাদা লম্বাঠ্যাং বকগুলোর দিকে। কখনও এক ঘোরের মধ্যে বাস করে সবুজ আম-কাঁঠাল-জাম-জামরুল বা ঘন ঝাঁকড়া হয়ে থাকা তেঁতুল-বট কিংবা অশথের দিকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে। কখনও বিড়বিড় করে একা-একা কী-সব বলে, যেন ঘুমের ভেতর কথা বলছে। আবার বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে শাদাপাতার ওপর এঁকে চলে চমৎকার সব ছবি। সে-সব আঁকিবুকির ধরনই আলাদা। যেন আঁকতে আঁকতে স্বপ্নের ভেতর পার হয়ে চলেছে এক রূপকথার দেশ।

এইসব ভাবতে ভাবতে, নৌকোর দুলুনিতে দুলে দুলে শঙ্খ ক্রমশ সেঁধিয়ে যাচ্ছে এক আশ্চর্য পৃথিবীর মধ্যে। তার বাবা আগে ছিলেন মৌগ্রাম নামের এক ছোট্ট গাঁয়ে, এখন নতুন বাসা নিয়েছেন সাগরদ'য়া—যে গাঁয়ে সে এই প্রথম চলেছে। নতুন কোনও জায়গায় যাওয়া মানেই এক অন্যরকম উত্তেজনা। সেখানকার ঘরবাড়ি, সেখানকার প্রকৃতি, সেখানকার মানুষজন সবই আলাদা। নতুন করে চেনাজানা হবে তাদের সঙ্গে। নতুন করে একটি বসতকে আবিষ্কার করবে তার দশবছরের চোখ দিয়ে, তারা কেমন মানুষ, তাদের বসতবাড়িগুলোই বা কীরকম, কেমন সেখানকার দৃশ্যপট, সেখানকার মানুষরা শঙ্খকে পছন্দ করবে কি করবে না তার কিছুই জানে না সে। তাই তার বুকের ভেতর জমা হয়ে আছে শুধু একরাশ কৌতূহল আর কৌতূহল। এক রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা।

একটু পরেই সোনাই নদী বেশ খানিকটা চওড়া হয়ে গেল। দু'পাশের গাছগাছালি, বসত দেখতে দেখতে কোথাও চোখে পড়ছে এক-একটা ঘাট। দুপুর এতক্ষণে ঢলে পড়েছে বিকেলের দিকে, তবু এই অবেলায় কোথাও চানে নেমেছে কেউ-কেউ। কোথাও নারী-পুরুষেরা ঝাঁক বেঁধে চান করছে, কোথাওবা আবার তারই বয়সী ছেলে-ছোকরারা ঝাঁপাই জুড়েছে। এমন টলটলে সবুজরঙের জল দেখে শঙ্খরও লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয় সোনাইএর জলে। শেষ-শরতের এই চমৎকার দিনগুলোয় সন্ধের দিকে একটু শীত-শীত করলেও দুপুরবেলাটা ভারী মনোরম। এহেন মিঠেন হাওয়ার দিনে জলে ঝাঁপাই জোড়ার মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আর কীই বা আছে!

একনাগাড় ঘণ্টাতিনেক ছইএর ভেতর বসে সোনাইনদীর পটভূমি দেখার মধ্যেই হঠাৎ তাদের নৌকো এসে ভিড়ল সাগরদ'য়ের ঘাটে। শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে দেখল, তাদের ঈশ্বরীপুরের বাড়ি ইছামতীর যতটা কাছে, সাগরদ'য়ের বাসাবাড়ি তার চেয়েও কাছে, বস্তুত ঘাট থেকেই সরু মেটেপথ গিয়ে ঠেক খেয়েছে একটা মস্ত দালান-বাড়ির খিড়কি-দরজায়। দরজা পেরোলেই মস্ত উঠোন। উঠোনের চারপাশেই উঁচু পাঁচিল। উঠোন পেরোলে দোতলা পেল্লাই বাড়ির একতলায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর নিয়ে ব্রজনাথের বাসাবাড়ি।

শঙ্খর মা তাকে দেখেই বললেন, যাক, তালে তুই এলি? আমি ভাবলাম, তোর দাদু আর তোরে আমাদের এখেনে আসতি দেবে না।

শঙ্খ লাজুকভাবে হাসল। তার ঠাকুর্দা তাকে এত ভালোবাসেন যে, তাকে একদণ্ড না দেখলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শঙ্খরও যাবতীয় আবদার তো ঠাকুর্দাকে ঘিরেই। ইস্কুলে যাওয়ার পথে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেলে সে হাত পাতে, দাদু, পাঁচটা নয়াপয়সা দ্যাও তো। ইস্কুলের মাঠে এমন দারুণ ঝাল-লজেন এসে বসে—

শঙ্খ ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তার নতুন বোনটিকে নিয়ে। খুব ফর্সা হয়েছে সে। আর কথা বললেই ফিকফিক করে হাসছে। হাসলে তার কচি গালদুটোয় টোল পড়ে। আবার বেশি হাসলে তার গাল বেয়ে নাল।

শঙ্খর বড়বোন টুয়া এবছরই ভর্তি হয়েছে ইস্কুলে সাগরদ'র পাঠশালায়। তবে টুয়ার কথাবার্তা শুনে মনে হল তাদের পাঠশালাটা একেবারে অজগাঁয়েই। সাগরদ' অজ কি না তা শঙ্খ এখনও জানে না। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল টুয়ার লেখাপড়ার বহর দেখে। ক্লাস ওয়ানে তারা স্লেট-পেন্সিলে লেখাপড়া শিখেছে। টুয়ে উঠে খাতা আর পেন। টুয়াদের পাঠশালায় লেখা শেখাচ্ছে স্লেট বা খাতা কোনোটাতেই নয়, তাদের অ আ ক খ লেখা শুরু হয় তালপাতায়।

শঙ্খ অবাক হয়ে বলল, তোদের পাঠশালায় সব্বাই তালপাতায় লেখে।

টুয়া বিজ্ঞের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

তালপাতার মাপ চওড়ায় এক ইঞ্চির মতো, লম্বায় একফুট। তাদের লেখার কালিও ভারী অদ্ভুত। শঙ্খদের মতো বাজার থেকে জে.বি.ডি. বড়ি কিনে তা দিয়ে কালি বানায় না ওরা। নেভা-উনুনের ভেতর থেকে পোড়া কাঠকয়লা বেছে নিয়ে তা গুঁড়ো করে প্রথমে, সেই গুঁড়ো জল দিয়ে গুলে কালি তৈরি করতে হয়। তারপর কঞ্চির কলম সেই কালিতে ডুবিয়ে গোটা-গোটা অক্ষরে লিখেছে অ আ ই ঈ । ঔ পর্যন্ত লিখতেই একটা তালপাতা শেষ। পরের তালপাতায় শুরু করেছে ক খ গ ঘ ঙ....

টুয়া তার পাঠশালার ঝোলা থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা গুচ্চের তালপাতা বার করে দেখাল শঙ্খকে, এই এত্ত লিকিচি—

টুয়ার পাণ্ডিত্য দেখে শঙ্খ তো থ। তাদের ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই বাংলার ক্লাস নিতে নিতে কখনও স্মৃতিচারণ করেন তাঁর ছোটবেলার। পুব-বাংলার পাঠশালায় পড়ার সময় তাঁরা নাকি তালপাতায় খাগের কলম দিয়ে লিখতেন। সে তো বহুযুগ আগের কথা। মান্ধাতার আমল বললেও চলে। এতকাল পরে সাগরদ'য় এসে হঠাৎ সেই মান্ধাতার আমল ফিরে পেয়ে শঙ্খর কাছে ভারী কৌতুককর মনে হল। তা'লে সাগরদ' অজ পাড়াগাঁই নিশ্চয়। এখানে কাছাকাছি ডাঙার দেশ বলতে সেই তেঁতুলিয়া। যোগাযোগ বলতে এই দীর্ঘ জলপথ। এখান থেকে সাপে-কাটা রুগী নৌকো করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে-যেতেই নাকি রুগীর প্রাণ বেরিয়ে যায়।

অজ পাড়াগাঁ হলেও শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে গেল আরও অনেক কারণে। পরদিন সকালে সেই দালানবাড়ির বৈভব দেখে সে চোখ ফেরাতে পারে না। ঈশ্বরীপুরে তারা বাস করে গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা মেটেবাড়িতে। পুজোর ছুটির শেষে সেখানে ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবে টালির ঘরখানা ততদিনে তৈরি। হয়তো তোড়জোড় চলছে গৃহপ্রবেশের। সেই টালির ঘরখানাই তার চোখে এক অদ্ভুত ঐশ্বর্যময়। কিন্তু এই মস্ত দালানবাড়ির ঐশ্বর্য দেখে সে হাঁ হয়ে গেল। বাড়ির মালিক জগদীশ মুখুজ্জে বেশ পয়সাঅলা মানুষ। তিনি এই এলাকার ডিস্ট্রিক্টি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। খুবই নামীদামি লোক। তাঁর দোতলা বাড়িতে ওপর-নীচ

মিলিয়ে বারো-চোদ্দখানা ঘর। বাড়ির পাঁচিলের বাইরেও অনেকখানি জুড়ে তাঁর বাড়ির চৌহদ্দি। সেখানে নারকেল-সুপুরি-তাল ছাড়াও মেলাই ফল-ফলারির গাছ। তার মাঝখানে মস্ত একখানা পুকুর। তাতে থইথই জল। সে পুকুরে জাল ফেললেই নাকি বড় বড় রুই-কাৎলা অমনি ছটফটিয়ে ওঠে। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে শান-বাঁধানো ঘাট। ঘাটের ওদিকে মস্ত দু'দুখানা ধানের মরাই।

জগদীশবাবুর হাঁকডাকে নাকি গোটা অঞ্চল সদা-সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে। তাঁর ফর্সামুখে বসন্তের দাগ কিছুটা মালিন্য সৃষ্টি করেছে, কিন্তু নাকের ওপর চশমা ঝুলিয়ে যখন ডাগা-ডাগা চোখদুটো তুলে তাকান তখন শিরশির করে ওঠে শরীর। সেই আতঙ্কটুকু বাদ দিলে মাত্র একদিনেই সাগরদ' গাঁ-টিকে ভারী ভালোবেসে ফেলল শঙ্খ। শুধু এখানকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের জন্যই নয়, জগদীশবাবুর কণিষ্ঠ দুই পুত্র অনু আর রনুর জন্যও।

অনু শঙ্খর চেয়ে মাত্র দেড়বছরের বড়ো। বড়ো হলেও তার দাদাগিরি ফলানোর শখ নেই। বরং সে একটু লাজুক, নম্রস্বভাবের। তার কথা বলার ঢংও বেশ মিষ্টি। আর রনু শঙ্খর চেয়ে এগারমাসের ছোট। ছোট হলেও সে চটপটে, মাঝে মধ্যে রগড় করতে হুল্লোড় করতে ভারী পছন্দ তার। অনবরত হাসেও হি হি করে। অজগ্রামে বাস করা এই দুই বালক হঠাৎ ঈশ্বরীপুর নামক এক দূরবর্তী শহর থেকে আসা শঙ্খকে দেখে একটু সমীহও করল। যেন সে এক সহুরে বালক, একজন কেউকেটা। ঈশ্বরীপুর! সে তো কলকাতা থেকে খুব কাছের কোনও শহর। সে শহরে পাকারাস্তা দিয়ে অনবরত হর্ণ বাজাতে বাজাতে দাপিয়ে ছুটে যাচ্ছে বাস-ট্যাক্সি-লরি।

শঙ্খও মুহূর্তে রপ্ত করে নিল ব্যাপারটা। সাগরদ'য়ের এই অপার বৈভবের পাশে তার ঈশ্বরীপুরের বসবাস যে নিতান্তই দীনদরিদ্রের মতো তা সে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করল না। বরং বলল, জানিস, বাসে করে পুজোর সময় আমরাবসিরহাট মসলন্দপুর হাবড়ায় ঠাকুর দেখতি যাই।

অনু চোখে সম্ভ্রম ফুটিয়ে বলল, আর কলকেতায়?

শঙ্খ চট করে এ মিথ্যেটা বলতে পারল না। সে ছোটবেলায় একবার কলকাতা হয়ে তার মামাবাড়িতে গিয়েছিল এটুকুই মনে আছে। কিন্তু কলকাতার আদত চেহারা এখন তার মনে পড়ে না। বলল, কলকেতা যাবার কী দরকার। আমাদের হাবড়ায় তেত্রিশখানা ঠাকুর হয়, বসিরহাটে চব্বিশখানা, টাকিতে বারোখানা। তাই দেখে দেখে বলে ভুল করতি পারিনে। হাবড়ার রেলগেটের পাশে ঠাকুরটা, বুঝলি, এইই এত্ব উঁচু—

শঙ্খ তার আঙুল একেবারে আকাশের দিকে তুলে দিল।

অনু-রনু শুনতে শুনতে তাজ্জব। তারা দু'জন এই সাগরদ' ছেড়ে কক্ষনো তেঁতুলিয়া লকগেট পর্যন্তও যায়নি। হাবড়ার ঠাকুরের মাহাত্ম্য তার বুঝবেই বা কী করে।

কয়েকদিনের মধ্যেই শঙ্খ তাদের দু'জনের সামনে মেলে ধরল এক আশ্চর্য রূপকথার দেশ। সে দেশের নাম ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুর যে বাংলাদেশের কয়েকহাজার গাঁয়ের চেয়ে ঢের সুন্দর, সে গাঁয়ের পরতে পরতে মাখানো আছে এক অদ্ভুত জাদু, সেখানকার মাটি, গাছগাছালি, লতাগুল্ম, মানুযজন যে অন্যসব গাঁয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা জানাতে ভুলল না। এমনকি ইছামতী নদী যে সোনাই তো ছার পদ্মা-মেঘনার চেয়েও আকারে বিশাল ও ভয়াল, আর সেই সঙ্গে দুর্দান্ত রূপবতী, তাও অকাতরে বলে ফেলল। আর ঈশ্বরীপুরের আকাশ—তার

মহিমাও কি কম!

অনু-রনু সম্মোহিত হয়ে সে-সব গল্প শোনে, আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। অনু-রনুর আটবছরের বোন জলির কাছে শঙ্খ তখন এক রূপকথার নায়ক। সে তখন মহা উৎসাহে বলে চলেছে, তাদের ঈশ্বরীপুরের পিচরাস্তা দিয়ে রঙচঙে সব বাস হর্ণ বাজিয়ে যায়, তাদের কন্ডাক্টররা চেঁচাতে থাকে, মসলন্দপুর যাবে, হাব্‌ড়া? বসিরহাট, খোলাপোতা যাবে? কখনও নোকপুল, কোলসুর, তারাগুনে, রঘুনাথপুর এমন আশ্চর্য সব গ্রাম বা শহরের নাম বলে তারা। ঈশ্বরীপুর থেকে একটা পিচরাস্তা সোজা গিয়ে ঠেকেছে কলকাতায়। শুধু কি পিচরাস্তা, তাদের ইস্কুলগুলোও কি কম আশ্চর্যের! মাদারিপুর হাইস্কুল তো রীতিমতো দালানবাড়ি একটা, সাগরদ'র ইস্কুলের মতো মেটেবাড়ি নয়।

এতসব গল্প সাতকাহন শোনাচ্ছে বটে শঙ্খ, কিন্তু সে নিজে ভেতরে ভেতরে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে সাগরদ'র রূপ দেখে। সোনাইএর দু'পারে কোথাও বেতবন, কোথাও হলকলমির ঝোপ, কোথাও মেলেপাতার রাশ, কোথাও বা শাদা কাশফুলে ছেয়ে আছে কাশবন। সাগরদ'র আনাচে-কানাচে অজস্র পুকুর। কোথাও মস্ত দিঘি, আর দীর্ঘ-দীর্ঘ সব জলাভূমি। একটু এদিক-ওদিক গেলে ক্রোশের পর ক্রোশ শুধু ধানবন। কোথাও অজস্র ঝুরি নামিয়ে বিশাল বটগাছ, তার নীচে লাল বটফলে ছেয়ে আছে। দূর থেকে মনে হবে একখানা লালরঙের মস্ত গাল্‌চেই যেনবা। কোথাও আকাশছোঁয়া এক-একটা কামরাঙ্গা গাছ। কোথাও পর-পর কদম কিংবা বকুল, কোথাও পথের দুধারে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে নিশিন্দার ঝোপ। কোথাও যোজন-যোজন মাঠ জুড়ে অজস্র অসংখ্য নারকেলগাছের এক আশ্চর্য সমাহার।

এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশের প্রকৃতির মধ্যে ক'দিন ধরে বুঁদ হয়ে রইল শঙ্খ। হঠাৎ তার মনে হল, এ দেশে এত নদী-নালা জলাভূমি বলেই বোধহয় এখানে প্রকৃতি আরও সবুজ, গাছগাছালি আরও নিবিড়, আকাশ আরও একটু নীল।

তা ছাড়া অনু-রনুদের পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির ভেতরটাই কি কম রহস্যময়! একদিকে একটা মস্ত গোহালে বাঁধা থাকে লাল-শাদা-বাদামি রঙের নধর সব দুধেল গরু। অন্যদিকে একটা হাঁসের ঘর, বেশ বড়সড়, সকাল হলেই সে-সব হাঁস চইচই করে জলে জলে ঘুরতে বেরোয়, সন্ধেয় ফিরে আসে যে-যার জায়গায়। কী চমৎকার লাগে তাদের কলরব। ওদিকে লাল টকটকে শানের মেঝেয় বসলে—আহ্, কী ঠাণ্ডা কী ঠাণ্ডা। ওদের বারান্দার এককোণে লালশানের ওপর বাঘবন্দি ঘর কাটা আছে। তেলের মতো চকচকে আর পিচ্ছিল লালশানে বসে সে একদিন অনু-রনুর কাছে শিখে নিল বাঘবন্দি খেলা। তাতে কখনও শঙ্খ বাঘ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনু কিংবা রনুর ছাগলের ওপর। কখনও ছাগল নিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়। কখনও রুদ্ধশ্বাসে কৌশল খোঁজে কী করে বন্দি করে ফেলবে অনু-রনুর হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়া বাঘকে।

কয়েকদিনের মধ্যে তাকে আশ্চর্য করে দিল আরও একটা ম্যাজিক। দোতলার একটা কোণের ঘরে চৌকির নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল অনু, সেখান থেকে খুব অবহেলাভরে বার করে আনল ধুলোয় পড়ে থাকা একটা কলের গান। সেটাকে ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করে, তাতে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দম দিয়ে যখন রেকর্ডের ওপর পিন চাপিয়ে দিল অনু, তার ভেতর থেকে বেজে উঠল একটা সুরেলা গান : শাওনরাতে যদি....

রেকর্ড চলতে চলতে দম ফুরিয়ে এলে আবার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দিতে হয়। একপিঠের রেকর্ডে একখানা গান, তাতেই দু'বার হ্যান্ডেল ঘোরাল অনু। নইলে সুরেলা গলা বাজতে

বাজতে হঠাৎ কেমন মোটা, কেমন বেসুরো হয়ে যায়। সেদিন সারা দুপুর ধরে একটার পর একটা গান শুনল শঙ্খ। শুনতে শুনতে সেই অদ্ভুত মিঠেন সুরের ভেতর ক্রমশ বুঁদ হয়ে যায়। তাদের ঈশ্বরীপুরে রূপশ্রী সিনেমা খুলেছে নতুন করে। সেখানে মাইকে রোজ গান বাজে। সেও নিশ্চয় কলের গান থেকে হয়। কিন্তু সে কলের গান কখনও শঙ্খ চোখেও দ্যাখেনি। আজ শুধু দেখল তা নয়, নিজের হাতের মুঠোয় ধরতে পেল। নিজেই হ্যান্ডেল ঘোরাল, রেকর্ড বসাল, পিন বদলালো। যেন সহসা তার মুঠোয় উঠে এল বহুকালের আকাঙ্খিত এক আশ্চর্য পৃথিবী।

কিন্তু সেই রূপকথার দেশের তখনও আরও অনেককিছু আবিষ্কার করা বাকি ছিল তার। একদিন সকালবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে বেরিয়ে দেখছে, আগের দিন কখন যেন, সন্ধের পরই বোধহয়, দু-তিনটে গরুর গাড়িতে করে রাশরাশ কাটা ধানের আঁটি এসে পৌঁছেছে মস্ত মরাইদুটোর পাশে। অনুর কাছে জানতে পারল, কার্ত্তিকশাল ধান। অলঙ্গীপুরের মাঠ থেকে এয়েছে।

—অলঙ্গীপুর। সে আবার কোথায়? শঙ্খ চোখ তোলে।

অনু অনির্দেশ্যের দিকে আঙুল দেখায়, সে হুই অনেক দূরে—একবেলার পথ।

একবেলার পথ শুনে দমে যায় শঙ্খ, তবু বলে, সেখেনে যাওয়া যায় না?

অনু হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠে, কেন যাওয়া যাবে না। আমরা তো গেল বছর গিইছিলাম।

—তাই? শঙ্খ উৎসাহিত হয়, কী করে যেতি হয়?

—সে ভারী মজার যাওয়া। প্রথমে গরুর গাড়ি, তারপর শালতিতে।

—শালতি? শঙ্খর চোখে তখন পৃথিবী-জোড়া বিস্ময়,আমাদের নে যাবি?

—দাঁড়া, হীরুদাকে ধরি। গেলবার হীরুদাই নে গিইছিল।

সেদিনটা শঙ্খর জীবনে এক স্মরণীয় দিন। তার এই অলঙ্গীপুরে যাওয়া। অনু রনুর সঙ্গে যাচ্ছে, তার উপর নিয়ে যাবে হীরুদা—শুনে শঙ্খর বাবা বিশেষ বাধা দিলেন না। শঙ্খরা তখন এক আশ্চর্য দেশের দিকে রওনা দিচ্ছে. সকাল-সকাল দুটো খেয়ে ওরা গরুর গাড়িতে উঠে বসল অলঙ্গীপুরের পথে। ঈশ্বরীপুরে গরুর গাড়ির চল তেমন নেই, যা আছে চিংড়িপোতা, নাচিন্দা কিংবা তিন্তিড়িপাড়ার দিকে। গরুর গাড়িতে চড়াও শঙ্খর জীবনে এই প্রথম। প্রথম হেমন্তের দুপুর, মিঠেন হাওয়ায় রোদও তেমন একটা চড়া নয়। সাগরদ' পেরিয়ে যেতে লাগল ঘন্টাখানেক, একটু পরেই ওরা চলে এল মস্ত একটা সবুজ মাঠের ধারে। সে মাঠ কত্ত যে বড় তার ইয়ত্তা করতে পারে না। তাতে শুধু ঘাস আর ঘাস। সবুজ জাজিম যেন বিছিয়ে আছে মাইলের পর মাইল। তার মাঝখান দিয়ে গরুর গাড়ির লিক চলে গেছে দূর দিগন্তের দিকে। সেই লিক বরাবর তারা চারজন চলেছে তো চলেছেই। হীরুদা, অনু, রনু আর শঙ্খ। হীরুদা অনু-রনুদের কেমন যেন আত্মীয় হয়। কিন্তু ভারী বোকা-বোকা ধরনের বলে তার কাজই হল জগদীশবাবুর বাড়িতে ফাইফরমাস খাটা। এখন ব্যস্ত আছে অলঙ্গীপুর গিয়ে চাষীদের কাটা ধান গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসতে। এখন কার্তিকশাল ধানের সময়। এরপর পৌষমাস শুরু হলেই আরম্ভ হবে আমনধান কাটা। আহ্, এই ক'মাস হীরুদা রোজ অলঙ্গীপুর যাবে।

গরুরগাড়ির একটানা ক্যাঁচোর ক্যাঁচ শব্দের ভেতর একবুক শিরানি নিয়ে বসে আছে তারা। বসে বসে নিঃসীম প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে সম্বিত হারিয়ে ফেলল শঙ্খ। চরাচর জুড়ে এমন

শূন্যতা, এতখানি নির্জন প্রান্তর একসঙ্গে কখনও চোখে দ্যাখেনি সে। এ যেন রাজপুত্র সহসা পথ ভুলে গিয়ে এতোল-বেতোল ঘুরছে দিগন্ত ছোঁয়া কোনও তেপান্তরের মাঠে।

তেপান্তর শব্দটা মনের গহনে হঠাৎ-হঠাৎ ঘাই মেরে উঠছে তার। তেপান্তর শব্দটার মধ্যেই যেন এক অদ্ভুত সম্মোহন জড়িয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ ভীষণ উদ্বেল হয়ে উঠল তার সমগ্র চেতনা। হ্যাঁ, এহেন মাইলের পর মাইল ঘাসময় মাঠই নিশ্চয় তেপান্তর। তাহলে কি এই তেপান্তরের মাঠ পেরোলেই রূপকথার সেই অরণ্য, যার কোনও নিঃসাড় গহনকোণে হানাবাড়ির ভেতর রাক্ষসেরা লুকিয়ে রেখেছে রাজকন্যাকে!

কিন্তু না, জঙ্গল নয়, তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে তারা এসে পৌঁছল একটা বিশাল জলার কাছে। জলা ভাবল বটে কিন্তু পরক্ষণেই শঙ্খর মনে হল, এই যোজন-যোজন জলাভূমি সমুদ্র না হয়ে যায় না। যতদূর চোখ যায় শুধু একঢালা জল আর জল। তবে জলের রং নীল নয়, ঘন সবুজ। সবুজ কেননা জলের ভেতর থে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ধানগাছ। অজস্র, অনন্ত ধানবন একগলা জলে ডুব দিয়ে পাহারা দিচ্ছে এই নিঃসীম, দিগন্ত প্লাবিত চরাচর। চোখে-চোখে রাখছে কে এই প্রান্তরে এল-গেল, এই জলাভূমিতে স্বাক্ষর রাখছে তাদের উপস্থিতির। কেউ যদি আনকা অতিথি হয় তবে ধানগাছের সারি বোধহয় বুঝতে পারে। বোধহয় তাইই সাগরদ'য়ের নতুন অতিথি শঙ্খকে সেই বিজন জলাভূমির কিনারে অপেক্ষারত ছোট্ট একটি শালতিতে চরতে দেখে বিস্ময়ে থ হয়ে রয়েছে। তারপর হঠাৎ মিঠেন হাওয়ার স্পর্শ পেতে দু-হাত তুলে নাচন জুড়ে অভিবাদন জানাল এই বালক-অতিথিটিকে, স্বাগতম, সুস্বাগতম।

শঙ্খও প্রত্যুত্তরে ঘাড় নাড়ল, সত্যিই, তোমরা কী আশ্চর্য! ভাগ্যিস আজ এসে পড়েছিলাম এখানে, নইলে প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য দেখতে পেতাম কীভাবে!

তাকে একলা-একা বিড়বিড় করতে দেখে অনু-রনু হাসল, কী বলছিস রে তুই? খুব অবাক হয়ে গেছিস, তাই না? এই হল বল্লির বিল।

তাহলে সমুদ্র নয়, বল্লির বিল! তাইই এর জলের রং নীল নয়, সবুজ। তাইই এর নীচে তল আছে, মাটি আছে। সেই মাটির গভীরে শিকড় চারিয়ে থে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই লক্ষ লক্ষ ধানগাছ। লক্ষ লক্ষ, কিংবা কোটি কোটি। সেই ধানবনের ভেতর ছোট্ট শালতিতে উঠতেই হীরুদা লগি দিয়ে ঠেলতে শুরু করল নিত্যিদিনকার অভ্যস্ত ভঙ্গিতে।

শালতির চেহারা সরু, রোগাধরনের। ডিঙিনৌকোকে লম্বালম্বি দু'ভাগ করলে যেরকম ফিনফিনে ঢ্যাঙ্গা লাগে অনেকটা সেইরকম। ফলে একটু নড়া চড়া করলেই টাল খেয়ে ওঠে সহসা। এমন দু-চারবার দুলে উঠতেই শঙ্খর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। সে শালতির দেওয়াল দু-মুঠোয় চেপে ধরার চেষ্টা করতেই হেসে উঠল রনু, ভয় পেয়েচিস নাকি রে?

ফ্যাকাসে মুখে ঘাড় নাড়ল শঙ্খ, মোট্টেও না—

রনু হিহি করে হেসে উঠল, সাঁতার জানিস তো?

শঙ্খ সাহস সঞ্চয় করে বলল, খু-উ-ব। অত্ত বড় ইছামতী কতবার পারাপার করিচি।

হীরুদা দ্রুতহাতে লগি ঠেলছেন যেনবা রণপায়ে হেঁটে চলেছেন লম্বা লম্বা পা ফেলে। ছোট্ট শালতিটাও লগির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত পার হয়ে চলেছে ধানবনের পর ধানবন। চারপাশে সবুজ শীষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাঁটোভঙ্গিতে। হেমন্তের হাওয়ায় ক্রমশ শক্ত হয়ে আসছে তার ভেতরের দুধ। সে শীষ কখনও শালতির ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়লে ছুঁয়ে যাচ্ছে শঙ্খর গা। তাতে তার শরীরে জেগে উঠছে এক আশ্চর্য শিরানি। যেন এই বিশাল

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সে এক অচেনা বালক, তাকে ভালোবেসে আদর করে যাচ্ছে সেই প্রকৃতির বুকে থির হয়ে থাকা ধানের গুচ্ছ। সে আদর বড়ো মিষ্টি, বড়ো মনোরম, গা-শিরশির-করা।

ক্রমশ বিশাল জলরাশির একেবারে মাঝখানে এসে পৌঁছল তারা। চারপাশে শুধু জল আর জল, তার ভেতর থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো অপর্যাপ্ত শস্যসম্ভার। এহেন দুর্দান্ত পটভূমিকায় শালতির গলুইএ বসে এক অন্যরকমের সম্মোহন জাগল শঙ্খর শরীরে। এই চরাচরে তারা পৃথিবীর কয়েকটি প্রাণী এসে পড়েছে এক নতুন কোনও বিভুঁয়ে। এই জল, এই ধানবন, এই আকাশ, আকাশের কোলে ঝুলে থাকা ছিট-ছিট শাদা মেঘ কেউই তাদের চেনে না। এই অন্তহীন চরাচর তাই বিপুল বিস্ময় নিয়ে দেখে যাচ্ছে তাদের কাণ্ডকারখানা।

তারপর একসময় শেষ হয়ে গেল জল। আবার ডাঙা পেয়ে শঙ্খরা টুপটুপ করে লাফিয়ে নামল। সেখানে কার্তিকশাল ধানের রাশ পেকে সোনা-সোনা হয়ে রয়েছে বহুদূর পর্যন্ত। সেখানে বিহীনবেলা থেকে ধান কেটে যাচ্ছে ভিনগাঁয়ের চাষীরা। কাটা ধানের আঁটি জমা হচ্ছে কাছেই নোঙর করে রাখা সারসার অপেক্ষমান শালতিতে। শালতি বোঝাই হয়ে গেলে সে ধান চলে যাবে বল্লির বিল বরাবর ওদিকের ডাঙায়। সেখানে বিকেলে এসে দাঁড়াবে অনেক গরুর গাড়ি। অলঙ্গীপুরের কার্তিকশাল ধান গরুর গাড়িতে চেপে চলে যাবে সাগরদ'য় জগদীশ মুখুজ্জের বাড়ি। সেখানে গিয়ে থিতু হবে মরাইএর সামনে—ঝাড়াই মাড়াইএর উঠোনে।

হীরুদা, অনু-রুনু শালতি থেকে নেমে তদারকি শুরু করে দিল। চাষিরা কেউ ধান কাটছে, কেউ হয়তো ধান কাটা ফেলে এক লহমা জিরেন নিচ্ছে পরম আরামে বিড়ি ধরিয়ে, কেউবা গল্পগাছা করছে উবু হয়ে বসে। হীরুদা হাঁকডাক করছে, কী হল, অত জিরেন নিলি চলবে? কাজ করো কাজ করো। সন্ধের আগেই শালতি পূরণ হবা দরকার। অনু-রনু নিজেরাই ধানের গোছ বয়ে বয়ে রাখতে লাগল শালতির ভেতর। যেন ধান বয়ে আনাও একধরনের আনন্দ। শঙ্খও কিছুক্ষণ পর হাত লাগাল। বুকের ভেতর ধানের গোছ সাপ্টে ধরতেই তার নাকের লতিতে ঠোনা মারল এক অদ্ভুত আন্‌কা ধরনের গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে রোমকূপে কাঁটা দিয়ে উঠল তার।

সারাদিন এমন উপুড়ঝুপুড় সবুজ গন্ধের ভেতর কাটিয়ে সন্ধের আগেই আবার ফেরার পথ ধরল তারা। সঙ্গে আরও শালতি চলেছে ধান-বোঝাই হয়ে। পাশাপাশি সাত-আটটা শালতি। সাত-আটটা রণ-পা উঠছে আর নামছে। কখনও মনে হচ্ছে রণ-পা'র দৌড়, কখনও বাইচ-খেলার দৃশ্য।

শঙ্খর জীবনে সেদিন এমন সব আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সমারোহ। রাতে বাড়ি ফেরার পর ভাবছিল, এবার সাগরদ'য় না এলে এত সব মণিমুক্তো কী করে জমত তার ঝুলিতে! এ যেন হঠাৎ আলাদীনের প্রদীপ খুঁজে পেয়ে একদিনে যা-চাই তাইই পেয়ে যাওয়া।

কিন্তু ঘরে ফিরে এতসব অভিজ্ঞতা সারারাত ধরে রোমন্থন করবে, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে সে উপায় রইল না। বাড়ি ফিরে দেখল, এক হৈ-রৈ কাণ্ড। সন্ধের দিকে ঈশ্বরীপুর থেকে এসে পৌঁছেছেন তার ঠাকুর্দা জীবেন্দ্রনাথ। এসেই হাঁকডাক শুরু করেছেন, কই, সে হারামজাদা গেল কোথায়! তখনই বুঝিছি, বেড়াতে এসে বইএর পাতাটি খুলবে না, কেবল টইটই করে আগান-বাগান খাল-বিল ঘুরে বেড়াবে। এদিকে পরীক্ষা যে ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে সে খেয়াল নেই। নে, তোয়ের হয়ে নে, কাল ভোর-ভোর নৌকো ধরতি হবে।

শঙ্খর শরীরে তখনও সারাদিনের ক্লান্তি। ঠাকুর্দার হাঁকডাকে বেশ ঘাবড়েও গেল। প্রায় দশদিন হতে চলল সে সাগরদ'য় এসেছে, এই ক'দিনে সত্যিই সে বইএর একটা পাতাও খুলে দ্যাখেনি। দেখার ফুরসতই বা পেল কোথায়! এই ক'দিন শুধু চারপাশের এক আশ্চর্য পৃথিবী আবিষ্কারে মত্ত হয়ে ছিল । সম্মোহিতের মতো, রোমাঞ্চিতের মতো।

শঙ্খর মায়ের মুখখানাও কালো হয়ে গেছে। এতদিন পর ছেলেটাকে কাছে পেলেন, এর মধ্যেই তাকে নিয়ে চলে যাবেন তাঁর শ্বশুর!

ঠাকুর্দা থম হয়ে বললেন, তা আমারে কী করতি বলো? হারামজাদা পাশে না শুলি আমার যে আবার চোখে ঘুম আসে না!

পরদিন সকালে উঠেই আবার সোনাইনদী বরাবর গয়নার নৌকোয় চলা। ঠাকুর্দা ছইএর ওপর পাটাতনে বসে আছেন উবু হয়ে, আর একটার পর একটা বিড়ি খেয়ে চলেছেন। তারপর একসময় বললেন, ক'দিন পরেই আমাদের নতুন ঘরখানায় গৃহপ্রবেশ হবে। কত হৈ-রৈ হবে। তুই বাড়ি না থাকলি কি চলে?

শঙ্খ লাফিয়ে উঠে বলল, টালি চেপেছে চালে?

ঠাকুর্দা ঘাড় নাড়লেন, হুঁ, কী পেল্লাই হয়েছে এক একখান ঘর, দেখলি তাজ্জব হয়ে যাবি। ছাউনি না দিলি ঘরের মাপ বোঝা যায় না। গিয়ে দেখবি, কী তাণ্ডব কাণ্ডই না করে ফ্যাললাম এই ক'দিনি—

শঙ্খর ভেতরে আস্তে আস্তে চারিয়ে যাচ্ছে ঈশ্বরীপুরে ফেলে যাওয়া অনুভূতিগুলো। সত্যিই তাহলে তারা এবার নতুন বাড়িতে বাস করতে চলেছে! নতুন ঘরে, নতুন দাওয়ায় থাকার আমোদই যে আলাদা। তার শিহরণ, তার রোমাঞ্চ হঠাৎ গুরগুর করে উঠল বুকের ভেতর।

সারাদিন নৌকো, বাস ঠেঙিয়ে জেলারো-অফিসের মোড়ে এসে নামতেই শঙ্খ আবার ঈশ্বরীপুরের মানুষ। গাছ-গাছালির সেই পুরনো গন্ধটা ঠোনা দিযে গেল তার নাকের লতিতে। আবার সেই চেনা পৃথিবী। তবু হাঁটতে হাঁটতে শীতলাতলার মুখে পৌঁছতে হঠাৎ এক নতুন খবর নিয়ে এল টুপুর। তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, ওহ্, তুমি তা'লি এইছ, শঙ্খদা! জানো, কাল বিকেলে স্বপ্নাদিরা এইছে। তোমার খোঁজ করছিল।

—তাই! শঙ্খ হঠাৎ বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। স্বপ্নাদি তার প্রিয় মানুষদের একজন। খড়্গপুরে থাকে স্বপ্নাদিরা। টুপুরের ছোটকাকার মেয়ে স্বপ্নাদি। প্রতিবছর পুজোর ছুটিতে ওরা সবাই মিলে একবার করে আসে এখানে। খুব হৈ-চৈ করে থাকে। স্বপ্নাদির জন্যেই তো তারা উৎসুক হয়ে থাকে গোটা একবছর। স্বপ্নাদি তাদের কাছে এক দুর্নিবার আকর্ষণ।
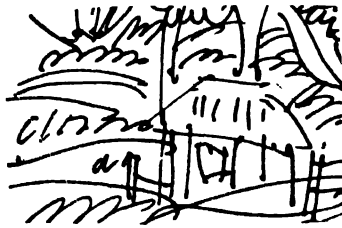
স্বপ্নাদিই হল শঙ্খর এই দশবছর বয়সের সময়-সীমায় দেখা সবচেয়ে সুন্দরী আর ভালো মেয়ে। ঠাকমার মুখে শোনা যে রাজকন্যার মুখচ্ছবি বহুবার তার মনের ভেতর খোদাই হয়ে আছে, স্বপ্নাদি দেখতে ঠিক সেরকমই; শুধু শঙ্খর চেয়ে তিনবছরের বড় এই যা। পড়েও তিন ক্লাস ওপরে।

স্বপ্নাদি ক্লাস নাইনে ওঠার পর তার সঙ্গে এই প্রথম দেখা হবে শঙ্খর। গেলবার যখন এসেছিল, তখনই দারুণ চোখমুখ নেড়ে কথা বলত। বলে গিয়েছিল, নাইনে উঠলে সে একেবারে পাকা গিন্নি হয়ে উঠবে। এই একবছরে সত্যিই কতটা বড় হয়ে উঠেছে স্বপ্নাদি, তা দেখতে তক্ষুনি ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু ঠাকুর্দা সঙ্গে রয়েছেন বলে সে বাসনা দমন করতে হল।

ভোর হতেই কিন্তু দেখা হয়ে গেল কলতলায়, এই যে পাজিটা, কোথায় ছিলিস্ কাল?

সবুজ ঘাসের উপর খালিপায়ে হাঁটছিল স্বপ্নাদি। তার ঠোঁট জুড়ে এক ধরনের টেপা হাসি। তাকে দেখে শঙ্খও হাসল। শুধু কাল নয়, গত দশদিন ধরেই সে ঈশ্বরীপুরে ছিল না। এক আশ্চর্য রূপকথার দেশে বেড়াতে গিয়ে তার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে কী কী মণিমুক্তো কুড়িয়ে এনেছে তা এখন সাতকাহন শোনাতে গেলে বেলা দুপুর গড়িয়ে যাবে। কিছু না বলে তাই হাসল, কখন এলে তোমরা?

—সেই পরশু বিকেলে এসে ইস্তক তোকে খুঁজছি। কোথায় না কোথায় গিয়েছিলি এক ধ্যাদ্ধেড়ে গোবিন্দপুরে!

শহরে থাকে বলে স্বপ্নাদির মনে মনে একটা ডাঁট আছে। উমনো বলে, শুধু শহরের মেয়ে বলে নয়, স্বপ্নাদি খুব রূপসীও বটে, তাই দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না তার। শঙ্খ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল, এই একবছরে কতখানি বড় হয়েছে স্বপ্নাদি। সবুজে-নীলে মেশা একটা চমৎকার স্কার্টের ওপর ধবধবে শাদা জামা পরেছে। তাতে আরও যেন একটু সুন্দরী দেখাচ্ছে স্বপ্নাদিকে। চোখদুটো সেরকমই টানা-টানা আছে। না কি বোধহয় আরও একটু গভীর হয়েছে। নাক আরও একটু টিকোলো। ফোলা-ফোলা গালদুটো কী সুন্দরভাবে নেমে এসে মিশেছে চিবুকে। কোঁকড়াচুলের রাশ দু'কানের লতি পেরিয়ে পিঠময় ছড়াতে ছড়াতে নেমে এসেছে পাছা পর্যন্ত। শঙ্খর ঠাক্‌মা বলে, শুধু চুল দেখিয়েই স্বপ্নার বিয়ে দেওয়া যাবে। আর কী ফর্সা রং ওর!

সব মিলিয়ে স্বপ্নাদির গোলচাঁদের মুখ একেবারে ছবির মতো আঁকা। যখন তাকায়, কী সুন্দর লাগে তার চোখদুটো। যখন খিলখিল করে হাসে, তখন সমস্ত শরীর উথাল দিয়ে হাসে। যখন গম্ভীর, তখন সমস্ত শরীরই যেন থমথমে—কিন্তু তখনও যেন সে এক আশ্চর্য সুন্দরী, অদ্ভুত রহস্যময়ী।

এহেন স্বপ্নাদি হঠাৎ তাকে বলে উঠল, কী রে, তুই নাকি এ বচ্ছর ফার্স্ট হতে পারিসনি, শঙ্খ?

ঠিক এই ভয়টাই করছিল সে। স্বপ্নাদি শুধু দেখতেই সুন্দরী তা নয়, লেখাপড়ায়ও দারুণ। খড়্গপুরে একটা নামী ইস্কুলের ফার্স্টগার্ল। গত ক'বছরের মধ্যে কেউ তাকে হারাতে পারেনি। শঙ্খ ম্লান হয়ে গিয়ে বলল, এবার পারিনি।

—ছি ছি। তা'লে নিশ্চয় তুই বখে গিয়েছিস।

শঙ্খ প্রতিবাদ করে বলতে চাইল, মোটেও বখে যাইনি, স্বপ্নাদি। সামনের বার দেখো—

কিন্তু স্বপ্নাদি কোনও ওজর শুনতে চায় না, কোঁকড়াচুলের রাশ ঝাঁকিয়ে বলে, নইলে তুই তো বরাবরের ফার্স্ট। পড়াশোনায় ভালো ছেলে। এর'ম রেজাল্ট হওয়ার তো কথা নয়। শুধু টৈ-টৈ করে ঘুরে বেড়াস নিশ্চয়।

শঙ্খ মরমে মরে যেতে থাকে। স্বপ্নাদির সঙ্গে প্রায় একবছর পরে দেখা। কোথায় চুটিয়ে গল্প শুনবে তাদের খড়্গপুরের, তা নয়তো প্রথমেই এমন হুড়হাড় করে বকাবকি। কী বলবে, কী করে এমন অভিযোগের উত্তর দেবে তা বুঝে পায় না সে। এমন কুয়াশা-মাখানো ভোর-বেলাটা হঠাৎ কীরকম তিতো-তিতো হয়ে গেল। স্বপ্নাদিকে সে এত ভালোবাসে, কবে আবার পুজোর ছুটিতে এলে স্বপ্নাদি তাদের সঙ্গে জুতজাত করে বসে জমিয়ে গল্প করবে ভেবে অপেক্ষা করে তারা, সেই স্বপ্নাদি কিনা—

সে ঠিকঠাক কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই স্বপ্নাদি ফের বলল, বুঝেছি। ওই বখাটে ছেলেটার পাল্লায় পড়েছিস বোধহয়—

—বখাটে ছেলে? শঙ্খ বেশ অবাক হল, সে আবার কে?

—ওই যে, তোদের অর্ঘদা। এখেনে এসে কীর'ম আল্‌সের মতো দিন কাটাচ্ছে। লেখাপড়া করে না, কেবল শাদা পাতা জুড়ে ছবি আঁকছেন উনি।

—ও, শঙ্খ এতক্ষণে বলে ওঠে, মোটেও অর্ঘদার জন্যি আমার রেজাল খারাপ হয়নি। অর্ঘদা তো এসেছে এই সেদিন। আমার রেজাল বেরুনোর অনেক পরে।

স্বপ্নাদি সে কথা মানতে চায় না, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, ওই হল—

—আর অর্ঘদা কক্ষনো বখাটে নয়, তুমি মোটে একদিন দেখে অমনি বললিই হল? অর্ঘদা কীই যে ভালো না—, শঙ্খও হার মানতে চায় না।

—তুই এখনও ছোট তো, তাই বুঝিস নে। আমাকে প্রথমদিন দেখা হতেই কী বলল জানিস। বলল, তুমি এর'ম শাদা-ফর্সা কেন? আর একটু গোলাপি হলে কীই যে সুন্দর দেখাতো তোমাকে, বলে হঠাৎ যা করল তুই শুনলে অবাক হয়ে যাবি—

শঙ্খ বিস্মিত হয়ে গেল, কী করল?

—আমার নাকে একটা টোকা দিয়ে বলল, দেখি, লাল হয় কি না।

—লাল হল? শঙ্খ নিঃশ্বাস বন্ধ করে অর্ঘদার কাণ্ড শুনতে থাকে।

স্বপ্নাদি এবার রেগে উঠে বলল, আমি কি তখন আয়নায় মুখ দেখেছি নাকি যে বুঝব লাল হল কি হল না। ও বলল, হল না। তারপর বলল, তোমার এ দেশে জন্মানো উচিত হয়নি। এস্কিমোদের দেশে জন্মালেই সবচেয়ে ভালো হতো।

শঙ্খ আরও আশ্চর্য হয়ে বলল, এস্কিমোদের দেশে!

—হ্যাঁ। আমার গায়ের রং নাকি বরফের মতো। বরফের দেশে থাকলেই আমাকে নাকি বেশি মানাতো।

শঙ্খ অবাক হয়ে ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করে। স্বপ্নাদির গায়ের রং ফর্সা, তাকেদেখতে সুন্দর, হঠাৎ দেখলে তাকে রাজকন্যা বলে যে-কারও ভ্রম হতে পারে, কিন্তু তাকে যে বরফের দেশের মেয়ে বলে ভাবা যেতে পারে তা কখনও ভেবে দ্যাখেনি শঙ্খ। এখন হঠাৎ মনে হল,

বাহ্, বেশ ভেবেছে তো অর্ঘদা!

কিন্তু অর্ঘদার এহেন ভাবনায় ভীষণ রেগে গেছে স্বপ্নাদি। এতক্ষণে উত্তেজনায় রাগে সত্যিই স্বপ্নাদির শাদা-ফর্সা রঙে গোলাপি একটা আভা ফুটে উঠেছে যেন। স্বপ্নাদি তখন বলছে, কীরকম গায়ে-পড়া ছেলে বল্‌তো! বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ একটা মেয়ের সঙ্গে একদিন ভালো করে আলাপ হল কি হল না, অমনি তার নাকে টোকা মেরে দেবে?

শঙ্খ এবার ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিকই বলেছ স্বপ্নাদি, আমি অর্ঘদাকে বলে দেব, আর কক্ষনো যেন—

—না, স্বপ্নাদি তার নরম আঙুল দিয়ে শঙ্খর ঠোঁট চেপে ধরে, তোকে আবার এসব বলতে যেতে হবে না। যা বলবার আমিই তক্ষুনি শুনিয়ে দিয়েছি। তুই বলতে গেলে ভাববে'খন আমি বোধহয় সারা পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছি। আসলে শুধু তোকেই বললাম—

অর্ঘদার সঙ্গে শঙ্খর দেখা হল সেদিন বিকেলে। সকালে অর্ঘদা নাকি এক-একা খেয়া পার হয়ে ওপারে গিয়েছিল। ফিরেছে বেলা দুপুর করে। দেখা হতেই বলল, ওই বরফের মেয়েটা তো খুব মুখরা!

বরফের মেয়ে! এক মুহূর্ত হকচকিয়ে গেলেও শঙ্খ বুঝতে পারে স্বপ্নাদির কথা বলছে অর্ঘদা। স্বপ্নাদি নিশ্চয় তাকে খুব করে কথা শুনিয়ে দিয়েছে কাল, তাইই—

সকালে অর্ঘদার হয়ে স্বপ্নাদির কাছে খুব ওকালতি করেছিল শঙ্খ। এখন স্বপ্নাদির হয়ে ওকালতি করল, স্বপ্নাদি মোটেই মুখরা নয়, তুমি তো জানো না, স্বপ্নাদি ফি-বচ্ছর ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে ওঠে! গেলবার ইস্কুলে আবৃত্তি করে কত্ত হাততালি পেয়েছে, তার সঙ্গে মেডেল, বই, কত কি—

—তাই বলে একটু ঠাট্টা-ইয়ার্কিও বুঝবে না?

শঙ্খ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে, আসলে তোমার সঙ্গে তো মোটে একদিন আলাপ। এখনও বুঝে উঠতে পারেনি তোমাকে—

অর্ঘদা গম্ভীর হয়ে বলল, ওই বরফের মেয়েটাকে বলে দিস, আমি মেয়েদের দেখলে মোটেই হ্যাংলামি করি নে। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে আমার বয়েই গেছে। ভারী তো নাকে একটা টোকা মেরেছি, তাতে কী না কী শুনিয়ে দিল—

শঙ্খ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তা তুমিই বা হঠাৎ নাকে টোকা মারতে গেলে কেন, অর্ঘদা?

—বাহ্, নাকটা কেমন চোখা-চোখা মনে হল যে, ঠিক টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো লাগছিল। শুধু লাল নয় এই যা। আমি তো আবার কিছু রেখেঢেকে রাখতে পারি নে। যা মনে হয় করে ফেলি। তবে মেয়েটা যে এমন গোখ্‌রোর মতো ফোঁস করে উঠবে তা বুঝতি পারিনি। এখন যখন বুঝে গেছি, আর আমি ওর সঙ্গে কথা বলি!

অর্ঘদার কথা শুনে শঙ্খ খুব ফাঁপরে পড়ে গেল। কচি দাড়ি-গোঁফে দু'গাল ভরে যাওয়া এই তরুণটিকে সে এই অল্প ক'মাসে খুবই ভালোবেসে ফেলেছে। স্বপ্নাদিকেও আজ কতবচ্ছর ধরে মনে মনে ভারী পছন্দ তার। অথচ মাত্র ক'দিন ঈশ্বরীপুরে ছিল না সে, এর মধ্যে দু'জনে

কী বিশ্রীভাবে একটা ঝগড়া করে ফেলেছে! এখন দু'জনের মধ্যে কী করে ভাব করে দেওয়া যায় তা সে বুঝে উঠতে পারে না। খানিকক্ষণ থম্ হয়ে থেকে কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে গেল, সকালে কোথায় গিইছিলে, অর্ঘদা, খুঁজে খুঁজে হদিশ করতি পারলাম না তোমারে?

—ওহ্, সে একটা দারুণ জায়গায়। খেয়া পেরিয়ে চিংড়িপোতার বাঁধে উঠলে যে ভেড়ি দেখা যায়, সেখেনে—

— তাই? শঙ্খ আফসোস করে, ইস, যাবার আগে আমাকে বলনি কেন? কদ্দিন ধরে অবনবুড়োর ওখেনে যাইনি—

— বুঝলি শঙ্খ, অবনবুড়োর সঙ্গে কত কথা হল ওর চালাঘরে বসে। একলা একা অমন থাকে তো, কথা বলার লোক বলতে দিগরে কেউ নেই। শুধু রাশরাশ মাছ পাহারা দিয়েই চলেছে এতক্ষণ।

শঙ্খ হি হি করে হাসল, খুব মজার মানুষ। একা একা কার সঙ্গে যেন কথা বলে। আমারে একদিন ওখেনে নে যাবা, অর্ঘদা! অবনবুড়োর সঙ্গে আলাপ করতি ভারী ভাল্লাগে আমার।

—ঠিক আছে, সে হবে'খন। এখন চল্, দেখে আসি মরাসোঁতার জলে কতখানি পূর্ণিমা গেল। এবার নাকি কার্তিকমাসে ষাঁড়াষাঁড়ির গোণ। জল নাকি কিনার ছাপাই গিয়ে ডাঙায় উঠতি পারে। সকালে খেয়া বাইতি বাইতি কালোমানিক বলছিল। কতটা ছাপাই গেল দেখে আসি।

অর্ঘদার সঙ্গে নদীর কিনারে বসার একটা আলাদা মজা আছে। জলের সঙ্গে কতরকম ইয়ার্কি করে অর্ঘদা, কত কথা বলে হাসতে হাসতে, কখনও গুনগুন করে ছলছল ঢেউএর সঙ্গে তাল মিলিয়ে দু-এক কলি গান গায়, যেন তার কতদিনের চেনা এই ইছামতীর জল। তবু এখন তার সঙ্গে যাবার উপায় নেই। বলল, এখন যেতি পারব না অর্ঘদা। স্বপ্নাদি আজ সকালে বলে গেছে, বিকেলে কী যেন খুব দরকার আছে, একবার দেখা করতি—

স্বপ্নাদির নাম শুনেই অর্ঘদা রেগে গেল, বলল, তুই বুঝি ওই বরাবরই ওদের আঁচল ধরা?

আঁচল-ধরা শব্দটা মোটেই পছন্দ হ'ল না শঙ্খর। স্বপ্নাদি এখনও স্কার্ট ব্লাউজই পরে, কখনও শখ করে শাড়ি পরে না তা নয়, কিন্তু কখনও তার আঁচল ধরেছে বলে শঙ্খর মনে পড়ে না। বিব্রত হয়ে বলল, মোটেই আমি কারও আঁচল-ধরা নই, সকালে কথা দিইছি বলেই এখন যেতি হবে। আমি কারুকে কথা দিলি তা রাখি।

—ঠিক আছে, তা'লি যা, বলে অর্ঘদা গম্ভীর হয়ে হাঁটা দিল মরাসোঁতার দিকে।

তীব্র এক টানাপোড়েনের মধ্যে কয়েকলহমা থম্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শঙ্খ। সব পেয়েছির মতো মরাসোঁতার খালে ষাঁড়ষাঁড়ির গোণ এসে কীরকম ঢেউঢক্কার হচ্ছে তা দেখতে মন চাইছিল শঙ্খর, কিন্তু স্বপ্নাদি যে তাকে বলেছিল 'বিকেলের দিকে একবার আসিস, শঙ্খ' সে নির্দেশ অমান্য করাও তার পক্ষে দুঃসাধ্য। উমনো-ঝুমনোদের বাড়ি গিয়ে দেখল, স্বপ্নাদি ততক্ষণে একেবারে পরীর মতো সেজেগুজে তৈরি। হ্যাঁ, পরীই যেন সত্যিকারের, কারণ আজ সে ফ্রক বা স্কার্ট-ব্লাউজ নয়, গাঢ় নীলরঙের একটা শাড়িই পরেছে স্বপ্নাদি, তাতে কী চমৎকারই না দেখাচ্ছে তাকে। তার দীর্ঘ আঁচল এমনভাবে উড়ছে যেন বা একজোড়া ডানাই লাগানো রয়েছে তার

পিঠে। শঙ্খকে দেখেই বলল, চল্, একটু ঘুরতে যাই---

---কোথায়?

স্বপ্নাদি হাসি-হাসি মুখে বলল, কোথায় আবার? যেখানে খুশি। কতদিন পর ঈশ্বরীপুরে এসেছি, একটু ঘুরেঘেরে দেখব না?

শঙ্খ অবাক হয়ে বলল, উমনো-ঝুমনো নেই? ওরা যাবে না সঙ্গে?

—না, ওরা তো খুশিপিসিদের বাড়ি গেল। কূল-কুলুতি ব্রত করবে, তার আয়োজন করতে--

--সে আবার কী ব্রত? শঙ্খ তো এরকম কোনও ব্রতের নামই শোনেনি।

---সে নাকি সারা কার্তিকমাস ধরে করতে হয়। তাতে শ্বশুরকূল, মাতৃকূল, পিতৃকূলের খ্যাতির বাড়বাড়ন্ত হয় স্বর্গে। বলতে বলতে ঠোঁট টিপে হাসল স্বপ্নাদি।

--- সেই ব্রত উমনো-ঝুমনো করবে কেন? ওদের তো বিয়ের ঢের দেরি এখনও।

স্বপ্নাদি হেসে গড়িয়ে পড়ল, সে আর ওদের কে বোঝাবে? আমাকেও ধরেছিল, চলো, তুমিও করবে আমাদের সঙ্গে। আমি অনেক কষ্টে নিস্তার পেয়েছি। চল্, বেরুই—

শাড়ি পরে স্বপ্নাদিকে আজ রীতিমতো লেডি-লেডি লাগছে। এমন চোখধাঁধানো সাজ যে স্বপ্নাদির সঙ্গে একা বেরোতে আজ কীরকম লজ্জা-লজ্জাই লাগছে তার। স্বপ্নের রাজকন্যার মতো সেজেগুজে দুলকি তালে হেঁটে চলেছে যেন। ক্লাস নাইনের মেয়ে কে বলবে তাকে! তার পাশে-পাশে হাঁটতে কেমন অদ্ভুত, আর আশ্চর্য লাগছে শঙ্খর। তাকে নিয়ে কোথায় যাবে, কোথায় নিয়ে গেলে তার সবচেয়ে ভালো লাগবে, এমন ভাবনা ভেবে জেরবার হয়ে যায়, ভালোও লাগে কম নয়। বিকেলের এই রোদ-মরা মুহূর্তগুলো হঠাৎই তার কাছে কেমন জমজমে হয়ে উঠল। এহেন আশ্চর্য সময়ে সবচেয়ে ভালো লাগে নদীই। কিন্তু সেদিন হাটবার, খেয়ানৌকোয় টইটম্বুর ভিড় বলে শঙ্খ আনমনে পায়ে-পায়ে চলে এল ইছামতী থেকে দলছুট হয়ে বেরিয়ে এসেছে যে মরাসোঁতা সেদিকেই। চারঘর নতুন পত্তনের ওপাশে খালপাড়ে একটা ফাঁকা জায়গায় মরাসোঁতা এপার-ওপার করার জন্য খালের ওপর ফেলা রয়েছে মস্ত একটা তালগাছের কাণ্ড। তারই পাশে একটা বাবুল গাছের গোড়ায় কিছুটা সবুজ দুব্বোঘাস—সেখানে প্রায়ই শঙ্খরা এসে কাটিয়ে যায় কিছু অলস মুহূর্ত। প্রায় তার পাশেই মরাসোঁতার মোহনা। ঘাসের ওপর বসে দু'চোখ ভরে দেখতে থাকে মরাসোঁতার শীর্ণশরীরে জোয়ার-ভাঁটার খেলা।

আজ হঠাৎ সেখানে এসে পৌঁছতেই স্বপ্নাদি চট করে শঙ্খর হাত টেনে ধরল, এখানে নিয়ে এলি কেন তুই?

শঙ্খ চোখ তুলে তাকায়, কেন? কী হয়েছে।

—সেই বখাটে ছেলেটা বসে আছে যে।

অর্ঘদা যে এই মরাসোঁতার কিনারে বসে ষাঁড়াষাড়ির গোণ দেখবে তা যেন মনে ছিল না শঙ্খর। অথবা তার মনের গহন কোণে কোথাও সুপ্ত ভাবনা ছিল টায়টায় মরাসোঁতার বুকে জলের কারুকাজ দেখার, হয়তো তাইই স্বপ্নাদিকে সে নিয়ে চলে এসেছে এখানে। কিন্তু স্বপ্নাদি

বেঁকে বসল, চল্, অন্য কোথাও যাই।

অর্ঘদা ততক্ষণে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ফেলেছে তাদের, হাত নেড়ে ডাকল, আয়, শঙ্খ, দেখে যা, কী দারুণ--

স্বপ্নাদি তখনও শঙ্খর হাত ছাড়েনি, বলছে, চল, অন্য কোথাও যাই--

শঙ্খ এই নিদারুণ দোটানায় পড়ে যাবে কি যাবে না ভেবে আকুল হয়ে পড়ে। তখন তার চোখে পড়েছে, মরাসোঁতার ক্ষীণ জলধারা ফুঁসে উঠে হু-হু করে বয়ে যাচ্ছে পুব থেকে পশ্চিম বরাবর। জোয়ার এখনও পুরুনি হয়নি বলেই তার ধারণা। পুরুনি হলে কিনার ছাপিয়ে তাদের সবাইকার বাড়ির উঠোনে জল ঢুকে যেতে পারে। এমন অনেকদিন আগে একবার হয়েছিল তা মনে আছে। আজও কি তাদের বাড়িগুলো তেমনই বানভাসি হবে? সারা উঠোন জুড়ে থইথই করবে জলরাশি! সে তো ভারী মজার হবে তাহলে। তার ঠাকুর্দা অবশ্য সেবার খুব সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, জল ক্রমশ নদী ছাপিয়ে উঠোনে ঢুকে পড়ছিল বলে বারবার বিড়বিড় করছিলেন, তাইলে কি বন্যা হবে সত্যি সত্যি? ঠাকমাকে ডেকে বলেছিলেন, আগে ঘর সামলাও, উঁচু করে পোতা বেঁধেছি তাতে কী হয়েছে। জল ঢুকলি মহা কেলেঙ্কারি হবে। ঘর সামলাও, ঘর সামলাও।

শেষপর্যন্ত অবশ্য বন্যা হয়নি সেবার। জোয়ার পুরুনি হয়ে ভাঁটা লেগে গেলে ভাঁটার সঙ্গে জল নেমে গিয়েছিল। কিন্তু সারা উঠোন, পথঘাট কাদা-কাদা হয়েছিল বেশ ক'দিন ধরে। কোথায় কোথায় যেন ধানবন ডুবে গিয়েছিল তাও শুনেছিল ওরা।

স্বপ্নাদি ততক্ষণে তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে শীতলাতলার দিকে। সে দৃশ্য অর্ঘদা দেখতে পাচ্ছে বলেই শঙ্খ লজ্জা পাচ্ছিল। দু'একবার চেষ্টা করেছিল হাতটা ছাড়িয়ে নিতে। কিন্তু স্বপ্নাদি বেশ শক্ত করে ধরে থাকায় শঙ্খ পেরে উঠছিল না। পতপত করে উড়তে থাকা স্বপ্নাদির নীল আঁচল ঢেকে ফেলছিল তাকে। তার চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠছিল লজ্জায়, কেননা এরপর অর্ঘদার সঙ্গে দেখা হলেই নিশ্চয়ই বলে উঠবে, তাইলে ঠিকই বলেছিলাম। তুই ওই মেয়েটার একেবারে আঁচল-ধরা।

পরের দিন দেখা হতে অর্ঘদা অবশ্য সে-কথা বলল না, ঠোঁটের কোণে আলতো করে হাসি ঝুলিয়ে বলল, ওই বরফের মেয়েটা আমাকে দেখে পালিয়ে গেল কেন রে?

শঙ্খ ঠোঁট উল্টে বলল, সে আমি জানব কী করে? তোমরা দু'জনে কী ঝগড়া করেছ, সে তোমরাই জান।

—মেয়েটা খুব ডাঁটিয়াল, তাই না?

স্বপ্নাদির একটু ডাঁট আছে সে কথা ঈশ্বরীপুরের সবাই জানে। সে খড়্গপুরে থাকে, খড়্গপুর যে একটা জমজমাটি শহর, সেখানকার সাউথসাইডের রেলকলোনি যে ছবির মতো সাজানো জায়গা, সেখানে এশিয়ার বৃহত্তম রেল-প্লাটফর্ম আছে, প্রচুর দোকান পাট, গুচ্ছের সিনেমা হল আছে, এ সংবাদ তাদের কতবার শুনতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু স্বপ্নাদি দেখতে সুন্দরী, লেখাপড়ায় ভালো, শহরে থাকে বলে কথায় শহুরে টান, সব মিলিয়ে সে যে তাদের ঈশ্বরীপুরের মেয়েদের তুলনায় ঢের ঢের শ্রেষ্ঠ তা তো একবাক্যে মেনেই নিয়েছে তারা। এখন হঠাৎ অর্ঘদা যদি বলে স্বপ্নাদি ডাঁটিয়াল তাহলে কীই বা করার আছে শঙ্খর!

অথচ আশ্চর্য এই যে, অর্ঘদা আর স্বপ্নাদি, দুজনেই এখন উমনো-ঝুমনোদের বাড়ির বাসিন্দা। দু'জনে একই বাড়িতে এসে উঠে এমন রেষারেষিতে জড়িয়ে পড়েছে--

শঙ্খ আস্তে আস্তে বলল, স্বপ্নাদি খুব ভালো মেয়ে, তুমি অমন করে চটিয়ে দিয়েছ বলেই তো--

অর্ঘদা হেসে উঠে বলল, ঠিক আছে বাবা, ওকে বলে দিস, আমি না-হয় ওর সঙ্গে আর কথাই বলব না।

হাসতে হাসতে বলল বটে অর্ঘদা, কিন্তু শঙ্খ বুঝতে পারে তার দাড়িগোঁফের বাইরে যে ফর্সা মুখখানা দৃশ্যমান, তাতে কোথাও জমে আছে একটুকরো মন-খারাপ।

তাতে শঙ্খও বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। পুজোর লম্বা ছুটিতে কোথায় অবসরের ফুরসতটুকু কাটাবে হৈ-চৈ করে, দল বেঁধে জমিয়ে, তাদের ভেতর যে একটা সোনালি কেশরঅলা উদ্ধত ঘোড়া আছে তার লাগামটাকে দেবে খুলে, তা নয়তো এমন একটা ঝুটঝামেলা! এখন এই ঝঞ্ঝাট যে কীভাবে 'ম্যানেজ' করবে তা ভেবে কূল করতে পারে না। উমনো ঝুমনোর সঙ্গেও তো শঙ্খর খুনসুটি লেগে যায় কখনও, কিন্তু কয়েকলহমার ভেতর ভাবও হয়ে যায় ফের। ইস্কুলে কখনও পার্থ, কখনও সুনীল কিংবা মহাদেবের সঙ্গেও মন-কষাকষি হয়, মিটেও যায় পলক না ফেলতে, কিন্তু অর্ঘদার সঙ্গে স্বপ্নাদির ঝগড়া যেন অন্যরকম।

এই ঝগড়াটা যে রকম সেটা ঠিক কী তা শঙ্খর উপলব্ধিতে কুলোয় না। হঠাৎ দু'জনেরই ওপর ওর রাগ উথলে ওঠে। দিনদুয়েক কারও সঙ্গেই আর দেখা করল না।

সে তখন একলা-একা বসে থাকে তাদের বাড়ির পেছনে, মরাসোঁতার ক্ষীণ স্রোতধারাটির কিনারে। চুপচাপ তাকিয়ে থাকে ওপারের চর জমিটার দিকে। মস্ত মস্ত ধেড়ে ইঁদুর আছে জমিটার নীচে। পল্টনের সঙ্গে সে-সব সরেজমিন করে দেখে এসেছে শঙ্খ। জমিটায় অনেকগুলো গহ্বর। এক গহ্বর থেকে আর এক গহ্বরে যাওয়ার জন্য মাটির নীচে টানেলের মতো পথ আছে। তা দিয়ে ইঁদুরগুলো অতবড় চরজমিটার ভেতর বিশাল এক সাম্রাজ্য বসিয়েছে। সে সাম্রাজ্যের ভেতরটা ঠিক কীরকম দেখতে ভারী ইচ্ছে করে শঙ্খর। কিন্তু গর্তগুলো বড্ড ছোট যে।

চরজমির ওপর, গহ্বরের আশেপাশে কখনও একটা দাঁড়াশ সাপ তার বিশাল শরীর নিয়ে শুয়ে থাকে। সাপটা ঝিরোয় না কি অমন চুপটি করে ইঁদুরের খোঁজে ওঁত পেতে থাকে! দাঁড়াশ সাপ কি ইঁদুর খায়? শঙ্খ ভাবল কিছুক্ষণ। আজ চরজমির চারপাশে তন্নতন্ন চোখ রেখে দাঁড়াশটাকে কোথাও দেখা গেল না। শীত আসছে, হয়তো তাই দীর্ঘ এক ঘুমের প্রস্তুতি নিতে তোড়জোড় করছে কোথাও। ইদুঁরগুলোও তাই আজ নিশ্চয়ই নিরুপদ্রব।

দাঁড়াশের বদলে শঙ্খ আজ দেখতে পেল নীল আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে সেই চিলটা। এমন প্রায়ই দেখে, আজও দেখল। ছোট্ট কালোবিন্দুর মতো চিলটা একা-একা কাটাকুটি খেলছে আকাশের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত। ঠাকুর্দা বলেন, ওটা শঙ্খচিল। ওরা সারাক্ষণ আকাশে জলছবি আঁকে। সারাক্ষণ যত ছবি আঁকে, পরক্ষনেই তা মুছে যায়। মুছে যায়, আবার

আঁকে। আবার মুছে যায়।

শঙ্খচিল শব্দটায় ভারী মজা পায় শঙ্খ। সেও কিছুসময় শঙ্খচিলটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে অতবড় নীল আকাশটায় কাটাকুটি খেলল। ইস, সত্যিই যদি সে উঠে যেতে পারতো অত উঁচুতে! সহসা তার মনে হয়, যদি তার সামনে একটা রক পাখির ডিম রাখা থাকত, তাহলে সে লুকিয়ে থাকত তার ওপর। হঠাৎ রক পাখিটা তার বিশাল ডানা মেলে এসে বসত ডিমটার ওপর। তারপর শঙ্খকে নিয়ে উঠে যেত অনেক উঁচুতে। শঙ্খচিলটার কাছেই। সেও তখন আর একটা শঙ্খচিল হয়ে—

এমন ভাবনার মধ্যে শঙ্খ মরাসোঁতার কিনার ছেড়ে উঠে পড়ে ফের। হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় চাটুজ্জেপাড়ার দিকে। বিমল, বিকাশ, সুখেন, প্রলয় ওরা নতুন একধরনের খেলা চালু করেছে। সিগারেটের প্যাকেটের দু-পিঠের ছবিগুলো এখন ওদের কাছে এক-একটা 'তাস'। সিজার্স, ক্যাপস্টান, প্যাসিং শ্যু, চারমিনার—এমন নানান ধরনের ছবিঅলা তাস ধরা থাকে ওদের বাঁ-হাতের মুঠোয়। কোনওটার দাম ধরা হয় দশ, কোনওটার বিশ, কারও দাম পঞ্চাশ বা একশ। লন্ডন নামে নতুন একটা সিগারেট বেরিয়েছে। তার ওপর একটা নীলরঙা জাহাজের ছবি। ছবিটা এত চমৎকার যে ওরা তার দাম একলক্ষ ঘোষণা করেছিল। তখন একটা লন্ডন সিগারেটের প্যাকেট পেলে মুহূর্তে ধনী হয়ে উঠত ওরা। ক্রমে বাজারে লন্ডন এসে ছেয়ে গেল। তার দাম একলক্ষ থেকে কমতে কমতে একশ'য় এসে ঠেক খেয়েছে এখন। কিন্তু দাম বেড়ে গেছে রেড অ্যান্ড হোয়াইটের। লালটুপি পরা চুরুট-মুখে সাহেবের ছবিটা তাদের কাছে এক দুর্লভ দৃশ্য। হঠাৎ কে যেন সেদিন বরাতজোরে পেয়ে গেছে একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের খালি প্যাকেট। সেটাও দুর্দান্ত দেখতে। লালমুখো সাহেবটা হঠাৎ কীভাবে যেন কালোমুখো হয়ে গেছে।

বাঁহাতে তাস, ডানহাতে ডেগেল, এই নিয়ে ওদের খেলা শুরু হয়। ডেগেল দেখতে অনেকটা ক্যারামের স্ট্রাইকারের মতো। একটু আকারে বড়, আর ভারী, এই যা।

খেলাটা আবিষ্কার হওয়ার পর ওদের লাটিমখেলা, মার্বেলখেলা সব এখন শিকেয়। সারাক্ষণ ডেগেল ছুড়ছে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, বিশ, পঞ্চাশ, বা আরও বেশি। আর পাগলের মতো গঞ্জের বাজার টুঁড়ে সংগ্রহ করে চলেছে সিগারেটের খালি প্যাকেট।

দিনদুয়েক চাটুজ্জেপাড়ায় এভাবে ডেগেল ছুড়ে ছুড়ে গা-ঢাকা দেওয়ার পর হঠাৎ সেদিন বিকেলে ধরা পড়ে গেল স্বপ্নাদির কাছে, তুই আর আমাদের বাড়ি আসিস নে কেন রে?

শঙ্খ বিব্রত হয়ে পড়ে। সে যে কী দোটানায় পড়ে আছে, তা ঠিক খোলসা করে বলা যাবে না কাউকে। তার দুই প্রিয়জনের মধ্যে ঝগড়া হলে কীই বা করতে পারে সে। এমন এড়িয়ে চলা ছাড়া।

স্বপ্নাদি তখন দারুণ সেজেগুজে বেরুচ্ছে কোথাও। সাজলে স্বপ্নাদিকে আরও ঢের রূপসী দেখায়। পরনে জংলা ছাপা-ছাপা স্কার্ট-ব্লাউজ। চুলে বাহারি খোঁপা। চোখে হাল্কা কাজল দিতে কীই যে মিষ্টি লাগছে।

স্বপ্নাদির সঙ্গে তখন অনেকে। উমনো-ঝুমনো-টুপুর সব্বাই। শঙ্খকে বলল, চল্ তো।

খেয়ানৌকোয় চড়ব আজ। এ বছর ঈশ্বরীপুরে এসে একদিনও চড়িনি।

খেয়াঘাটের পাশে বাড়ি বলে যখন তখন খেয়ানৌকোয় চড়াটা ওদের অন্যতম বিলাসিতা। যখন কোনও কিছু করার নেই, সামনে অফুরন্ত সময়, তখন কালোমানিককে গিয়ে বললেই হল, চলো তো, তোমার সঙ্গে দুক্ষেপ খেয়াপারাপার করে নি—

সারাক্ষণ পারাপারের লোক ঘাটে থাকেই। তাদের সঙ্গে একবার এপার থেকে ওপারে, পরক্ষণেই ওপার থেকে ফের এপারে। তারপর আবার—

খেয়ানৌকোয় চড়ে মাঝগাঙ পর্যন্ত চলে যায় ওরা! মাঝগাঙে আরও একটু বেশি করে ভাব করা যায় জলের সঙ্গে। সেখানে জল ঢের গম্ভীর। যেন সে দারুণ ভারিক্কিচালে চলতে ভালোবাসে। তার ওজনও বেশি।

আজ খেয়াঘাটে যাওয়ার পথে দেখা হয়ে গেল পল্টনের সঙ্গে। তার হাতে একটা নতুন গুলতি, লাল টকটকে চাম্, চামের ভেতর পোড়ামাটির বাঁটুল পুরে আকাশের দিকে তাক করছিল একা-একা। তাদের দলবল দেখে অবাক হয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছিস রে?

—খেয়ানৌকোয় চড়তে, স্বপ্নাদি উচ্ছ্বসিত হয়, তুই যাবি?

পল্টন তৎক্ষণাৎ গুলতি গুটিয়ে তার ঢাউস পকেটে ভরে ফেলল, চলো—

খেয়াঘাটে তখন কালোমানিক একা-একা ঝাড়পোঁছ করছিল তার প্রিয় আড়বাঁশিটা। তাদের আবদার শুনে বলল, এখন ঘাটে পেসেঞ্জার নেই। ওপারে নৈকো যাবে না। আমি এখন বাঁশি বাজাব।

স্বপ্নাদির মুখখানা লাল হয়ে উঠল। সে একবছর পরে ঈশ্বরীপুরে এসে একদিন খেয়ানৌকোয় চড়তে চাইল, আর কালোমানিক কিনা পত্রপাঠ তাকে না করে দিল! শঙ্খ তৎক্ষণাৎ আবার অনুরোধ জানাল, বা রে, কালোমানিকদা, তুমি আমাদের এর'মভাবে ফিরাই দেচ্ছ?

কালোমানিকের তবু একই গোঁ, এখুন আমার টাইম নেই।

পল্টন অবশ্য একটুও না ঘাবড়ে বলল, আমি নৌকো নে যাব? আমি তো কতবার পারাপার করিছি।

কালোমানিক ততক্ষণে তার ঠোঁট সরু করে আড়বাঁশিতে রেখেছে। ফুঁ দিয়ে একঝলক মিঠেন সুর ভাসিয়ে দিল হাওয়ায়। দু-তিনবার ফুঁ দিতে মনটা বোধহয় প্রসন্ন হয়ে উঠল, হঠাৎ মুখ তুলে বলল, পারিস তো নে যা—

পল্টন তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে খেয়ানৌকোর নোঙর খুলতে লেগে গেল। শঙ্খরা হুড়মুড়িয়ে পা রাখল পাটাতনে। এতক্ষণে স্বপ্নাদির মুখে হাসি ফুটেছে। ক'দিন আগেই ষাঁড়াষাড়ির গোণ পার হয়ে গেছে, তবু এখনও জলের কিছুমাত্র কমতি নেই। ইছামতীকে দেখে মনে হচ্ছে টইটম্বুর, পুকুনির মতো, যদিও এখনও জোয়ার ঢুকছে গাঙে।

নোঙর খুলে বিশাল হালটায় সবে হাত দিয়েছে পল্টন, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, খেয়াঘাটের একটু দূরেই অন্যমনস্ক হয়ে নদীর পাড়ে বসে রয়েছে অর্ঘদা। তক্ষুণি সে চেঁচিয়ে হাঁক পাড়ে,

ওপারে যাবা নাকি, অর্ঘদা?

স্বপ্নাদি এতক্ষণ বেশ ফুর্তিতে ছিল। কোত্থেকে এক বিশাল গন্ধরাজ ফুল পেতে সেটা বেশ মৌজ করে মাথার চুলে গুঁজছিল, পল্টনের হাঁক শুনে ভুরু কুঁচকে বলল, আমি যেখানে যাব, সেখানে গিয়ে হাজির হবে নাকি?

শঙ্খ বলতে চেষ্টা করল, অর্ঘদা তো আগেই এসে বসে আছে, স্বপ্নাদি।

কিন্তু স্বপ্নাদির মুখখানা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল, কারণ তখন অর্ঘদা তার ঘাসের আসন ছেড়ে পায়ে-পায়ে চলে এসেছে ঘাটে। ঘাট থেকে নৌকোয় উঠতে উঠতে বলল, খুব সাহস তো তোর পল্টন। এত বড় খেয়ানৌকো সামলাতি পারবি?

পল্টন তার স্বভাবসিদ্ধ ডাকাবুকো গলায় বলে উঠল, এর আগে কতবার পাবাপার করিছি—

কিন্তু যতখানি সাহসের সঙ্গে সে কথাটা উচ্চারণ করল, নৌকোর হাল ধরে দেখল, আজ কাজটা বেশ কঠিনই। ষাঁড়াষাড়ির গোণের পর নদীর টান বোধহয় ঢের বেড়েছে। গাঙে জোয়ার ঢুকছে হু-হু করে, দু-চারবার হালে মোচড় দিতেই দেখা গেল চিংড়িপোতার ঘাটে না গিয়ে নৌকো ভেসে চলেছে উত্তরের দিকে।

শঙ্খ উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, কী রে, পল্টন, পারছিস নে?

পল্টন অবশ্য চট করে হার স্বীকার করার পাত্র নয়। তার কব্জিতে এত জোর যে সে গুলতিতে টান দিয়ে একের পর এক বাঁটুল পার করে দিতে পারে ভাঁটার সময়কার ইছামতী। আজও সে প্রাণপণে মোচড় দিচ্ছে খেয়ানৌকোর প্রমাণসাইজের হালে। তার হাতের বাইসেপ ফুলে উঠছে, চোয়াল শক্ত হয়ে যাচ্ছে, তবু তার দু'চোখে ঘনিয়ে আসছে একরাশ শঙ্কা।

সেই শঙ্কা ক্রমশ চারিত হল শঙ্খদের চোখেও। উমনো ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, কী রে পল্টন, তোর গায়ে জোর নেই?

স্বপ্নাদি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে সম্ভাব্য বিপদ। তার চোখেও তখন উথাল দিয়ে উঠেছে ভয়তরাস, শঙ্খর দিকে তাকিয়ে বলল, তুই হাঁ করে দেখছিস কী? হাত লাগা, হাত লাগা। নইলে কোথায় না কোথায় ভেসে যাব আমরা কে জানে।

শঙ্খ ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াল তক্ষুনি, কিন্তু যে কাজ পল্টন পারেনি সে কি তা পারবে! বিব্রতমুখে বলল, দেখি পল্টন—

তার পাশে বসে এতক্ষণ মুচকি মুচকি হাসছিল অর্ঘদা। তাকে বসিয়ে দিয়ে ঝট কবে উঠে দাঁড়াল। পল্টনকে এক ধমক দিয়ে বলল, সর্ তো এখন। তোর কেরামতি খুব দেখাইছিস—

বলে তার জামার হাতা গুটিয়ে হালে মোচড় লাগাল সজোরে। অতবড় খেয়ানৌকো একঝটকায় মুখ ফেরাল তৎক্ষণাৎ। এতক্ষণ চিংড়িপোতার ঘাট ফেলে তারা ভেসে চলেছিল উত্তরে আতারপুরের দিকে, এখন ফের সঠিক পথে পা বাড়াল তাদের বাহন। শঙ্খরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

স্বপ্নাদি ভুরু কুঁচকে রাগ-রাগ মুখে বসে ছিল। অর্ঘদার হঠাৎ খেয়ানৌকোয় ওঠাটা সে মোটেই পছন্দ কবেনি। কিন্তু পল্টনের হাল বাওয়ার রকম দেখে এতক্ষণ ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল

তাকে। সঙ্গে এতগুলো বালক-বালিকা, তাদের নিয়ে এহেন সংকটে পড়ে বুঝে উঠতে পারছিল না কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে, এখন অর্ঘদা হঠাৎ ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় তার ভুরুর কোঁচ মিলিয়ে যেতে লাগল ক্রমশ। মুখের অপ্রসন্নভাবটা কমে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চমৎকার চাউনি।

যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে অর্ঘদা হালে বড় বড় মোচড় দিচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই খেয়ানৌকো পৌঁছে গেল ওপারে চিংড়িপোতার ঘাটে। নৌকো ঘাটে ভিড়তেই অর্ঘদা লাফিয়ে নেমে বলল, যা রে পল্টন, তুই এবার নৌকো নে ওপারে চলে যা। আমি এখন ওই জলার ভেতর অবনবুড়োর টঙে গে দু'দণ্ড গপ্পো করে আসি—

অবনবুড়োর ওখানে যাওয়ার কথা শুনে শঙ্খ লাফিয়ে ওঠে অন্যসময়, কিন্তু এহেন সংকটের মুহূর্তে অর্ঘদার কথায় ওরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। স্বপ্নাদির দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল মুহূর্তে, হঠাৎ ক্রুদ্ধগলায় বলল, বা রে, আমাদের পল্টনের ভরসায় রেখে উনি এখন গপ্পো করতে চললেন!

পল্টনও বিব্রত বোধ করছিল। এর আগে কতবার পুরুনি জোয়ারেও সে খেয়ানৌকো পারাপার করেছে। কিন্তু এবার সংকট তীব্রতর। এহেন ষাঁড়াষাড়ির গোণের পাল্লায় কখনও পড়েনি। জলের টান নয় তো চোরাঘুর্ণিই যেন বা। সে কিছু বলার আগেই শঙ্খ বলে ওঠে, পল্টন পারবে না, অর্ঘদা।

অর্ঘদা যেন ভারী মজা দেখছে এমন ফুটি-ফুটি হাসি তার মুখে। কিনারের দিকে পা বাড়িয়েছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তাই?

উমনো-ঝুমনোও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে একযোগে, তুমি আমাদের ফেলি চলে যাচ্ছ, অর্ঘদা? বেশ আক্কেল তো তোমার!

এমন সমবেত আক্রমণের কাছে যেন হার মানল অর্ঘদা। একটা বাটাং পাখি যেন হুস্ করে বকচরের ওপর থেকে তাড়াচ্ছে এমন ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, তা'লি চ—। তারপর নৌকোয় উঠে হালে মোচড় দিতে দিতে বলল, আমি বাপু অজগাঁয়ের ছেলে। তোদের মতো অত বিদ্যেটিদ্যে নেই আমার। এই নৌকো বাওয়াবায়ি করিই বেঁচে থাকতি হবে হয়তো।

কথাটা স্বপ্নাদিকে ঠেস দিয়েই যে বলা তা স্বপ্নাদি বুঝতে পারল। তৎক্ষণাৎলাল হয়ে উঠল তার মুখখানা, সে রক্তবর্ণ মুখের পাশে খোঁপার গন্ধরাজ ফুলটা আরও শাদা মনে হল যেন। কোনও উত্তর করল না অর্ঘদার কথায়, যতক্ষণ না সেই তীব্রস্রোতের ইছামতী পার হল, মুখ নিচু করে বসে রইল পাটাতনের ওপর। ওপারে পৌঁছুতে, ঘাট্‌লার সিঁড়িতে পা রাখতে রাখতে বলল, কথা শুনে তো মনে হয় পেটে-পেটে অনেক বিদ্যে।

বলেই আর দাঁড়াল না, মুখখানা ঝটিতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে হন হন করে হাঁটা দিল বাড়ির দিকে। অর্ঘদা তখনও হাসছে মিটিমিটি। কী এক কৌতুক আজ সহসা আচ্ছন্ন করেছে তাকে। চমৎকৃত করেছে।

শঙ্খরা অবশ্য দাঁড়িয়ে পড়ল। কারণ কী এক এলোঝড়ের খবর পেয়ে কালোমানিক তার

আড়বাঁশি বাজানো বন্ধ রেখে বেরিয়ে এসেছে ছাউনির বাইরে। কোথাও একটা প্রবল হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। কোলাহলের শব্দটা ভেসে আসছে জেলেপাড়ার দিক থেকেই। কে একজন মেয়েলোক চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে তুলেছে।

শঙ্খরা স্থির হয়ে কান পাতল সেদিকে। গলা শুনে মনে হল এ সেই কারোয়ান মঙ্গলা। কেন কে জানে চিল্লাচ্ছে আকাশ ফাটিয়ে।

শঙ্খ অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে কালোমানিকদা?

কালোমানিক সম্বিত ভেঙে বলল, শুনতি পালাম, কোথায় যেন পবনরে দেখতি পেয়েছে কেউ?

—পবন! কোন পবন?

—সেই পবন যারে বাঘে নে গিস্‌ল।

এমন অবাক করা কথা শঙ্খরা যেন জীবনে শোনেনি। তারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কোলাহল যেদিকে হচ্ছে তার উৎসের দিকে। কালোমানিকের কথা তাদের যেন ঠিক প্রত্যয় হল না। পবনকে সোঁদরবনের বাঘে নিয়ে গেছে এ কথা ঈশ্বরীপুরের কচি-বুড়ো সব্বাই জানে। সেই বাঘে-খাওয়া মানুষকে কেউ দেখতে পেয়েছে তা আবার হয় নাকি! ধুস্‌—

কয়েকমাসের মধ্যে পুণ্যিবৌ তার দুধ-দোয়ার কাজে বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেসময় তাদের পাড়ায় একটা আন্‌কা খবর নিয়ে এল পাশের গাঁ খড়ম্বা থেকে জাহের নামের একজন জোলা।

জাহেররা মুসলমান তাঁতি। এ দেশের লোকে তাদের বলে জোলা। খড়ম্বার জোলাপাড়ায় ঘরে-ঘরে তাঁত। সারাদিন মাকুর খটাখট্ খটাখট শব্দে ভরে থাকে এলাকা। জোলারা তাঁতের কারবারী, আর জেলেরা জালের। দুই পাড়ার লোকেরই সুতোর জোগান চাই, তাই একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বহুকাল ধরে। তাদের জাহের ঈশ্বরীপুরে এসেছিল সুতোর খবরাখবর নিয়ে. কলকেতায় ভালো সুতো পাওয়া যাতিছে, নতুন মিলের সুতো। কিনতি যাবা নাকি তুমরা?

সেই জাহেরই হঠাৎ পাড়ার পঞ্চাকে ডেকে বলল, কী রে পঞ্চা, তোদের পবনরে নাকি বাঘে ধরে নে গিছ্‌ল?

পঞ্চা চোখে শঙ্কা নিয়ে বলল, গেছেই তো—

—তারে যে ফের আমি দেখে আলাম।

পঞ্চা অবাক হয়ে বলল, দেখে আলাম মানে?

—কুটুমবাড়ি গিছ্লাম নারানগঞ্জে। সেখেনে বাজারে গে দেখি, ও মা, এ যে আমাদের ঈশ্বরীপুরের পবন। আমারে দেখতি পেয়েই সট্‌কে গেল এক চালাঘরের মধ্যি।

—নারানগঞ্জ আবার কোথায়?

—সে মধ্যমগ্রাম পেরুই যাতি হয়। ওখেনে আমাদের কুটুমবাড়ি আছে।

পঞ্চা তার কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, ধুর, তুমি তাইলে নিঘ্যাত তার ভূত দেখিচ।

—ভূত নয়, সত্যি। আমারে দেখেই পলিয়ে গেল হঠাৎ। স্বচক্ষি দ্যাখ্‌লাম।

—অমনি হাওয়ায় মিলাই গেল? আর দেখতি পালে না? বাপরে, ঈশ্বরীপুরের ভূত গিয়ে শেযে বাসা বেঁধিছে মধ্যমগ্রামের নারানগঞ্জে? পঞ্চা চোখ কপালে তুলে বলল, ও, বুঝিছি।

—কী বুঝিছ?

—নিঘ্যাত ওর কাছাকাছি সোঁদরবন। সেখেন থে বাসা খুঁজতি খুঁজতি পবনদার ভূত গে ঠেকেছে তোমাদের কুটুমবাড়ির কাছে। কিন্তু কী হবে?

—কী হবে?

—তারপর বাসা খুঁজতি খুঁজতি পবনদা যদি ঈশ্বরীপুর চলি আসে? ওরে বাবা—

—তুমার আর ডর করতি হবে না। পবন আর আসবে না।

—কী করি জানলে?

—আমি তো গে ধরলাম পবনরে, কী রে পবন, তুই এখেনে সট্‌কান দে রয়িছিস? গাঁয়ে যাবিনি?

—তুমি জিজ্ঞেস করলে? পঞ্চা হাঁ হয়ে যায়।

—জিজ্ঞেস করলাম। তা বলল, যাব না। যাব কী করে? শোনলাম, বৌটা বেধবা হয়িছে। আমার ছেরাদ্দ হয়িছে। সে গাঁয়ে আর যাই কোন মুখে। তুমরাই বলো না, হেরিয়ে যাওয়া লোকের জন্যি তো বারো বছর অপিক্ষে করতি হয়। সেইটেই তো গাঁ-গেরামের রীত্। তাই না? তা উরা অপিক্ষে করতি পারল না?

কথাটা এককান হয়ে পাঁচকানে ছড়িয়ে পড়ল গোটা ঈশ্বরীপুরে। জাহের যে-লোকটাকে দেখে এসেছে, সেটা সত্যিই পবন, না কি পবনের ভূত, তাই নিয়ে এ-ঘরে ও-ঘরে জোর তর্কবিতর্ক শুরু হল। আলোচনা হতে হতে দু-চারজন চেপে ধরল মোড়ল মহাদেবখুড়োকে, কী সব শুনতি পাতিছি, মহাদেবখুড়ো? পবনরে নাকি দেখা গেছে—

মহাদেবখুড়ো হা হা করে হেসে ওঠে, বাঘের মতো ডাক সে হাসির শব্দে, সে কী করে হবে? তারে তো বাঘে নে গেছে।

—তোমরা সচক্ষি দেখিছ?

—আমি দ্যাখপো কী করে। দেখিছে যত্না।

সবাই গিয়ে তখন ভর করল যত্নার ঘাড়ে। সে সব শুনেটুনে বলল, আমি দ্যাখপো কী করে? আমি কি ড্যাঙায় নেমিছি? সে তো উরা জানে। ভনা, কেলো, বগলা—সব ছেলে ছোকরারা।

ভনা, কেলো, বগলা তখন সবাই একগলা জলে। একে অপরের দিকে তর্জনী বাড়িয়ে দেয়,

আমি তো দেখিনি, ও-ই তো বলল—

কেউ বলল, পবন তো দিনিদুকুরি বাঘ্যে করতি ড্যাঙায় নেমিছিল। আর উঠি আসেনি। কেউ বলল, বাবলার দাঁতন ভেঙে আনতি পবন জঙ্গলে ঢুকিছিল। কেউ বলল—

এমন বলাবলির মধ্যে এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেল, ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা কুয়াশা আছে। পবনকে যে বাঘে নিয়ে গিয়েছিল তা কেউ স্বচক্ষে দ্যাখেনি। সে সোঁদরবনের গহন জঙ্গলে নেমেছিল ঠিকই, কিন্তু কোনও কারণে আর ফিরতে পারেনি নৌকোয়। তাকে অমন গহনে সোঁদরবনে নির্বাসিনে রেখে বেলাবেলি নোঙর তুলে রওনা দিয়েছিল মাছমারাদের পালতোলা নৌকোর সার।

ঘটনাটা জানাজানি হতে পাড়ার মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

আর ওদিকে মঙ্গলা পাড়া মাথায় করে তুলল তার বিখ্যাত কারোয়ানিতে। তার চিৎকারে এমনিতেই দিগরে কাকপক্ষি বসতে পারে না, আজ তার চেঁচামেচিতে হৈ-চৈ পড়ে গেল গোটা পাড়ায়, তুমরা তা'লি কেউ পবনের খবর রাখোনি! একট জলজ্যান্ত মান্‌ষেরে জঙ্গলের মধ্যি ফেলাই পলিয়ে এইছ। হতচ্ছাড়া ড্যাক্‌রারা—রকমারি গালাগালিতে সে আদ্যপান্ত ভরিয়ে দিতে লাগল সেইসব মাছমারাদের যারা সোঁদরবনে যাওয়ার সময় সঙ্গি হয়েছিল পবনের। এমনকি সে রেয়াত করে ছেড়ে দিল না পাড়ার মাথা মহাদেবখুড়োকেও, ছি ছি খুড়ো, তুমি না জেলেপাড়ার মাতব্বর লোক! তুমার কথায় গোটা পাড়ার লোক ওঠে-বসে! তুমি জেনিশুনি এমন সব্বোনাশটা করলে আমার বুনির—

মঙ্গলার পিঠোপিঠি বোন পুণ্যি-বৌ তখন হতভম্ব হয়ে আছে। কুলুঙ্গিতে রাখা ঘষা কাচের আয়নাটার ভেতর দেখছে তার শাদা ধবধবে হয়ে যাওয়া টানা সিঁথিটি। কতকাল সিঁদুর না পড়ে এখন তার সিঁথিটা যেন একটা ধু ধু মেঠোপথ। পরক্ষণেই একবার চোখ পড়ে গেল কুলুঙ্গিতে রাখা সিঁদুর কৌটোটার দিকে। এতদিন ফেলব-ফেলব করেও ফেলা হয়নি সেটা।

খড়ম্বার জাহেরের কাছে খবরটা শোনা ইস্তক বুকের ভেতরটা ধকধক করছে তার। তাহলে কি সত্যিই বেঁচেবর্তে আছে পবন? সত্যিই কি তার মানুষটা আবার ফিরে আসতে পারে ঈশ্বরীপুরে! শুধু তার শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে বলে, পুণ্যি-বৌ বিধবার বেশ ধরেছে বলেই সে আর ঘরে ফিরে আসতে পারছে না?

এতসব ভাবতে ভাবতে পুণ্যি-বৌএর নিঃশ্বাস ক্রমশ ঘন হয়ে আসতে থাকে। তার মনে হয় হু হু করে কাঁপ দিয়ে জ্বর আসছে তার শরীরে। বুকের ভেতর একনাগাড় ধক্‌ধক্ শব্দ আরও দ্রুত হয়ে বাজতে থাকে সহসা। সে এবার মনসার ভাসানে তার গলা উজাড় করে দিয়ে গান গেয়েছিল। তার গলায় বেজে উঠেছিল এক অন্যরকম সুর। তার শরীরে যেন ভর করেছিল এক অলৌকিক শক্তি। সে যেন তখন আর ঈশ্বরীপুরের জেলেপাড়ার পুণ্যি-বৌ ছিল না। কখন যেন রূপান্তরিত হয়েছিল বেহুলায়। পবন যেন তখন এক লখিন্দর। সাপে নয়, বাঘে খেয়ে গিয়েছে তাকে। আর সেই লখিন্দরকে জীয়ন্ত অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে বলে অসীম সাহসে ভর করে নদীতে ভেলা ভাসিয়েছে বেহুলা। একের পর এক গানের ভেতর দিয়ে সে তখন

ভেসে চলেছে সেই অলৌকিক স্বর্গের দিকে, যেখানে গেলে ফিরে পাওয়া যাবে জীবিত পবনকে। তার সেই আশ্চর্য গানের কথা আজও এ দিগরের মানুষ বলাবলি করে। তাহলে কি ভগবান তার গানে প্রীত হয়ে মুখ তুলে চেয়েছেন! ফিরিয়ে দিয়েছেন তার পবনকে! তাহলে কি সে আবার তার সিঁথিতে সিঁদুর দেবে!

জোলাপাড়ার জাহের সত্যিই পবনকে দেখেছে কি দেখেনি এই নিয়ে ঈশ্বরীপুরের মানুষ তখন সরগরম। কেউ বলল, জাহের কী দেখতি কী দেখেছে তার ঠিক নেই, আগে ভালো কবি খোঁজখবর নাও। কেউ বলল, পবন ফিরে আসলি কি পবনের বেধবা বৌ আবার সধবা হবে? ও মা, কি কাণ্ড? কেউ বলল, জাহের এসে বলেছে, পবন বেঁচে আছে, আর অমনি পবন বেঁচে উঠল! আমরা তন্ন তন্ন করি জঙ্গল ঢুঁড়ি দেখে এইছি। কোথাও পবনের চিহ্নমাত্তর দেখিনি। এট্টা লোক বেঁচে থাকলি তো হাউমাউ করি ছুটি এসে নৌকোয় উঠি বসবে'খন। তা নয়-- -

এতসব বলাবলি শুনে ফের থম্ মেরে যায় পুণ্যি-বৌ। তার হাতের তেলোয় যেমন-কে-তেমন রয়ে যায় ভরা সিঁদুরের কৌটো। ক'দিন এর-ওর ফিসফাস কানাকানি শুনে সে বুঝতে পারে না কী করা উচিত তার। একে-ওকে অনুনয় করে বলতে লাগল, তুমরা কেউ যাউ না নারানগঞ্জ। দেখি এসো না, সে লোকটা কেন ফিরতেছে না। মানুষটা ফিরলি তো ফের প্রাচিত্তির করি নেব'খন।

পবনের বেঁচে ওঠার খবর পৌঁছে গেছে আতারপুরের টিকিঅলা বামুনের কানে। টিকিঅলা বামুনই তো পবনের শ্রাদ্ধে মন্তর পড়েছিল। খবর শুনে তিনি এসে খুব করে কথা শুনিয়ে গেলেন পাড়ার মোড়ল মহাদেবখুড়োকে, তোমার তো তিনকাল গে এককাল ঠেকেছে, মহাদেব। এখনও এটুকু হুঁসজ্ঞান হল না, অপঘাতে মরণ হলি তার মড়াটা চোখে দেখা চাই। তার মড়া দেখলে না, দাহ করলে না, অমনি-অমনি তার শ্রাদ্ধ করে দিলে? কচি বৌটারে বেধবা সাজাই দিলে!

মহাদেবখুড়োও থ হয়ে গেছে হঠাৎ। এ ক'দিনে তার প্রবল হাঁকডাক, প্রায় অশথ গাছের মতো তার বিশাল অস্তিত্ব মিইয়ে গেছে আচমকা। ছেলে ছোকরারা নৌকোয় ফিরে এসে তাকে বলেছিল, পবনকে বাঘে নে গেছে। জঙ্গলে নেমে খোঁজা-খুঁজি, ডাকাডাকি করেছিল খানিক, তারপরও তারা ঘাটে অপেক্ষা করেছিল ঘণ্টাখানেক। শেষে পবন না ফিরতে নৌকোর নোঙর তুলে নেয়। বেঁচে থাকলে লোকটা নির্ঘাত ফিরে আসত নৌকোয়।

অবশেষে আতারপুরের বামুন প্রায়শ্চিত্তের বিধানও দিয়ে গেছে। বলেছে, মরামানুষ ফের যদি ফিরে আসে, তবে বিধবা বৌকে সধবা করার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে।

কিন্তু লোকটা বেঁচে আছে কি না তার তো সরেজমিন প্রমাণ চাই। পুণ্যি-বৌ তখন একে ধরে, ওকে ধরে, তোমরা কেউ যাউ না নারানগঞ্জ—

নারানগঞ্জ ঈশ্বরীপুর থেকে ঢের দূর। তিন-তিনখান বাসে উঠে যেতে হয় সেখানে। এবেলা গেলে ওবেলা ফিরে আসা যায় না। কে এমন ঝক্কি ঘাড়ে করে নেবে?

তার মধ্যে কে যেন হঠাৎ বলে বসল, জাহের যারে দেখেছে সে তো পবন না, পবনের ভূত। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে ভূত খুঁজতে তিন-তিনখানা বাস ঠেঙিয়ে নারানগঞ্জ যাবে!

কথাটা ফের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল জেলেপাড়ায়। সত্যিই তো, জাহের যাকে দেখে এসেছে সে নিশ্চয় পবনের ভূত। ঈশ্বরীপুরে যে ভূতের বাসা বাঁধার কথা, সে কিনা গিয়ে ঠেক খেয়েছে নারানগঞ্জে।

পুণ্যি-বৌ একে-ওকে সাধে, কিন্তু কেউ রাজি হয় না। ভূত ধরতে যেতে কারোরই সাধ নেই, সাহসও নেই। ঈশ্বরীপুরে এত ভূতের উপদ্রব যে—

কথাটা এ-কান ও-কান হয়ে পৌঁছে গেল নতুন পত্তনীদের ঘরে ইস্কুল-পড়তে-আসা অর্ঘর কানে। সে অবাক হয়ে বলল, খুঁজতে যাবে না মানে? আলবৎ যাবে। আর কেউ না যাক, আমি তাইলে পবনরে খুঁজে আনতি যাব।

সে-কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে গেল সবাই। যে অর্ঘ ঘরের বাইরে বেরুতে চায় না, বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে চায়না, সে কিনা যাবে সেই দূর নারানগঞ্জে! পবনের ভূত খুঁজতে!

উমনো হঠাৎ কেন যেন ক'দিন ধরে অর্ঘদার ওপর ভারী বিরক্ত। অর্ঘদা নারানগঞ্জ যাবে শুনে তার পুতুল খেলা থামিয়ে মুখ ঝাঁকিয়ে বলল, হুঁ! উনি নারানগঞ্জ যাবেন!
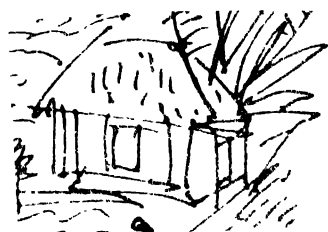
অনেকদিন পর বেশ জাঁকিয়ে পুতুল-খেলার আসর বসিয়েছিল উমনো-ঝুমনো। স্বপ্নাদির পুজোর ছুটি শেষ হয়ে এসেছে, যাবার আগে একদিন বলল, তোরা এখনও পুতুল খেলিস, উমনো? সেই আগেকার মতো? একসময় পুতুল খেলার খুব জাঁকজমক ছিল ওদের। উমনোর ছেলের সঙ্গে ঝুমনোর মেয়ের বিয়ে হতো রীতিমতো কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে। তাতে খাওয়ান দাওয়ান হতোও মন্দ নয়। তাদের মায়ের তৈরি গরম-গরম ফুলকো লুচির সঙ্গে কুচো-কুচো আলুর চমৎকার তরকারি। সেই পুতুল খেলার আসর একসময় তুলে দিতে হল উমনো-ঝুমনো উঁচু-ক্লাসে উঠেছে বলে নয়, খেলতে-খেলতে দুইবোনে প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হতো বলে। ঝুমনোর মেয়ে বিয়ে হয়ে শ্বশুরঘরে চলে যাওয়ার পর-পরই ঝুমনো বায়না ধরত তার মেয়েকে বাপের বাড়ি পাঠাতে হবে। আর সে মেয়ে একবার বাপের বাড়ি এলে আর যেতে চাইত না শ্বশুরঘরে। মানে ঝুমনোই আর পাঠাতে চাইত না, উল্টে সে যা-যা বরপণ দিয়েছিল সব ফেরত চাইত। তাই নিয়ে চুলোচুলি পর্যন্ত গড়াতো। তারপর একদিন তাদের মা টান মেরে—

স্বপ্নাদি বলতেই আবার দুইবোনে অনেকদিন পর পাতিয়ে বসল বর-বৌ খেলা। মহা-উৎসাহে স্বপ্নাদিও তার স্কার্ট বিছিয়ে জাবড়ি মেরে বসল পুতুল বিয়ের আসরে। উমনোর মা ওদিকে গরম-গরম লুচি ভাজতে বসেছেন ঘিয়ের চমৎকার গন্ধ ছড়িয়ে।

উমনো তখন তার ছেলেকে পাউডার মাখাতে মাখাতে বলছে, জানো স্বপ্নাদি, অর্ঘদা নাকি

সেই কোথায় নারানগঞ্জে যাবে পবনের ভূত ধরতি।

পবনের ভূত কথাটা তখন বেশ চাউর হয়ে গেছে ঈশ্বরীপুরের হাওয়ায়। স্বপ্নাদিও শুনেছে, জেলেপাড়ার পবন নাকি আবার ভেসে উঠেছে অনেকদূরের এক গাঁয়ে। উমনোর কথা শুনে ঠোঁট উল্টে বলল, আহা, ন্যাকা নাকি?

শঙ্খ আর পল্টন ঠিক সেই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে বিয়েবাড়িতে। পল্টনের হাতে একটা বড়সড় ভাঁড়, তাতে উপচে পড়ছে চমৎকার গন্ধঅলা নলেনরস। সে গন্ধ পুতুল খেলার আসরে ম ম করে ছড়িয়ে পড়তেই স্বপ্নাদি লাফিয়ে উঠল, সত্যি এনেছিস!

শঙ্খ, পল্টন দুজনেই হাসল, উফ্, যা করে এনেছি আজ। খেয়ে দেখো, একদম জিরেন কাট্—

উপছানো ভাঁড় হাতে নিতে নিতে স্বপ্নাদি বলল, আয়, বোস্-

আজ এই বিয়ের আসরে শঙ্খদেরও নেমন্তন্ন। কিন্তু শঙ্খর আজ উমনো ঝুমনোদের বাড়ি এখনই বসার সময় নেই। সকালের এই সময়টুকু তার কাছে খুবই মূল্যবান। পুজোর ছুটির পর ইস্কুল খুললেই অ্যানুয়াল পরীক্ষার রুটিন দেবে। ঠাকুর্দা তাকে পইপই করে বলে দিয়েছেন, এখন একটি সেকেণ্ডও নষ্ট করার নয়। শঙ্খ তা বোঝেও। কিন্তু এই বিয়ের আসরে চারপাশে সারসার পুতুল, তাদের বাড়িঘর, খাট-বিছানা, মায় দোলনা পর্যন্ত পাতা দেখে তার মন চইচই করে উঠছে। পুতুল-বিয়ে মানে উমনো-ঝুমনোদের বাড়ি সারা দিন এক হৈ-রৈ কাণ্ড। এমন বর্ণাঢ্য পরিবেশ, তার সঙ্গে ঘিয়ে-ভাজা লুচির গন্ধ ছেড়ে সে কি এখন পড়ায় মন বসাতে পারবে!

স্বপ্নাদির কথা শুনে শঙ্খরা মাটিতে বাবু হয়ে বসতেই স্বপ্নাদি ফের বলল, সেই গেলবছর জিরেন-রস খেয়েছিলাম, তারপর আবার আজ।

পল্টন আর শঙ্খর চোখে তখন বিশ্বজয়ের অহঙ্কার। কার্তিকের শেষে এখনও খেজুরগাছ ঝোড়ার দিন শুরু হয়নি। সবে কাল বিকেলেই পল্টন দেখে এসেছিল, সামসের আলি মরাসোঁতার পারে গোটা তিনেক খেজুরগাছ ঝুড়ে নলি পুতেছে। স্বপ্নাদিকে বলতেই তার মুখ ঝলমল করে উঠেছিল, ইস, কতদিন ঈশ্বরীপুরের খেজুর রস মুখে দিইনি। খড়্গপুরে ক্বচিৎ যদিওবা পাওয়া যায় তাও জল-মেশানো।

সেই প্রথম-কাটের জিরেন রস জোগাড় করতেই আজ পল্টন আর শঙ্খর ভোরবেলা অভিযান ছিল। তখনও রাত ভোর হয়নি এমন আঁধার থাকতে পল্টন এসে ঠকঠক শব্দ করেছিল জানালায়। শঙ্খর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল চুপিচুপি। তারপর দু'জনে অন্ধকারে পথ ঠাহর করে সোজা মরাসোঁতার ধারে। পল্টন খেজুরগাছে ওঠায় ভারী ওস্তাদ। এসব কাজে রোমাঞ্চও যেমন, তেমনি ভয়তরাস। সামসের নাকি কখনও কখনও রাত জেগে পাহারা দেয় তার খেজুরবাগান। একবার ধরে ফেললেই তার হাতে হেনস্থা হবে কম নয়। চাটুজ্জেপাড়ার ছেলেরা একবার হাতেনাতে ধরা পড়তে কি নাকানি চোবানি!

পর পর তিনটে খেজুরগাছে তখন সদ্য-কেনা ভাঁড় ঝুলছে নলির নীচে। পল্টন তরতরিয়ে

উঠে গিয়ে নীচে নামিয়ে আনল একটা ভাঁড়। প্রথম-কাটের জিরেন রসের গন্ধই আলাদা। পল্টন চট করে ভাঁড়ের ভেতর আঙুল ডুবিয়ে জিবের ওপর ফেলল একফোঁটা। দেখাদেখি শঙ্খও। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি খেজুবরসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল তার জিব থেকে কণ্ঠনালীতে, সেখান থেকে শিরা-উপশিরায়। সে এক অপূর্ব স্বাদগন্ধ। প্রায় রাজা হয়ে যাওয়ার মতোই।

এ সব অভিযানে পল্টন প্রতিবারই একটা ভাঁড় বয়ে নিয়ে যায় সঙ্গে। প্রথম ভাঁড়ের রস তাতে উপুড় করে ঢেলে সেটা আবার বেঁধে রেখে এল নলিতে। এভাবে দ্বিতীয় গাছ থেকেও নামিয়ে আনল আর একটা ভাঁড়। তাতেই প্রায় ভরে এল তাদের খালি ভাঁড়টা। শঙ্খর ভেতরে তখন প্রবল ভয়তাড়স। ভয়ে তার বুকেব ভেতবটা ধড়াস ধড়াস করছে। একবাব সামসেব দেখে ফেললেই—

সে বলে উঠল, চ' পল্টন, এই ঢের হয়েছে।

পল্টন অবশ্য তার কথা গায়ে মাখল না। বলল, দাঁড়া না, বাকি ভাঁড়টা পেড়ে এনে দু'জনে সাবাড় করি। তুই ওই পাটকাঠির ডাঙ্ থেকে দুটো নল তৈরি করে আন তো---

পাটকাঠিব নল দিয়ে জিরেন-রস খাওয়ার একটা আলাদা আমোদ। পল্টন ততক্ষণে ছড়মুড় কবে উঠে গেছে তৃতীয় গাছটার ওপরে। পট করে ভাঁড়টা খুলতে যাবে, এমন সময় পল্টন থমকে গিয়ে বলল, যাস্ শালা---

শঙ্খ ভয় পেয়ে বলল, কী হয়েছে রে পল্টন?

ভাঁড়টা না নামিয়েই পল্টন সরসরিয়ে নেমে এল ফের, চোখমুখ কুঁচকে বলল, ভাঁড়ের গায়ে আকন্দর আঠা লেগে আছে।

---আকন্দর আঠা! সে তো বিষ!

—হ্যাঁ, সে জন্যিই তো পাড়লাম না। তবে মনে হয় আমাদের ভয় দেখানোর জন্যিই সামসের ভাঁড়ের গায়ে আকন্দর আঠা দিয়ে রেখেছে। চ', এতেই হয়ে যাবে—

শঙ্খর জিবটা তখন তিতো-তিতো লাগছে। বলল, তা'লে বাকি দুটো ভাঁড়েও যদি আকন্দর আঠা দিয়ে থাকে?

পল্টন ঘাড় নাড়ল, দ্যায়নি। তাইলে এত্ক্ষনে আমাদের গা জ্বলা শুরু হয়ি যেত।

শঙ্খ নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে কিছুক্ষণ। একবার তার মনে হয় জিবটা তিতো লাগছে, গায়েব ভেতর একধরনের জ্বলুনি। তারপর বাড়ি আসতে আসতে মনে হল, নাহ্, ঠিকই আছে। তিতো-ভাবটা কেটে গিয়ে জিবের ডগায় জিরেনরসের মিষ্টি স্বাদ আবার উথাল দিয়ে উঠছে যেন।

এখন সেই মিষ্টি খেজুররস স্বপ্নাদির হাতে তুলে দিতে দিতে তাদের মনে হল, এত কষ্ট করে চুরি করতে যাওয়াটা সার্থক হয়েছে তাদের। নইলে স্বপ্নাদির মুখের এমন চমৎকার হাসিটি কি দেখতে পেত তারা? এত খুশি হয়েছে আজ স্বপ্নাদি—

শঙ্খ বলে উঠল, জানো স্বপ্নাদি, আমার কী যে ভয় করছিল বস চুরি করতি গিয়ে—

স্বপ্নাদি ভুরু কুঁচকে বলল, তোরা চুরি করে এনেছিস নাকি?

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠল পল্টন। কেন, চুরি হবে কেন? এ গাছ তো মরাসোঁতার চরের

ওপর জন্মেছে। তার ওপর তো আমাদের সক্কলের অধিকার।

শঙ্খ তবু বলতে থাকে, ওহ্, সামসের যদি দেখে ফেলত না—

ততক্ষণে স্বপ্নাদি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে শঙ্খদের কষ্ট করে বয়ে আনা রসটির সদ্ব্যবহারে, মহা-উৎসাহে গেলাসে ঢেলে ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করছে খেজুর-রস। কেউ গেলাসটা মুহূর্তে নিঃশেষ করে আবার বাড়িয়ে দিচ্ছে ভরে দেওয়ার জন্যে। স্বপ্নাদি তাকে তাড়া দিচ্ছে, অ্যাই, তোর নোলা বড় কম নয় তো। আগে সবার এক-এক গেলাস হয়ে যাক। তারপর যদি বাঁচে—

তারই মধ্যে একটা গেলাসে রস টায়টায় করে ভরে স্বপ্নাদি বাড়িয়ে দিল শঙ্খর দিকে, এইটে তোর অর্ঘদাকে দিয়ে আয় তো। আর বলবি, পবনের ভূত ধরতে তাকে যেতে হবে না।

শঙ্খ চমকে উঠে তাকাল স্বপ্নাদির দিকে। সে জানেই না, অর্ঘদা পবনের ভূত ধরার মতো এমন একটি আশ্চর্য কাণ্ড করার তাল করেছে, বলতে গেল, তাই নাকি? কিন্তু বলা হল না, কারণ ততক্ষণে অর্ঘদা নিজেই 'হাঁউ মাউ খাঁউ রসের গন্ধ পাঁউ' বলতে বলতে তার ছোট্ট কামরাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। তারপর ভাঁড় প্রায় খালি দেখে হতাশ হয়ে বলে উঠল, বাহ্, আমাকে বাদ দিয়ে তোরা সবাই খেজুররস সাবাড় করে ফেললি!

শঙ্খ তৎক্ষণাৎ তার হাতের গেলাসটা বাড়িয়ে দিল অর্ঘদার দিকে, মোটেই সাবাড় করে ফেলিনি আমরা। তোমার জন্যে আলাদা করে রেখে দিয়েছে স্বপ্নাদি।

—তাই নাকি, ফার্স্ট ক্লাস, বলে এক চুমুকে গেলাসটা নিঃশেষ করতে করতে অর্ঘদা বলল, যাক, তাইলে আমার কথা মনে আছে তোদের।

খালি গেলাসটা অর্ঘদার হাত থেকে নিল শঙ্খ, তারপর বিজ্ঞের মতো বলল, মনে তো আছেই। কিন্তু স্বপ্নাদি কী বলেছে জানো? বলেছে, তোমাকে ওই পবনের ভূত ধরতি যেতি হবে না। এত সাহস মোট্টেও ভালো নয়।

অর্ঘদা অম্লানবদনে বলল, আমি যেখানেই যাই, তাতে স্বপ্নার কী?

সেদিনকার ইছামতী কেলেঙ্কারির পরও বোধহয় অর্ঘদা আর স্বপ্নাদির ঝগড়াটা পুরোপুরি মেটেনি। অর্ঘদা বিগের আসরে আসতেই স্বপ্নাদি মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে। এখন অর্ঘদার শেষকথাটা কানে যেতেই তার মুখটা লাল হয়ে উঠল। চকিতে একবার অর্ঘদার দিকে তাকিয়ে নিয়ে শঙ্খকে বলল, শঙ্খ, তুই বলে দে তো, কে কোথায় গেল না গেল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি সাবধান করে দেবার জন্যেই বলেছি।

অর্ঘদার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, আমাকে সাবধান করার দরকার নেই কারও। এমন জ্যান্ত ভূত ধরার চান্স পেলি কেউ ছাড়ে নাকি?

স্বপ্নাদির মুখ আরও টকটকে হয়ে গেল, বলল, শঙ্খ, বিদ্যের ঢেঁকিটাকে বলে দে তো, ভূত ভূতই, তা কক্ষনো জ্যান্ত হয় না। সে ভূত ধরতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অর্ঘদার আবার উত্তর, শঙ্খ, তাইলে তুইও তোর স্বপ্নাদিকে বলে দিস, আমার গার্জেন আমিই, অন্য কেউ নয়—

বলে পায়ে ধপ্‌ধপ শব্দ তুলে অর্ঘদা অমনি মিলিয়ে গেল তার ঘরের ভেতর। স্বপ্নাদির

মুখ তখন রাগে কাঁই হয়ে উঠেছে। অর্ঘদা ভালো করে লক্ষ করলে বুঝতে পারতো, অন্তত এটুকু সময় স্বপ্নাদি আর বরফের মেয়ে ছিল না। তার শাদাফর্সা মুখ সত্যিই রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল কয়েকমুহূর্তের জন্য।

বেশ অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে থাকার পর স্বপ্নাদি হঠাৎ শঙ্খর দিকে তাকিয়ে বলল, তোর অর্ঘদার খুব ডাঁট, তাই না?

শঙ্খ বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল এতক্ষণে। ক'দিন আগে অর্ঘদাই বলেছিল 'তোর স্বপ্নাদি খুব ডাঁটিয়াল মেয়ে তাই না?' আজ স্বপ্নাদি বলল—

দু'জনের তর্কাতর্কি, রাগারাগির মাঝখানে পড়ে শঙ্খ তখন রীতিমতো চিঁড়েচ্যাপ্টা। অর্ঘদা অমন হুল ফুটিয়ে চলে যেতেই স্বপ্নাদিও মুখ লাল করে ঢুকে পড়ল তার ঘরে, হয়তো শয্যাই নিয়েছে এতক্ষণে। উমনো অবশ্য কী যেন খুঁজে পেল ওদের এহেন অদ্ভুত ঝগড়ায়, মুখ বাঁকিয়ে বলল, বাহ্ শঙ্খ, তুই কি এখন ওদের দু'জনের ঝগড়ায় দূতী হয়েছিস?

শঙ্খর দৌত্য অবশ্য তখনই শেষ হয়ে গেল না। সেদিন বিকেলেই স্বপ্নাদি তাকে ডেকে তার হাতে একটা কাগজ সযত্নে ভাঁজ-ভোঁজ করে দিয়ে বলল, যা তো, তোর অর্ঘদাকে এটা দিয়ে আয়। কেউ যেন দেখতে না পায়। খুব সাবধান।

শঙ্খ একছুট্টে গিয়ে সেটা দিতেই অর্ঘদা পড়তে লাগল বেশ নিবিষ্ট হয়ে। দু একবার মুখের কোণে চিলতে হাসির রেখ্ও দেখতে পেল শঙ্খ। বারদুই কাগজটা পড়ার পর কিছুক্ষণ থম্ হয়ে রইল। তারপর দ্রুতহাতে আর একখানা কাগজে কীসব লিখল ঘস্ঘস্ করে। সেটা বেশ অবহেলার সঙ্গে শঙ্খকে দিয়ে বলল, যা তো, এটা তোর স্বপ্নাদিকে দিয়ে আয়—

সে চিঠি স্বপ্নাদি পড়তে পড়তে আবারও লাল হয়ে উঠল। তবে সে রক্তবর্ণ মুখ যে লজ্জায় নয়, রাগেই—তা বোঝার মতো ক্ষমতা হয়েছে শঙ্খর। কিছুক্ষণ লাল হয়ে বসে থেকে আবার একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল শঙ্খর হাতে। তারপর অর্ঘদাও আর একখানা।

একদিনে এমন তিন-চারবার চিঠি চালাচালি করার পর স্বপ্নাদি চোখ লাল করে বলল, ভীষণ বেইমান, আর কক্ষনো চিঠি লিখব না বলে দিস—

একই বাড়িতে বাস করে এ-ঘরে ও-ঘরে চিঠি লেনদেন করা যায় তা শঙ্খর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। এখন বুঝল, এমন অনেক কথা থাকে যা মুখে বলা যায় না, চিঠিতে লিখতে হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি লিখছে, অথচ দেখা হলেই মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে এ ঘটনাও তার জীবনে সত্যিই ব্যতিক্রমী। শঙ্খ বাড়ি ফিরে পড়ার বইএ মন বসাতে গিয়ে দেখে, কেবলই চোখের সামনে ভেসে উঠছে স্বপ্নাদির অভিমানী রাগ-রাগ মুখখান। অর্ঘদার সঙ্গে স্বপ্নাদির কী হয়েছে? এত রাগই বা দেখাচ্ছে কেন দুজনে? হঠাৎ নাকের লতিতে এক টোকা দিয়ে 'বরফের মেয়ে' বলে অভিহিত করায় এমন কী অভাবনীয় ঘটে গেল যে তার জের আর মিটছেই না!

শঙ্খ বেশ ঝামেলায় পড়ল। আর একদিন পরেই স্বপ্নাদি চলে যাবে, আবার হয়তো সেই একবছর পরে পুজোর ছুটিতে আসবে ঈশ্বরীপুরে, এহেন সময়ে দু'জনের মধ্যে এমন ঝগড়া থাকাটা খুবই অনুচিত। সাতপাঁচ ভেবে শঙ্খ পরদিন সকালে স্বপ্নাদিকে বলল, কী তুমি এত রেগে গেলে যে আর কথাই বললে না এ ক'দিনের মধ্যে?

অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল স্বপ্নাদি। হঠাৎ শঙ্খর কথা শুনে তার চোখে আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল তুমুল রাগ, বলল, জানিস কী লিখেছে আমাকে? লিখেছে, আগে ভেবেছিলাম তুমি ববফের মেয়ে। এখন দেখছি, আগুনের মেয়ে!

শঙ্খ চোখ গোল গোল করে তাকাল স্বপ্নাদির দিকে, স্বপ্নাদির চোখদুটো সত্যিই তখন আগুনের মতো ফুলকি ঠিকরোচ্ছে। অর্ঘদাকে কাছে পেলে হয়তো পুড়িয়েই দিত তার ফণা-তোলা শিখায়।

স্বপ্নাদির কাছে দাঁড়িয়ে তার তাপ টের পাচ্ছে শঙ্খ নিজেই।

সেদিন সন্ধেবেলা ইছামতীর কিনার থেকে ফেরার পথে হঠাৎ এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল অর্ঘদা। কোথায় রাস্তার ধারে এক পুরনো টিনের কানা পড়ে ছিল থে হয়ে, তাতে কিভাবে পা বেধে ডীপ করে কেটে গেল অনেকখানি। অন্ধকারে তেমন ঠাহর হয়নি, বাড়ি ফিরে হারিকেনের আলোয় দেখল, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার পরনের কাপড়। স্বপ্নাদি ছুটে এসে দেখে বলল, এ মা, এ কী করেছে?

অর্ঘদা ব্যাপারটা লুকোতে চেয়েছিল, কিন্তু স্বপ্নাদির চোখে পড়ে যাওয়াতে বেশ হৈ-চৈ হল। একেই অর্ঘদা এরকম রক্তের দৃশ্য সহ্য করতে পারে না, তার উপর নিজের পা থেকেই এত রক্ত বেরুতে দেখে সে কেমন যেন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। স্বপ্নাদি কোত্থেকে গাঁদা পাতা জোগাড় করে তা চিপে তার রস চেপে ধরল ক্ষতের ওপর, রক্ত বন্ধ হতেই একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে ভালো করে বেঁধে গম্ভীরভাবে বলল, পুরনো টিনের কাটা যখন, একটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে। এ.টি.এস।

অর্ঘদা ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ বলল, ইঞ্জেকশন লাগবে না—

স্বপ্নাদি প্রায় ধমক দিয়ে বলল, বলছি লাগবে। পুরোন টিনের কাটা খুব খারাপ। বিষিয়ে যায়—

—বিষোক।

সেদিন রাতে অর্ঘদার বেশ জ্বর এসে গেল। পরদিন সকালেই স্বপ্নাদিরা চলে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু করেছে। ঈশ্বরীপুর থেকে দুটো বাস বদলে শ্যামবাজার, সেখান থেকে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে ওদের। গোছগাছ করতে করতে স্বপ্নাদি আরও একবার হুকুম দিয়ে গেল, ডাক্তারখানায় গিয়ে এখনই ইঞ্জেকশন নিয়ে আসতে। নইলে খুব খারাপে দাঁড়াতে পারে।

অর্ঘদা অবশ্য তার সিদ্ধান্তে অনড়। সে ঈশ্বরীপুরে আসার পর এতদিনের মধ্যে একবারও গঞ্জের দিকে যায়নি। বলা যায়, অন্তরিন হয়ে রয়েছে এই ছোট্ট জায়গাটার মধ্যে। উমনো-ঝুমনোদের বাড়ি থেকে ইছামতীর ধার, খেয়াঘাট পেরিয়ে ওপারের ভেড়ি, কি বড়জোর মরাসোঁতা পেরিয়ে তিন্তিড়িপাড়ার সবুজ মাঠটা পর্যন্ত তার গতিবিধি। স্বপ্নাদির কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল, কী আর হবে। বড়জোর মরে যাব। তার বেশি তো কিছু নয়।

পথে বেরুনোর সময় স্বপ্নাদি হঠাৎ কেঁদেই ফেলল। একসময় শঙ্খকে ডেকে বলল, আমি

বললে জেদ করে আরও যাবেনা। তুই বলে দ্যাখ্ না যদি যায়। পুরনো টিনের কাটা খুব খারাপ।

শঙ্খ আস্তে আস্তে বলল, তুমি কিছু ভেব না স্বপ্নাদি, ঠিক নিয়ে যাব আমি। দেখো—

স্বপ্নাদিরা চলে যাওয়ার সময় সবারই খুব মন খারাপ হয়ে গেল। বলতে কি, স্বপ্নাদিরা সবাই আসে বলেই পুজোর একঘেয়ে ছুটিটা ভারী চমৎকার হয়ে ওঠে তাদের সবাইকার কাছে। ক'দিন খুব হৈ-চৈ, হুল্লোড় করে কাটে। এখন আবার ঈশ্বরীপুর সেই একই রকম, বিবর্ণ, একঘেয়ে, পান্‌সে।

শীতলাতলার কাছে গিয়ে শঙ্খরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল, যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত স্বপ্নাদিদের চলে যাওয়া দেখল ওরা। তারপর মন ভারী করে ফিরে এল বাড়িতে। অর্ঘদা অবশ্য যায় নি। সে চৌকির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শাদা পৃষ্ঠায় কাটাকুটি করছিল অনামনস্কভাবে। কেমন আত্মমগ্ন আর দুঃখী দেখাচ্ছিল তাকে। শঙ্খ কিছুক্ষণ নীল কালির আঁকিবুকি দেখতে দেখতে বলল, ইঞ্জেকশনটা নে এলিই পারতে, অর্ঘদা।

অর্ঘদা সম্বিত ভেঙে বলল, ধুর, আমি কি বাড়ি থেকে বেরোই যে গঞ্জের ডাক্তারখানায় গিয়ে ইঞ্জেকশন নিয়ে আসব। ছেড়ে দে। শঙ্খ হঠাৎ ঝেঁকে উঠে বলল, স্বপ্নাদিরে আমি কথা দিইছি; তোমারে নে যাব বলে। যাবা কি না বলো—

অর্ঘদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, কী আর হবে নির্জিরি নে এতখান ভেবে? যা হোক কিছু এট্টা হলি বেঁচি যাই। ঘরের বাইরে যখন বেরুতি পারিনে, তখন মরে যাওয়াই ভালো রে। সারা জীবন বন্দি হয়ে থাকাই যখন আমার বরাদ্দ।

শঙ্খ ঠিক বুঝতে পারল না, অবাক হয়ে বলল, তাইলে তুমি যে বললে নারানগঞ্জে গিয়ে পবনের ভূত খুঁজবে? সে কী করে যেতে?

অর্ঘদা হাসল, সে তো ওদের পাড়ার ভোদো যাবে শোনলাম। আমার আর যেতি হবে না। তা ছাড়া আমার বেশ জ্বর এয়েছে।

শঙ্খ অর্ঘদার গায়ে হাত দিয়ে দেখল, সত্যিই গা পুড়ে যাচ্ছে তার।

ঈশ্বরীপুরের জেলেপাড়ায় তখন এক অলৌকিক পবনকে নিয়ে ঘোর আলোচনা। পবনের ভূত ধরতে কে যাবে এই নিয়ে অনেক জল ঘোলাঘুলির পর ভোদো রাজি হয়ে গেল যেতে। কালো গুঁটধরনের চেহারা ভোদোর, মাথায় কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তেমন সাহসী না হলেও কথাবার্তায় সে কিছুটা গোঁয়ার। পুণ্যি-বৌ তাকে ধরে ফেলল বেশ করে, যাউ না একবার। যাতায়াত গাড়িভাড়া দেব, খোরাকি দেব, আরও কিছু টাকা নগদ—

কিছুটা টাকার লোভে কিছুটা কৌতূহলে যেতে মন করে ফেলল ভোদো। যে লোকটারে সোঁদরবনে বাঘে নিয়ে গেছে বলে গাঁয়ে চাউর হয়ে গেল, তার শ্রাদ্ধশান্তি হল, বৌ বিধবা হয়ে গেল, সে লোকটারে আবার জ্যান্ত দেখা গেছে শুনে তার মনে হরেক দোনামোনা। যদি সত্যিই পবনরে আবার দেখা যায় নারানগঞ্জে, তাকে কি ফের জ্যান্ত ধরে নিয়ে আসা যাবে!

পুণ্যিবৌ কাকুতিমিনতি করে বলল, মানুষটারে দেখতি পালে নে এসো। বোলো'খনে প্রাচিত্তির হবে। টিকিঅলা বামুনঠাকুর বিধান দে গেছে। কুনো দোষ হবে না।

টাকাপয়সা বুঝে নিয়ে ভোদো রওনা হয়ে যেতে পুণ্যি-বৌ উৎকণ্ঠায় থম হয়ে রইল। তার এতটুকুন জীবনে এ এক আশ্চর্য, অদ্ভুত টানাপোড়েন। সে ভেবে দিশে করতে পারে না, মানুষটা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে গাঁয়ে ফিরবে কি ফিরবে না। যদি ফেরে, তবে পুণ্যিবৌকে এহেন বিধবার সাজে দেখলে কোথায় যে মুখ লুকুবে কে জানে!

শীতের হাওয়া তখন একটু-একটু করে ঈশ্বরীপুরের মাটিতে জানান দিচ্ছে। ভোরের দিকে হিম পড়ছে বেশ। রাতে আর কাঁথাকানি গায়ে না দিলে চলছে না। ভোরে উঠলে ঘাসের উপর ছড়িয়ে থাকে শিশিরবিন্দু। চারপাশে হিম হিম আবহাওয়া। কিন্তু তার চেয়েও বেশি হিম জড়িয়ে গেল পুণ্যি-বৌএর গায়ে। যদি মানুষটা ফিরে আসে—

মঙ্গলা এসে বলল, পুণ্যি, তুই সিঁদুব পর। আমার মন বলছে, লোকটা বেঁচে আছে।

পুণ্যি-বৌএর মন উথালপাথাল হয়। সারা শরীরে তখন চারিয়ে যাচ্ছে এক অদ্ভুত শিরানি। তার ইচ্ছে হয় ফের সিঁথিতে সিঁদুর পরে নিতে। তবু মন থেকে দ্বিধা যায় না, তারপর যদি বেঁচে না থাকে, যদি খড়স্বার জাহের জোলার কথা ঠিক না হয়! কাকে দেখতে কাকে দেখেছে তার ঠিক কি। ববং ভোদো ঘবে ফিরুক। নিয্যাস খবর নিয়ে আসুক। তারপর—

একটা গোটা দিন সে যেন অনেক সময়। দুই বোনে মুখোমুখি বসে কেবল কথার পৃষ্ঠে কথা বোনে। দিন পার হয়ে রাত আসে। সারারাত জেগে জেগে প্রতিটি মুহূর্ত উলিধুলি করে দু'জনে। একটা গোটা মানুষ হঠাৎ হারিয়ে গেল আচমকা, সে যদি ফের ফিরে আসে, তাহলে কতটা অদলবদল হয়ে যায় আর একটা মানুষের জীবন! পুণ্যিবৌ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সিঁদুর-কোটোটা বুকবুক করে রেখি দিইছিলাম, দিদি। প্রাণ ধরি ফেলতি পারিনি।

মঙ্গলা বলল, তোর পয় আছে পুণ্যি, নইলে আমার মানুষটারও তো অপঘাতে মৃত্যু। অমন জোয়ান মানুষটা মাছ ধরতি গেল, আর ফিরি এল না—

পুণ্যি-বৌ বলল, আমি তারে স্বপন দেখিছি, দিদি, আমারে বলতিছিল, পুণ্যি, বেধবা মানুষের কাছে কী করি যাই বল দিকিনি?

মঙ্গলা বলল, তুই আবার সিঁদুর পর—

কথা বুনতে বুনতে গোটা রাত পার হয়ে যায়। রাত পরে হয়ে ক্রমে পৃথিবী ফর্সা হয়ে আসে ফের। সারারাত হিম-পতনের শব্দ শুনতে শুনতে স্বপ্নের জাল যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওদের সামনে। এক দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাত কেটে গিয়ে একসময় সকাল হয়। যত সময় গড়ায় প্রতিটি মুহূর্তই যেন ভারী হয়ে চেপে বসে দু'বোনের মনে। সকাল থেকে দুপুর, সেও যেন একযুগ।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল, তাও এক অনন্ত প্রতীক্ষার কাল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুণ্যিবৌ একসময়

বলল, কী হল দিদি, ভোদো তো ফিরল না এখুনো—

মঙ্গলার বাঁ-চোখের পাতা হঠাৎ তিরতির করে কেঁপে ওঠে, দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে বলল, ফিরবে, ফিরবেনে ঠিক। আর এট্টু সবুর স, পুণ্যি।

তারপর ফের রাত আঁধার হয়ে আসে ক্রমশ। ঈশ্বরীপুরের বুকে গাঢ় হয়ে জমতে থাকে মিশ অন্ধকার। দুইবোনে থম্ হয়ে বসে আছে খড়ের চালের ঘরে, কুপী জ্বেলে। বাইরে খুট্ করে একটু শব্দ হলেই দু'জনে একবুক আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে ঘরের দরজা খোলে। কাউকে না দেখে আবার দরজা ভেজিয়ে বসে পড়ে, বড়ো করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে মুহূর্তের শরীর গোনে।

তারপর একসময় নারানগঞ্জ থেকে তাদের গাঁয়ে সত্যিই ফিরে এল ভোদো। তখন অনেক রাত। ঘুমে ঢুলছে জেলেপাড়া, এমন সময় ভোদো এল। তার খালি পায়ে তখন ধুলোভর্তি। ভারী লাগছে পা-দুটো। ভারী হয়ে রয়েছে তার মন ও শরীর। মুখ শুকনো, ফ্যাকাসে। সেদিন জেলেপাড়ায় শুধু পুণ্যি আর মঙ্গলাই অপেক্ষায় ছিল তা নয়, অপেক্ষায় রয়েছে গোটা পাড়ার মানুষ। ভোদোকে দেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, কী হল, ভোদো, কী দেখলি? খবর ভালো?

ভোদো মাথা নাড়ে, খবর ভালো নয়।

ভাল নয় শুনে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে গোটা পাড়ার মানুষের মনে, কেন রে ভোদো, পবন বেঁচে নেই? তারে দেখতি পালিনে?

ভোদো মাথা নাড়ে, বেঁচে আছে, তবে আসবে না—

বেঁচে আছে শুনে একটা অন্যরকম বিস্ময় ও উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছিল সবাইকার মনে। পরের কথায় হতাশ হয়ে বলল, কেন? আসবে না কেন? আতারপুরের বামুন তো প্রাচিত্তির করি দিবে বলে গেল।

ভোদো ফের মাথা নাড়ে, তা'লেও আসবে না, তার আর আসার জো নেই। সে ওখেনে—

সবাই তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ভোদোর ওপর, কী হয়িছে ওখেনে?

ভোদো খানিক ইতস্তত করে। এমন ভয়ঙ্কর খবরটা কীভাবে সে বলবে সবার কাছে ভেবে পায় না। এর চেয়ে পবনের মৃত্যুসংবাদ বয়ে আনাই বোধহয় তার পক্ষে ঢের স্বস্তির ছিল। মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, পবনদা ওখেনে আর এট্টা বে করিছে। সেখেনে বৌ নে থাকে।

কথাটার ভেতর এমন একটা আকস্মিকতা ওতপ্রোত হয়ে ছিল যে প্রথমমুহূর্তে সবাই বোবা হয়ে যায়। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একরাশ স্তব্ধতা নেমে আসে। পবন বেঁচে আছে কি নেই সে আশঙ্কা কেউ-কেউ মনের ভেতর পোষণ করলেও সে যে আর একটা বিয়ে করতে পারে এমন কথা ভাবেইনি কেউ।

একগলা স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ মঙ্গলার গলা ঝনঝন করে বেজে উঠল, বে করবে না কেন? জ্যান্ত মানুষটারে তোমরা সবাই যড়্ করি মেরি দিলে। বৌটারে বেধবা সাজালে। তবে তার আর অপ্‌রাধ কোথায়?

কথাগুলো মাছ-ধরা বল্লমের মতো গিঁথে গেল চারপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়া মাছমারাদের

মুখে—সেই সব মাছমারা যারা পবনকে গহন জঙ্গলে বাঘের মুখে রেখে নোঙরের দড়ি খুলে দিয়েছিল। একবুক আঁধারের মধ্যে আরও গভীর স্তব্ধতা গহন হয়ে নেমে এল সহসা।

কিন্তু ভোদো তখন মাথা নাড়ছে, উঁহু। আমি শুনি আলাম অন্যরকম। পবনদা নাকি আগে থে ভাব-ভালোবাসা করিছিল মেয়েলোকটার সঙ্গে। সে-ই আগে থে ষড় করি রেখিছিল তারে নে পলাই গে বে করবানে। তারপর সমুদ্দুর থে ফেরার পথে কোঁচড়ে কড়কড়ে পাতি নে ওর'মভাবে জঙ্গলে নেমি পলাই যায়। যাতি কেউ বুঝতি না পারে। যাতি কেউ সন্দ করতি না পারে।

—তাই! বেটা তা'লি ভেতরে ভেতরে ওর'ম ষড় করিছিল? তৎক্ষণাৎ সমস্ত গাঁ থেকে একটা ছিছিক্কার লাফিয়ে উঠে হামড়ে পড়ল পুণ্যি-মঙ্গলাদের ঘরের চালে। ছি, ছি, পবন তা'লি ওর'ম? পুণ্যি-বৌ তার মানুষটারে ঘরে ধরি রাখতি পারল না!

সেই ছিছিক্কার অজস্র সূচীমুখ হয়ে বিদ্ধ করতে লাগল দুইবোনের বুকে। পুণ্যি-বৌ সে যড়ের খবর শুনে থম্ মেরে যায়। তার পা-জোড়া নিথর হয়ে গিঁথে যায় মাটির সঙ্গে। তার জিব শুকিয়ে আসে। বিধবা থেকে ফের তার সধবা হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, হয়তো তাই এমন অসহনীয় লজ্জা পাহাড় হয়ে চেপে বসল তার মাথায়। একঘর লোকের মাঝখানে হঠাৎ তাকে যেন উদোম করে দিয়ে গেল এক ভয়ঙ্কর এলোঝড়। আর মঙ্গলার কারোয়ানি গলা বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। সে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পুণ্যির দিকে। পুণ্যি কি একবারও বুঝতে পারেনি তার মানুষটা ভেতরে ভেতরে এমন যড়ের ভেতর জড়িয়ে পড়েছে!

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল পুণ্যি-বৌ, এর চেয়ে বেধবা হয়ে থাকাই তো ভালো ছেল, দিদি—

সে কান্নার সুর চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগে গোটা জেলেপাড়ায়। সারারাত হিমপতনের শব্দের মতো তার ফোঁপানি-ডোক্‌রানি এঁকেবেঁকে ঠোনা মেরে যায় ঈশ্বরীপুরের মাটিতে।

সারা ঈশ্বরীপুর হিম হয়ে যায় বিস্ময়ে।

সহসা ঈশ্বরীপুরের হাওয়ায় হিম গাঢ় হয়ে নামতে শুরু করে। সবুজ দুব্বোঘাসের উপর চকচক করতে থাকে সারারাত ধরে জমে থাকা ফোঁটা ফোঁটা শিশির। ভোরের বেলা তার গায়ের মহিষ-রং সুতিচাদরটা আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে নিতে শঙ্খ দেখতে পায়, সামনের একবিঘের ফালি জমিটার কোণে এসে দাঁড়িয়েছে সোলেমান। এই হাড়হিম শীতেও তার গায়ে

একটা মাত্র পল্‌কা গেঞ্জি। পরনে সেই চেককাটা নীল লুঙিটা। তাতে হি হি করে কাঁপছে সোলেমানের উনিশ বছরের ডাঁটো শরীর।

আনন্দ চাটুজ্জের একবিঘে জমিটায় বর্ষার ফলন তেমন ভালো হয়নি এবার। বৃষ্টিবাদ্‌লা মন্দ হয়নি এ বচ্ছর, তবু ম্যাস্তাপাটের গোড়ায় ঘাসের জঙ্গল, গুল্মলতা জড়িয়ে গিয়ে হঠাৎ কেমন দরকচা মেরে যায়। তাতে ম্যাস্তার বাড় না হওয়াতে মৈনুদ্দির ডাহা লোকসান। সে-ফসল কেটে নিয়ে মাঠে এবার মটরের চাষ দিয়েছে সোলেমানের বাপ।

জমিটায় মটর বোনায় অবশ্য শঙ্খদের উল্লাসই বেশি। পল্টন তো চেপে রাখতে পারল না তার মনের গোড়ায় উথলে ওঠা হুরুষ। বলল, সকাল-বিকেল রুটি খেয়ি খেয়ি অরুচ্‌ ধরি গেছে জিবি, এবাব থে মটরশুঁটি খেয়িই পেট ভরাবো।

সে-কথা মৈনুদ্দির কানে গিয়েছে কি না তা শঙ্খরা জানে না, তবে যখন ফালি জমিটায় মটর চারা মাথাচাড়া দিয়ে সবুজ গাল্‌চের মতো দেখাচ্ছে, সেসময় মাঠের কোণে শঙ্খদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মৈনুদ্দি বলেছিল, বাবারা, তুমরা গাছগুলো এট্টু দেখ্‌ভাল কোরো। চারপাশ থে উচ্চিংড়ের দল এসে মাঠে হামলে না পড়ে।

পল্টন তৎক্ষণাৎ ঘাড় অনেকখানি কাত্‌ করে ভালোছেলের মতো মুখ করে উত্তর দিয়েছিল, সে আর বলতে চাচা। দেখে নিও, একখানা উচ্চিংড়েও মাঠের ধারেকাছে ঘেঁষতি পারবে না।

মৈনুদ্দি তাতে খুশি হয়ে বলেছিল, মটরশুঁটি হলি একদিন তুমাদের খাতে দে আসবো'খন।

মৈনুদ্দি মাঠ ছেড়ে চলে গেলে পল্টন মাটিতে একখানা ডিগবাজি খেয়ে বলেছিল, দেখে নিস্‌ শঙ্খ, কারুক্কে ঘেঁষতি দেব না মাঠে। সব আমরা একাই গেলব। যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক।

শীত একটু পেকে উঠতে সেই লতানে মটরচারা মাঠে দ্যাখ্‌দাখ্‌ করে ডাগর হয়ে উঠেছে। আকারে মটরশুঁটিগুলো হয়েওছে বোম্বাইসাইজের। একখাব্‌লা গাছ তুলে আনলে খোসা ছাড়িয়ে মটরদানা খেতে খেতে বেলা ফুরিয়ে যায়। আর কচি-কচি মটরদানার যে কী-ই স্বাদগন্ধ!

যখন মৈনুদ্দি কিংবা সোলেমান দিগরে থাকে না, তখন পল্টন তো চোখের পলকে খাবলা করে মটরগাছ তুলে আনেই, আবার যখন ওরা থাকে, তখনও ফের ভালোছেলের মতো মুখ করে গিয়ে বলে, তোমার মাঠ কিন্তু আমরা পাহারা দিইছি। দ্যাও, একখাব্‌লা দ্যাও দিকিনি, খাই—

আজও সোলেমানকে মাঠের কোণে দেখতে পেয়ে শঙ্খর পড়া মাথায় উঠল। বইখাতা বন্ধ করে পায়ে-পায়ে গিয়ে দাঁড়াল সোলেমানের কাছে, কী সোলেমানদা, কেমন আছ?

অন্যদিন সোলেমানকে কেমন শুকনো-শুকনো লাগে। বিশেষ করে তাকে বিয়ে দেবে বলে ঘুরোতে ঘুরোতে যখন তার বাপ নিজেই একটা কচিমেয়েকে বে করে আনল, তারপর থেকে আরও বিষন্ন দেখাত তাকে। আজ কিন্তু কী কারণে যেন তার মুখখানা ঝলমল করছে। শঙ্খকে দেখে ঠোঁটের কোণে হাসি বিস্তৃত হল খানিক, ভালো, তুমি?

সোলেমানের হাসি দেখে শঙ্খর বুকে আশার সঞ্চার হয়। মেজাজ ভালো থাকলে আজ একটু বেশি করে মটরশুঁটি পাওয়া যাবে নিশ্চিত। এখনও নিশ্চয় পল্টনের চোখে পড়েনি

সোলেমানকে। নজরে পড়লেই সে দৌড়তে দৌড়তে এসে হামলে পড়বে মাঠে, কই, দ্যাও, বেশি করে দ্যাও। বলতে বলতে নিজেই বড় এক খাব্‌লা তুলে নিয়ে শুঁটির খোসা ছাড়িয়ে হাউঁহাঁত করে গিলতে শুরু করবে। সে একাই বেশি করে নিলে অন্যদের দেওয়ার সময় হাত টান করবে সোলেমান। তারপর ওদিক থেকে টুপুর ছুটে আসবে, উমনো-ঝুমনোও না আসে এমন না। হয়তো টাপুরদাও এসে পড়তে পারে। কোনও কোনওদিন মণিকাকাও এসে যায়।

আজ সবার আগে চলে এসে তাই প্রথম চোটেই বেশি করে বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা শঙ্খর।

সোলেমানের কালো মসৃণ কপালটা বেশ চকচক করছে আজ। চুলও অন্যদিনের মতো তেমন উস্কখুস্ক নয়। বরং এই সাতসকালেই কেমন আলবোট কেটে আঁচড়ানো। গায়ের গেঞ্জিটাও আগের মতো তেলচিটে তো নয়ই, বরং নতুন কেনা বলে মনে হচ্ছে। সব মিলিয়ে আজ যেন অন্য সোলেমান। সোলেমানের এই আকস্মিক পরিবর্তন চমৎকৃত করল শঙ্খকে, হেসে বলল, কী চেহারা হয়েছে মটরশুঁটিগুলোর, দেখেছ সোলেমানদা?

সোলেমান তার চোখ স্বপ্নালু করে তাকিয়ে থাকে গোটা একবিঘে জুড়ে জমজম করতে থাকা শুঁটিগাছের দিকে। মাঠময় এখন নরম নধর সবুজের এক দুর্দান্ত সমাহার। সেই দৃশ্যের ভেতর লীন হয়ে চমৎকার করে হাসল, হ্যাঁ, বেশ ডাগরডোগর চেহারা হয়িছে—

বলে হঠাৎ ফিক করে হাসল সোলেমান, বলল, ঠিক আমার নোতন-মায়ের মতো।

শঙ্খ চমকে উঠল যেন। ক'দিন আগেই সোলেমান ভীষণ মনমরা হয়ে এসে বসেছিল জমিটার কোণে। শঙ্খকে দেখে বলেছিল, কোথায় নোতন-মা আমার বৌ হবে, তা নয়তো বাপ তারে বে করি আনল। অমন বাপের মুখে—

শঙ্খ সে-কথা স্মরণ করে বলল, তোমার নোতন-মারে বুঝি খুব ভালো দেখতি?

সোলেমানের কলো চকচকে মুখে ঝলমল করে ওঠে একরাশ প্রসন্নতা। খুব উৎসাহিত দেখাল তাকে, খু-উ-ব। এক্‌বারে আসমানের হুরিপরীদের মতোন।

—তাই? তোমার সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে বুঝি?

সোলেমান আগের মতো ভরাট গলায় টেনে টেনে খুশিয়াল গলায় বলল, খু-উ-ব। কী যে সো-ন্দ-র!

—তাই নাকি? শঙ্খ ভারী খুশি হল কথাটা শুনে। তার মা এখানে থাকে না, থাকে অনেকদূরের সেই সাগরদ' গাঁয়ে। তাই মা না থাকার অভাব সে যেন একটু-একটু বুঝতে পারে। বিশেষ করে সাগরদ' থেকে ঘুরে আসার পর বেশ ক'দিন মায়ের অভাব যেন আর বেশি করে অনুভব করে। সোলেমানেরও ছোটবেলা থেকে মা নেই, সোলেমানের নিজের মা মরে যাওয়ার পর তার বাপ যাকে বিয়ে করে এনেছিল তার চিল-চিৎকারে এখন বাড়ির দিগরে কাকপক্ষি ঘেঁযতে পারে না। সে মা থাকাও যা, না-থাকাও তাই। সেই মা-হারা সোলেমানকে যদি তার নতুন-মা খুব ভালোবাসে, তাহলে কি যে ভালো হয়। শঙ্খর চোখে উথাল দিয়ে ওঠে খুশির ঝিলিক।

সোলেমানের চোখেও তখন শুঁটিবাগানের নরম সবুজ স্বপ্ন মাখানো। সেই স্বপ্নে ওতপ্রোত

হয়ে হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, জানো, নোতন-মা'র সঙ্গে আমার খুব আসনাই হয়েছে।

শঙ্খ ততক্ষণে সবুজ শুঁটিবাগানের ভেতর বসে পড়েছে জাব্‌ড়ি মেরে। কথা বলতে বলতে তার মুখও চলছে, এক-একটা করে শুঁটি ছিঁড়ছে মটর-লতা থেকে, আর খোসা ছাড়িয়ে শাঁসালো দানা মুখে ফেলছে টকাটক। নরম দানার স্বাদ জিব থেকে কণ্ঠনালীতে. সেখান থেকে রক্তের ভেতরে চারিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ আসনাই শব্দটায় গিয়ে ঠেক খেয়ে গেল। এ শব্দটা তার কছে কেমন নতুন।

—আসনাই!

—হ্যাঁ, সোলেমানের কালো চকচকে মুখ সহসা কেমন বাদামিবর্ণ ধারণ করল, কী সোন্দব যে দেখতি নতুন মা-কে তা কি করে বলি। ঠিক ওই টগরের মতোন—

মুহূর্তে শঙ্খর মনে টগরের মুখখানা ভেসে উঠল, অবাক হয়ে বলল, ওর'ম ফর্সা?

উঁহু, সোলেমান হাসতে হাসতে ঘাড় নাড়ল, ফরসা না! শামলা রং, কিন্তু লাল-লাল দেখতি লাগে, অনেকটা ঠিক মোরগফুলের মতোন। তবে টগরের পারা ডাগরডোগর চ্যায়রা। আর কী নরম তার গা!

শঙ্খর ভুরুতে কোঁচ পড়ে। সোলেমানের কথাগুলো আজ যেন কেমন-কেমন। নতুন-মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঘনঘন মুখের রং বদলে যাচ্ছে সোলেমানের। বদলে যাচ্ছে তার গলার স্বর। এ সোলেমান যেন শঙ্খর ঠিক পরিচিত নয়। তা ছাড়া ওই আসনাই শব্দটা! সেটাও যেন কেমন অন্যরকম। শঙ্খর এই দশবছর বয়সের অভিধান ঘেঁটে তার মানে খুঁজে পেল না।

নরম মটরশুঁটির স্বাদে-গন্ধে চনমনে হতে হতে শঙ্খর ভেতর-শরীরটা হঠাৎ শিরিয়ে উঠল যেন। যে সোলেমানকে এতদিন ধরে সে দেখেছে এ সোলেমান যেন সে সোলেমান নয়। কয়েক দিনের মধ্যে আমূল বদলে গেছে সে।

শীতের ভোর তখন একটু একটু করে সোনা ছড়াচ্ছে পৃথিবীর মাটিতে। সে সোনার কিছু কুচি আল্‌গাভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে সোলেমানের চোখমুখ। ক'দিন আগেই সে হাহাকার করেছিল, তার বাপ তাকে বে দেবে বলে কেবল ঘোরাচ্ছে। বাপকে গালি দিয়েছিল কতবার। এখন তার বাপ নিজেই বে করে এসেছে ফের, তাতে সোলেমানের দুঃখ তো হয়ইনি, উপরন্তু তার চোখমুখে উপচে পড়ছে হাজার হুরুয।

সে হুরুয আরও ছড়িয়ে পড়ল তার আনমনা হাসিতে, হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, জানো সেদিন কী হয়িছে। হঠাৎ নোতন-মা বলল, ও ছেলে, আমারে পুজো দেখতি নে যাবা রথতলার মাঠে? বললাম, নে যাবানে। সন্‌ঝেবেলা। তো দেখি সন্‌ঝের পর কী সেজেগুজে তোয়ের হয়িছে পুজো দেখতি যাবে বলে। তা বলল, বাপকে বোলোনি যে পুজো দেখতি গিইছি। হিঁদুদের পুজো দেখতি গিইছি শুনলি গোসা হবে। তো সেদিন দুজনে মিলি ঘুরি ঘুরি খুব পুজো দেখা হল। রথতলা, বোষ্টমপাড়া, আতাবপুর অবদি ঘুরে আলাম। রেতে ফেরবার পথে কী করল জানো! একটু নিরিবিলি পেতি রাস্তার পাশে নে গে আমারে জড়াই ধরল, তারপর সারামুখে চুমকুড়ি খেতি খেতি বলতি লাগল, ও আমার সোনা ছেলে. ও আমার বড় ছেলে, তুমি খুউব

ভালো। কত পুজো দেখাইছ আজ। বুঝতি পারলে, কী রকম গা না নোতন-মা'র—

শুনতে শুনতে শঙ্খর সমস্ত শরীর কী এক অদৃশ্য স্পর্শে শিরশির করে ওঠে। যেন সোলেমানকে নয়, তার নোতন-মা শঙ্খকেই জড়িয়ে ধরে সারা মুখে চুমকুড়ি দিচ্ছে। সোলেমানের মুখ জুড়ে তখন উপছে পড়ছে সোনালি আলোর ছটা। সেই সোনা-সোনা রোদ এক অদ্ভুত খুশির ঝিলিক হয়ে যেমতো ঠিকরে পড়ছে, সেই ঝিলিক স্পর্শ করছে শঙ্খর মুখেও। নিজের মুখখানা দেখতে পাচ্ছে না শঙ্খ, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছে সোলেমানের শরীর-জোড়া হুরুষ কী অলৌকিকভাবে চারিয়ে যাচ্ছে তার শরীরেও। তার হাতের মুঠোয় তখন ধরা মটরগাছের নধর লতপাতার গুচ্ছ, তার জ্বিব তখন সবুজ শুঁটির নরম স্বাদে ওতপ্রোত, তার শরীরে তখন খেলা করছে সোলেমানের নতুন-মা'র চুমকুড়ি।

পরক্ষণেই শঙ্খর মনে হল, এই গা-শিরশির অনুভূতির মধ্যে কোথাও একটা নিষিদ্ধ ব্যাপার আছে যা ভাবা বা অনুভব করা পাপ।

পাপ শব্দটা দ্রুত বিদ্যুতের মতো খেলা করে গেল শঙ্খর শরীরে। তার জিবের মটরদানা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কণ্ঠনালীতে ঢোকার মুখে। যে সবুজ লতাপাতার মিঠেন গন্ধে এতক্ষণ ওম্ হয়ে ছিল তা এখন স্বাদহীন হয়ে গেল মুহূর্তে। সোলেমানের চোখ জুড়ে যে আমোদ লীন হয়ে আছে তা যেন অশালীন, তা যেন নিষেধের বেড়া টপকানো কোনও বিশ্রী অভিব্যক্তি।

শঙ্খ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো সেই সবুজ মটরশুঁটির পৃথিবী ছেড়ে। হঠাৎ তার শরীরে চারিয়ে গেল যে নিষিদ্ধ পাপ তা এক্ষুনি ধুয়ে ফেলা দরকার। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, সোলেমানদা, আমি যাই।

সোলেমান তার স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ তুলে বলল, আর খাবা না?

—না, পড়া ফেলি উঠে এইচি কিনা।

সেইমুহূর্তে শঙ্খর চোখে পড়ল তাদের বসতের দিক থেকে ডাকাবুকোর মতো প্রবল গতিতে দৌড়তে দৌড়তে আসছে পল্টন। এই হিমভোরেও তার গায়ে চাদর নেই, কেবল ফ্লানেলের জামা একটা। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে শঙ্খর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে বলল, আমারে না ডেকে শুঁটিবাগানে চলে এইচিস যে বড়ো!

শঙ্খ অপ্রস্তুত হয়ে হাসার চেষ্টা করল, এই তো, এইমাত্তর এইচি আমি।

পল্টনের অবশ্য সে-কথা শোনার আর অবসর নেই। সে হামলে গিয়ে পড়েছে মটরগাছের ভেতর। দ্রুত শুঁটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে খোসা ছাড়াচ্ছে, আর গালে ফেলছে কপাকপ। এক-এক মুঠো ভর্তি করে শুঁটি পুরছে মুখের ভেতর, যেন বেশি দেরি হলে ফুরিয়ে যাবে। কিংবা অন্য কেউ এসে ছিনিয়ে নেবে তার শুঁটির সম্ভার।

সোলেমান তার কাণ্ডভাণ্ড দেখে হাসছিল। আজ তার মেজাজ ভারী চমৎকার হয়ে আছে। যেন হঠাৎ রাজার ঐশ্বর্য কুড়িয়ে পেয়ে সে এখন একজন বড়লোক মানুষ। হাসতে হাসতে বিড়বিড় করে তার ঠোঁট, ন্যাও, যত লাগে ন্যাও—

শঙ্খর তখন আর সে দৃশ্য দেখার ফুরসত নেই। দেখতে পেল, দূরে তার ঠাক্‌মা ইতি-

উতি খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছে শুঁটিবাগানের দিকে। নিশ্চয় শঙ্খর খোঁজেই। শঙ্খকে ঠাহর করতেই গলা উঁচিয়ে চেঁচালেন, ও-ই, ড্যাক্‌রা, তোর দাদু যে তোরে তখন থিকে খুঁজতি লেগেছে। ভোরে উঠে পড়া নেই শোনা নেই, মটরশুঁটি খেতি হামলে পড়িছিস? সামনে একজামিন, সে খ্যাল নেই? দাদু যে লাঠি নে আসচে—

বগলে সাপ্‌টে ধরা শুঁটিগাছের পাঁজা শঙ্খ ফেলে দিল ঝপ্‌ করে। তারপর দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল তাদের বাড়ি পেছনদিকপানে। পেছন দিয়ে লুকিয়ে চুরিয়ে এখন বাড়ির ভেতর ঢুকতে হবে তাকে। তারপর যেন কিচ্ছুটি জানে না এমন ভালোছেলের মতো মুখ করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে হবে বাবরের ভারত আক্রমণ কিংবা আকবরের রাজত্বকাল।

অ্যানুয়াল পরীক্ষার ঠিক সম-সম সময়ে প্রতিবার কোনও না কোনও অসুখ এসে শঙ্খর গায়ে হামলে পড়ে। গতবছর হয়েছিল প্যারা-টাইফয়েড, তার আগের বছর গাল-গলা ফুলে মাম্‌স্‌, তার আগের বছর বুকে সর্দি বসে গিয়ে একেবারে শয্যাশায়ী। এ-বছর শীত জম্পেশ করে পড়তেই ঠাক্‌মার বকবকানি শুরু হয়ে যায়, ঠাণ্ডা লাগবে গায়ে, চাদরের খুঁটটা মাথায় দে রাখলি ঠাণ্ডা আর কাছে ঘেঁষতি পারবে না। বিকেলে সোয়েটার না পরে একদম বেরুবি নে।

শঙ্খ একটু শীত-কাতুরেও অবশ্য, কিন্তু চাদরের খুঁটো মাথায় দিতে তার ভারী আপত্তি। উমনো-ঝুমনো দেখলেই খেপাতে শুরু করবে অমনি, কী রে শঙ্খ, বৌ সেজিছিস নাকি রে।

কিন্তু খুঁটো মাথায় না দিলে কান দিয়ে হু-হু করে ঢুকে যায় উত্তরের হাড়হিম হাওয়া। পৌষের কাঁপ-ধরানো ঠাণ্ডা দু-একবার তাকে ধরব-ধরব করেও অল্পের জন্য ছাড় দিয়ে গেল। তাতে শঙ্খ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এ-বছরও যদি তাকে অসুখে ধরে, আবারও রেজাল খারাপ হবে নির্ঘাত।

পরীক্ষার আগে শুধু অসুখ বিসুখের বিপত্তিই যে শঙ্খর একমাত্র ভয় তা নয়। পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে সে আরও একটা দুশ্চিন্তায় নীল হয়ে যায়। প্রতিবারের মতো এবারও ইস্কুলে নোটিশ জারী করা হল এই মর্মে যে, পরীক্ষার পনেরদিন আগেই ফি জমা দিয়ে দিতে হবে। তার পরীক্ষার ফি একটাকা পঁচিশ নয়া-পয়সা, দু'ক্লাস ওপরে পড়ে বলে মণিকাকার ফি একটাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা। নোটিশটা পড়েই শঙ্খর মুখখানা ছোট্ট হয়ে গেল। নোটিশ বোর্ডের টাইপ-করা কালো-কালো অক্ষরগুলো এখন ঠাকুর্দার কানে কীভাবে পেশ করা হবে, কে-ই বা বলবে তা নিয়ে মণিকাকার সঙ্গে আলোচনা হল বহুক্ষণ।

সেদিন সন্ধের পর শঙ্খই ভয়ে-ভয়ে পাড়ল কথাটা। ঠাকুর্দার কানে সে ক'টা অক্ষর গরম

সিসের মতোই সেঁধুল মনে হল। টাকার হিসেব করে মাথাটা ঘুরে গেল তাঁর, পাঁচসিকে আর দেড়টাকা, তার মানে দু'টাকা বারোআনা। ও বাবা, এখন অতটাকার জোগাড় হবে কোথ্ থেকে। এই সেদিন চালের সের ছিল ছ'আনা, এর মধ্যি ন'আনা হতি চলল। দু'বেলা খোরাকির চাল জোগাড় করতিই বলে হয়রান হয়ি যাচ্ছি। আর এখন হারামজাদারা পরীক্ষার ফি চায়—

পরীক্ষা এলে শঙ্খর প্রতিবার এই এক ভাবনা। ফি দিতে হবে ভাবলে সে ভারী মুষড়ে পড়ে, মাথাটা তারও ঘুরে যায় যেন। উদ্বাস্তু হওয়ার সুবাদে ইস্কুলে বেতন দিতে হয়নি আজ পর্যন্ত, কিন্তু বছরে দু'বার পরীক্ষার ফিস মকুব হওয়ার কোনও উপায়ই নেই। তাদের হেডমাস্টার ফিস জমা না দিলে পরীক্ষায় বসতেই দেবেন না।

কিছুক্ষণ থম্ হয়ে থাকার পর ঠাকুর্দা আবার বললেন, ব্রজটা তবু আগে মাস গেলি কুড়িটা তিরিশটা ক'রে টাকা পাঠাতো, আজ ক'মাস হল তাও দেয়া বন্ধ করে দিয়েচে। আমি এখন তার ছেলের পড়ার খর্চা কীর'মভাবে জোগান দি?

কথাটা শঙ্খকে উদ্দেশ্য করেই বলা। শঙ্খ তখন ভুষোকালিমাখা চিমনির আলোয় তার পরীক্ষাব পড়ার ভেতর সেঁধুতে চেষ্টা করছে। হারিকেনটা এত পুরনো হয়ে গেছে যে তাতে ভালো করে পলতে ওঠে না। যদিও বা অনেক কষ্টেসৃষ্টে পলতে ওঠানো গেল, দেখতে দেখতে কালি পড়ে যাচ্ছে চিমনিটায়। রাত্তিরে পড়ার এই এক ঝামেলা। যেদিন কেরাসিন থাকে, সেদিন গোলমাল করে পলতে কিংবা চিমনি। আবার কোনও দিন কেরাসিনের অভাবে নিবু-নিবু হয়ে যায় পলতে। সেদিন যতবার পলতে বাড়াতে চায়, ততবার আলোর তেজ একটু বেড়ে আবার নিভে আসতে থাকে। আজও এহেন হারিকেনের সঙ্গে যুদ্ধ করার মধ্যে আবার ঠাকুর্দার কথাগুলো কানে ঢোকে তার। শব্দগুলো মগজে তীক্ষ্ণ সুঁচের মতো ঢুকে যায়। তার বাবা হঠাৎ কী কারণে যেন অনেকদিন হল মাস-মাস টাকা পাঠাচ্ছেন না। এই টাকাটা এতদিন বড়ো বলভরসা ছিল জীবেন্দ্রনাথের। হঠাৎ সেটা বন্ধ হতে তা নিয়ে প্রায়ই আফসোস করেন। এখন পরীক্ষার ফিসের প্রসঙ্গ উঠতেই আবার একরাশ বাক্যবাণ এসে আছড়ে পড়ল শঙ্খর উপর।

শঙ্খ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে, একমনে গুনগুন করে মনসংযোগ করার চেষ্টা করে তার পাঠ্যপুস্তকে। তারপব আস্তে আস্তে গলার জোর একটু বাড়ায়। তার একটু পরে আরও জোরে জোরে পড়ে। কণ্ঠস্বর একটু তীব্র করে তুললে পড়ায় বেশ মন বসে যায় তার। আপাতত ফিজের কথা ভুলতে জোরে জোরে পড়াই শ্রেয়।

সে বুঝতে পারে, কীইবা আর করবেন ঠাকুর্দা। খরচ বেড়েই যাচ্ছে রোজ। চারপাশের এত অভাবের মধ্যে পরীক্ষার খরচ তাঁর কাছে একটা বোঝার মতো মনে হয়। কয়েকদিন এই বোঝাটা চেপে থাকে শঙ্খর কাঁধেও। তারপর দিনের দিন কোত্থেকে যেন টাকাটা জোগাড় হয়ে যায় ঠিক। ঠাকুর্দা সকালে কোর্টে বেরুবার মুখে তাঁর শার্টের ঝুল পকেট থেকে একগাদা রেজগি বার করে গুনে গুনে দু'জনের ফিজের টাকা বাড়িয়ে দেবেন শঙ্খ আর মণিকাকার দিকে। দু'জনেরই তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে যেন। এ ক'দিন ভয়ের একটা কাঁটা সর্বক্ষণ দু'জনকে বিঁধে ছিল। ফিজ না দিতে পারলে হেড্মাস্টার সুরেশবাবু নির্ঘাত অ্যাডমিটকার্ড দিতেন না।

পরীক্ষার ফিজ হাতে পেতে শঙ্খরা পরদিন থেকে আরও জোরে জোরে পড়তে শুরু করে। প্রতিদিন আরও ভোরে তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে থাকেন ঠাক্‌মা। ঘুম থেকে তড়াক করে উঠেই মুখহাত ধুয়ে চাটাই বিছিয়ে বসে পড়ে ঘরের দাওয়ায়। আস্তে আস্তে খেলাধুলোয় ঢিল দিতে হয়। আগানে বাগানে টইটই করে ঘোরা বন্ধ হয়ে যায়। বইএর পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যে সমর্পিত হয়ে যায় তাদের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। তাদের সমস্ত পৃথিবী হয়ে ওঠে কালো অক্ষরময়। রাত্রি গভীর পর্যন্ত সে পড়ার জের চলতে থাকে। পড়তে পড়তে কখনও একবার থেমে পরখ করে আশপাশের বাড়ির পরীক্ষার্থীরা তখনও পড়ছে কি না। ওদিকে গোরাকাকা আর পল্টনের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে কি না। টাপুরদা কি এর মধ্যে শুয়ে পড়েছে। না কি ঘুমোবার উদ্যোগ করছে! হঠাৎ কারও গলার আওয়াজ পেয়ে গেলে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে পড়তে শুরু করে শঙ্খ। যেন পরীক্ষার আগে এক অলিখিত প্রতিযোগিতার শুরু হয়ে যায় কে আরও রাত জেগে পড়বে। কখনও ঠাকুর্দা তাঁর মশারির ভেতর লেপের ওম্ থেকে মাথা বার করে বলেন, নে হয়েছে, এখন শুয়ে পড়। যা হবে তা হবে।

বছরের অন্যসময় ঠাকুর্দার এই কথাগুলোর জন্য চুকিয়ে বসে থাকে শঙ্খ। কথাগুলো কানে যাওয়া মাত্র সে বইখাতা গুটিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। একেবারে সোজা বিছানায়। কিন্তু পরীক্ষার আগে আর তা হওয়ার জো নেই। হঠাৎ বুঝতে পারে, বইএর অনেক কিছুই এখনও তার মুখস্থ হতে বাকি। এখনও সব অঙ্কগুলো সড়গড় হয়নি। ইংরিজির গদ্য-পদ্য, এমনকি গ্রামারও বেশ খটোমটো লাগছে। নতুন একটা বিষয় সংস্কৃত যোগ হয়েছে এ বছর, তারও রকমসকম সুবিধের ঠেকছে না তার কাছে। অতএব চট্ করে শুয়ে পড়া চলবে না। তা ছাড়া, ওদিকে গোরাকাকার গলা শোনা যাচ্ছে এখনও। তার বাবা পড়াশোনার ব্যাপারে ভীষণ কড়া। অতএব—

অতএব বেশ জোর কদমে চলতে লাগল তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি। প্রস্তুত হয়েওছে প্রায়, হঠাৎ সে বছর কী কারণে যেন ডিসেম্বরে পরীক্ষা হবে না জানিয়ে দেওয়া হল ইস্কুল থেকে। পরীক্ষা পিছোতে পিছোতে সেই মার্চ। হা ভগবান, মা-র্চ! তি-ন মাস পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় ভারী ক্ষুন্ন হল শঙ্খ। কতদিন ধরে তারা অপেক্ষা করে আছে পরীক্ষা শেষ হলেই একটা চড়ুইভাতি করবে সবাই মিলে। আর একদিন বন্ধুরা দল বেঁধে বেড়াতে যাবে দূরে কোথাও। হাঁটতে হাঁটতে তিন্তিড়িপাড়া পেরিয়ে আলতাগ্রাম কিংবা আরও দূর আতারপুরের দিকে। চাটুজ্জেপাড়ার বারোয়ারি তলায় একটা ফুটবল নামানো যায় কি না সে কথাও ভাবাভাবি করেছে তারা। এর মধ্যে হঠাৎ পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া মানে তাদের মুখে একগাল মাছি।

ঠাকুর্দা একদিন শুনে বললেন, তা ভালোই হয়েছে। আরও বেশি টাইম পেলি পড়ার জন্যি। এক্‌বারে ঠোঁটস্থ করে ফ্যাল্ সব বই। এবার ফার্স্ট না হলি লোকের কাছে মুখ দেখাব কী করে!

শঙ্খ চমকে ওঠে হঠাৎ। কথাগুলো মনে-মনে সে-ও ভেবেছে, কিন্তু ঠাকুর্দার মুখে শুনে কেমন হিম হয়ে যায়। সে কি সত্যিই ফার্স্ট হতে পারবে! কিন্তু সুবোধ থাকতে, মহাদেব থাকতে সে ফার্স্ট হবেই বা কী করে। সেদিন খবর নিয়ে জেনেছে সুবোধ নাকি ভীষণ পড়ছে এবার। হাফ-ইয়ার্লিতে সুবোধের রেজাল্ট ভালো হয়নি বলে সে ভীষণ ভয়ে-ভয়ে আছে। কাকে যেন

বলেছে, ফার্স্ট হতিই হবে আমাকে। নইলে মাস-মাস বেতন দেব কোথ্ থেকে? বেতন দিতি হলি তো আর পড়া হবে না আমার। ঠিক সেরকম একটা কথা আজ ঠাকুর্দাও শুনিয়ে দিলেন শঙ্খকে, বুঝলি, গরমেন্ট বলছে, উদ্বাস্তুদের পড়ার খরচ আর জোগাতি পারবে না। পরের বছর থে সব উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের মাইনে দে পড়তি হবে। আমরা সে টাকা জোগাড় করব কীর'ম করে? ভালো করে পড়। যদি ফার্স্ট হতি পারিস, তা'লি বিনি-মাইনেতে পড়তি পারবি। নচেৎ—

নচেৎ কী হবে তা আর পরিষ্কার করে বলেন না ঠাকুর্দা। কিন্তু শঙ্খ বুঝে গেল সব। কথাগুলো একরাশ হিম গায়ে মেখে শুনল। শুনে নিজের ভেতর কাঁপল কিছুক্ষণ। এত বড় হাইস্কুলে এত-এত ছেলের মধ্যে ফার্স্ট হওয়া কি মুখের কথা! তা ছাড়া সুবোধ তো তাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সব মাস্টার-মশাইরা তাকে ভালোবাসেন। গরীব বলে আরও বেশি করে পছন্দ করেন। তার জায়গা সে ছেড়ে দেবে নাকি! শঙ্খ যতই পড়ুক, সুবোধ আরও বেশি করে পড়ে। পড়তে পড়তে সে রাত কাবার করে দেয়। ফার্স্ট হওয়াটা তার ভীষণ জরুরি।

পরীক্ষাটা হঠাৎ তিনমাস পিছিয়ে যাওয়ায় শঙ্খ সত্যিই ফাঁপরে পড়ে গেল। পরীক্ষা পিছোলে পড়ায় ঢিল পড়ে যায়। বইএ মন বসাতে ইচ্ছে যায় না। হঠাৎ মনে হয়, সিঁদুরকোটো আমগাছটা বৌলে বৌলে উপছে পড়ছে। যাই একবার দু-চোখ ভরে দেখে আসি। কাঁঠালগাছের মস্ত কাণ্ড জুড়ে মুচিগুলো মাথা উল্টে ঝুলে আছে। দেখে আসি আরও কতটা বড় হল। বাঁশবাগানের ভেতর বাঁশের ছোট-ছোট বোগ্ বেরিয়েছে, রোজ নাকি একহাত করে বাড়ে বোগগুলো, কাল খড়ি দিয়ে দাগ কেটে রেখে এসেছিল, আজ দেখতে হবে সত্যিই একহাত বাড়ল কি না। এমনি হাজারও রহস্য প্রকৃতির, তার সবটুকু রহস্য পরতে পরতে আবিষ্কার করতে ইচ্ছে হয় শঙ্খর। এত বড় পৃথিবীর ছোট্ট একটা গাঁয়ে সে বড় হয়ে উঠছে, সেই ছোট্ট গাঁ-টিই এখনও সে ভালো করে দেখে উঠতে পারেনি, এখানকার সব মানুষজনকে এখনও চিনে উঠতে পারেনি পুরোপুরি। অথচ ঈশ্বরীপুরের বাইরে রয়ে গেছে আর এক বিশাল পৃথিবী, তার চোখের আড়ালে রয়ে গেছে আরও কত যে অজানা রহস্য, সে সব রহস্য কবে আবিষ্কার করতে পারবে শঙ্খ! আরও কতকাল পরে সে সব দেশের সঙ্গে, তার মানুষদের সঙ্গে চেনা জানা হবে তার! ইস্কুলের শেষ পরীক্ষার বেড়া ডিঙোনোর পর সে কলেজে পড়তে পারবে, তখনই কি সেই অনাবিষ্কৃত পৃথিবী তার হাতের মুঠোয় ধরা দেবে! সে আর কত দেরি! ক-ত্ব?

এমন ভাবনার মধ্যে হঠাৎ একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল তার জীবনে। একদিন বিকেলবেলা ঈশ্বরীপুরের ডাকপিওন রতনদা একটা চিঠি তার হাতে দিল। পোস্টকার্ড নয়, নীলরঙের খাম, তাতে পনের নয়াপয়সার স্ট্যাম্প মারা। শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে দেখল, চিঠিটা তার নামেই লেখা! সেই নীলখামে ভরা চিঠি কত দূর থেকে এসে পৌঁছেছে তার কাছে। কিন্তু খামে করে কে-ই বা চিঠি দিল তাকে! এর আগে পোস্টকার্ডে দু-একখানা চিঠি এসেছে তার নামে। তার বাবা সাগরদ' থেকে খোঁজখবর নিয়ে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু খামে করে চিঠি দেননি কখনও।

আর তর সইল না শঙ্খর। নীল খামের আঠা খুলে ফেলল অতি সন্তর্পনে। এমনভাবে যেন খামটা একটুও না ছিঁড়ে যায়। এত সুন্দর রঙিন খাম ছিঁড়ে ফেললে যেন তার নিজেরই ব্যাথা

লাগবে এমন মনে হয়। ভেতরে নীলকালিতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা একটা চিঠি। চিঠির নীচে নাম দেখে শঙ্খর শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল যেন। চিঠিটা লিখেছে স্বপ্নাদি। সেই খড়্গপুর থেকে।

স্বপ্নাদি লিখেছে, শঙ্খ, তোদের ওখান থেকে চলে আসার পর থেকে বারবার ঈশ্বরীপুরের কথাই মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওখানে ক'টা দিন প্রতিবছর কী হুটোপুটি করে কেটে যায়। তার রেশ আরও দীর্ঘদিন রয়ে যায় মনের ভেতরে। একলা-একা বসে তা নিয়ে সারাবছর জাবর কাটি। কেন জানি না এ বছর সে-সব স্মৃতি নিয়ে আরও বেশি করে লীন হয়ে আছি। আবার এক বছর পরে ঈশ্বরীপুরে যাব তা যেন ভাবতেই পারছি না। মনে হচ্ছে আবার এক্ষুনি কোনও অলৌকিক পরীর ডানায় ভর করে চলে যাই তোদের কাছে। আবার ভোর-ভোর উঠে তোদের চুরি করে আনা খেজুর রসে ঠোঁট ডুবোই। আবার উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে পুতুল খেলি। বিকেল হলে খেয়াঘাটে গিয়ে খেয়ানৌকোয় বারবার এপার-ওপার করি। তোর অর্ঘদা সেদিন যেভাবে আমাদের ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ফিরে এল তা ভেবে এখনও বুকের ভেতর কাঁপ ধরে। ও না থাকলে সেদিন কী হতো বলদিকি? হয়তো খেয়ানৌকোয় চড়ে কোনও গাঁয়ে, তাদের চান করাব ঘাটে গিয়ে ঠেক্ খেতাম। বাড়ির লোক আর কোনও দিন খুঁজে পেত না আমাদের। এক-এক সময় মনে হয়, ভেসে চলে গেলে হয়তো বেশ মজাই হতো। আমরা নতুন একটা গাঁয়ের লোক হয়ে যেতাম। আমি, তুই, উমনো-ঝুমনো, পল্টন, টুপুর, আর তোর অর্ঘদা। নতুন একটা জীবন শুরু হয়ে যেত আমাদের। নতুন নামে, নতুন পরিচয়ে। সে বেশ হতো, তাই না? যাই হোক, ঈশ্বরীপুর ছেড়ে ফিরে আসার পর থেকে একটা কথা ভেবে খুব খচখচ করছে মনের ভেতর। তোর অর্ঘদার পা কেটে গিয়েছিল পুরনো টিনে, তারপর কত করে একটা ইঞ্জেকশন নিতে বলে এসেছিলাম, তা কি নিয়েছিল? না কি আমার কথা অগ্রাহ্য করেই আনন্দ পেয়েছে? এখন কেমন আছে কাটাটা? সেরে গেছে তো? তোর অর্ঘদাকে আমি এখানে এসে ইস্তক দু-দুখানা চিঠি দিয়েছি, অথচ একটারও উত্তর দ্যায়নি। তুই একটু জানাবি, ও এখন কেমন আছে? আমার মন কি জানি কেন খুব খারাপ। তোর অর্ঘদাকে বলিস। ইতি, স্বপ্নাদি।

চিঠিটা দু'বার তিনবার করে পড়ল শঙ্খ। স্বপ্নাদির চিঠি পাওয়াটা তার কাছে স্বপ্নের মতো। সেই স্বপ্নাদি তার কাছে এত্ব বড় একটা চিঠি লিখেছে! কিন্তু স্বপ্নাদি যে দু'-দু' খানা চিঠি লিখেছে অর্ঘদাকে, কই অর্ঘদা তো তাকে সে-কথা ঘুণাক্ষরেও বলেনি! অর্ঘদা কি তাহলে স্বপ্নাদিব চিঠি পায়নি, না কি চিঠি পেয়েও পুরোপুরি চেপে গেছে শঙ্খর কাছে!

শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে চিঠির ব্যাপারটা সারাক্ষণ ঢালা-উপুড় করল মনে মনে। স্বপ্নাদি পর-পর দু'খানা চিঠি দিয়েছে অর্ঘদাকে, অথচ অর্ঘদা সে-কথা প্রকাশ করেনি কেন! শঙ্খর এতাবৎ ধারণা ছিল, অর্ঘদার যাবতীয় খবর সবই জানে সে। অর্ঘদা যা-যা ভাবে, সারাদিনে যা-যা করে, যখনই দেখা হয়, শঙ্খকে উজাড় করে বলে একটু-একটু করে। অথচ স্বপ্নাদির চিঠি পাওয়ার মতো একটা রোমাঞ্চকর খবর স্রেফ চেপে গেল তার কাছে! তাহলে অর্ঘদার সঙ্গে স্বপ্নাদির কি কোনও গোপন ব্যাপার আছে! 'আস্‌নাই' এর মতো কোনও গোপন, জটিল সম্পর্ক!

একদিন খুব ভোরবেলা আজানের শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যায় শঙ্খর। তিন্তিড়িপাড়ার মোল্লার ঠেক থেকে এমন প্রায়ই ভেসে আসে শব্দটা, কিন্তু আজ শঙ্খর মনে হল, আজানের শব্দটা অন্যরকম। একটু বেশি ভালো লাগা মিশে আছে তাতে। মোল্লার ঠেকের কথা মনে হতেই সোলেমানদার কথাগুলো আর একবার ঘাই মেরে গেল তার মগজে। বোধহয় তাইই এই ভালো লাগা। সেই মুহূর্তে কোথাও যেন ডেকে উঠল একটা কোকিল, ভারী মিষ্টি স্বরে, কু—হু।

তখনই শঙ্খর মনে পড়ে যায়, এখন ফাল্গুনমাস। শীত পার হয়ে গিয়ে কখন যেন ঈশ্বরীপুরের বুকে নেমে এসেছে বসন্তকাল। ফুরফুর করছে ফাল্গুনের মিঠেল বাতাস। এ সময় মনের ভেতর চইচই করে এক অন্যরকম হুকয। তার শরীরে শিরশির করে জাগ্‌ দিচ্ছে এক আশ্চর্য ভালো-লাগার স্পর্শ, বোধহয় সোলেমানদার কাছ থেকেই সঞ্চারিত হয়েছে এই ভালোলাগাটুকু। যার অন্য নাম আস্‌নাই।

বেশ কয়েকদিন 'আস্‌নাই' শব্দটা নিয়ে নিজের ভেতর নাড়াচাড়া করল শঙ্খ। শব্দটা যেন নিষিদ্ধ কোনও বাক্য। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে এক ভিন্‌ ধরনের রোমাঞ্চ। যা সোলেমানদার তামাটে মুখে এক রক্তাভা এনে দেয়। যার জন্য অর্ঘদা শঙ্খর কাছে চেপে যায় স্বপ্নাদির চিঠি পাওয়ার কথা।

কোকিলের কুহু ডাকটুকুর মধ্যেও যেন সেই রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে।

শীতলাতলার অশত্থগাছটার মগডালে একটা কোকিল কোত্থেকে এসে জোটে প্রতিবছর, তারপর অন্তত একটা-দুটো মাস রোজ ভোরবেলা ডাক দেবে কু-হু, কু-হু। কোনও দিন শুধু ভোরবেলা নয়, দুপুর কিংবা বিকেলের দিকেও কোকিলটা মিষ্টি করে ডাক দেয়। কখনও শঙ্খও তাকে ভেংচি কাটার মতো ভঙ্গি করে ডাক দেয়, কু-হু, কু-হু। শঙ্খর ডাক শুনলে কোকিলটা হঠাৎ দু-এক মুহূর্ত ডাক থামিয়ে চুপ করে যায়। বোধহয় হদিশ করার চেষ্টা করে, সে ডাকটা কোনও কোকিলের কি না। কয়েকলহমা পর আবার ডাকতে শুরু করে, কু-হু, কু-হু। শঙ্খও আবার—

ফাল্গুনের ফুরফুরে বাতাসে গা জুড়োতে জুড়োতে কয়েকদিন বেশ অন্যমনস্ক হয়ে থাকে সে। বছরের এই সময়টাই সব থেকে আরামের দিন। শীতও নেই তেমন, গরমও পড়েনি। ভূগোল-বই-এর সেই নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর মতো একটা অদ্ভুত আমোদ ঘিরে থাকে সমস্ত শরীর। সেদিন ইস্কুলে রাসবিহারীবাবু ইংরিজির ক্লাস নিতে নিতে এমনই একঝলক দখিনা বাতাস ভেসে আসতে থেমে গিয়েছিলেন হঠাৎ। সে সময় তিনি পড়াচ্ছিলেন থর ও দৈত্যের

গল্পটি। শক্তিমান থর কীভাবে পরের পর তার হাতুড়িটা মারছিল বিশালদেহী দৈত্যের দিকে, যার একটা আঘাতেই দৈত্যের মাথা চুরচুর হয়ে যাওয়ার কথা, অথচ প্রতিবারই দৈত্য হা হা করে হেসে উঠে বলছিল, আমার মাথায় কি পাখির পালক পড়ল একটা! আসলে গ্রিক-পুরাণের সেই বিখ্যাত নায়ক থর জানতোই না, দৈত্য তখন হাতুড়ির আক্রমণ ঠেকাতে একটা পাহাড় সৃষ্টি করেছিল তার অলৌকিক জাদুবলে। থর অবাক হয়েছিল প্রথমটা, পরে দৈত্য চলে গেলে দেখেছিল, পাহাড়ের গায়ে এক-একটা গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে তার হাতুড়ির ঘায়ে। শঙ্খরা সেই গল্প গোগ্রাসে গিলছিল। হঠাৎ রাসবিহারীবাবু থেমে গিয়ে বড় করে একটা শ্বাস নিলেন। যেন বুঁদ হয়ে গেলেন বসন্তের হাওয়ায়। যেন ঋতু-পরিক্রমার একটি বাঁক মুগ্ধ কবল তাঁকে।

দৃশ্যটা ভারী ভালো লেগে গেল শঙ্খর। রাসবিহারীবাবু তখন বলছেন, বসন্তই হল ঋতুর রাজা। এ সময়ে শরীর ভালো থাকে। শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকে। পরীক্ষাটা তিনমাস পিছিয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে তোদের। এই ক'মাস ভালো করে পড়ে নে। সারাবছরে যেটুকু ডেফিসিট্ ছিল, পূরণ করে ফ্যাল্। পড়ার বইএর সঙ্গে ভাব পাতিয়ে নিবি, তা হলেই---

বইএর সঙ্গে ভাব-পাতানোর কথা শুনে সবাই বেশ অবাক হয়ে গেল। বন্ধুর সঙ্গেই একমাত্র ভাব পাতানো যায় তাইই জানতো এতকাল! বইও মানুষের বন্ধু হয় নাকি!

কথাগুলো কয়েকদিন নিজের মনে ঢালা উপুড় করল শঙ্খ। তারপর সে-ও ভাব পাতাতে চাইল বইগুলোর সঙ্গে। কঠিন-কঠিন পরিচ্ছেদ খুলে তাদের দিকে অন্যভাবে তাকাল যেন। মিষ্টি করে হাসলও একবার। তারপর ফিসফিস করে বলল, আই অ্যাম ইয়োর ফ্রেন্ড। এসো ভাব করি। উঁহু, ভাব নয়, আস্‌নাই।

শরীরে একরাশ উত্তেজনা নিয়ে শঙ্খ তাকিয়ে রইল কালো-কালো অক্ষরগুলোর দিকে কয়েকদিন আগেই রাসবিহারীবাবু তাকে ডেকে বলেছিলেন, তুই ইংরেজিতে একটু কাঁচা, ইংরেজির দিকে একটু বেশি করে মন দে। তারপর থেকে শঙ্খ বেশি করে ইংরেজি পড়ছে। ইতিমধ্যে পুরনো বছর পার হয়ে নতুন ক্যালেন্ডার এসেছে ঘরে। নাইনটিন ফিফটি এইট, আর ক'মাস পরেই তার এগারবছর পূর্ণ হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতারও বয়স হবে এগার। এতদিনে সিক্সের বেড়া পার হয়ে তার সেভেনে ওঠার কথা। হঠাৎ তিনমাস পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় এখনও সিক্সেই পচছে তারা। সেই পুরনো বইএর সঙ্গে ভাব পাতিয়ে যেতে হচ্ছে। এক-একটা দিন, তাও কত দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে। পরীক্ষা পিছনো মানে তার বড় হওয়া একটু পিছিয়ে যাওয়া। খুব দ্রুত বড় হয়ে উঠতে হবে তাকে। সে বড়ো হলে হয়তো এই অভাবী সংসারের একটু সুরাহা করতে পারবে। ঠাকুর্দা আর পেরে উঠছেন না। অতএব পড়ো, আরও পড়ো, আরও পরিশ্রম করো—

পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঠিক আগেই দশই ফেব্রুয়ারি হঠাৎ শিক্ষক-ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল ইস্কুলে-ইস্কুলে। শঙ্খরা ইস্কুলে গিয়ে দেখল, মাত্র কয়েকজন টিচার এসেছেন, কিন্তু কেউই ক্লাস নেবেন না। বরং টিচার্স-রুমে বসে মিটিং করলেন নিজেদের মধ্যে। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ কৌতূহলী হয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখে এল, জোর বাদানুবাদ চলছে। রাসবিহারীবাবু উত্তেজিত

হয়ে কিছু বলেছেন কোনও ধর্মঘটী শিক্ষককে, তাই নিয়ে ভীষণ তর্ক হচ্ছে। রাসবিহারীবাবু নাকি এই ধর্মঘটের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। অন্যেরা তাঁর প্রতিবাদ করছে সমস্বরে।

ওদিকে হেড্‌মাস্টারমশাই তাঁর নিজের ঘরে বসে নিবিষ্টমনে কী-সব কাজ করছেন। তাঁকে সাহায্য করছেন হরিসাধনবাবু। হরিসাধনবাবু হেডমাস্টারমশাইএর খুব কাছের লোক। তিনি টিচার্সরুমেই যাননি আজ। তাঁর সঙ্গে অন্য টিচারদের বরাবরই একটা দূরত্ব ছিল, ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দূরত্ব আরও বেড়ে গেল অনেক।

পরীক্ষার আগের কয়েকদিন শঙ্খ কখনও ইস্কুল কামাই করতে চায় না। সে জানে, এই ক'দিন টিচাররা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ ইম্পর্ট্যান্টি প্রশ্নগুলো দাগিয়ে দেন। হঠাৎ কোনও একটা প্রশ্ন নিয়ে পড়াতে শুরু করেন বিশদভাবে। শঙ্খ বুঝতে পারে, এ-সব প্রশ্নের কিছু-কিছু পরীক্ষায় আসবেই নিশ্চিত। কিন্তু আচম্‌কা ধর্মঘট হওয়ায় সেই প্রশ্নগুলোর হদিশ পাচ্ছে না এ-বছর।

চার-পাঁচদিন লাগাতার ধর্মঘট হওয়ার পর সবাই বলাবলি করতে লাগল, হয়তো এ-বছর পরীক্ষাই হবে না আর। হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্ট দেখে তুলে দেওয়া হবে নতুন ক্লাসে। কেউবা বলল, আরও এক বছর থেকে যেতে হবে পুরনো ক্লাসেই।

এতসব ভাবাভাবি, কূটক চালির মধ্যে হঠাৎ আটদিনের দিন ধর্মঘট মিটে গেল। যেদিন ইস্কুল খুলল, সেদিন সবাইকে চমকে দিয়ে পরীক্ষার রুটিন ঘোষণা করে দিলেন হেডমাস্টারমশাই। বোঝা গেল, এ ক'দিন হরিসাধনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে হেডমাস্টরমশাই মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষার রুটিন তৈরি করতেই ব্যস্ত ছিলেন।

ধর্মঘট মিটে যাওয়ার পর শিক্ষকদের মধ্যে স্পষ্ট ভাগাভাগি হয়ে গেল। হরিসাধনবাবু ধর্মঘটে যোগ দেননি বলে শিক্ষকদের একটা বড় অংশ তাকে বয়কট করলেন। নীলকান্তবাবু তো একদিন প্রকাশ্যেই বললেন, দালাল। তা নিয়ে হরিসাধনবাবুর সঙ্গে নীলকান্তবাবুর তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। এ ছাড়া শিক্ষকরা এড়িয়ে চলতে লাগলেন রাসবিহারীবাবুকেও।

শিক্ষকদের মধ্যে এই অবনিবনা অবশ্য সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেল আসন্ন বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে। শিক্ষকরা যেমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পরীক্ষা নেওয়ার কাজে, তেমনি ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে।

পরীক্ষার ঠিক আগে আগে একটা অদ্ভুত ঘোরের ভেতর ডুবে যায় শঙ্খ। রাত শেষ হয়ে ভোর হওয়ার সময়ে যে ঘোরভাব সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি। অঝোরে বৃষ্টির সময়েও অমনি একটা আলো আর অন্ধকারে মেশামেশি ঘোর থাকে। তখন শঙ্খর চারপাশ ঘিরে থাকে পড়ার বইএর কালো-কালো হরফগুলো। ছোট-ছোট অজস্র অসংখ্য অক্ষর সহসা প্রাণ পেয়ে নড়েচড়ে ওঠে। তারা গিজগিজ করতে থাকে মগজের ভেতর। শঙ্খর চারপাশের পৃথিবী তখন ছোট্ট এতটুকুন হয়ে যায়। মুছে যায় আকাশের নীল, প্রকৃতির সবুজ, গোধূলির লাল আভা। বহির্বিশ্বে ছড়ানো-ছিটোন সমস্ত বর্ণালিই। তখন কোনও রং বলতে আর নেই, শুধু সেই ঘোরভাবটা ক্রমশ ঘিরে ধরে তার চেতনার শেষবিন্দু পর্যন্ত। ভোর থেকে গভীররাত পর্যন্ত তার সামনে তখন ঘুরে বেড়াতে থাকে অজস্র অক্ষরমালা। সেই অক্ষরের রাশ সে হুড়মুড় করে নামিয়ে দিতে থাকে

পৃষ্ঠার ওপর। এক-একদিন এক-এক বিষয়ে।

কীভাবে পরীক্ষার দিনগুলো পার হয়ে গেল তা বুঝতেই পারল না সে। পরীক্ষা শেষ হতে একটা বিশাল পাহাড় যেন নেমে গেল মাথা থেকে। চারপাশে তাকিয়ে সে তখন একটু-একটু করে ফিরে পেতে চাইছে তার নীল আকাশ, তার সবুজ পৃথিবীর তন্নতন্ন অলিগলি। কিন্তু তার আগেই একদিন ঠাকুর্দার গম্ভীর গলা শুনে থমকে গেল সে।

ঠাকুর্দা চিন্তিত শীর্ণ মুখে বিড়ি টানছিলেন। শঙ্খকে সামনে দেখে ভারী গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, এক্‌জামিন কেমন দিলি?

শঙ্খ প্রতিবারের মতো বলতে যাচ্ছিল, ভালোই। কিন্তু বলল না। গতবারের অ্যানুয়ালে খুব খারাপ রেজাল্ট হয়েছে। সেবারও জনে জনে সবাইকে বলেছিল, ভালোই। তাই এবার মণিকাকা তাকে ডেকে শিখিয়ে দিয়েছে, পরীক্ষা দেওয়ার পর কখনও ভালো বলতে নেই, বলবি, মোটামুটি। সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল শঙ্খর। সেই দাওয়াই প্রয়োগ করতে হল ঠাকুর্দার ওপরই। বলে ফেলল, মোটামুটি।

ঠাকুর্দা ভাসা-ভাসা চোখে তাকালেন তার দিকে। তাঁর শরীরটা মোটেই ভালো যাচ্ছে না গত কয়েকমাস। প্রায়ই বুক ধড়ফড় করে, অর্শের অসুখে ভুগছেন খুব। কোথা থেকে একটা সিসের আংটি জোগাড় করে এনে পরানো হয়েছে তাকে। মন্ত্রপূত আংটি। তাতে নাকি রোগের প্রকোপ একটু কমেছে. তবু এখনও বেশ দুর্বল। মাঝেমধ্যে কোর্টে যাওয়া বন্ধ রাখতে হচ্ছে। কোনও ক্রমে হেঁটে হেঁটে ঈশ্বরীপুর গঞ্জ পর্যন্ত যান, আবার দু-তিন ঘণ্টা পর ফিরে এসে বসে থাকেন জলচৌকির ওপর, সেই একই ভঙ্গিতে, উবু হয়ে। বোধহয় অর্শের জন্যই বহুদিন ধরে এভাবে উবু হয়ে বসতে হয় তাঁকে।

শঙ্খর উত্তর শুনে শুধু গম্ভীর স্বরে বললেন, হুম্।

শঙ্খ ভয়ে-ভয়ে প্রায় পালিয়ে এল ঠাকুর্দার সামনে থেকে। ভীষণ খারাপ হয়ে গেল তার মনটা। কেবলই মনে হতে লাগল, তার পরীক্ষা তেমন ভালো হয়নি। বেশ কয়েকটা অঙ্ক ভুল করে ফেলেছে। ইংরেজি ট্রানশ্লেসন তেমন মনঃপূত হয়নি। এমনকি যে বাংলা ব্যাকরণে সে পাকা. তাতেও একনম্বর কাটা যাবে তার।

ঠাকুর্দার কথা ভেবেই আরও শঙ্কিত হয়ে পড়ছে সে। নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয় করে এত বড় সংসার সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন, লড়াই করছেন এক প্রবল দারিদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কখনও পেছন ফিরে তাকান না। কখনও ওপার বাংলার কথা বলেন না। ভুলেও উচ্চারণ করেন না, ওপারে তাঁদের কী ধনসম্পত্তি ছিল। কেবল বলেন, যে হাঁড়িতে কুকুরে মুখ দিয়েছে, লালমুখো সায়েবরা এক কালির আঁচড়ে যাকে উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছে, সে হাঁড়ি আর মুখে তোলব কী করে? পেছনে তাকায়ে আর কী হবে? সুস্কি তাকাও—

সুস্কি, মানে সম্মুখে। শঙ্খ সামনের দিকে তাকায়। তার পেছন পানে অন্ধকার। সে জানে না তাদের অতীত কীরকম ছিল। কিন্তু সামনেও বা আলো কোথায়? ঠাকুর্দা বলেন, যা হবার তা হবে। ভাগ্যের লিখন যা আছে, তাই হবে। নইলে লালমুখো সায়েবের আঁচড় পড়ে আমাদের

গায়! আঁচড় কাটার সময় একটু হাত কাঁপল না সায়েবটার? একটু এদিক-ওদিক হলেই তো খুলনা হিন্দুস্থানে চলে আসত।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরের দিনগুলো তাদের কাছে এক বিস্তীর্ণ উদোম। ধান-কাটার পর যেমন গাঁয়ে-গাঁয়ে গরু-ছাগলের উদোম হয়, মাঠে-মাঠে ইচ্ছেমতো ঘুরতে পারে, ঘুরে-ঘুরে নতুন গজানো ঘাস চিবুতে পারে, কেউ আর ধরে খোঁয়াড়ে ঢোকাবে না, তেমনি এখন শঙ্খদের উদোম। চৈত্রের প্রথমে এই ডা-ডা রোদের ভেতর তাদের এখন লাগামবিহীন ঘুরে বেড়ানোর দিন। কোথায় সিঁদুরকৌটো আমগাছে কতটা রং ধরে এল আমে, কোথায় জামের ডালে কালো হয়ে এল টোপা-টোপা ফলগুলো,কোথায় জামরুল গাছ দিনে-দিনে টইটম্বুর হয়ে উঠছে জামরুলে, এতসব ঐশ্বর্য সরেজমিন করার সময়।

কিন্তু শঙ্খর মনে একটুও স্বস্তি নেই। তার পরীক্ষার ফল যদি এ-বছরও ভালো না হয়! যদি এবারও পুনরাবৃত্তি হয় গতবছরের ফলাফল! তাহলে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবে না সে। তার ফল শুনে আরও গম্ভীর আরও বিষন্ন হয়ে যাবেন ঠাকুর্দা। বাবা চিঠি লিখবেন সাগরদ' থেকে, এবারও ফল ভালো হল না! পাড়ার লোক তার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসবে, মনে মনে বলবে, হুঁ। স্বপ্নাদির চিঠি আসবে খড়্গপুর থেকে, কী রে শঙ্খ! এবারও—

এমন সব ভাবনায় গেরো দিতে দিতে শঙ্খ অস্থির হয়ে ওঠে। তার চোখের সামনে ঝুপ্ হয়ে নেমে আসে রাজ্যের আঁধার। দেখা হয় না, জবাদের বাগানে কামরাঙ্গা হলুদ হয়ে এল কি না। জেলারো-আপিসের মোড়ে যে মুচকন্দ ফুলের গাছ তার ডালে কুঁড়ি এল কি না। পল্টন সেদিন এসে বলল, মোল্লার ঠেক যেতে যে জাওয়াবাঁশের ঝোপ, সেখানে ক'টা ছানা হয়েছে খটাশের, খটাশটা নাকি রোজ ভোরে তার ছানাদের গর্তের বাইরে নিয়ে আসে, তাজা হাওয়ায় ঘুরতে দেয়, রোদ উঠলে ফের ফিরিয়ে নিয়ে যায় গর্তে। শঙ্খর তাও দেখা হয়ে উঠল না। এমনকি উমনো-ঝুমনোর পুতুল বিয়ের আসরে বসে থাকতে গিয়েও উস্‌খুস্ করে ওঠে।

ওদিকে পরীক্ষার ফল বেরুবার সময় হয়ে যায়। যতই সেই অমোঘ দিনটি ক্রমশ এগিয়ে আসে, হাত-পা অবশ হয়ে আসে তার। শরীরভরে কম্প দিয়ে জ্বর আসবে এমন মনে হয়।

সেদিনও এমন একটা মন-খারাপ ভর করেছিল শঙ্খর শরীরে। একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বই জোগাড় করে এনেছিল, সেটা পড়তেও মন লাগছিল না। সন্ধে হতেই ঠাক্‌মাকে বলল, খেতি দ্যাও তো। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

খেয়েদেয়ে সোজা বিছানায়। বিছানায় এগোড়-ওগোড় করতে করতে কখন যে ঘুমের অতলে সেঁধিয়ে গিয়েছিল তা মনে নেই। ঠাকুর্দা তখনও বাড়ি ফেরেননি। নিশ্চয় কোথাও মামলার কাজ পেয়ে সেখানেই দলিলপত্তর বুঝে নিচ্ছেন কুপির অস্পষ্ট আলোয়।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল তা জানে না। হঠাৎ ঠাকুর্দার হাঁকডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল, বোধহয় তক্ষুনি ঘরে ফিরেছেন তিনি, বাড়ি এসেই হাঁকডাক শুরু করেছেন, হারামজাদা কী করেছে, এ্যাঁ? কী কান্ডটাই না করেছে?

শঙ্খ কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। কাঁচা ঘুম ভেঙে যেতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে আছে।

পড়াশুনো না করে কখনও সন্ধে সন্ধে শুয়ে পড়লে ঠাকুর্দা এরকম চেঁচামেচি করেছেন তার বা মণিকাকার উপর। কিন্তু এখন তো তাদের সামনে কোনও পরীক্ষা নেই।

বাড়িময় লোককে তটস্থ করে ঠাকুর্দা এসে দাঁড়ালেন বিছানার সামনে, শঙ্খকে লালচোখে উঠে বসতে দেখে হুঙ্কার ছাড়লেন, কী করেছিস ড্যাক্‌রা, অ্যাঁ?

শঙ্খ হাঁ করে একবুক ভয়তরাস নিয়ে তাকিয়ে থাকে ঠাকুর্দার মুখের দিকে। নিশ্চয় সে এমন কিছু অপরাধ করেছে, যার জন্য ঠাকুর্দা ভীষণ রেগে গেছেন। তাই এমন হাঁকডাক, চিল্লানি।

ঠাকুর্দা তখনও তাকিয়ে আছেন শঙ্খর দিকে, অনেকক্ষণ পর বললেন, তুই এবাব পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিস।

শঙ্খ বিহ্বল চোখে তাকাল, এখনও তো রেজাল্ট-আউট হতে দু'দিন বাকি আছে, ঠাকুর্দা এর মধ্যে তার পরীক্ষার ফল জেনে এলেন কী ভাবে। নাকি তার পরীক্ষা খাবাপ হয়েছে বলে মস্করা করছেন তার সঙ্গে!

—হরিসাধনের সঙ্গে দেখা হল জেলাবো-আপিসের মোড়ে। আমাকে দেখে সাইকেল থেকে নামল, বলল, আপনার নাতি এবার ফার্স্ট হয়েছে। মিষ্টি পাওনা রইল কিন্তু।

ঠাকুর্দাব কথাগুলো তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না শঙ্খর। সে কি অত-অত ছেলের মধ্যে সত্যিই ফার্স্ট হতে পেরেছে? সুবোধ, মহাদেব, পার্থ সবাইকে পেছনে ফেলে! অবশ্য একমাত্র হরিসাধনবাবুই ইস্কুলের ভেতরের খবর জানতে পারেন। তিনিই হেডমাস্টারমশাই-এর সবচেয়ে কাছের লোক।

সেইমুহূর্তে হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, আমি ফার্স্ট হলে সুবোধ ইস্কুলে পড়বে কী করে?

ঠাকুর্দা বিস্মিত হয়ে বললেন, সুবোধ কে?

—সে-ই তো আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। ভীষণ গরীব। এতকাল ফার্স্ট হয়ে এসেছে বলে মাইনে লাগতো না তার। তাইই পড়তে পেরেছে এতকাল। এবার ফার্স্ট না হলে সুবোধকে হয়তো পড়া ছেড়ে দিতি হবে।

এবার ঠাকুর্দার অবাক হওয়ার পালা। তিনি স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে রইলেন শঙ্খর দিকে। তারপর এবার সত্যিসত্যি ধমক দিয়ে উঠলেন, হারামজাদা, তোর মাথায় কি গোবর ভরা আছে' তুই কি তার চেয়ে কম গরীব? এ্যাদ্দিন রিফিউজি হওয়ার সুবাদে তোদের মাইনে লাগেনি ক্লাসে। তাই পড়তি পেরিছিস। এ-বছর থে গভর্ণমেন্ট রিফিউজিদের সব সুযোগ-সুবিধে কেড়ে নেচ্ছে। বিধানবাবু বলেছেন রিফিউজি স্টাইপেন্ড আর দেয়া হবে না। গভর্ণমেন্টের ফান্ডে নাকি টাকা নেই। এবার ফার্স্ট না হলি তোরেও তো পড়া ছেড়ে দিতি হতো রে।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন ঠাকুর্দা। তাঁর চোখের কোণে তখন চিকচিক করছে ক'ফোঁটা জল। বোধহয় কাঁদছেন। আনন্দে না কষ্টে তা বুঝে উঠতে পারল না শঙ্খ। একটু পরে ফের বললেন, বাবাকে চিঠি লেখ। তোর খোরাকির টাকা দেয়া তো বন্ধ করে দিয়েছে। অন্তত নতুন বই যাতে কিনে দিয়ে যায়, তা জানিয়ে শিগ্গির-শিগ্গির পত্তর দে একখান—

নতুন বইএর গন্ধই একেবারে অন্যরকম।

গতবছর সিক্সে ওঠার পর শঙ্খ কিছু পুরনো বই কিনেছিল সিক্স থেকে সেভেনে ওঠা এক ছাত্রের কাছ থেকে। হাফ-দামে। এ-বছর সেভেনে ফার্স্ট হয়ে ওঠার সুবাদে তার বাবা একদিন এসে অনেকগুলো নতুন বই কিনে দিয়ে গিয়েছেন। সেই বইগুলো কতবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সে। ভেতরে শাদা ঝকঝকে পাতা, তাতে কালো কালো অক্ষরে কত অচেনা-অজানা রোমাঞ্চ। বাইরে রঙিন চকচকে প্রচ্ছদ। এহেন নতুন বইএর গন্ধে ওম্ হয়ে থাকতে কীই যে আরাম!

কখনও নতুন বইগুলো পাঁজা করে এনে বালিশের পাশে রেখে দেয় রাতে ঘুমোবার সময়। সারারাত বুঁদ হয়ে থাকে তার চমৎকার সুবাসে। কখনও ঘুম ভাঙলে বইগুলোর নরম, ঠাণ্ডা পৃষ্ঠা ছুঁয়ে দ্যাখে।

নতুন ক্লাসে ওঠার পর স্বাভাবিক ভাবেই তাদের রুটিনে অনেক রদবদল হয়ে গিয়েছে। লিকলিকে চেহারার একলব্যস্যারের বদলে তাদের ক্লাস-টিচার হয়েছেন হরিসাধনবাবু। বোধহয় শঙ্খর ঠাকুর্দার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ আছে বলে, অথবা হয়তো শঙ্খ ফার্স্ট হয়ে উঠেছে বলে আজকাল তার দিকে হঠাৎ নজর দিতে শুরু করেছেন তিনি। প্রায়ই বোর্ডে অঙ্ক দিয়ে ভারী চশমার ভেতর দিয়ে বলে ওঠেন, ইয়েস ফার্স্টবয়, তুমি এসো। অঙ্কটা করো তো।

তখন বুকটা দুরদুর করতে থাকে শঙ্খর, সে পারবে তো!

ইতিমধ্যে ইতিহাসের টিচার অমিয়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে দীর্ঘমেয়াদি ছুটিতে গিয়েছেন। বেশ বয়স হয়েছে অমিয়বাবুর। মস্ত ভুঁড়ি, মাথার সব চুলই শাদা। শেষদিকে যখন ইস্কুলে আসতেন, রীতিমতো ক্লান্ত দেখাতো তাঁকে। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করতে বলে প্রায়শ ঘুমিয়ে পড়তেন চেয়ারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়াশুনো শিকেয় তুলে ছাত্ররা কেউ কাটাকুটি, কেউ আগডুম-বাগডুম খেলায় মন দিত। তাতে বেশি চিল্লাচিল্লি হলে অমিয়বাবুর ঘুম ভেঙে যেত কোনও দিন। তখন এত রেগে যেতেন যে ডাস্টার হাতে নিয়ে যাকেই সামনে পেতেন, তারই মাথা ভাঙার চেষ্টা করতেন। অবশ্য বেশির ভাগ ছাত্রই তাঁর হাত ফস্কে পালিয়ে যেত রোজ। কাউকেই হাতের কাছে না পেলে রাগে ধেইধেই করে নাচতে শুরু করতেন। তারপর হাঁপাতেন খুব।

ইতিহাসের ক্লাস পর-পর কয়েকটা দিন হল না তাদের। এর মধ্যে হতে পারল না ইংরেজির ক্লাসও। সেও এক অদ্ভুত কারণে। সেভেনে ওঠার পর তাদের ইংরেজি পড়ানোর দায়িত্ব পড়েছে রাসবিহারীবাবুর ওপর। তাদের প্রথম ক্লাসে অঙ্ক নেন হরিসাধনবাবু। তার পরের পিরিয়ডেই ইংরেজি। কিন্তু আজকাল কী হয়েছে হরিসাধনবাবুর, অঙ্কের ক্লাস ছাড়তে বেশ কিছুটা দেরি

করে ফেলছেন। এগারটা পঁয়তাল্লিশে ঘণ্টা বাজার পর আরও পাঁচ সাত মিনিট ধরে অঙ্ক করান। তারপর রোলকলের খাতা, চক, ডাস্টার গুছিয়ে বেরোতে আরও দু-তিন মিনিট। ওদিকে রাসবিহারীবাবু কাঁটায় কাঁটায় এগারটা পঁয়তাল্লিশে এসে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন ক্লাসরুমের বাইরে। চার-পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর যখন হরিসাধনবাবু বেরোন না, তখন বিরক্ত হয়ে ফিরে যান টিচার্স-রুমে। আর গেলেন তো গেলেন, হরিসাধনবাবু চলে যাওয়ার পরও আর ক্লাস নিতে আসেন না। পর পর বেশ কয়েকদিন রাসবিহারীবাবু এভাবে ফিরে যেতে একদিন হরিসাধনবাবু দাঁত কিড়মিড় করে যেন নিজেকে শুনিয়েই বললেন, হুঁ, আমাকে পাঙ্খুয়ালিটি শেখাচ্ছেন!

এরকম আরও দু-তিনদিন কেটে গেল, তারপর একদিন রাসবিহারীবাবু ফিরে না গিয়ে সোজা ঢুকে পড়লেন ক্লাসের ভেতর, হরিসাধনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার অঙ্কের ক্লাস কি শেষ হয়েছে?

ঘড়িতে তখন এগারটা পঞ্চাশ, নিজের কব্জিতে একবার চোখ বুলিয়ে হরিসাধনবাবু গম্ভীরস্বরে বললেন, না, আরও একটা অঙ্ক না কষালে আমার চ্যাপ্টার শেষ হবে না।

রাসবিহারীবাবুও তাকালেন তাঁর ঘড়ির দিকে, কিন্তু ঘণ্টা অনেকক্ষণ আগেই পড়ে গেছে—

হরিসাধনবাবুর কণ্ঠে কিছু উষ্মা যোগ হল, ঘণ্টার শব্দ আমার কানে গেছে। আমি কানে কালা নই। কিন্তু অত সেকেণ্ড-মিনিট হিসেব করে আমি পড়াতে পারি না। যেদিন যে চ্যাপ্টার পড়াই, তা শেষ না করে বেরিয়ে যাওয়া যায় না ক্লাস থেকে।

—তাহলে রুটিনে আমাকে অন্যসময় ক্লাস দিন। আমি টাইমলি ক্লাসে ঢুকতে চাই। দেরি করে ক্লাসে ঢোকা বা দেরি করে ক্লাস ছেড়ে বেরুনো আমার ধাতে নেই। প্রথম পিরিয়ড না-হয় আমাকেই দিন।

হরিসাধনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনার ইচ্ছে অনুযায়ি রুটিন বদলানো যাবে না। বহু পরিশ্রম করে রুটিন তৈরি করা হয়েছে। হেডমাস্টারমশাই সে রুটিন অ্যাপ্রুভ করেছেন। এখন বদলাতে হলে আপনি হেডমাস্টারমশাইকে গিয়ে বলুন—

রাসবিহারীবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠছিল, তাঁর ধবধবে শাদা পাঞ্জাবির এখানে-ওখানে ঘামে ভিজে যাচ্ছিল, তবু কণ্ঠস্বর সংযত রেখে বললেন, রুটিন তো আপনিই তৈরি করেছেন শুনলাম, আপনার যদি ক্লাস নিতে সময় বেশি লাগে, তাহলে টিফিনের আগের পিরিয়ড আপনি নিন। আমাকে সময়মতো ক্লাসে ঢুকতে না দিলে আমার পক্ষে পড়ানো সম্ভব হবে না।

হরিসাধনবাবু তৎক্ষণাৎ বললেন, আপনার না পোষায় আপনি ছেড়ে দিন। আপনার জন্য ইস্কুলের সমস্ত টিচার সাফার করবে তা হতে পারে না।

রাসবিহারীবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন হরিসাধনবাবুর কথা শুনে। হঠাৎ হরিসাধনবাবু তাঁর মুখের উপর এত বড় কথাটা বলবেন তা যেন ভাবতে পারেননি। তিনি নিজে থেকে এ স্কুলে টিচারি করতে আসেননি। স্কুলের প্রেসিডেন্ট, হেডমাস্টার তাঁকে অনুরোধ জানাতে তবেই তিনি এই স্কুলে শিক্ষকতা করতে রাজি হয়েছেন।

কিন্তু অন্য কোনও শিক্ষক এ-কথাটা বললে তার এক মানে হতো, কথাটা যেহেতু

হরিসাধনবাবুর মুখ থেকে বেরিয়েছে, রাসবিহারীবাবু যেন তার ভেতর একটা অন্য অর্থ আবিষ্কার করলেন। হরিসাধনবাবু হেডমাস্টারমশাইএর খুবই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর কথার ভেতর দিয়ে যেন হেডমাস্টারমশাইএর কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন হঠাৎ। তাঁর ভুরুতে কোঁচ পড়ল বড় করে। তৎক্ষণাৎ বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন ক্লাস ছেড়ে।

রাসবিহারীবাবু ভেবেছিলেন, আজকের এই ঘটনায় অন্য শিক্ষকরা নিশ্চয় উত্তেজিত হবেন, প্রতিবাদও করবেন কেউ, কিন্তু কিছুই হল না। কারণ তাঁর উপর নানা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন অন্য শিক্ষকরা। ধর্মঘটের সময় রাসবিহারীবাবু শিক্ষকদের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হননি, তখন থেকেই ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। তা ছাড়া বেশ কিছুদিন যাবৎ রাসবিহারীবাবু বলতে শুরু করেছিলেন, ইস্কুলের প্রায় সব শিক্ষক বাড়িতে চুটিয়ে টিউশন করেন। সকাল-বিকেল-সন্ধেয় ব্যাচের পর ব্যাচ ছাত্র পড়িয়ে যাচ্ছেন যন্ত্রের মতো, তাতে তাঁরা স্কুলে গিয়ে ঠিকমতো পড়ানোর মানসিকতা হারিয়ে ফেলছেন ক্রমে ক্রমে। যে-সব ছাত্ররা টিউশন পড়তে পারে না পয়সার অভাবে, তারা এর ফলে মার খাচ্ছে। দেশে আইন করে স্কুল-শিক্ষকদের টিউশন করাটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আর যদি টিউশন প্রথা চালু থাকে, তাহলে শিক্ষকরা তাব জন্য কোনও টাকা নিতে পারবে না ছাত্রদের কাছ থেকে।

কথাটা শিক্ষকমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সবাই একবাক্যে বলল, রাসবিহারীবাবুর মাথাটা নিশ্চিত খারাপ হয়ে গেছে। শিক্ষকরা যা কম মাইনে পান, তাতে টিউশন না করলে তাদের চলবে কী করে! বরং উনি নিজেই ফ্রি-তে ছাত্র পড়ানো শুরু করুন বাড়িতে, তাতে দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে, তখন ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করা যেতে পারে।

শেষবাক্যটি হয়তো রসিকতা করেই বলেছিলেন শিক্ষকরা। তাঁরা ভাবতে পারেননি যে রাসবিহারীবাবু সত্যিই বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্র পড়ানো শুরু করবেন বাড়িতে। কথাটা তাঁর কানে যাওয়ার পর একদিন হঠাৎ শঙ্খকে ডেকে পাঠালেন টিচার্স-রুমে, তার দিকে বার দুই পলক ফেলে বললেন, তুই ইংরেজিতে ভীষণ কাঁচা। সেদিন ক্লাসে ট্রানস্লেসন করতে দিয়েছিলাম, তোর খাতায় তিন-তিনটে লাল কালির আঁচড় দিতে হল। কাল থেকে আমার বাড়িতে আসবি। ঠিক সকাল আটটায়। রোজ একঘন্টা করে পড়াব তোকে।

শঙ্খ খুব ঘাবড়ে গেল রাসবিহারীবাবুর কথায়। তার তো কোচিং-এর মাইনে দেওয়ার মতো ক্ষমতা নেই। সে পড়তে যাবে কী করে! রাসবিহারীবাবু কি তাকে বিনা মাইনেতে পড়াবেন?

ক্লাস থ্রিতে পড়ার সময় ঊমনো ঝুমনোকে পড়াতে আসতেন এক মাস্টারমশাই। শঙ্খকে ঠাক্‌মা বলেছিলেন, জগদীশবাবু খুব ভালো লোক, তুই গিয়ে বসলে নিশ্চয় তোকেও পড়াবেন উনি। যা না ক'দিন। তা শঙ্খ যেত ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারত, সে টিউশন-ফি দিতে পারবে না জেনে জগদীশবাবু তার দিকে তেমনভাবে মনোযোগ দেন না। শুধু বলতেন, তুই নিজে পড়। সে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, পরে বলব। পরে বলার সময়ই পেতেন না বেশিরভাগ দিন। কখনও বিরক্তও হতেন বেশ। তারপর শঙ্খ একদিন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছিল যাওয়া। এবার রাসবিহারীবাবু তাকে পড়তে যেতে বলছেন। সে মাইনে দিতে পারবে না একথা জেনেও।

শঙ্খ মনে মনে আশ্চর্য হল, আবার উত্তেজিতও হল কম নয়। ইংরেজি পড়তে গিয়ে অনেক শব্দে হোঁচট খায় সে। গ্রামারের অনেক রহস্য তার কাছে এখনও অচেনা। গদ্য পদ্যের অনেক টপিক পড়তে গিয়ে তার মনে হয়, কেউ একজন ভালো করে বুঝিয়ে দিলে বেশ হতো।

পরদিন ভোর হতে না হতে এক অদ্ভুত উত্তেজনা ঘিরে ধরল তার শরীর। রাসবিহারীবাবুকে বেশ রাশভারী মানুষ বলে মনে হয়। খুব মেজাজী আর একগুঁয়ে ধরনের। একাই সমস্ত শিক্ষকদের সঙ্গে লড়াই করে বেশ শোরগোল ফেলে দিয়েছেন ইস্কুলে। এহেন টিচারের কাছে প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাওয়া বেশ রোমাঞ্চকর।

ঠিক আটটা নাগাদ রাসবিহারীবাবুর বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল সে। তবু একধরনের কুণ্ঠা, লজ্জা, সংকোচে জড়িয়ে যেতে লাগল তার দুটো পা। কেমন মানুষ উনি কে জানে। তাঁর কাছে বসে ইংরেজির মতো একটা শক্ত বিষয় একঘন্টা ধরে পড়াটা ভারী কঠিন লাগল। কয়েক মুহূর্ত এমন দোনামোনায় কাটানোর পর সে বাড়ির দরজায় মুখ বাড়াল, স্যার—

—কে, ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে প্রায় কেঁপে উঠল শঙ্খ।

—স্যার, আমি শঙ্খ, আপনি কাল আমাকে আসতে বলেছিলেন।

নিজের ঘরে টেবিল-চেয়ারে বসে নিবিষ্টমনে কী যেন একটা কাজ করছিলেন রাসবিহারীবাবু, লুঙির মতো করে পরা একটা শাদা ধুতির ওপর ধবধবে হাতাওলা গেঞ্জি পরে আছেন। চোখ তুলে শঙ্খকে দেখে পরক্ষণেই পাশে একটা টেবিল-ঘড়ির দিকে চোখ রাখলেন, তারপর তেমনই গম্ভীর স্বরে বললেন, এখন তো আটটা বেজে পাঁচ। তোকে তো ঠিক আটটায় আসতে বলেছিলাম। তুই ঠিক সময়ে না এসে পৌঁছনয় আমি এখন অন্য কাজ ধরে ফেলেছি, কাল ঠিক সময়ে আসবি। যা এখন।

শঙ্খ স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে তো আটটার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল এ বাড়িতে। ক' মিনিট সময় সে তো ইতস্তত করেই কাটিয়ে দিয়েছে বাইরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে, আর সেই অপরাধে কিনা—

রাগে, দুঃখে মুখটা কালো করে শঙ্খ ফিরে এল বাড়িতে। বুঝতে পারল না, রাসবিহারীবাবু ইচ্ছে করেই অপমান করলেন তাকে, নাকি মানুষটা সময় পাগল বলেই তাকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে সে আরও সময়ানুবর্তী হয়ে ওঠে।

পরদিন সকালে উঠে শঙ্খ ঠিক করল, আজ আর একবার বই খাতা নিয়ে সে যাবে রাসবিহারীবাবুর বাড়িতে। আটটা বাজার আগেই চলে যাবে, যাতে উনি দেরিতে আসার অজুহাত না তুলতে পারেন।

সেই মতো সেদিনও গিয়ে মুখ বাড়াল যখন, তখন আটটা বাজেনি। তার কণ্ঠস্বর কানে

যেতে রাসবিহারীবাবু মুখ তুললেন তাঁর দু'হাতে ধরা একটা মোটা বই থেকে। শঙ্খকে দেখে চট্ করে নজর করলেন টেবিল-ঘড়িটার কাঁটা দুটোর দিকে। বললেন, আজ আবার সকাল সকাল এসে পড়েছিস। আটটা বাজতে এখনও চারমিনিট ছত্রিশ সেকেণ্ড বাকি। তুই একটু অপেক্ষা কর। আটটা বাজলেই আমি ডেকে নেব। ততক্ষণে বই-এর এই চ্যাপটারটা শেষ হয়ে যাবে।

শঙ্খ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রাসবিহারীবাবুর মুখের দিকে। তিনি অবশ্য তখন নিবিষ্ট হয়ে গেছেন তাঁর হাতের মোটা বইটার ভেতর। বোধহয় হিসেব করে ঠিক চারমিনিট ছত্রিশ সেকেণ্ড পর বই বন্ধ করে মুখ তুললেন, এবার আয়।

শঙ্খর বুকের ভেতর ধপাস ধাঁই শব্দ হতে থাকে। এমন একগুঁয়ে, জেদি আর লড়াকু মানুষেব সামনে তাকে এখন এক ঘন্টা বসে থাকতে হবে। শঙ্খ ইংরেজিতে যে ভীষণ কাঁচা তা তিনি জানেন! তবু শঙ্খ বানান ভুল বললে, কিংবা ট্রানশ্লেসন করতে ভুল করলে কতখানি বকাঝকা করবেন কে জানে। মাটির মেঝেয় বিছানো মাদুরের ওপর বইখাতা খুলে ভয়ে কাঁটা হয়ে রইল সে। এক ঘন্টা মানে যাট মিনিট মানে তিনশো যাট সেকেণ্ড।

রাসবিহারীবাবু অবশ্য পড়াতে এসে একেবারে অন্যরকম মানুষ। প্রথমদিন কোনও প্রশ্ন তো করলেনই না, বরং নিজেই বলতে শুরু করলেন কীভাবে ইংরেজরা বেনিয়ান হয়ে এসে এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে শুরু করল, তারপর রাজা হয়ে বসে তাদেব ভাষা, কৃষ্টি, আচার-আচরণ ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে এদেশের মানুষদের ভেতর। অথচ ভারতবর্ষে ইংরেজরা আসাব আগে বাণিজ্য করতে এসেছিল পর্তুগীর্জরা, ওলন্দাজরা, ফরাসিরা। তারা যদি এ দেশ দখল করে ফেলত তাহলে এদেশের মানুষদের শিখতে হতো পর্তুগীর্জ, ওলন্দাজ, বা ফরাসিদের ভাষা, কৃষ্টি ইত্যাদি। অবশ্য তারা রাজত্ব না করলেও অনেক পর্তুগীর্জ, ওলন্দাজ কিংবা ফরাসি শব্দ এর মধ্যেই বাংলাভাষার ভেতর এমনভাবে মিশে গেছে যে সেগুলো আর আলাদা করে বোঝাই যায় না এখন। বলতে বলতে রাসবিহারীবাবু চলে এলেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনায়। কোনও বিদেশি ভাষা শিখতে হলে তার সাহিত্য সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। তাহলে সে ভাষা শিখতে আগ্রহ বাড়ে, ইংরেজি সাহিত্য যে কতটা সমৃদ্ধ তাইই বোঝাতে শুরু করলেন নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। শেক্সপীয়ার থেকে শুরু করে চলে এলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ-ব্রাউনিং-শেলি-কিট্স-বায়রন পর্যন্ত।

শঙ্খর চোখের সামনে থেকে এতদিনকার একটা আবরণ যেন সরে গেল। সাহিত্য মানে শুধু গল্প নয়, তার সঙ্গে তার ভাষা, আবহ, লিখনভঙ্গি, অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে একটা অন্য পৃথিবী, সে কথা হঠাৎ অনুভূত হল তার কাছে। এসব কথা এতদিন শঙ্খকে কেউ বলেনি। হঠাৎ তার সামনে রাসবিহারীবাবু মেলে ধরলেন এক অন্য পৃথিবী, তাতে সহসা তার বয়স অনেকখানি বেড়ে গেল যেন। শঙ্খ বড় হয়ে উঠল আরও একটু। শরীরের বয়সে নয়। মনের বয়সে।

ঠিক একঘন্টা টানা বক্তৃতার পর রাসবিহারীবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল আবার আসবি। তবে দাঁড়া, কাল আটটার সময় আমার একটা অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তুই আরও সকাল-সকাল আয়। হ্যাঁ, ঠিক সকাল ছটা উনচল্লিশে আসবি।

পাঞ্চুয়ালিটি কাকে বলে তা শঙ্খকে একেবারে হাড়ে-হাড়ে বুঝিয়ে দিলেন রাসবিহারীবাবু। তার ঠাকুর্দা জীবেন্দ্রনাথের একটা সাবেককালের পকেট-ওয়াচ আছে। তাঁর জামায় বুক পকেটের ঠিক নীচে আর একটা পাশ-পকেট, টাকাকড়ি কিংবা জরুরি কাগজপত্র রাখার জন্য। ঘড়িটা থাকে তার ভেতর। ঘড়িটার আকার বেশ বড়সড়, রূপোর একটাকার ঠিক দ্বিগুণমাপের। তার ডায়ালে রোমান ভাষায় এক থেকে বারো পর্যন্ত সংখ্যা আঁকা। ঘড়িটার উপরের দিকে আংটা লাগানো, তাতে মোটা একটা কার বেঁধে কারের অন্যদিকটা আটকানো থাকে শার্টের বোতামের সঙ্গে। সময় কত তা জানার জন্য ঠাকুর্দা বারবার পকেট-ওয়াচটা বার করে দেখতে থাকেন। শঙ্খও আজকাল রাসবিহারীবাবুর চাপে ঘনঘন ঘড়ি দেখা শুরু করল। শুধু তাইই নয়, তার প্রতিদিনের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করল ঘড়ির সময় ধরে।

শুধু নিয়মানুবর্তিতাই তার রক্তের ভেতর বাসা বেধে ফেলল তাই নয়। তার চারপাশে তখন গড়ে উঠতে শুরু করল একটা অন্য জগৎ। বালককাল পার হয়ে সে হঠাৎ যেন উপনীত হল কৈশোরকালের দিকে। তার চারপাশে গাঢ় হয়ে ঘিরে ছিল যে রূপকথার পৃথিবী, তার খোলস যেন ছিঁড়ে গেল। পরিবর্তে রূঢ় হয়ে দেখা দিল অলিভার টুইস্টের দুঃখ, আঙ্কল টমের কেবিন, জাঁ ভালজাঁর কয়েদখানার ছবি। সবখানেই তখন এক প্রবল ধাক্কা। রাসবিহারীবাবু একদিন বললেন, ধাক্কা না খেলে মানুষ বড় হয় না, তার অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ে না। ঠেকে শিখতে শিখতে যে মানুষ বড় হয়, তার শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা।

শঙ্খও ক্রমাগত ধাক্কা খেতে শুরু করল। একদিন তিন্তিড়িপাড়া থেকে দুপুর রৌদ্রে ঘাম ঝরাতে ঝরাতে ছুটে এল পল্টন, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, শুনিছিস শঙ্খ, কী বেজায় একটা কাণ্ড ঘটেছে?

শঙ্খ তখন উমনো-ঝুমনোর পুতুল খেলা দেখছিল একমনে। সেদিন তখনও দুই বোনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়নি। কেবল বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়েছে মাত্র।

শঙ্খ চোখ বড় করে তাকাল, কী হয়েছে?

—সোলেমানদা তার নোতন-মারে নে পলায়ে গিইছে।

—পলায়ে গিইছে! শঙ্খ এ হেন আশ্চর্য কথা তার জীবনে শোনেনি। সোলেমানদা হঠাৎ তার মাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে কেন, কোথায়ই বা যাবে, তার কিছুই ভেবে পেল না। তাহলে কি তার বাপ মৈনুদ্দি খুব মারধোর করছিল নতুন-বৌকে? তাইই সোলেমান তার নতুন মাকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকবে বলে চলে গেছে?

পল্টন হি হি করে হাসল, বুঝলি, পাড়ার মোড়ে গহর মিঞা খুব রস করে গল্প করছে, সোলেমানদা নাকি তার নোতন-মারে নিকে করবানে।

উমনো এতক্ষণ পাকা গিন্নির মতো ঝুমনোর সঙ্গে দেনা-পাওনা নিয়ে দর-কষাকষি করছিল। ঝুমনো কোত্থেকে চমৎকার একটা পুঁতির হার জোগাড় করে এনেছে। উমনো সেই হারটা ছেলের বিয়েতে পণ হিসেবে চাইছিল, কিন্তু ঝুমনো সে হার কিছুতেই দিতে নারাজ, তাতে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায় যায়। উমনো রাগমাগ করে সবে বলতে যাবে, এমন হিরের টুকরো ছেলে জামাই হিসেবে পেতে গেলে ওটুকু পণ না দিলে হবে না। তার আগেই পল্টনের কথা শুনে তার যেন বাক্‌রোধ হয়ে গেল, চোখ থে করে বলল, বলিস কীরে পল্টন?

—হ্যাঁ উমনোদি, এই শুনে আলাম।

—ছি ছি, উমনো হাঁ করে জিব কাটল, এখন তো চারদিকে টি টি ক্কার পড়ে যাবে।

পল্টনও মুখে বেশ বয়স্ক-বয়স্ক ভাব করে, পড়ি যাবে কি, পড়ি গেছে এতক্ষণে। মৈনুদ্দি নাকি রোয়াব করছে খুব, বলছে, জলবিছুটি ঘষি দুজনেরে একসঙ্গে মেরে কবরে দেবে।

ঝুমনোও গালে হাত দিয়ে গিন্নি সেজে বলল, তা তো দেবারই কথা। নোতন-মারে নে ছেলে পলায়ে গেল, এ কি আর চাট্টিখানি কথা!

পল্টন ফের হি হি করে হাসল, মৈনুদ্দি এখন আর ওদের খুঁজি পাবে কোথায়। সে তো শোনলাম দু'জনে মিলি বর্ডার পার হয়ি পাকিস্থানে চলি গেছে।

উমনোও গালে হাত দিল, পাকিস্থানে?

—হ্যাঁ, গহর মিঞা তো তাইই বলল, বনগাঁ বর্ডার পার হয়ে চলি গেছে যশোরের দিকি।

উমনো-ঝুমনোর সঙ্গে শঙ্খও চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকে পল্টনের দিকে। ক'দিন আগেও সোলেমান মন খারাপ করে বসে থাকত সামনের একবিঘে ফালি জমিটার আলের ওপর। তার বাপ তাকে বিয়ে দেবে বলে ঘুরোচ্ছে খুব এমন বলত রোজ। মাঠে ঘাস তুলতে তুলতে নিড়ানি হাতে নিয়ে কেমন উদাস হয়ে যেত। চোখে ফেটে পড়ত রাগ, অভিমান। সেই সোলেমান এমন সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে তা ভাবতেই পারেনি কেউ।

খানিকক্ষণ থম হয়ে বসে উমনো হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে শঙ্খর দিকে তাকাল, বলল, তবে আমিও বলে দিচ্ছি, তোদের ওই পীরিতের কালোমানিকও এমন ধারাই করবে।

শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে বলল, কী করবে?

—ও-ও পলাবে। রোজ রাত্তির হলি লাবনি-বৌএর ঘরে গে ভিটির ভিটির করে। ঘাটের লোক তারে ডেকি ডেকি পায় না। কোনদিন শুনবি ওরা দুজনেও—

শঙ্খ অবিশ্বাসের সুরে বলল, যাহ্—

উমনো চোখমুখ পাকিয়ে বলে, যাহ্ আবার কী। আমি বলে দেলাম, দেখে নিস্।

—বাহ্, লাবনি-বৌএর তো বর আছে। তারে নে পালিয়ে যাবে কী করে?

—কেন, সোলেমানের নোতন-মার বর ছিল না? ওরা পলাই গেল কেন?

লাবনি-বৌ-এরশামলাপানা গোল মুখখানা চকিতে ভেসে ওঠে শঙ্খর মনে। নদীর ধার ঘেঁষে তার খড়ের চালের ঘরখানার দাওয়ায় বসে থাকে সর্বক্ষণ, কখনও বাচ্চাটাকে সামলাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায় একা একা। কখনও ঘর থেকেই আস্তে করে অথচ কালোমানিকের কানে যায় এমন স্বরে ডাক দেয়, একটুখানি আসবা? ছেলেটা বড্ড বায়না ধরিছে। কালোমানিক হয়তো তখন তার ছোট্ট ঘরখানায় বসে মনে-মনে সুর ভাঁজছে। নতুন কোনও গান শুনে এসেছে, সেটা তার আড়বাঁশিতে হয়তো তুলবে। ডাক শুনে তক্ষুনি একছুটে চলে গেল লাবনি-বৌএর চালায়। তার পর যতক্ষণ না ঘাটে কোন পারাপারের লোক এল ততক্ষণ দাওয়ায় বসে দুজনের

গল্প আর গল্প। মাঝেমধ্যে হাসির লহরাও ছোটায় দু'জনে, কে কী বলল তাতে কারোরই যেন গা নেই।

ভাবনাটা ভাবতে ভাবতে শঙ্খ থম্ মেরে গেল। হঠাৎ যেন শিরিয়ে উঠল তার শরীর। এমন অদ্ভুত সব ভাবনা ইদানীং তার মনকে ঘাই দিচ্ছে। তাতে সহসা আরও একটু বড় হয়ে ওঠে সে। তার পৃথিবী আরও খানিকটা বড়, আরও জটিল হয়ে উঠতে থাকে। চারপাশের সবুজ গাছপালা আরও ঘন হয়ে দানা বাঁধতে থাকে ক্রমশ।

বড় হয়ে ওঠার এই জটিল দিনগুলিতে হঠাৎ একটা বড় ধাক্কার সম্মুখীন হল শঙ্খ। একদিন ইস্কুলে গিয়ে শুনল, হরিসাধনবাবুর সঙ্গে আরও একদফা কথা কাটাকাটির পর রাসবিহারীবাবু নাকি কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে ছিলেন টিচার্সরুমে। তারপর হঠাৎ একখণ্ড কাগজ টেনে নিয়ে তাতে খসখস করে কিছু লিখলেন গম্ভীর মুখে। লেখা হয়ে গেলে কাগজটা আস্তে করে এগিয়ে দিয়েছেন হেডমাস্টারমশাই-এর টেবিলে, বলেছেন, কাল থেকে আমি আর স্কুলে আসব না।

রাসবিহারীবাবু রিজাইন করেছেন এই খবরটা বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করল ছাত্রদের মধ্যে। এই কয়েকমাসে অন্তত এটুকু বোঝা গিয়েছিল, পড়ানোর ব্যাপারে রাসবিহারীবাবু অসাধারণ কর্তব্যপরায়ণ। তাঁর সময়ানুবর্তিতা এবং নিয়ম নিষ্ঠা কিছুটা মাত্রাছাড়া হলেও তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি বেশ পছন্দ হয়েছিল ছাত্রদের। একদিন উপরের ক্লাসের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করে ঠিক করল, তারা হরতাল করবে। কোনও ছাত্রকে ক্লাসে ঢুকতে দেবে না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য সে হরতাল আর ডাকা হয়নি, কারণ ছাত্ররা তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে ব্যাপারটা নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ শুরু করলেন শিক্ষকরাই। যে নীলকান্তস্যার এতদিন রাসবিহারীবাবুকে ধর্মঘটে সামিল না হওয়ার জন্য দোষারোপ করতেন, কথা শোনাতেন প্রায়ই, তিনিই হঠাৎ টিচার্স-রুমে মিটিং করে বললেন, হেডমাস্টারমশাই হরিসাধনবাবুকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছেন। সেই সাহসেই তিনি রাসবিহারীবাবুকে বারবার অপমান করেন, তাঁকে রিজাইন করতে বাধ্য করেছেন। এর প্রতিকার না হলে তাঁরা ক্লাস বয়কট করবেন।

কয়েকদিনের মধ্যে ইস্কুলে বেশ একটা উত্তেজনার বাতাবরণ তৈরি হয়ে গেল। ছাত্রদের অনেকের মুখেই আফসোস শোনা যেতে লাগল, কী দারুণ পড়াতেন বল্!

বিশেষ করে মন-খারাপ হয়ে গেল শঙ্খর। সে সবেমাত্র পড়া শুরু করেছিল রাসবিহারীবাবুর কাছে, তাতে বাধা পড়ে গেল। হঠাৎ তিনি চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় সে আর তাঁর কাছে পড়তে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না। রোজ সকাল হলেই অভ্যেশ মতো রাসবিহারীবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার কথা মনে হতো, ইংরেজি বইগুলো দু-চারবার নাড়া চাড়া করত। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাটাই বিছিয়ে বসে যেত নিজের বাড়িতেই। সে এখন পড়তে গেলে রাসবিহারীবাবু কী মনে করবেন কে জানে।

রাসবিহারীবাবু পদত্যাগ করার পর শঙ্খদের ক্লাসে সেকেণ্ড পিরিয়ডে ইংরিজি পড়াতে এলেন স্বয়ং হেডমাস্টার সুরেশবাবুই। ভীষণ রাশভারী মানুষ, শাদা শার্ট আর ধুতিই পরে আসেন ইস্কুলে, তবু চালচলনে, ব্যবহারে কোথায় যেন একটা সাহেবি-সাহেবি ব্যাপার ফুটে ওঠে। হয়তো অল্পবয়সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে বিলিতি ধ্যানধারণা তাঁর মধ্যে মিশে গিয়েছিল। মাদারিপুর স্কুল মিশনারীদের অধীনে পরিচালিত, আর হেডমাস্টারমশাইও খ্রিস্টান, দুয়ে মিলিয়ে এই বিলিতি আবহাওয়া শঙ্খদের ভেতরেও চারিয়ে যেতে চাইত কখনো সখনো।

হেডমাস্টারমশাইএর অনেক কিছুই ছিল আশ্চর্যের, তাঁর শাদা শার্টের ধবধবে কলারের নীচে একখণ্ড শাদা রুমাল থাকে সবসময়। হয়তো ঘাম থেকে শাদা কলারটিকে রক্ষা করতেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যাপারটি তাঁকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিল অন্য শিক্ষকদেব থেকে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, চশমার কাচের নীচে এক জোড়া শাণিত চোখ, দেখলেই মনে হতো খুবই বাগী মানুষ।

কিন্তু তাঁর ইংরেজি পড়ানোর ধরনটি ভারী চমৎকার। হাতদুটি পেছনে ঝুলিয়ে, এক করতলে অন্য করতল ভাঁজ করে রেখে, শরীরটা সামনে সামান্য ঝুঁকিয়ে অনবরত পায়চারি করেন ক্লাসের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত, আর নিবিষ্টমনে উচ্চারণ করেন সেদিনের পাঠ। সামান্য বিদেশি অ্যাক্‌সেন্ট মিশিয়ে তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ খুবই মুগ্ধ করল শঙ্খকে। যখন গদ্য পড়ান তখন রীতিমতো নাটকীয় ঢঙে পড়াতে থাকেন। প্রতিটি বাক্যই যাতে গেঁথে বসে যায় ছাত্রদের মগজে। এক-একটি বাক্য কখনও দু-বার কখনও তিনবারও পড়ান। যখন পদ্য পড়াতে আসেন, তা উচ্চারণ করেন একান্তভাবে তন্ময় হয়ে। তবে সবচেয়ে বেশি নজর দিলেন ট্রানশ্লেসনে। বললেন, প্রথমে ভালো করে টেন্‌স্ শিখতে হবে। টেন্‌স্ সম্পর্কে জ্ঞান হলেই ইংরেজি লেখাব অর্ধেক পথ পাড়ি দেওয়া হয়ে গেল।

কয়েদিনেব মধ্যে শঙ্খরা বুঝতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে যতখানি রাশভারী কিংবা রাগী মনে হয়, হেডমাস্টারমশাই আসলে ততখানি নন। পড়ানোর সময় একটা অদ্ভুত আন্তরিকতা ভরা থাকে তাঁর মনের মধ্যে। পড়াতে পড়াতে প্রায়ই শঙ্খর দিকে তাকিয়ে বলেন, অ্যাম আই ক্লিয়ার?

শঙ্খ ঘাড় নাড়তেই আবাব পড়ানো শুরু কবেন পায়চারি করতে করতে।

গরমের ছুটি পড়তে খুব বেশিদিন আর নেই এরকম একদিন শঙ্খ খবর পেল, হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন রাসবিহারীবাবু। বয়স তেমন হয়নি, কিন্তু ইস্কুলের নানান্ ঝড়ঝঞ্ঝাটে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। একা একা বেশ মন মরা হয়ে থাকতেন বাড়িতে। কয়েক দিনের সামান্য জ্বরে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন নাকি। শঙ্খ তক্ষুনি ছুটল তাঁকে দেখতে। ভেতরে সে কিছুটা লজ্জিতও হয়ে ছিল। এতদিনের মধ্যে সে তো একবারও তাঁর খোঁজে নেয়নি।

শঙ্খকে দেখে রাসবিহারীবাবু ম্লান মুখে হাসলেন, কীরে, তোদের স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিলাম বলে রাগ করে আর পড়তে এলিনে?

মাথা নিচু করে রইল শঙ্খ। সে বলতে পারল না, আসল ঘটনা তা নয়। রাসবিহারীবাবু চাকবি ছেড়ে দেওয়ার পব তাকে আর পড়াবেন কি না এ বিষয়ে সে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল।

রাসবিহারীবাবু আবার বললেন, স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি বলে তোকে পড়ানোর চাকরি তো আর ছেড়ে দিইনি। আমি সুস্থ হয়ে উঠলেই তুই রোজ পড়তে আসবি।

শঙ্খ সেদিন একরাশ সবুজ নিঃশ্বাস বুকে নিয়ে ফিরে এসেছিল বাড়িতে। সে কেন এতদিন সংকোচের শিকার হয়ে ছিল তা ভেবে লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। সে কেন ভাবল, রাসবিহারীবাবু তাকে আর পড়াতে চাইবেন না! রাসবিহারীবাবুকে কেন এত ছোট ভেবেছিল মনে মনে!

বাড়ি ফিরেছিল একরাশ উল্লাস নিয়ে। কিন্তু ফিরে যা দেখল তাতে বুকের ভেতরটা কেমন ছাঁত করে উঠল তার। জীবেন্দ্রনাথ নাকি গঞ্জের হাটখোলায় হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছেন। গঞ্জের লোকজন তাঁকে ধরাধরি করে রিক্সায় তুলে পৌঁছে দিয়ে গেছে একটু

আগে। শরীর ভীষণ দুর্বল। গঞ্জের পশ্চিমপ্রান্তে সরকারি ডাক্তারের বাড়ি, এই এলাকার একমাত্র নামডাকওয়ালা ডাক্তার। তিনি তৎক্ষনাৎ এসে দেখে বলেছেন, দীর্ঘদিনের শূল ব্যথার প্রকোপে জীবেন্দ্রনাথের পেটে ঘা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখনই পরিপূর্ণ বিশ্রাম না নিলে গ্যাসট্রিক আলসার হয়ে যাবে শিগগির।

ঠাকুর্দার চোখমুখের অবস্থা দেখে শঙ্খর কান্না পেয়ে গেল।

পরদিন সকালে জীবেন্দ্রনাথকে আর একবার দেখতে এলেন সরকারি ডাক্তার। বিছানায় শুয়ে ছিলেন জীবেন্দ্রনাথ, উঠে বসলেন ধড়মড় করে। ধুতির ওপর চেক কাটা শার্ট, তার ওপর একটা পাত্‌লা জহরকোট পরা সরকারি ডাক্তারের বহুদিনের অভ্যাস। মাথায় একটা হ্যাটও পরে থাকেন সর্বক্ষণ, হ্যাট থেকে একটা বক্‌লস্‌ বেরিয়ে বাঁধা থাকে তাঁর চিবুকের সঙ্গে। বহুদূর থেকে সাইকেলে বসে থাকা তাঁর এই চেহারাটা স্পষ্টই চিনে ফেলা যায়। ডাক্তার বাড়িতে আসা মানেই সারা বাড়িতে একটা শোকের আবহাওয়া। তাঁর সাইকেল দেখেই মন খারাপ হয়ে গেল সবাইকার।

জীবেন্দ্রনাথের বুকে স্টেথো দিয়ে দেখতে দেখতে ডাক্তার বললেন, অসুখটা জোর বাড়িয়েছেন চাটুজ্জেমশাই, এখন মাসখানেক একদম বেড্‌রেস্ট, কোনও রকম কাজকর্ম করা চলবে না।

জীবেন্দ্রনাথ তাঁর শীর্ণমুখে হাসার চেষ্টা করলেন, আপনি তো বলেই খালাস ডাক্তার ঘোষ। কিন্তু আমি কোর্টে না বেরুলে এত বড় সংসারটা চলবে কী করে?

সরকারি ডাক্তার তখন খস্‌ খস্‌ করে লম্বা প্রেসক্রিপসন লিখছেন, কলম থামিয়ে বললেন, সে বললে তো চলবে না চাটুজ্জেমশাই। আপনার ঘাড়ে এখনও অনেক দায়িত্ব। সব ছেলেরা এখনও লায়েক হয়ে ওঠেনি। তাদের তো মানুষ করতে হবে। তা কত বয়স হল আপনার?

জীবেন্দ্রনাথ হিসেব করে বললেন, এই আটান্ন পেরিয়ে ঊনষাটে পড়েছি। উনিশশো সালে জন্ম।

—আটান্ন ঊনষাট তো কোনও বয়সই নয়। শুধু দুশ্চিন্তা করে করে এহেন বিচ্ছিরি রোগটা বাধিয়ে বসেছেন। অতিরিক্ত খাটুনি আর দুশ্চিন্তা থেকেই এসব রোগ হয়। অতএব বিশ্রামই হল এর আসল ওষুধ, তার সঙ্গে এই প্রেসক্রিপসনের ওষুধগুলো আনিয়ে নিন। নিয়ম করে ক'দিন খান। কোনও অসুবিধে হলে আবার খবর দেবেন আমাকে।

সরকারি ডাক্তার বাড়িতে এলে সামান্য ভিজিট নেন। এক একবারে একটাকা ভিজিট তাঁর। জীবেন্দ্রনাথের পকেট থেকে খুঁজে পেতে চারটে সিকি এনে সরকারি ডাক্তারের হাতে দিল রনো।

সরকারি ডাক্তার তাঁর সাইকেলে চড়ে বেল বাজিয়ে চলে যাওয়ার পর রনো বলল,

তোমার পকেটে আর তো টাকাপয়সা নেই, বাবা। ওষুধ আনতে হবে তো—

জীবেন্দ্রনাথ হাতে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, ডাক্তার দেখেছে এই ঢের, আবার ওষুধ লাগবে কী রে? অম্বলের অসুখ, ক'দিন সোডার জল খেলিই ব্যাথাবেদ্‌না কোথায় উবে যাবে দেখিস'খন।

রনো তখনও হাঁ করে আছে দেখে জীবেন্দ্রনাথ তাকে তাড়া দিয়ে বললেন, আবার দাঁড়িয়ে কী দেখছিস। বরং ঘরে চাল নেই এককুন্‌কেও। গঞ্জে হরেনমুদির দোকানে যা, বলবি বাবা কাল পাঁচসের চালের কথা বলে গিয়েছিল, সেইটে দিন।

বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জীবেন্দ্রনাথ, আগে খোরাকির জোগাড় করি, তারপর ওষুধ। নে যা—

বড়ো করে একটা ধমক দিতেই রনো মাথা নিচু করে সেঁধিয়ে গেল ঘরের ভেতর। তার একটু পরেই বেরিয়ে এলেন স্নেহবাসিনী, ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে বললেন, ওযুধ বিযুধ না খেলি সারবা কী করে? অসুখটা তো আর কম বড় নয়। ডাক্তার তো বেশ সাবধান করে দে গেল।

জীবেন্দ্রনাথ ততক্ষণে নীলসুতোর বিড়ি ধরিয়েছেন। ছোট ছোট টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন নাক দিয়ে। কিছুক্ষণ উদাসীন হয়ে ভাবলেন কিছু, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, অচিন কবে যেন বাড়ি ফেরবানে বলে গেল?

—সে তো বলে গেল মাইনে পেয়ে আসবে'খন। এখন তো সবে বাংলামাস পড়েছে। ইংরিজিমাস পড়তি এখনও দশ-বারোদিন। তদ্দিন ওযুধ না খেলি চলবে? যদি কোনও দোকানে ধারবাকি দেয় তো বলো, রনো গে নে আসবে'খনে।

জীবেন্দ্রনাথ ভুরুতে কোঁচ ফেলে মাথা নাড়তে লাগলেন, আর কত দোকানে কর্জ করব বলতি পার? ধারে ধারে গলা পর্যন্ত ডুবি আছে. অচিন আসুক, তারপর ওযুধপত্তোর যা কেনার কিনতি পাঠাব। এখন কোর্টের কাগজপত্তরগুলো দ্যাও তো। পরশু কোর্টে একটা কেস আছে। তার আরজিখানা লিখে ফেলি। তাতে আটআনা-একটাকা যা পাওয়া যায়—

স্নেহবাসিনী মুখ অন্ধকার করে সরে গেলেন সেখান থেকে। জীবেন্দ্রনাথ দাওয়ায় একা বসে-বসে শুধু বিড়ির ধোঁয়া ওড়াতে লাগলেন। তাঁর দু চোখ জুড়ে একটা ঘোলা চাউনি। ক্রমশ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে হাত-পা। নীলশিরাগুলো হাতের আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। মুখের চারপাশেও বড়-বড় শিরা। আজকাল চোখেও বড্ড কম দেখছেন। ছানি পড়তে শুরু করল কি না কে জানে। একা-একা বসে বিড়বিড় করতে লাগলেন, ছেলেগুলো চাকরি-বাকরি না পেলি কী আর করতি পারি? অবনীটা লেখাপড়া করল না। রনোটা ইস্কুল-ফাইনাল পাশ দে বসি আছে। এদের দুটোর গতি করতি পারলি হয়তো একটু সুসার হতো—

জীবেন্দ্রনাথের অসুস্থতার খবর পেয়ে পরদিন সকালেই ছুটে এল হীরালাল অধিকারী। ছোট্টখাট্ট মানুষটা চটিতে ফটাস ফটাস শব্দ তুলে হাঁটে। একটু জোরেই হাঁটে বরাবর। জীবেন্দ্রনাথ তখনও বিছানায় শুয়ে। পাদুটোয় তেমন জোর পাচ্ছেন না ক'দিন ধরে। হীরালাল এসে সোজা ঢুকে এল ঘরে, কী ব্যাপার তালুইমশাই, আপনি নাকি অসুখ বাধিয়ে বসেছেন?

জীবেন্দ্রনাথ ক্ষীণ শরীরে উঠে বসার চেষ্টা করলেন, মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, আর গেরো কপালে থাকলি কে খণ্ডাবে?

হীরালাল জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল, উঁহু, অসুস্থ হয়ে থাকা চলবে না। শিগগির

শিগগির ভালো হয়ে উঠুন। এখনও অনেক কাজ বাকি। পার্টি থেকে আমাকে মেলাই দায়িত্ব দিয়ে বসে আছে। আপনার মতো কর্মী লোকের সাহায্য না পেলে কি আমার পক্ষে একা সব কাজ করা সম্ভব?

জীবেন্দ্রনাথের শীর্ণ মুখচোখে একবিন্দু আশার আলো জ্বলে উঠল যেন, ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, এই দুর্বল শরীরে কি আর আগের মতো খাটতি পারব?

হীরালাল অধিকারী তাঁর ছোট মুঠিটি শূন্যে তুলে বলল, আলবৎ পারবেন। আপনাকে কিছু করতে হবে না, শুধু সামনে বসে থাকবেন। আপনার পাকা মাথার বুদ্ধি পেলে আমার আর কিচ্ছু চাইনে। বিধানবাবু তো এখন প্রায় সব ব্যাপারেই ফেলিওর। ওঁর নাকের ডগা দিয়ে নেহেরু 'মাসুল সমীকরণ' নীতি পাস করে দিলেন। এত বড় একটা দেশ, তার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত লোহা-ইস্পাতের পরিবহন খরচ কিনা এক করে দেওয়া হল! অথচ অন্য সমস্ত কাঁচামালের পরিবহন খরচে বৈষম্য রেখে দিলেন। তাতে ওয়েস্টবেঙ্গল কী ভয়ানকভাবে মার খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন? এখানকার ইন্ডাস্ট্রি থেকে অর্জিত মুনাফা নিয়ে অন্য রাজ্যে ইনভেস্ট করার সুযোগ করে দেওয়া হল। বিধানবাবু তার কোনও প্রতিবাদ করলেন না?

চিফ মিনিস্টারের নাম শুনলে জীবেন্দ্রনাথ আজকাল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। হীরালালের কথায় সায় দিয়ে বললেন, বিধানবাবুর দিন ফুরিয়ে এসেছে। যেদিন উনি রিফিউজিদের ভাতে হাত দিয়েছেন, সেদিনই উনি ওঁর গভর্ণমেন্টের কবর খুঁড়েছেন। তুমি দেখে নিও, হীরালাল, নেক্সট্ ইলেকশনে কংগ্রেস কীরকম গো-হারান হারে।

হীরালাল খুবই উল্লসিত হয়ে উঠল, ঠিকই বলেছেন তালুইমশাই। ওই যে রিফিউজিদের একটা অর্গানাইজেশন হয়েছে, ইউ.সি.আর.সি, আমি খবর পেয়েছি, ভীষণ স্ট্রং অর্গানাইজেশন। নেহেরু পাঞ্জাবের রিফিউজিদের জন্য এত এত টাকা খরচ করে তাদের সবাইকে সেট্‌ল করে দিলেন, আর পশ্চিমবঙ্গের রিফিউজিদের সময় হাত গুটিয়ে নিলেন। এতে কী ভীষণ এজিটেশন শুরু হয়েছে রিফিউজিদের ভেতর তার খবর তো পাচ্ছি। ইউ.সি.আর.সি এখন কমুনিস্টদের একটা বড় হাতিয়ার।

জীবেন্দ্রনাথও ঠিক একইরকমভাবে উত্তেজিত। বলতে শুরু করলেন, ওদিকে বিধানবাবুর ল-মিনিস্টার সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় রিজাইন করেছেন মাসতিনেক হল। তিনিও এখন কম্যুনিস্টদের সাপোর্ট নিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্রের বাই-ইলেকশনে লড়ছেন কংগ্রেসের বিজয় ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে। দেখে নিও, বিজয় ব্যানার্জী নির্ঘাত হারবে।

জীবেন্দ্রনাথের যে খুবই অসুখ, এই উত্তেজনায় তিনি আরও দুর্বল বোধ করছেন, তা চোখে পড়ছে না হীরালাল অধিকারীর। বরং জীবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে বরাবরই সে এতটাই সমর্থন পায়, তাঁর কাছ থেকে লড়াইএ নামার এমন প্রেরণা পায় যে এই মানুষটার উপস্থিতিই হীরালালকে আরও লড়াকু হয়ে ওঠার শক্তি জোগায়। আজও সেই সমর্থন পেয়ে হীরালাল আনন্দে, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল। নিজের মনেই বলল, ফুড্-পলিসিতেও ডাক্তার রায় একেবারে ব্যর্থ। গতবছর মোডিফায়েড রেশনিং চালু করেছেন। সারপ্লাস ডিস্ট্রিক্টগুলোকে কর্ডন করে দিয়ে ডেফিসিট ডিস্ট্রিক্টে ধানচাল নিয়ে যাওয়ার জন্য পারমিট-প্রথার ব্যবস্থা করলেন, তাতে কোনও সুরাহা হল? এ-বছর খাদ্য-সংকট শুরু হতেই বুঝলেন তাঁর পলিসি ফেল। এ-বছর ফুড-পলিসি আবার পরিবর্তন করেছেন। কর্ডন তুলে দিয়ে এবার পড়েছেন রাইস-মিলগুলোকে নিয়ে। তাদের উপর টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট লেভি চার্জ

করেছেন। ওদিকে ধানচাল যাতে রাজ্যের বাইরে না যায় তার জন্য রাজ্যের সব বর্ডার কর্ডন করে দিয়েছেন। তাতেও লাভ হল না কিছু। চাল এখন সাতাশ-আঠাশ টাকা মন। ভাবতে পারেন?

বলতে বলতে হঠাৎ বোধহয় তার নজর পড়ল জীবেন্দ্রনাথের দিকে। উত্তেজনায়, কথা বলার পরিশ্রমে তখন জীবেন্দ্রনাথকে কেমন ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য মনে হচ্ছে। শশব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি শুয়ে পড়ুন, তালুইমশাই। আমার এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না, আপনি বসে আছেন কষ্ট করে। সরকারি ডাক্তার তো আপনাকে দু'বার দেখে গেছেন শুনেছি। ওষুধ বিষুধ ঠিক সময়মতো খাবেন। আপনি ভীষণ নেগলেক্ট করেন নিজেকে।

যেমন দ্রুত এসেছিল হীরালাল, তেমনি ছোট-ছোট পায়ে চটির ফটাস ফটাস শব্দ তুলে চলে গেল আবার। জীবেন্দ্রনাথের হাতে যে একটিও পয়সা নেই, পয়সার অভাবে ওষুধ কিনতে পারেননি, তা একবারও মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে পারলেন না। হীরালাল ভারী ব্যস্ত মানুষ, তার ঘাড়ে এখন অনেক দায়িত্ব। দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে। কেউ কোনও বিপদে পড়েছে শুনতে পেলেই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তা ছাড়া অনবরত একবার কলকাতা একবার বসিরহাট ছুটোছুটি করতে হয় তাকে। এহেন মানুষটাকে এই ছোটখাটো ব্যাপারে বিব্রত করে লাভ কী।

স্নেহবাসিনী হঠাৎ এইসময় এক অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এলেন জীবেন্দ্রনাথের কাছে, ইতস্তত করে বললেন, খালপাড়ের কলাগাছে এককাঁদি কাঁঠালি কলা পেকে উঠেছে। রনো কি মণি যদি বাজারে গে বেচে আসে, তা'লে বোধহয় তোমার ওষুধ কেনার টাকাটা হয়ে যায়—

জীবেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, স্নেহবাসিনীর দিকে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে গেলেন, বলো কী, তুমি! চাটুজ্জেবাড়ির ছেলে হয়ে ওরা বাজারে কলা বিক্রি করতে যাবে? বলতে গিয়েও শেষপর্যন্ত কিছু বলতে পারলেন না। ক'দিন আগে গঞ্জের হাটে আতাবপুরের হীরু পোদ্দারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। হীরু পোদ্দার বেশ বড়ো ব্যবসায়ী, কথায় কথায় জীবেন্দ্রনাথকে প্রস্তাব দিয়েছিল, গঞ্জের মধ্যে ভালো একটা দোকানঘর আছে তার। জীবেন্দ্রনাথ চাইলে সেটি কিনে নিতে পারেন, অথবা মাস-মাস ভাড়ায় ব্যবহার করতে পারেন। মুদিখানার দোকান খুব ভালো চলবে। অবনী তো বসেই আছে, ওতে বসিয়ে দিলে টুকটাক রোজগার হবে দু-পয়সা।

ভেতরে-ভেতরে আপত্তি থাকলেও জীবেন্দ্রনাথ একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি কথাটা। ক'দিন ধরেই ভাবছেন, তাঁর শরীরের যা অবস্থা, অবনীটাকে একটা দোকান ফোকান করে দিলে হয়।

আজও সেই কথাটা মনের ভেতর পাক দিয়ে উঠতেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন স্নেহবাসিনীর দিকে। চাটুজ্জেবংশের ছেলে শেষ পর্যন্ত দোকানদারি করবে?
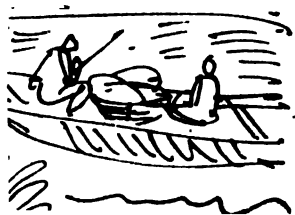
রনোকাকা নয়, কাঁঠালিকলার কাঁদি শেষপর্যন্ত চাপল মণিকাকার কাঁধেই। মণিকাকা ভীষণ অভিমানী, আত্মসম্মান জ্ঞানও প্রচণ্ড, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ গম্ভীর করে কাঁদিটা কাঁধে নয়, হাতে ঝুলিয়ে শঙ্খকে বলল, তুইও চল।

শঙ্খও চলল মণিকাকার সঙ্গে। কাজটা ঠিক কী ধরনের তা তখনও বুঝে উঠতে পারছিল না সে। বাজারে গেলেই কাঁদিটা কেউ টাকা দিয়ে কিনে নেবে এরকমই মনে হয়েছিল, কিন্তু মণিকাকা যখন চাটাই বিছিয়ে তার ওপর বসল সামনে কলার কাঁদিটা নিয়ে, বাজারের আরও অন্য আলুয়ালা, পটলওয়ালার পাশাপাশি, তখন একটা প্রবল অস্বস্তি ঘিরে ধরল তার শরীর। তারা দু'জনে তাহলে আজকের বাজারে কলাওয়ালা হয়ে গেল নাকি! শঙ্খ এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। গরমের ছুটি চলছে, তাদের ক্লাসের কোনও ছাত্র যদি হঠাৎ দেখে ফেলে তাহলে কী যে লজ্জার ব্যাপার।

মণিকাকার মুখের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল শঙ্খ। লজ্জায়, অপমানে তার মুখখানাও লাল হয়ে উঠেছে তখন। মাথা নিচু করে বসে নখ খুঁটছে একমনে। এর মধ্যে একজন লোক এসে তাদের সামনে নিচু হয়ে কলার কাঁদিটা দেখতে দেখতে বলল, কলা কত করে, খোকা?

মণিকাকা প্রথমটা উত্তরই দিতে পারল না যেন, তারপর অতিকষ্টে দাম বলল। বলতে গিয়ে গলা জড়িয়ে গেল তার। লোকটা ঠোঁট উল্টে বলল, এ তো সোনার মতো দাম বলছিস রে। তালে এ কলা আর বেচতি হবে না তোদের। যেমন কাঁদি তেমনি ঘাড়ে করে ফেরত নে যেতি হবে। দাম একটু কমিয়ে ব্যাচ্—

মণিকাকার মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। স্নেহবাসিনীই কলার সম্ভাব্য একটা দাম শিখিয়ে দিয়েছেন তাদের। সেইসঙ্গে ঠাকুর্দার অসুখের জন্য সরকারি ডাক্তার যে প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়েছিলেন সেটাও ভরে দিয়েছেন পকেটে। কলার কাঁদিটা যদি ঠিকঠিক দামে বিক্রি না করা যায়, তাহলে তারা ওষুধ কিনবে কী করে? মণিকাকা ঘাড় নেড়ে না বলতেই লোকটা মুখ বিকৃত করে 'ধু' বলে চলে গেল তৎক্ষণাৎ। মণিকাকা থতমত খেয়ে হঠাৎ শঙ্খকে বলল, তুই একটু বোস তো, আমি জেনে আসি, বাজারে কলার দাম কত করে যাচ্ছে।

মণিকাকা চলে যাওয়ায় ভীষণ ঘাবড়ে গেল সে। একা একা প্রমাদ গুনল। সেইমুহূর্তে আর একজন লোক এসে শঙ্খকে জিজ্ঞাসা করল কলার দাম। শঙ্খর মুখখানা তাতে লাল হয়ে উঠল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল মণিকাকার খোঁজে। কিন্তু মণিকাকা কোথাও নেই। বোধহয় কলার দাম জানতে অনেকটা দূরে চলে গেছে। এখন শঙ্খ কী করবে ভেবে পেল না। যদি ঠাকমার শেখানো দামটাই বলে লোকটার কছে, তাহলে নির্ঘাত এ-লোকটাও তাকে দু-কথা শুনিয়ে যাবে। কিন্তু দাম কমালে চলবে না। ওষুধ কিনতে হবে তো। সে আগের দামটাই বলল চোখকান বুজিয়ে।

দাম শুনে লোকটা থমকে দাঁড়াল। নিচু হয়ে কলার খোসা টিপে টিপে পরখ করতে লাগল। ভাবল কারবাইড দিয়ে পাকানো, না গাছপাকা! কিন্তু টিপে বোধহয় নিশ্চিন্ত হল, বলল, একডজন দে তো—

শঙ্খ আরও ফাঁপরে পড়ল। জীবনে প্রথমবার কলা বিক্রি করতে এসেছে, দাম বলতে গিয়েই তার চোখের সামনে নেমে এসেছে একরাশ অন্ধকার, এখন কাঁদি থেকে একডজন

কলা বেচে পয়সা গুনে নিতে হবে ভেবে গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠল। সে কাঁপা-কাঁপা হাতে একছড়া কলা ছিঁড়তে যেতেই লোকটা ধমক দিয়ে উঠল হঠাৎ, ওটা না, ওটা না, ওগুলো তো ছোটসাইজের, ওপরের ছড়া থেকে দে।

শঙ্খর হাতে আরও কাঁপন ধরল। কাঁদি থেকে অতবড় ছড়াটা ছিঁড়তে গিয়ে বুঝল, সেটাই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কাজ। টানাটানি করতে গিয়ে দুটো কলা আলাদা করে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল হাতে। তার মধ্যে একটা কলা তার হাতের চাপুনিতে নষ্টই হয়ে গেল প্রায়। শঙ্খ একলহমা থেমে এদিকে-ওদিকে তার চাউনি ছুড়ে দিল, যদি এর মধ্যে মণিকাকা ফিরে আসে, না দেখতে পেয়ে তার কান্না পেয়ে গেল। কাঁদি থেকে একছড়া কলা ছেঁড়াটা প্রায় অসম্ভব তার পক্ষে। একটা ছুরিও তাদের সঙ্গে নেই যে ছড়াটা কেটে বার করবে সে।

লোকটা তার অপদার্থতায় বিরক্ত হচ্ছিল। আবার এক ধমক দিয়ে বলল, দাঁড়া, এ তোর কম্মো নয়। আমিই ছাড়িয়ে নিচ্ছি, বলতে বলতে সবচেয়ে বড়ো ছড়াটা একমোচড়ে ছিঁড়ে পট করে ঢুকিয়ে নিল তার ব্যাগে। তাতে ঠিক ক'টা কলা আছে তা গুনে দেখাব ফুরসত দিল না লোকটা। একডজন কলার দাম তাকে বুঝিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে গেল অন্যদিকে।

মণিকাকা ফিরে এল একটু পরেই। বলল, বাজারে কলার দাম তো আরও বেশিই। মা তো দাম কম করে বলেছে। এ কি, তুই কলা বেচিছিস নাকি এর মধ্যে?

শঙ্খ ঘাড় কাত করে তার হাতের পয়সা এগিয়ে দিল। মণিকাকা গুনতে গুনতে বলল, একডজন! ওপরের ছড়াটায় তো পনেরটা কলা ছিল রে?

শঙ্খ অপরাধীর চোখ করে তাকাল। সে তখনই বুঝতে পেরেছিল, সবুজ লুঙিপরা লোকটা তাকে ছোটছেলে পেয়ে ঠকিয়ে গেল। লোকটার বয়স চল্লিশের ওপর। চোখটা গর্তের ভেতর ঢোকানো,মাথার চুল পাতলা। এখনও ইচ্ছে করলে লোকটাকে খুঁজে বার করতে পারবে বাজারের মধ্যে। কিন্তু মণিকাকা মাথা নাড়ল, ধুর, লোকটা বলবে, আমি পনেরটা কলারই দাম দিইছি। তারপর হৈ-চৈ হবে। চেনা লোক কেউ দেখে ফেললি সে খুব লজ্জার—

শঙ্খর ভারী অপমান লাগছিল। অত বড় একজন লোক তাকে এভাবে ঠকিয়ে দিয়ে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। এও তার জীবনে একটা বড় ধাক্কা। রাসবিহারীবাবু ঠিকই বলেছেন, ধাক্কা না খেলে মানুষ বড় হয় না। ধাক্কা খেতে খেতে মানুষকে চিনতে হবে ভালো করে—

আরও আধঘণ্টা ঠায় বসে থাকার পর মোটে দু'ছড়া কলা বিক্রি করতে পারল ওরা। তখনও অনেকটাই বাকি। যত সময় যাচ্ছে, ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকছে শঙ্খ। তার সমবয়সী কোনও ছেলেকে বাজারে ঘুরতে দেখলেই ভীষণ চমকে উঠছে। যদি তার ক্লাসের কোনও ছাত্র হয়! যদি সুবোধ, মহাদেব, পার্থ কিংবা সেরকম কেউ হয়! তাকে দেখে ফেললে ভীষণ হাসাহাসি করবে ওরা। সবাইকে বলবে, বুঝলি, শঙ্খ না কলা বিক্রি করছিল বাজারে বসে! হয়তো তার নামই দিয়ে দেবে, কলাওয়ালা।

ঠিক সেইমুহূর্তে মণিকাকা কী যেন দেখে চমকে উঠল, জিব কেটে বলল, এই রে—

শঙ্খ তটস্থ হয়ে ওঠে, কী হল, মণিকাকা?

মণিকাকার চোখমুখ ভয়ে লজ্জায় আবার থমথমে, ফিসফিস করে বলল, পণ্ডিতমশাই বাজারে এসেছে—

পণ্ডিতমশাই! মণিকাকার চোখ অনুসরণ করে শঙ্খর বুকের ভেতরটাও ধড়াস করে উঠল। ঠিকই তো, মস্ত একটা থলি হাতে নিয়ে পণ্ডিতমশাই এটা-ওটা কিনতে কিনতে এগিয়ে

আসছেন তাদের দিকেই। গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা লাগার মতো উঠে দাঁড়াল মণিকাকা, তুই একটু বোস, আমি ওদিকে লুকুচ্ছি। পণ্ডিতমশাই আমারে চেনেন। কলা বেচছি দেখতে পেলে—

বলতে বলতে মণিকাকা কোথায় যে গা ঢাকা দিল শঙ্খ হদিশ পেল না। ততক্ষণে সব্জীবোঝাই থলে হাতে নিয়ে টুকটুক করে পণ্ডিতমশাই এগিয়ে এসেছেন তার কাছেই। মণিকাকা লুকিয়ে পড়ল, শঙ্খ এখন কোথায় লুকোবে ভেবে পাচ্ছে না। চারপাশ আঁধার হয়ে এল তার। মনে হল, সীতার মতো সেও যদি 'ধরণী দ্বিধা হও' বলে পাতাল-প্রবেশ করতে পারত তাহলে বেঁচে যেত আজ। অন্তত খরগোশের মতো মাটির ভেতর মুখ চেপে যদি শুয়ে পড়তে পারত, তাহলে চিনতে পারতেন না পণ্ডিতমশাই।

সে সব কিছুই করতে পারল না শঙ্খ। শুধু তার চারপাশ ঘিরে জড়ো হয়ে এসেছে পৃথিবীর যাবতীয় অমানিশা রাত। তার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, তার মধ্যেই সে অনুভব করল, পণ্ডিতমশাইএর চোখ পড়ল তার সামনে রাখা কলার কাঁদিটার দিকে, পরমুহূর্তে তাকালেন তার মুখের দিকে, হয়তো একটু অবাক হলেন, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন পাশেই আলু-পেঁয়াজ নিয়ে বসে থাকা লোকটার দিকে। নিচু হয়ে দর করতে শুরু করলেন।

শঙ্খর গা দিয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে। বোশেখমাসের সূর্য তখন চড়চড় করছে মাথার ওপর। সেই কঠিন রোদ্দুর এতক্ষণ তেমন দুঃসহ মনে হয়নি, যতখানি তীব্র মনে হল পণ্ডিতমশাইএর বিস্ময়ে ওতপ্রোত হয়ে থাকা চাউনি। নিশ্চয় কাল টিচার্সরুমে গল্পের ছলে আলোচনা করবেন, জানেন, ক্লাস সেভেনের ফার্স্টবয় কাল বাজারে বসে কলা বিক্রি করছিল।

ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ ঝিম হয়ে বসে রইল শঙ্খ। পণ্ডিতমশাই তখন অনেকটা দূরে চলে গেছেন। মণিকাকা নিশ্চয় দূর থেকে সে দৃশ্য দেখেছে। একটু পরেই ফিরে এসে চাটাইএ বসতে বসতে বলল, কিছু বললেন পণ্ডিতমশাই?

শঙ্খ মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ল। তার ঠোঁট কাঁপছিল। সেদিন বাকি সময়টা কেটে গেল এক অসহ্য অপমানে, লজ্জায়। তবু শঙ্খ নিজেকে বারবার সান্ত্বনা দিতে লাগল, ঠাকুর্দার ওষুধ কেনাটা খুব জরুরি। ঠাকুর্দা এতকাল বটগাছের মতো সামাল দিয়েছেন এত বড় সংসার। তাদের জন্য ঠাকুর্দাকেও কম অপমান কম লজ্জা সইতে হয়নি প্রতিটি মুহূর্ত। কত দোকানে যে ধার করেছেন, আরও করতে হচ্ছে প্রতিদিন তার ইয়ত্তা নেই। অন্তত একদিন তাঁর জন্যে যদি তাদের সামান্য অপমানও সইতে হয় তাতে এত লজ্জা কিসের!

কাঁদির শেষ ক'ছড়া মণিকাকা একটু কম দামেই ছেড়ে দিল। তখন অনেকখানি বেলা হয়ে এসেছে। মাথার চাঁদি কড়ারোদ্দুরে ফেটে যাওয়ার জোগাড়। কোনও ক্রমে কাঁদিটা শেষ করে যে ক'টা পয়সা হল, তা দিয়ে ওযুধ কিনে নিল মণিকাকা। অবশ্য সব ওযুধ কেনা গেল না। তবু তাতেই অনেকখানি মনের জোর বেড়ে গেল তাদের। বড় বড় পা ফেলে বাড়ির পথে ঢোকার মুখে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অর্ঘদার সঙ্গে। অর্ঘদার মুখে দাড়ি আরও ঘন হয়ে উঠেছে এতদিনে। গোঁফদাড়িতে তার মুখ প্রায় ঢেকে গেছে অর্ধেক, চুলও বড় বড় রেখেছে আজকাল। শঙ্খদের দেখে হাসল অল্প করে। বলল, কালোমানিকরে নাকি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ পলিয়ে গেছে। শঙ্খরা চমকে উঠে বলল, সে কি! তবু আশ্বস্ত হল শুনে যে, সে একাই গা ঢাকা দিয়েছে, লাবনি-বৌকে নিয়ে নয়।

শঙ্খ তার বিস্ময় কাটিয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ, অর্ঘদা?

অর্ঘদা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, তোমাদের বাড়ি কে যেন এয়েচে, দ্যাখো গে—

—কে এয়েচে?

অর্ঘদা ঘাড় নাড়ল, সে চেনে না নতুন লোকটাকে। শুধু বলল, কুটুম বোধ হয়।

হাঁটিতে হাঁটিতে অর্ঘদা চলে গেল খেয়াঘাটের দিকে। হয়তো কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবে নদীর ধারে, কদম গাছটার নীচে। নদীর স্রোত দেখবে আপনমনে! কতক্ষণ সে-ই জানে।

অনেক চেষ্টার পর এ-বছর ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে অর্ঘদা। তবে শঙ্খদের মাদারিপুর হাইস্কুলে নয়, এমনকি তাদের পাশের গাঁয়ের তেজেন্দ্রনাথ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়েও নয়। কাঁকিদহ থেকে আসার সময় ওখানে যে-ইস্কুলে পড়ত, সেখান থেকে ট্রান্সফার-সার্টিফিকেট আনেনি যে! তাতে কোনও ইস্কুলেই ভর্তি করতে চায়নি অর্ঘদাকে। শেষে অনেক খোঁজাখুজি করে জানা গেল, ওপারে চিংড়িপোতায় নতুন যে হাই-ইস্কুল খোলা হয়েছে এ বছর, তাতে ক্লাস টেনে ভর্তি করছে এ ধরনের ছাত্রদের। তারা ছাত্র পাচ্ছে না বলেই—

চিংড়িপোতার নতুন ইস্কুলে ভর্তি হতে পেরে অর্ঘদাও বর্তে গেছে। খেয়া পার হয়ে সেই অচেনা গাঁয়ে যেতে পারে রোজ। তাতে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। শঙ্খকে বলেওছে একদিন, ঈশ্বরীপুর গঞ্জ পার হয়ে মাদারিপুরে রোজ যেতে হলে আমার গায়ে জ্বর আসত। বেশি লোকজন আমার সহ্য হয় না। চিংড়িপোতাই আমার কাছে ঢের ভালো। বেশ নিরিবিলি জায়গা। কেউ আমারে চেনবে না—

আসলে অর্ঘদার স্বভাবটাই অমনি। ভিড়ের থেকে আড়াল হয়ে নির্জন কোনও নদীর ধারে, কিংবা গাঁয়ের থেকে দূরে কোনও আমবাগানে একলা-একা সময় কাটানোই তার পছন্দ। শঙ্খর প্রায়ই মনে হয়, কবিটবি হলেই অর্ঘদাকে মানাতো বেশি। অক্ষয়কুমার বড়াল কিংবা যতীন্দ্রমোহন বাগচির কবিতা পড়তে পড়তে কখনও অর্ঘদার কথা মনে পড়ে শঙ্খর। কিন্তু অর্ঘদা তো কবি নয়, শিল্পী। হয়তো শিল্পীরাও এমনি একলা-একা থাকতে পছন্দ করে।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি পৌঁছে যে কুটুমকে শঙ্খরা দেখতে পেল তা সত্যিই আশ্চর্য করে দেওয়ার মতো। আতাকাকাকে সেই কবে দেখেছে, ক্লাস ওয়ান কি টু-তে পড়তে, তা মনে করতে পারে না। এখন বেশ শৌখিন সাজপোশাক পরে এসেছে। ফিনফিনে ধুতির ওপর গরদের জামা। বেশ ঝকমকে লাগছে আতাকাকাকে। শঙ্খকে দেখে তার মাথার চুল ঘুটে দিয়ে বলল, ওরে ব্বাস, তুই যে বেশ ডাগর হয়ে উঠিছিস।

আতাকাকা শঙ্খর মেজ ঠাকুর্দার ছেলে। মেজঠাকুর্দারা এখনও পাকিস্থানেই পড়ে আছেন। সাতক্ষীরের ভিটে ছেড়ে জীবেন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে রওনা দিয়েছিলেন এ-পারের উদ্দেশে, তখন মেজঠাকুর্দা নগেন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন, তোমরা গেলি যাও। আমি বাপ-পিতামোর ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও নড়ছি নে।

আতাকাকার এ বাড়িতে আসা মানে বেশ একটা হৈ-চৈ। তাদের ফেলে-আসা ভিটেবাড়ি এখনও সামলে সুমলে আছে তারা। সাতক্ষীরের সে-বাড়ি শঙ্খ কখনও চোখে দ্যাখেনি, মণিকাকারও মনে নেই, কিন্তু অবনীকাকা, রনোকাকার মনে আছে। তারা আতাকাকাকে ঘিরে ধরে বলছে, আমাদের ঘরগুলো এখনও আছে, আতা? সেই নারকেল গাছগুলো? সেই দিঘিটা, সেই আমবাগান?

আতাকাকা ঘাড় নেড়ে জানাল, তোমাদের ঘরগুলো আর রাখা গেল না। ভেঙি পড়ছে—

ভেঙে পড়ছে শুনে সবাইকার চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া। আর কোনদিনও সাতক্ষীরার

ভিটেবাড়িতে যে ফিরে যাওয়া যাবে না তা যেন মনে থাকে না কারও। এমনকি ঠাক্‌মাও ক্ষুন্নমনে বললেন, তোদের হাতে ফেলে রেখি চলে এইছি, দ্যাখ্‌, চেষ্টাচরিত্তির করে ঠেকানো যায় কি না—

আতাকাকা হেসে বলল, আমরাই চলে আসার চেষ্টা করছি এখন। ও দেশে যা অত্যাচার শুরু হয়িছে, ক'দিন থাকা যাবে বলতি পারছি নে। সেদিন দুপুরটা শঙ্খদের কাছে একটা অন্যরকম আশ্চর্য হওয়ার দিন। ছোটবেলা থেকেই শঙ্খ জানে, আতাকাকা ডাকাবুকো স্বভাবের। এও শুনেছিল, মেজঠাকুর্দার ছেলেরা বেলাক করছে আজকাল। বেলাক কী জিনিষ তা শঙ্খ জানত না। এদিনই প্রথম জানল আতাকাকার সঙ্গে সারাটা দুপুর কাটিয়ে। খাওয়াদাওয়ার পর ঘরের দরজা ভেজিয়ে আতাকাকা একটা অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাল তাকে আর মণিকাকাকে। যে ফিনফিনে ধুতিটা পরে এসেছিল, তার কোমরে বাঁধা ছিল একটা টাকাব গেঁজে। বেল্টের মতো করে বেঁধে এনেছে বেশ তৈজস করে। সেটা কোমর থেকে খুলে এনে চৌকির ওপর উপুড় করে ধরল আতাকাকা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল তাদের। গেঁজের ভেতর থেকে টুপ টুপ করে খসে পড়তে লাগল এক-একখানা বিস্কুট। সব বিস্কুটই সোনার। সোনার! শঙ্খরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আতাকাকার দিকে। আতাকাকার সারা মুখ জুড়ে তখন রহস্যময় হাসি। বলল, কাল ভোর-ভোর উঠি কলকেতা যেতি হবে। বিস্কুট ক'খান বড়বাজারের আড়তে পৌঁছে দিতি পারলিই নগদ পাঁচশো টাকা।

—পাঁচশো! শঙ্খদের চোখ তখন এক বিপুল ঐশ্বর্যের কথা ভেবে ঠিকরে বেরোতে চাইছে। মাত্র কয়েকটা পয়সাব জন্যে বাজারে হাজার লোকের সামনে বসে শঙ্খদের কলা বিক্রি করতে যেতে হয়, আর আতাকাকা কয়েকখানা সোনার বিস্কুট সাতক্ষীরে থেকে নিয়ে এসে কলকাতায় পৌঁছে দিলেই পাঁচশো টাকা পাবে!

আতাকাকা হাসতে হাসতে বলল, এ সব কাজে কত রিক্‌সি জানিস্‌! বর্ডারে ধরা পড়লি বাইফেলের এক গুলিতে বুক ঝাঁঝরা করি দেবে। না হলি অন্তত হাজতবাস।

শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে আতাকাকার ফিনফিনে ধুতি আর গরদের ঝলমলে জামার দিকে তাকিয়ে দেখে। যে সাইকেল চড়ে সে এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে সেটাও নতুন, ঝকঝকে। শঙ্খর যেদুই ঠাকুর্দা তাদের ভিটেবাড়ি জমিজমা ফেলে এপারে চলে এসেছে তাদের সব সম্পত্তিই আগলে রেখে ভোগ করছে আতাকাকারা। তাতেই তাদের মস্ত বড়লোক হওয়ার কথা। তার উপর তারা বেলাকের ব্যবসা করছে আরও বড়লোক হওয়ার জন্য। হয়তো টাকার পাহাড় করে তাব ওপর বসে থাকতে চায় আতাকাকারা। তাই এহেন 'রিক্‌সি' নিয়ে সোনার বিস্কুট কোমরের গেঁজেয় বেঁধে পার হয়ে চলে আসছে বর্ডার।

শঙ্খ আর মণিকাকা একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক হয়ে। মানুষ এত ঝুঁকি নিয়েও টাকার পাহাড়ের ওপর বসতে চায় কেন কে জানে। শঙ্খরা পাহাড় চায় না, টিলা বা ঢিবিও নয়, শুধু কর্জ না করে দু-বেলা পাত্‌ পেড়ে যদি পেট ভরে খেতে পারত! যদি ঠাকুর্দাকে ধারে ধারে চুল বিক্রি না করতে হতো, শুধু তা হলেই বর্তে যেত ওরা।

এতসব ভাবনায় শঙ্খরা যখন একগলা আশ্চর্যের ভেতর ডুবে আছে, আতাকাকা হঠাৎ বলে উঠল, উই দাড়িঅলা ছেলেটা কেডা রে?

—দাড়িঅলা ছেলে! শঙ্খ চোখ তুলল। একটু পরে বুঝতে পেরে বলল, তুমি অর্ঘদাব কথা বলছ?

—ওর নাম অর্ঘ নাকি? আতাকাকাও কিছু যেন ভাববার চেষ্টা করছে, এ বাড়িতে আসার সময় তখন শীতলাতলার কাছে ওরে দেখে মনে হল, চেনা-চেনা।

শঙ্খ হেসে উঠল, তুমি ওকে দেখনি, আতাকাকা। অর্ঘদা ঈশ্বরীপুরে এয়েছে মাত্তর একবছর হতি চলল, কি তার এট্টু বেশি।

—তাই! আতাকাকা তখন তার সামনে ছড়ানো সোনার বিস্কুটগুলো একটা-একটা করে গুছিয়ে ভরছে গেঁজের ভেতর। গোছগাছ করে বলল, কাল ভোরে উঠিই আমি কলকেতা যাব। সাইকেলটা তোদের বাড়ি রইল। আমি কাল বাদে পরশু ফিরি আসব'খন। তারপর সাইকেল নে ফের সাতক্ষীরে।

সোনার বিস্কুটগুলো তখনও শঙ্খব চোখের সামনে ঝলঝল করছে। সেই ঐশ্বর্যের ঝলমলানি দেখে তার ভেতরে তখন এক ধরনের অস্বস্তি। আতাকাকা কত অনায়াসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। টাকা রোজগারের জন্য। কিন্তু সে টাকা তো টাকা নয়। পাপের টাকা।

আতাকাকার রোজগারের বহর দেখে শঙ্খদের বাড়ির সবাই বলাবলি করতে লাগলো, এভাবে বড়লোক হওয়ার চেয়ে না হওয়াই ভালো। হ্যাঁ, যদি একটা চাকরি জোগাড় করতে পারতো তো বোঝতাম।

ঈশ্বরীপুরের মানুষ টাকা রোজগারের দাম তত দেয় না, যত দেয় ভালো একটা চাকরি পাওয়ার দাম। একটা চাকরির জন্য সবাই হাঁ করে বসে আছে।

ঠিক সে সময় সবাইকে অবাক করে খবর এল, কোথাও পালিয়ে যায়নি কালোমানিক। একটা চাকরি পেয়েছে সে। তাই উধাও হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। চাকরি পেল খেয়াঘাটের মাঝি কালোমানিক। খুব আশ্চর্যই বটে।

জীবেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বললেন, কালোমানিক পুলিশের চাকরি পেয়েছে?

—হ্যাঁ, পুলিশের চাকরি। পুরুলিয়া না বাঁকুড়া, কোথায় যেন আছে। পোস্টোকার্ড এয়িচে—

জীবেন্দ্রনাথের ঠোঁটে তখনও বিড়ির টুকরো ধরা আছে। বিড়ির নীলসুতোটুকুও পুড়ে গেছে কখন, তবু সম্বিতবিহীন হয়ে আছেন। চোখের দৃষ্টি আব্ছা হয়ে এসেছে। ঝাপ্সা চোখ মেলে ভাবছেন, তাঁর রনো স্কুল ফাইন্যাল পাস দিয়ে বসে, চাকরি জোটাতে পারল না, আর কালোমানিক সামান্য লেখাপড়া জানে, তাতেই চাকরি পেয়ে গেল! তাও যে-সে চাকরি নয়, পুলিশের দপ্তরে!

হঠাৎ রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে কালোমানিক—ঘটনাটা এভাবে চাউর হলেও আসলে সে যে একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলেছে তা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি কারও কাছে। হঠাৎ কেন যে না বলে চলে গেল তাও স্পষ্ট হচ্ছে না। যখন সবাই তার সন্ধানে খোঁজ-খোঁজ করছে, তখনই একটা পোস্টকার্ড এসে পৌঁছেছে। তাতে ঠিক পরিষ্কার করে বলা নেই, ঠিক কোন জায়গায় তার চাকরি।

জীবেন্দ্রনাথ বিড়বিড় করলেন নিজের মনে—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া! বাপ্‌রে, সে তো খরার দেশ। এই ক'দিন আগেও পুরুলিয়া ছিল বিহারে। মাত্র বছরদুয়েক আগে, ফিফ্‌টি সিক্সে, 'স্টেট রিঅরগানাইজেসন কমিটি'র সুপারিশে বিহারের মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহাকুমা ও পূর্ণিয়া জেলার কিষেনগঞ্জ মহাকুমার কতক জায়গা চলে এসেছে পশ্চিমবাংলার মধ্যে। সে জেলা তো ঈশ্বরীপুর থেকে বহুদূর!

তবু চাকরি চাকরিই। জীবেন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন, তপশীলজাতির জন্যে নতুন কোটা হয়েছে চাকরির, তাতেই কাজ পেয়েছে কালোমানিক।

হঠাৎ খেয়াঘাটের হাল-বৈঠা ছেড়ে কালোমানিক বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে এ যেন প্রায় গল্পকথার মতো। জীবেন্দ্রনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সরকার রিফিউজিদের জন্য সব সুযোগ-সুবিধেই তুলে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। রনোটা একটা চাকরি পেলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। এত বড় সংসার এখন কী করে চলবে ভাবতে ভাবতে আরও বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন তিনি।

বেশ কিছুদিন হয়ে গেল বাড়ি থেকে আর বেরুচ্ছেন না জীবেন্দ্রনাথ। কখনও বিকেলের দিকে পায়ে-পায়ে পায়চারি করতে করতে চলে আসেন শীতলাতলার দিকে। সেদিন হঠাৎ সেখানে দেখা হয়ে গেল যতনখুড়োর সঙ্গে। যতন একটা লজেন্স-বিস্কুটের দোকান খুলেছে ঠিক শীতলাতলার গা ঘেঁষে। জীবেন্দ্রনাথকে সেখানে দেখে গড় হয়ে প্রণাম করে বলল, আসুন ঠাকুরমশাই, আমার দোকানে একটু পায়ের ধুলো দিন।

জীবেন্দ্রনাথ যতনখুড়োর দোকানের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন। বেশ তকতকে করে নিকোনো মেঝে। দেয়ালও ঝকঝকে করে লেপা, তাতে কয়েকটা তাকে পর-পর বয়েম সাজানো। এপাশে ওপাশে লাল-নীল-সবুজ কাগজ কেটে মালার পর মালা ঝুলিয়ে রাখায় চমৎকার লাগছে দোকানটাকে। ওপাশে শোলার একটা চাঁদমালাও ঝুলিয়ে রেখেছে।

দোকানের সামনের দিকে রাখা একটা বেঞ্চে উবু হয়ে বসলেন জীবেন্দ্রনাথ, একটা বিড়ি ধরালেন জুত করে, ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কেমন চলছে দোকানটা?

যতন হাত কচলাতে কচলাতে বলল, ভালোই বিক্রিবাটা হচ্ছে। খেয়াঘাটের লোকজন নৌকোয় ওঠার আগে এটা ওটা কিনে নে যাচ্ছে।

কালোমানিক যে পুলিশে চাকরি পেয়েছে, তা যতনের কাছেই প্রথম শুনলেন জীবেন্দ্রনাথ। বিড়িতে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকিয়ে দেখছেন দোকানটা, এখনও কিছু তাক ফাঁকা রয়েছে, ভরে গেলে বেশ জমাটি দোকান হবে এমন ভাবছেন, সেই সময় খবরটা তাঁর কাছে ভাঙল যতন, বলল, শুনিছেন ঠাকুরমশাই, আমাদের কালোমানিক একখান চাকরি পেইছে পুলিশে।

জীবেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? বলো কী?

—হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরিটা পেয়ে গেল। কালোমানিক আবার আমার সম্বন্ধীর ছেলে কিনা—

জীবেন্দ্রনাথ ততক্ষণে নিজের ভেতরে হারিয়ে গেছেন কী যেন ভাবতে ভাবতে। যতনের তা নজরে পড়ল না। সে আবার বলল, বোঝলেন ঠাকুরমশাই, আমার ছেলেটাও আপনার নাতির সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। সেও এবার ভালোভাবে পাশ দে কেলাসে উঠিছে। দেখবেন কালে কালে সেও মস্ত বড় একটা চাকরি জুটাই নিবে।

জীবেন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন, সে তো নিশ্চয়, সে তো নিশ্চয়।

তেমনি অন্যমনস্কভাবেই সেদিন হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলেন জীবেন্দ্রনাথ। ফিরতে গিয়ে দেখলেন, শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে যেন। গা টলে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে রনোকে দেখে মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল, একটু ঝেঁঝে উঠে বললেন, ঘাটে খেয়া বাইত যে ছোঁড়াটা, পেটে একফোঁটা বিদ্যে নেই, সে পর্যন্ত পুলিশে একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলাল, আর তুই একটা পাশ দে বসে আছিস, তোর কপালে চাকরি জোটে না?

সেদিন জীবেন্দ্রনাথ বকাঝকা শুরু করলেন মণিকেও, কোথায় রাতদিন টো-টো করে ঘুরিস, এত বড় একটা গ্রীষ্মের ছুটি পার হয়ে গেল,আর বইএর পাতা ছুঁতি দ্যাখলাম না একফোঁটা?

জীবেন্দ্রনাথ যেদিন ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, সেদিন বাড়ির সবাই কাঁটা হয়ে থাকে। বেশ ক'দিন ঘরবন্দি হয়ে আছেন বলে রাগের প্রকোপ একটু বেশিই প্রকাশ পাচ্ছে আজকাল। হঠাৎ একটা কাজের মানুষ ঝপ্ করে বসে গেলে হয়তো এমনই হয়। অচিন চাকরি পাওয়ার পর মাস গেলে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ যা পারে মাসপয়লা বাড়ি এসে তাঁর হাতে দিয়ে যায়। তার সঙ্গে তিনি কোর্ট থেকে যা অল্পসল্প আয় করছিলেন, তা দিয়ে সংসারটা সবে একটু সুসার হওয়ার মুখে। ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ তিনি বসে গেলেন আচমকা। তাতে যে আকাল ছিল সংসারে তেমনিই রয়ে গেল। এখন কবে তিনি শরীরে একটু জোর পাবেন, আবার যেতে পারবেন কোর্টে তা বুঝতে পারছেন না। সেদিন সরকারি ডাক্তার দেখতে এসেছিলেন ফের। হার্ট দেখে, প্রেসার মেপে রীতিমতো তাড়া লাগালেন তাঁকে, এই বয়সে শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো এমন জং পড়িয়ে ফেললেন কী করে চাটুজ্জেমশাই? বেশি দুশ্চিন্তা করেন আপনি। আটান্নবছর কি কোনও বয়স!

দুশ্চিন্তা তো গত দশবছর ধরেই করতে হচ্ছে জীবেন্দ্রনাথকে। সেই যেদিন শুনলেন, খুলনা আর হিন্দুস্থানে নেই, পাকিস্থানে পড়েছে, সেদিনই মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছিল।

সাতচল্লিশ সালে চলে এসেছিলেন এ দেশে, এই আটান্নয় পৌঁছে হঠাৎ জীবেন্দ্রনাথের কেন যেন মনে হতে লাগল, এবছর বোধহয় আরও একবার দুর্ভিক্ষ হবে। আঠাশ-উনত্রিশ টাকা চালের মন ক'বছর আগেও চিন্তা করা যেত না। তার উপর সরকারি নীতি যেভাবে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছে, ব্যর্থ হয়ে বারবার নীতি পরিবর্তন করছেন সরকার, অবস্থাটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে দিনদিন। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় যেরকম হয়েছিল, তেমনি মজুতদার আর মুনাফাখোরদের হাতে চলে যাচ্ছে সমস্ত চাল-গম-ডাল।

এক-এক সময় মনে হয় জীবেন্দ্রনাথের, আর বাঁচাতে পারলেন না, সংসারটা এবার জলে ভেসে যাবে। শরীরের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। দু-দুটো ছেলে কতদিন ধরে বেকার, একটা তো এখনও নাবালক। তিনি না থাকলে এদের কী অবস্থা হবে তা ভাবতেও শিউরে ওঠেন।

একদিন দাওয়ায় বসে এতসব ভাবতে ভাবতে ডাকলেন রনোকে। বললেন, তুই একবার বসিরহাটে যা। ওখানে অনাথ-উকিলের সঙ্গে দেখা করবি, বলবি, বাবা অসুস্থ, আমাকে

পাঠালেন, যদি আপনার কাজে আমাকে দিয়ে কোনও সাহায্য হয়। খুব ভালো লোক। আমার নাম করে বলে দ্যাখ্, যদি ওঁব সেরেস্তায় কোনও কাজটাজ দেন—

দু-তিনদিন যাতায়াত করার পর রনো একদিন বলল, অনাথবাবু বলেছেন, মাঝে মধ্যে খবর নিতে।

দিনসাতেক পরে খবর পেলেন, অনাথ উকিল রনোকে বলেছেন, আসা-যাওয়া করতে থাকো। কিছু-না-কিছু কাজ জুটে যাবে একটা।

খবরটা শুনে জীবেন্দ্রনাথের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ মনে হল, তাঁর উচিত ছিল, তিনি যখন নিয়মিত যাতায়াত করতেন কোর্টে, তখনই রনোকে তাঁর সঙ্গে কোর্টে নিয়ে যাওয়া, তাঁর কাজকর্ম বুঝিয়ে দেওয়া। তাহলে এতদিনে ও নিজেই হয়তো শুরু করে দিতে পারত মুহুরিগিরি। এ দেশে কেউ কাউকে সাহায্য করবে না। লড়াই করে জুটিয়ে নিতে হবে যার-যার খোরাকি।

বসিরহাটে কয়েকদিন যাতায়াত করতে করতে হঠাৎ আর একটা অদ্ভুত খবর নিয়ে এল রনো। বলল, সেট্‌লমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে জমিজমার যে মাপজোক হয়েছিল দু'বছর আগে, তার বোধহয় একটা হিল্লে হতে চলেছে। বাস্তু ভিটা রেকর্ড করা হবে প্রত্যেকের নামে-নামে। তার আগে একটা নোটিশ জারী করা হচ্ছে—

শুনে জীবেন্দ্রনাথের মনে একই সঙ্গে আশা ও আশঙ্কা। যে বাস্তুভিটায় তাঁরা বসবাস করছেন তা আনন্দ চাটুজ্জের জমি। কেবল মৌখিক অনুমতিতেই তাঁরা বসবাস করছেন আজ এগারবছর ধরে। লিখিত কাগজপত্রও কিছু নেই। এতদিন পর নতুন করে কোনও বিপত্তির সৃষ্টি হবে না তো! সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল, কিছুদিন আগে শুনেছিলেন, যে-সব উদ্বাস্তু পঞ্চাশসালের মধ্যে এসে অন্যের পতিতজমিতে মৌখিক অথবা বিনা অনুমতিতে, অথবা জবরদখল করে বসবাস করছেন, সরকার থেকে সে-সব জমি অধিগ্রহণ করে উদ্বাস্তুদের অনুকূলে সত্ত্ব দিয়ে দেওয়া হবে।

ভুরুতে কোঁচ ফেলে বললেন, ভালো করে খোঁজখবর নে তো। অনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করিস, শেষে উচ্ছেদ করে দেবে না তো এত বছর বসবাসের পর?

কয়েকদিন পর রনো এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে এসে জানাল, এটা উদ্বাস্তুদের ব্যাপার নয়, সেট্‌লমেন্ট দপ্তরের কে-বি অপারেশন হয়েছে। মনে হচ্ছে মালিক আপত্তি না করলে আমাদের নামেই রেকর্ড হবে বাস্তুভিটা।

খুব অন্যমনস্ক হয়ে বিড়িতে টান দিতে লাগলেন জীবেন্দ্রনাথ। এপার বাংলায় এসেছেন দীর্ঘ এগারবছর। স্বাধীনতার এগারবছর পরেও একটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এখনও গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। নিশ্চিন্ত রোজগারের কোনও ব্যবস্থা তো হলই না, এমনকি বাস্তুভিটেটুকু পর্যন্ত আজও নিশ্চিন্ত নয়। আরও কতকাল এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হবে কে জানে!

'মালিক যদি আপত্তি না করে' শব্দগুলো জীবেন্দ্রনাথের মাথায় ঘুবতে লাগল। আনন্দ চাটুজ্জের মেলা জমি। চারজন নতুন পত্তনীকে যে জমি দিয়েছিলেন, যা এককালে পতিত ছিল, তারা পরিষ্কার করে বসবাসের যোগ্য করে নিয়েছে, সে জমির ওপব আনন্দবাবুর কি এখনও টান আছে? তিনি কি আপত্তি জানাবেন সেট্‌লমেন্ট ডিপার্টমেন্টে?

আনন্দবাবু কিছুকাল যাবৎ তাঁর ছোট ছেলেটিকে নিয়ে ভারী বিব্রত হয়ে আছেন। জন্ম

থেকেই পনি নামের ছেলেটা কামলা রোগে ভুগছে। কলকাতায় গিয়ে যাবতীয় ডাক্তারকে মোটা-মোটা ফিজ দিয়ে দেখিয়েছেন, কিন্তু ডাক্তাররাও এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন কার কাছে শুনলেন, ছেলেটার অবস্থা ভালো না। হাত-পা ফুলে গিয়েছে।

এহেন নানান চিন্তার মধ্যে একদিন রনো একটা দারুণ সুখবর নিয়ে এল। অনাথবাবু বসিরহাট কোর্টের এক হাকিমের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন তাকে। হাকিম আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করবেন। কোর্টের রায় নকল করে বাদি-বিবাদিকে দিতে হয়, তেমনই একটি নকলনবীশের পদ খালি হবে খুব শিগগির। এক-এক পৃষ্ঠা নকল করলে নগদ তিরিশ নয়াপয়সা। সারাদিনে একজন নকলনবীশ দশ-বারো পৃষ্ঠা পর্যন্ত নকল করতে পারে। সেরকমই একটা চাকরি—

খবরটা শুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে রইলেন জীবেন্দ্রনাথ। এ তো দারুণ সুসংবাদ। এখন ঠাকুর যদি মুখ তুলে চান, তাহলে সংসারটা হয়তো শেষপর্যন্ত ভেসে যাবে না।

আতাকাকা কলকাতা থেকে ফিরে এল প্রায় দিনতিনেক পর। একলপ্তে অনেকগুলো টাকা পেয়ে সারা কলকাতা ঢুঁড়ে এত-এত জিনিস কেনাকাটা করে এনেছে। শঙ্খর জন্যে এনেছে কয়েকটা নতুন ধরনের চকোলেট যা তাদের মাদারিপুরে পাওয়া যায় না।

শঙ্খ কখনও কলকাতা দ্যাখেনি। খু-উ-ব ছোটবেলায় একবার রেলে চড়ে মামাবাড়ি গিয়েছিল। তখন নাকি কলকাতা শহর পেরিয়েই যেতে হয়েছিল তাদের। কিন্তু তার স্মৃতিতে সে শহরের কথা একবিন্দু মনে নেই। শুধু ট্রেনে চড়ে যাওয়ার একটা দৃশ্যের কথা স্মরণে আছে। ট্রেনের ভেতরটা ছিল একটা ছোট্ট ঘরের মতো। ট্রেনটা কোনও একটা নদীর ওপর দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল। সেই নদী, নদীর ওপর ব্রীজ ছিল সে কথাটা মনে পড়ে বারবার। কিন্তু কলকাতাকে আদপেই নয়। তাই আতাকাকার কিনে আনা জিনিসপত্র হাঁ করে দেখছিল। তবে দেখছিল সে একা নয়, বাড়ির সব্বাই।

দেখতে দেখতে শঙ্খ কলকাতার কথা ভাবছিল। কলকাতায় কত বাড়ি-ঘর-দালান। চওড়া রাস্তা। মস্ত মস্ত দোকান। সবই শুনেছে এর-ওর কাছ থেকে। সে আরও বড় হয়ে একদিন কলকাতা দেখতে যাবে।

কলকাতা থেকে কিনে আনা রকমারি জামা-কাপড়, কত নতুনরকমের মিষ্টি, খেলনা, সবার দেখা হয়ে গেলে একা গোছগাছ করছিল আতাকাকা। শঙ্খ তখনও হাঁ করে দেখছে। গোছাতে গোছাতে হঠাৎ আতাকাকা বলল, ওই যে নোতন ছোঁড়াটা এয়েচে তোদের এখেনে, ওর বাড়ি কোন গাঁয়ে রে?

শঙ্খ বুঝতে পারল, আতাকাকা অর্ঘদার কথা বলছে। আগের দিন এসেই বলেছিল, কোথায়

যেন দেখিছি ছেলেটারে, চেনা-চেনা। আজ বলল ছোঁড়া। শঙ্খর শুনতে ভালো লাগল না। তবু বলল, অর্ঘদাদের বাড়ি কাঁকিদহে। বর্ডারের কাছে একটা গাঁয়ে। তুমি চেনবা না।

—কাঁকিদহ! আতাকাকার চোখদুটো হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে গেল, বলল, কী নাম বললি ছোঁড়াটার! অর্ঘ? উঁহু, ওর নাম তো অর্ঘ নয়?

শঙ্খ অবাক হয়ে বলল, অর্ঘ নয়? তবে কী?

—ওর নাম তো টেবো। ভালো নাম কী যেন, হুঁ ফটিক। ফটিক চক্কোত্তি। মনে পড়েছে এবার।

শঙ্খ হেসে বলল, ধুর, তুমি কারে দেখতি কারে দেখিছ। ওর নাম অর্ঘ চক্রবর্তী। কাঁকিদহ থেকে এস্‌ছে। তুমি কাঁকিদহ গিছ্‌লে কখনো?

আতাকাকা তার জিনিসপত্র ফেলে থেবড়ে বসল বিছানায়, বলল, কাঁকিদহ তো আমাদের সাতক্ষীরের বাড়ি থেকে মোটে চার-পাঁচ মাইল। সাইকেলে করে পেরাই পেরাই যেতি হয়—

শঙ্খ আশ্চর্য হয়ে বলল, পাকিস্থান থেকে এদেশে আসতি হলি পাসপোর্ট লাগে না? নইলে পুলিশে ধরে শুনিছি।

—ধুর আমরা যারা বর্ডারে থাকি, তারা তো এব্‌লা-ওব্‌লা যাতায়াত করি। সাইকেলে করে ধাঁ-ধাঁ করে হিন্দুস্থান থেকে বাজারঘাট করি ফিরি যাই পাকিস্থানে। আমাদের ও সব লাগে না। দুপারেরই পুলিশ তো আমাদের চেনা। তুই যাবি তো চল্। নে যাই। ভিটেবাড়ি দেখি আসবি।

শঙ্খ অবাক হয়ে শুনছিল আতাকাকার কথা। ফেলে আসা যে দেশটা সে কখনও দেখেনি, যে-দেশে তার বাবা-কাকারা, ঠাকুর্দা, ঠাকমারা কাটিয়েছে জীবনের একটা বড় অংশ, সে দেশটা তারও দেখতে ইচ্ছে হয় বইকি। কত বড় বাড়ি ছিল তাদের, কে কোন ঘরে শুত, কোথায় রান্নাঘর ছিল, সে-সব কখনও একলা একা মনে-মনে ভেবেছে সে। হঠাৎ আতাকাকার প্রস্তাব শুনে পুব-বাংলা দেখতে যাওয়াব একটা লোভ চলকে উঠল তার ভেতরে। সে দেশটা তার কাছে এক স্বপ্নের দেশ। এক আশ্চর্য সবুজে মোড়া সে দেশের শরীর।

আতাকাকা তখন বলছে, কাঁকিদহে লতিফ মিঞার সঙ্গে তো আমাদের সম্পত্তি বিনিময় করার কথা চলছে। লতিফ মিঞা রাজি হলিই আমরা কাঁকিদহে চলে আসবানে। পাকিস্থানে হিন্দুরা আর থাকতি পারবে না। যা সব চলছে—

কী চলছে তা শঙ্খরা কিছু-কিছু শুনেছে আতাকাকার কাছ থেকে। সেদিন অনেক কিছু বলেছিল, কিন্তু এটুকু বলেনি যে তারা পাকিস্থানের সম্পত্তি বিনিময় করে এপার বাংলায় আসার চেষ্টা করছে। তাও কিনা কাঁকিদহে। একেবারে অর্ঘদাদের গাঁয়ে! ভারী অদ্ভুত তো।

আতাকাকা এরপর যা বলল তা শোনার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না শঙ্খ। তার ওই এগাব বছর বয়সে হঠাৎ এক প্রবল বিস্ফোরণ ঘটাল আতাকাকা। বলল, ওর দাড়ি-গোঁফ দেখে প্রথমটা আমি চিনতে পারিনি ফট্‌কেকে। কাঁকিদহ থেকে ফেরার হয়ে ও যে মাদারিপুরে এসে বাস করছে তা কেউ জানে না ওখেনে।

শঙ্খ চমকে উঠল, নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলল, ফেরার হয়ে?

—হ্যাঁ, পুলিশ তো ওরে খুঁজি বেড়াচ্ছে এখেনে-ওখেনে। দাড়ি-গোঁফ রেখে এক্‌বারে পাল্টে ফেলেছে চেহারা। এখেনে এসে নামটাও পাল্টে ফেলেছে তালি?—

—কেন? পুলিশ খুঁজি বেড়াচ্ছে কেন?

—ও তো মার্ডারার। খুন করি পলিয়ে গিছ্‌ল দেশ ছেড়ে। কেউ ওর খবর জানে না।

শঙ্খর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বুকের ভেতরটা রেলগাড়ির ধপাস ধাঁই ধপাস ধাঁই শব্দে কেঁপে ওঠে তীব্রভাবে। বুকেব খাঁচাটা হাপরের মতো ওঠানামা করতে থাকে। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না। হঠাৎ অনেকদিনের একটা রহস্য স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে। অর্ঘদা যে গাঁয়ে-গঞ্জে বেরুতে চায় না, ইস্কুলে যেতে চায় না, পুলিশ দেখলে ভয় পায়, রক্ত দেখলে চমকে ওঠে, এ সবই তার ভেতর ঘুরেফিরে ঘাই দিয়ে উঠতে লাগল।

আতাকাকাই আবার বলল, তাও খুন করিছে নিজির বন্ধুরে। বন্দুক দিয়ে।

—বন্দুক দিয়ে! শঙ্খ আর কিছু ভাবতে পারল না, শুধু কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, তোমার চিনতি ভুল হয়নি তো, আতাকাকা?

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আতাকাকা বলল, আমার চোখ বড় সাংঘাতিক, বেলাক করে এ-পারের মাল ও-পারে, ও-পারের মাল এপারে পাঠাই দিচ্ছি এব্‌লা-ওব্‌লা। দিনকে রাত, রাতকে দিন করে ফেলাচ্ছি রোজ। দুপারের পুলিশের সঙ্গে ওঠাবসা। আমার চোখেরে ও ফাঁকি দিতি পারবে না। সে জন্যি আমারে দেখিই সেদিন কেমন সট্‌কে পড়ল তখন। ওর চোখ দেখিই ধরিছি।

শঙ্খ স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে বসে রইল। আতাকাকার একটা কথাও তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু ক'দিন যাবৎ তাদের পাড়ায় সবাই বলাবলি করছে, অর্ঘর চালচলন কেমন যেন অন্যরকম। সে কোনও কারণে গাঁ ছেড়ে এখানে এসে লুকিয়ে রয়েছে তাও সন্দেহ হচ্ছিল কারও কারও। প্রায় দেড়বছর হতে চলল ঈশ্বরীপুরে এসেছে অর্ঘদা, কিন্তু বাজারে-দোকানেও কখনও যেতে চায় না। বরং দাড়ি-গোঁফ রেখে ক্রমশ চেহারাটা বদলে ফেলতে চাইছে যেন।

সেদিন বিকেলে আতাকাকা তার সাইকেলে হু-হু করে রওনা দিল সাতক্ষীরার দিকে, পরক্ষণেই শঙ্খর গা-হাত-পা শিরশির করতে লাগল। একটা অদ্ভুত ছমছমে ভয়, একজন মার্ডারার ফেরার হয়ে এসে তাদের পাড়ায় বসবাস করছে সাধারণ মানুষের মতো, আর সেই মার্ডারের সঙ্গেই কিনা শঙ্খর সবচেয়ে বেশি ভাব! অর্ঘদাই তো গত দেড়বছর ধরে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ।

পরক্ষণেই মনে হল, অর্ঘদা নয়, ফটিক, ফটিক চক্কোত্তি। কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত! কী ভয়ঙ্কর!

কিন্তু অর্ঘদার মুখখানা দেখলে তাকে কি মার্ডারার মনে হয়! তার কুচকুচে দাড়ি-গোঁফে ঢাকা ফর্সা মুখখানা এক নিষ্পাপ কিশোরের মতোই। কৈশোরকাল পার হয়ে অর্ঘদার শরীরে এখন প্রথম যৌবনের ছটফটানি। কিন্তু তার চোখে যৌবনের জোয়ার আছে, কোথাও তো বিদ্রোহ নেই! ঘটনাটা যতবার ভাবছে, ততই ছটফট করছে শঙ্খ। অর্ঘদা এখনও ক্লাস টেনে পড়ে, এমন চমৎকার মুখচোখ, দেখতে প্রায় দেবদূতের মতো, গলার স্বর নামিয়ে কথা বলে, পৃথিবীর যা-কিছু সুন্দর তাইই তার চোখে সুন্দরতর হয়ে দেখা দেয়, এমন মানুষ কি—

কখনও শঙ্খর মনে হয়, এ অসম্ভব। আতাকাকার কথাগুলো সে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এমনও তো হতে পারে, আতাকাকার চিনতে ভুল হয়েছে! কালো দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখে শুধু চোখ দেখেই কি কাউকে চেনা যায়! শুধু চাউনিই কি চিনিয়ে দিতে পারে কোনও মানুষকে?

ঠিক প্রত্যয় হল না শঙ্খর। তবু পরের কয়েকদিন অর্ঘদাকে এড়িয়ে থাকল সে। বিকেল

হলেই রোজ একবার করে অর্ঘদার ঘরে যাওয়া তার অভ্যাসে ছিল। অর্ঘদার ঘরে ঢুকে, সে কোনও ছবি এঁকেছে কি না, আঁকলে কিসের ছবি, তা খুঁটিয়ে দেখত রোজ। ছবি নিয়ে আলোচনাও করত কখনো সখনো। তারপর আরও কত কথা, কেবলই কথার পিঠে কথা। কিন্তু এখন উমনো-ঝুমনোদের বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবলেই তার শরীর জুড়ে এক নিদারুণ অস্বস্তি। অর্ঘদার চোখের দিকে এখন আর তাকাতেই পারবে না সে।

গরমের ছুটির পর আবার ইস্কুল খুলে গেছে তাদের। প্রায় রোজই দু-এক পশলা করে বৃষ্টি হচ্ছে। তাতে তাদের বাড়ি থেকে জেলারো-আপিস পর্যন্ত যেতে রোজই এক হাঁটু কাদা। কখনও পায়ের নিচ থেকে পিচিক করে কাদা উঠে জামা, প্যান্টে ফুটফুটে রং ধরিয়ে দেয়। পা থেকে, জামা প্যান্ট থেকে সে পাঁক তুলতে প্রাণ অস্থির।

এমনই একদিন কাদায় মাখো মাখো হয়ে ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ দেখল শীতলা-তলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অর্ঘদা। শঙ্খর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। অর্ঘদা নিশ্চয় খোয়াঘাটের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে নিশ্চিত। শঙ্খ আজ আর কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না তাকে। কাছাকাছি এসে তার দিকে একচিলতে হাসি ছুড়ে দিয়ে সে বাড়ির দিকে বাঁক নিতে চাইছিল পাশ কাটিয়ে। অর্ঘদা তার নরম গলায় ডাক দিল, শঙ্খ—

শঙ্খর পা নিথর হয়ে গিঁথে গেল মাটির সঙ্গে। তার সারা পায়ে কাদা, এ কাদা না ধুলে এখন কারও সঙ্গে দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না।

—শঙ্খ, এদিকে শোন্।

শঙ্খ আসবেই ধরে নিয়ে অর্ঘদা হাঁটতে শুরু করেছে খেয়াঘাটের দিকে। বিকেল বেলায় খেয়ার লোক দু-চারজন যাতায়াত করছে। তবু এ সময় পথটা ভারী নির্জন মনে হল শঙ্খর। মনে হল, অর্ঘদার সঙ্গে এই নির্জনে বসে কথা বলতে ছমছম করবে তার গা। অর্ঘদা যে খুনী, তার চোখ দুটোর মধ্যে যে অন্য একরকম চাউনি আছে, তা ভাবতে গিয়ে গায়ে জ্বর এসে যাচ্ছে তার। কিন্তু অর্ঘদার ডাক সে এড়াতেও পারল না।

অর্ঘদা পায়ে-পায়ে হেঁটে গিয়ে বসল সেই কদম গাছের তলায়। যেখানে আরও কয়েকশো দিন বসে তারা কথার পিঠে কথা বলেছে, ইছামতীর ঢেউ গুনেছে, ইছামতীর চলকে ওঠা জলে পা ভিজিয়েছে দু'জনে। সেই অর্ঘদার পাশে বসতে গিয়ে শঙ্খর জিব শুকিয়ে গেল আজ।

একটু দূরেই লাবনি-বৌএর ঝুপড়ি ঘর, দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে আছে লাবনি-বৌ। লালডুরে শাড়ি পরে এভাবেই বসে থাকে কত সময়। আজ তাকে একটু বেশি বিষন্ন মনে হল। কেননা কালোমানিক আর খেয়ার নৌকো নিয়ে এপার-ওপার করে না। রাতের বেলায় আড় বাঁশিতে সুর তুলে ছড়িয়ে দেয় না। সে যে পুলিশের চাকরি পেয়ে চলে গেছে পুরুলিয়া না বাঁকুড়া কোথায় যেন।

অর্ঘদাকেও আজ মনে হল শুধু বিষন্নই নয়, ভেতরে ভেতরে প্রবলভাবে বিপর্যস্তও। দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের ভেতর জেগে থাকা দুটি তীক্ষ্ণ চোখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারছিল না শঙ্খ, শুধু তার পাশে বসে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, কী?

অর্ঘদা অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল, যেন ভাবছে কী বলবে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, সেদিন তোদের বাড়ি যে কুটুম এসছিল সে চলে গেছে?

শঙ্খ হাসার চেষ্টা করল, ও কুটুম নয়। আতাকাকা।

—লোকটা তোরে কিছু বলে গেল?

শঙ্খর বুকের ভেতর হঠাৎ একটা কাঁপ দিয়ে উঠল। আতাকাকা কিছু বলে গেছে কিনা তা অর্ঘদা জানল কী করে? সেও চুপ করে রইল, শুধু বুকের ভেতর ধপাস ধাঁই ধপাস ধাঁই শব্দ শুনতে পেল। শিরশির করে উঠল তার সারা গায়ের রোমকূপ।

—লোকটা বলেনি যে অর্ঘ খুন করে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এস্‌ছে?

শঙ্খর চোখের সামনেটা ঝাপসা হয়ে এল মুহূর্তে। তার ইচ্ছে করছিল পা-ভর্তি কাদা নিয়ে একছুটে পালিয়ে যায় অর্ঘদার পাশ থেকে। সে তখন থরথর করে কাঁপছে। তার গলায় কোনও স্বরই বেরুল না, তার গলা কেউ যেন দৈত্যের মতো মোটা-মোটা আঙুলে সজোরে চেপে ধরেছে।

অর্ঘদার শরীর যেন থমথম করছে এক বিশাল ঝড় ওঠানোর প্রস্তুতি নিয়ে। শঙ্খর চোখে পড়ে, তার ফর্সা আঙুলগুলো কাঁপছে। সেই কাঁপ তার গলার স্বরেও।

—তা'লি তোরে সব কথা বলি, শঙ্খ। আবীররে কী করে মেরি ফেলিছি সে-কথা তোরে বলতি হবে। আবীর ছিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। দুজনে ছোট্ট থেকে এক ইস্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি। একেবারে ক্লাস টেনে ওঠা পর্যন্ত। ওর বাবা ছিল খুব বড়লোক। মেলাই ধেনোজমি। ওদের পাকা দোতলা বাড়িখানাও আমাদের তল্লাটে দেখবাব মতো। আমাদের বাড়ি ছিল ওদের বাড়ি থেকে একটু দূরেই। তবু রোজ ঘুম থেকে উঠলি আমাদের দুজনের একবার না একবার দেখা হওয়া চাই। কখনও আবীর চলে আসত আমাদের বাড়ি। কখনও আমি ওদের বাড়ি। সারাক্ষণ আমাদের কত যে কথা হতো। একরাত্তির পার হলিই মনে হতো, অনেক কথা জমে গেছে, এক্ষুনি বলা চাই।

আবীর আমার কী যে প্রাণের প্রাণ বন্ধু ছিল তা আমি কারুকে বোঝাতি পারব না। ওর বাবা যা-কিছু ওরে এনে দিত, তার ভাগ দেওয়া চাই আমারে। তাই ওর বাবা দুটো করে আনত সব। জানত, আবীর তার একটা আমারে দে দেবে।

একবার একটা ডাকটিকিটের অ্যালবাম নে এল ওর বাবা। এই মোট্টা বই। চল্লিশ টাকা দাম। ভাবতে পারিস! ডিকশনারির চেয়েও মোটা। ওর বাবা বলেছিল, একটাই ছিল কলকাতার দোকানে। অ্যালবামের পাতায় পাতায় ক'বছর ধরে কত যে ডাকটিকিট জমাল ও। তা সেই অ্যালবামটা আমি রোজ অনেকক্ষণ ধরে ধরে দ্যাখ্‌তাম। আর বলতাম কী সুন্দর ডাকটিকিটগুলো তাই না? গোটা পৃথিবীটা যেন হাতের মুঠোয় চলি আসে—

তাতে একদিন আবীর ভাবল; অ্যালবামটা বোধহয় আমার ভারী পছন্দের। বলল, নে, তোরে এটা আমি দে দেলাম। আমি ঘাড় নাড়লাম, তোর কাছে থাকা যা, আমার কাছে থাকাউ তাই। ও অনেক জোর করল, আমি নেই নি। তারপর আর একদিন আমি ওদের বাড়ি গে দেখি, ও একটা বন্দুক নাড়াচাড়া করছে। একদম নতুন বন্দুক। ওর বাবা লাইসেন্স করে নে এস্‌ছে সদ্য। বলল, চ', একদিন দুজনে মিলি শিকারে যাই। এ সময় বল্লির বিলে অনেক পাখি। একবার গুলি ছুড়লি দু-চারটে ঘুঘু, বগারি পড়ে যাবে। ভাগ্যি ভালো থাকলি বকপাখি। আমি বললাম, তুই কোনদিন বন্দুক ছুড়িছিস যে একগুলিতে অতকিছু পাখি মারতে পারবি। ও বলল, গুলতিতে যখন পাখি মেরিছি, তখন বন্দুকেও পারব। আমি বললাম, আমার হাতে কিন্তু টিপ নেই।

আবীর তখন আমার হাতে বন্দুকটা দে শেখাতি লাগল, কোথায় বন্দুকের মাছি, কীভাবে

টিপ করতি হয়। তারপর দেয়ালের কাছে গে পিঠ ঠেকায়ে দাঁড়াল, বলল, দ্যাখ্ তো, আমার দিকি টিপ করে। দেখতি পাচ্ছিস কি না।

বলতে বলতে অর্ঘদার গলা কাঁপতে লাগল, চোখের চাউনি কেমন অদ্ভুত হয়ে উঠল। সে তাকিয়ে আছে নদী পেরিয়ে ওপারের দিকে, কিন্তু সে চাউনি ওপারে নয়, মনে হল, দিগন্ত ফুঁড়ে আরও অনেক দূরে চলে যাচ্ছে তার চোখ।

—আমি বন্দুক তাক করে দেখতি লাগলাম আবীরকে, আবীর বলল, কী দেখতি পাস্? বলি, তোরে দেখতি পাচ্ছি। আবীর বলল, গোটা শরীরটা দেখতি পাস্? আমার বন্দুকের মাছি তখন তার শরীরে ঘোরছে। তার মুখ, তার চোখ, নাক, গলা দেখতি দেখতি বলালম, তোর গলার কাছে যে তিলটা আছে তাও দেখতি পাচ্ছি। আবীর হেসে বলল, ট্রিগার টিপে দ্যাখ তো হাত কাঁপে কি না। নোতন হাত হলি ট্রিগার টিপতি গে হাত কেঁপে যায়। বল্লাম, টোটা নেই তো? ও হেসে বলল, না রে, বাবা কালই বন্দুকটা নে এয়েছে। টোটা যা এনিছে, সব আলমারিতে ভরে রেখিছে। নে, ওয়ান টু থ্রি... বলতেই আমার আঙুল ট্রিগার টিপে ধরল, আর...

বলতে বলতে ফোঁপাতে লাগল অর্ঘদা, বুঝলি শঙ্খ, সে কী শব্দ! আমার কাঁধে সজোরে এসে লাগল বন্দুকের কুঁদোটা। কী তীব্র যন্ত্রণা হল কাঁধে, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর দৃশ্য তখন আমার চোখের সামনে। দেখি কি, ফিন্‌কি দে রক্ত বেরোচ্ছে আবীরের গলা দে। আবীর বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকি, টলতি টলতি দু-এক পা এগিয়েও এল, তারপর দড়াম করি পড়ি গেল মেঝের ওপর।

বলতে বলতে অর্ঘদা তখন ঠকঠক করে কাঁপছে, তার গলার স্বর জড়িয়ে আসছে কান্নার শব্দে, বলল, সে কি রক্ত, শঙ্খ, মেঝেয় গলগল করে রক্ত বেরুয়ে ভেসে যাচ্ছে তখন। দু-একবার হাত-পা ছুড়ল আবীর, তারপর চিরকালের মতো থির হয়ে গেল তার শরীরখান।

শঙ্খ নিথর হয়ে শুনছে কান্নায়-কাঁপুনিতে জড়িয়ে যাওয়া শব্দগুলো। অর্ঘদার কাঁপুনি ক্রমশ চারিয়ে যাচ্ছে তার শরীরেও। বিকেল তখন তার আলো হারিয়ে সন্ধে হয়ে আসছে। কদমগাছের নীচে বসে ছমছম করে উঠছে তার গা। কোথ্ থেকে একটা কাক বিশ্রীস্বরে ডেকে উঠতেই সে ভীষণভাবে শিউরে উঠল।

—সে রক্ত দেখি কাঁপতি কাঁপতি জ্ঞান হারাই ফেললাম আমি। জ্ঞান ফিরতি দ্যাখলাম, আমারে অন্য জায়গায় সরাই ফেলেছে বাড়ির লোক। সে অন্য একটা গাঁয়ে। শোনলাম, পুলিশ আমারে খুঁজি বেড়াচ্ছে। আরও ক'দিন সে গাঁয়ে লুকাই থাকার পর আমার বাবা বলল, তুই অনেক দূরে চলে যা। ঈশ্বরীপুরে তোতা বাঁড়ুজ্জের বাড়ি গে আমার নাম বলবি। তালি আর পুলিশ তোরে খুঁজি পাবে না।

একনাগাড়ে অনেক কথা বলে হঠাৎ থম মেরে গেল অর্ঘদা। চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল টকটকে। ক'ফোঁটা অশ্রুবিন্দু গাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে এসেছে চিবুকে। চিবুকে ফোঁটা ফোঁটা দাগ।

শঙ্খর শরীর ততক্ষণে অবশ, সাড়হীন, যেন এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে অনেকখানি বড় হয়ে গেল। মানুষের জীবনে কী অদ্ভুত সব ঘটনাই ঘটে যায়, যা ভাবনার বাইরে। নিজের জীবনকেও অনেকসময় নিজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কেউ যেন অদৃশ্যভাবে ঘটিয়ে দিয়ে যায় ভয়ঙ্কর কোনও কিছু।

—বুঝলি শঙ্খ, আমার আর ঈশ্বরীপুর থাকা চলবে না। এখান থে পালাতি হবে।

শঙ্খ চমকে তাকাল, তার গলায় তখনও কোনও স্বর নেই।

—চেনা লোক যখন দেখি ফেলেছে, তখন পুলিশে খবর হয়ে যাবে ঠিক। খবর পেলিই ধরতি আসবে আমারে।

বলতে বলতে অর্ঘদার গলার স্বর বুজে গেল হঠাৎ।

তখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে নদীর ওপর। ইছামতীর জল সামান্য আলো-আঁধারিতে চিকচিক করছে। তার মধ্যেই অর্ঘদার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল শঙ্খ। একমাথা কালো চুল, একমুখ দাড়িগোঁফের ভেতর শুধু চকচক করছে তার চোখদুটো। এক অদ্ভুত চাউনি ফুটে বেরুচ্ছে সে চোখের ভেতর দিয়ে। শঙ্খর গা-হাত-পা, গোটা শরীর কেমন শিউরে উঠল সহসা।

—কোথায় যাব বুঝতি পারছি নে। এমন কোথাও চলি যেতি হবে যেখেনে দিগরের কোনও মানুষ আর আমারে চিনতি পারবে না। অন্য নামে অন্য পরিচয়ে বেঁচে থাকতি হবে বাকি জীবন। কোনও চেনা মানুষ যেন আমারে সারাজীবন আর দেখতি না পায়।

আবারও কিছুসময় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অর্ঘদা। শঙ্খর বলতে ইচ্ছে করছিল, তুমি যেয়ো না অর্ঘদা, থাকো। কিন্তু বলতে পারল না। কেন থাকা যায় না সে বুঝতে পেরেছে। সে তো আরও খানিকটা বড় হয়ে উঠেছে।

শঙ্খকে চমকে দিয়ে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল অর্ঘদা, বলল, চল্—

আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করল না অর্ঘদা। দ্রুত পায়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে চলল বাড়ির দিকে। তার পিছুপিছু শঙ্খও। তখনও তার পা-ভর্তি কাদা। সেই পা টিউবওয়েলের অজস্র জলধারায় ধুতে লাগল। ধুতে ধুতে মনে হল গত কয়েকদিনে তার ভেতরে যে একরাশ পাঁক জমে উঠেছিল তাও যেন ধুয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

সেদিন রাতে পড়াশুনোর পাট শেষ করে ঘুমোতে যাওয়ার সময়ও অনুমান করতে পারেনি শঙ্খ যে, পরদিন ঘুম থেকে উঠেই চেঁচামেচি শুনতে পাবে উমনো-ঝুমনোদের বাড়ির দিক থেকে। অর্ঘদা নাকি তার সমস্ত জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে ভোররাতের দিকে।

পনির খুব বাড়াবাড়ি ধরনের অসুখ—এ কথাটা কদিন ধরেই শুনছিল শঙ্খরা। পনি তাদের মস্ত তিনতলা বাড়ির নীচের তলার বারান্দায় বসে রকমারি সব নতুন নতুন খেলনা নিয়ে খেলত, আর তা আশ্চর্য হয়ে দেখাই ছিল শঙ্খ, সুখেন, বিশ্বদেব, অমূল্য, প্রলয়, দুই যমজভাই বিমল-বিকাশদের সময় কাটনোর একটা উপায়। কখনও একটা খেলনা-মোরগ কী করে শাদা ফুটফুটে

ডিম পাড়ে, তা ফের কিভাবে একটা মোরগ-বাচ্চায় রূপান্তরিত হয়ে যায় তা কতদিন কতবার যে তারা চোখ বড় বড় করে দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। একটা খেলনা টিউবওয়েল পাম্প করে জল ফেলছে তো ফেলছেই পনি। এমন আরও কত খেলনা। সেই পনি আজ কতদিন ধরে তাদের দোতলার ঘরে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে।

আনন্দ চাটুজ্জের একতলার বারান্দা পেরিয়ে কখনও ভেতরে ঢুকতে পারেনি শঙ্খরা। পনির যে অসুখ, তাতেও ভেতরে গিয়ে কখনও দেখে আসতে পারেনি ওকে। বড়লোকদের বাড়ির নিয়মকানুনই অন্যরকম। কেউ বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে উঁকি দিতে গেলে এক উড়ে-চাকর এসে হৈ-রৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শঙ্খরা দল বেঁধে ভেতরে ঢুকতে পেল সেদিন, যেদিন একটু একটু করে ভুগে মারা গেল পনি। সমস্ত বাড়িতে তখন শোকের পরিবেশ। পনির মা ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন। পনির বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে চেঁচাচ্ছেন বিচিত্র স্বরে। কলকাতা থেকে অজস্র ডাক্তার গাড়ি করে করে এনেও কিছু করতে পারেননি।

ক'দিন খুব মন-খারাপ করে রইল শঙ্খ। পনির শ্রাদ্ধে সারা দক্ষিণ পাড়ার লোকের নেমন্তন্ন। উত্তরপাড়া থেকেও অনেকে। তার বাবা নাকি কেবলই বলছেন, আমার সম্পত্তির অর্ধেক তো ওর পাবার কথা। সব ওর শ্রাদ্ধেই খরচ করে ফ্যালো। আমার বয়স তো তিনকুড়ি পার হতি চলল, আমার আর টাকাকড়ি কী হবে।

সত্যিই সেরকম ঘটা করে শ্রাদ্ধ ঈশ্বরীপুরের লোক খুব একটা দেখেনি। কলকাতা থেকে সন্দেশই এল দু-তিন লরি। কতবড় যে ভিয়েন বসল তার মাপ করা যায় না। দশজন রাঁধুনি হিমশিম খেয়ে গেল ক'দিন ধরে। সে এক আশ্চর্য উৎসব। শোকের উৎসব, কিন্তু ঐশ্বর্যে, বৈভবে অবাক করার মতো।

পনির শ্রাদ্ধের দিন শঙ্খর সব বন্ধুরাই সারাদিন পনিদের বাড়ি মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াল। অতবড় তিনতলা বাড়ির ভেতরটা দেখল ঘুরে ঘুরে। সারা বাড়ির প্রতিটি ঘরেই পনির অস্তিত্ব ছুঁয়ে রয়েছে। তার জামা-প্যান্ট রাখার জন্য একটা ঘর, তার খেলনা রাখার জন্য একটা ঘর। সে ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছে কয়েকবছর আগে, তবু তার বই জুড়ে রয়েছে একটা ঘর। তাতে কত না পড়ার বই, কত গল্পের বই। বিদেশি ছবির বইও কত। দেখতে দেখতে বারবারই মনে হচ্ছিল শঙ্খর, এই বুঝি পনি এসে দাঁড়াবে তার সামনে, তার ফ্যাকাসে মুখে হাসি এনে বলবে, দেখবি বইগুলো? দাঁড়া, তাক থেকে পেড়ে দিচ্ছি।

সেদিন পর-পর দুটো অদ্ভুত ঘটনা ঘটল পনিদের বাড়িতে। উমনো রান্নাঘরে শিল-নোড়া দিয়ে কিছু যেন থেঁতো করছিল, হঠাৎ হাত ফসকে নোড়ার ঘায়ে ক্ষত হয়ে গেল তার একটা আঙুলে। দু-চার ফোঁটা রক্তও গড়িয়ে পড়ল। রোহিনী-মাসি দেখে বললেন, কাজের দিন, রক্ত বের করলি তো! দাঁড়া একটু আইডিন দে দি।

কাটার ওপর আইডিন দিলে বিষের মতো জ্বালা করে। উমনো অনেক না-না করেও রেহাই পেল না। ততক্ষণে রোহিনী-মাসি খানিকটা তুলোয় করে আইডিন মাখিয়ে নিচ্ছেন উমনোর হাতে লাগিয়ে দেবেন বলে। উমনোও আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে ভয়ে-ভয়ে। আসন্ন জ্বলুনির কথা ভেবে কাঁপছে ভিতরে-ভিতরে। শঙ্খ তার পাশে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে দেখছে আইডিন দিলে উমনোর চোখমুখের অবস্থা কী হয়! হঠাৎ কী হল কে জানে, উমনো একটা কাটা কলাগাছের মতো ধপাস করে পড়ে গেল শানের মেঝের ওপর। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে

দেখল, সে সংজ্ঞাহীন।

শ্রাদ্ধের বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। চারদিক থেকে সবাই ছুটে এসে জল ছিটোতে লাগল উমনোর চোখেমুখে। বাতাস করতে শুরু করল কেউ। কেউ চেঁচিয়ে বলল, ভিড় হালকা করো। সরো সবাই এখান থেকে।

বহুক্ষণ জল ঝাপটা-ঝাপটির পর উমনোর জ্ঞান ফিরতে বাড়িময় লোক ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপর, কী হয়েছে রে, উমনো।

উমনো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে চারদিকে, আর জড়ানো গলায় বলছে, পনি—

পনি! সবার গলায় একটা ভয়-মেশানো আতঙ্ক। কোথায় পনি?

একটু সুস্থ হওয়ার পর উমনো উঠে বসল। জড়ানো গলায় যা বলল তাতে শিউরে উঠল সবাই। রোহিনী-মাসি যখন তুলোয় আইডিন ভেজাচ্ছিলেন, সেইমুহূর্তে উমনোর চোখে পড়েছিল, শঙ্খর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে পনি। শঙ্খ ঠিক যেরকম কৌতূহল নিয়ে আইডিন লাগানোর দৃশ্য দেখছিল, ঠিক একইভাবে গলা উঁচিয়ে দেখছিল পনি। প্রথমে উমনো বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। যখন তার মনে পড়ল, পনি তো আর বেঁচে নেই, সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কী করে! মনে হওয়ামাত্রই উমনোর চোখ অন্ধকার হয়ে আসে। তারপর আর কিছু মনে নেই তার।

উমনোর কথাগুলো শঙ্খর শরীরে কুলকুল করে ঘাম বইয়ে দিতে থাকে। তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। হাঁটুর মালাই চাকিতে কাঁপন ধরে। পনি তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল! ঠিক তার পাশেই? ও মা গো—। কিন্তু আশ্চর্য, উমনো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে পনিকে, অথচ শঙ্খ পায়নি! দেখতে পেলে কী করত সে? সেও উমনোর মতো ধপাস করে পড়ে যেত শানের মেঝেয়!

ভাগ্যিস সে দেখতে পায়নি। উমনোর মতো তারও মাথার পেছনদিকটা সুপুরির মতো ফুলে উঠত তাহলে।

সারাদিন একবুক ভয়, শরীরময় ত্রাস নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল শঙ্খ। অতবড় বাড়িটার এ ঘরে ও ঘরে ঘুরতে ঘুরতে কেবলই মনে হতে লাগল, হয়তো পনিও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। সে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু যে-কোনও মুহূর্তে কারও চোখে পড়ে যাবে দৃশ্যটা। তখন সেও কাটা কলাগাছের মতো—

চাটুজ্জেপাড়ার অন্তুকাকা অবশ্য সব শুনেটুনে বললেন, উমনোর কথা তোমরা রাখো তো। আইডিন দেবার ভয়েই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে ও। যত্তো সব—

সেদিন রাতেই কিন্তু পনিকে ফের দেখতে পাওয়া গেল। দেখতে পেলেন আর কেউ নন, তার বাবা আনন্দ চাটুজ্জেই। তিনি তখন তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নীচের উঠোনে কাঙালিভোজন হচ্ছে তখন। অন্তত হাজারখানেক গরীবলোক খেতে বসেছে পাত পেড়ে। তিনতলায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে পনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে তদারকি করছে খাওয়ান দাওয়ান।

দৃশ্যটি দেখে আর একমুহূর্তও দাঁড়ালেন না আনন্দ চাটুজ্জে। তিনতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে এসে পাগলের মতো খুঁজতে লাগলেন পনিকে। নীচে অন্যেরা তাঁর হন্তদন্ত চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কী হয়েছে? অমন করছেন কেন? আনন্দ চাটুজ্জে শুধু বলছেন, পনি। পনি কোথায় গেল? এই তো একটু আগেই দ্যাখলাম, এখানে

দাঁড়িয়েছিল। কোথায় গেল? আমার চোখ ফাঁকি দে কোনদিকি গেল! আমি কেন তিনতলা থেকে ঝাঁপ দে পড়ে ওরে ধরলাম না?

তারপর বেশ কয়েকদিন শঙ্খর বুকে পনি সম্পর্কে একটা ত্রাস জড়িয়ে রইল। আনন্দ চাটুজ্জের বিশাল তিনতলা বাড়ির পাশ দিয়ে যাতায়াত করার সময় তার মনে হয়, হয়তো পনি দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার মোড়ে। কিংবা তেতলার বারান্দার গ্রিল ধরে ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে রয়েছে রাস্তার দিকে। কখনও সন্ধের পর ঘরে ফেরার সময় পথের পাশে ঝুপসি কোনও ঝোপ থাকলে ছাঁত করে উঠত বুকের ভেতরটা।

এহেন অস্বস্তির দিনে হঠাৎ রনোকাকা দারুণ একটা সুখবর নিয়ে এল বাড়িতে। কোর্টের হাকিম রনোকাকাকে বলেছেন, তুমি কাল থেকে কপিং সেকশনে জয়েন করো। তোমার হাতের লেখা ভারী সুন্দর। চমৎকার করে কপি করবে। দেখবে সবাই তোমার কাছ থেকেই কপি করাতে চাইবে। একপৃষ্ঠা কপি করলেই তিরিশ পয়সা।

সেদিন সন্ধেয় বাড়িতে দারুণ একটা খুশির রেশ ছড়িয়ে রইল। ঠাকুর্দা বিছানায় শুয়ে ছিলেন, উঠে বসতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু উঠে বসলেন। মুখে একরাশ হাসি ছড়িয়ে বললেন, যাক, এবার সংসারের একটা হিল্লে হল। শুধু অবনীটারই হল না কিছু। যা-ক গে, সবার ভাগ্যে কি আর চাকরি জোটে।

রনোকাকা তখন মনে-মনে হিসেব করছে। বলছে, রোজ দশ-বারো পৃষ্ঠা তো লিখতে পারবই। তার মানে মাসে ষাট-সত্তর টাকা রোজগার।

মাসে ষাট-সত্তর টাকা। সে তো মেলাই টাকা। একমণ চালের দাম আটাশ-উনত্রিশ টাকায় দাঁড়িযেছে। খুবই আক্রার বাজার, তবু দু-বেলা ডাল-ভাত অন্তত জুটে যাবে---

রনোকাকার চোখেমুখে তখন দারুণ উত্তেজনা, বলল, শুধু ডাল-ভাত কি আর খাব এখন। সপ্তাহে দু'দিন মাছ আসবে। প্রতি রবিবারে মাংস।

সেদিনও গভীর রাত পর্যন্ত হুল্লোড় চলল শঙ্খদের সবাইকার মনে। এমন একটা আনন্দের খবরে কারোরই চোখে যেন ঘুম আসছে না। গল্প করতে করতে যেন সারাটা রাত পার হয়ে যাবে আজ। যেন আর একটা মাস পরেই তাদের হাতে উঠে আসবে আলাদীনের প্রদীপ। তারা আর আগের মতো গরীব থাকবে না। কেউ আর আঙুল তুলে বলবে না, ওরা রিফিউজি।

পড়ার বইএর ভেতর আরও গভীরভাবে ডুব দিল শঙ্খ। ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় রনোকাকা পাশ দিয়েছিল বলেই এমন হুট করে একটা চাকরি পেয়ে গেল। অবনীকাকা পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। পাশ দেয়নি বলে তার চাকরি পাওয়ার কথা কেউ ভাবছে না। অবনীকাকার কথা ভেবে ঠাকুর্দা প্রায়ই বিড়বিড় করে কী যেন বলতে থাকেন। তাঁর ভুরুতে কোঁচ পড়ে, কখনও মণিকাকাকে তাড়া দেন, আর একটু পড়। ভালো ফল করতি হবে পরীক্ষায়। পাশ না করতি পারলি---

মণিকাকা এ-বছর ক্লাস নাইনে উঠেছে। তার অনেক পড়ার চাপ। ক্লাস নাইন থেকেই তো প্রবেশিকা পরীক্ষার কোর্স শুরু। আজকাল অনেক রাত জেগে পড়ছে মণিকাকা। তার পাশে বসে শঙ্খও। দু'জনে গভীর রাত পর্যন্ত চেঁচিয়ে পড়তে থাকে প্রাণপণে। যেন তাদের সামনে একটা যুদ্ধ। যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছুবার আগে এক মরণপণ লড়াই করছে। শরীরের ঘাম ঝরিয়ে বইএর পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে। তাদের দ্বৈতকণ্ঠের আওয়াজ টালির ঘরখানা পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। যেন যুদ্ধের দামামা বাজছে ইছামতী পার হয়ে বিস্তীর্ণ চরাচরে।

ক্রমশ বর্ষার দিনগুলো পার হতে থাকে তারা। এই বর্ষাটা ভারী চমৎকার কাটল তাদের, এবার আর ঘরের ভেতর জল পড়ছে না। লাল টালির ছাউনি ভেদ করে বৃষ্টির ধারা টুপিয়ে পড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে না তাদের বিছানা বালিশ। রাত জেগে সামলাতে হচ্ছে না মশারির ভিজে যাওয়া। শুধু রাস্তায় যা জল-কাদা। কাদায় প্যাচপেচে পথ পাড়ি দিয়ে তাদের ইস্কুলে যাওয়া অব্যাহত থাকে। ক্রমে শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্রের সোনালি রোদ এসে ভরে ফেলে ঈশ্বরীপুরের পৃথিবী। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে একটা পুজো পুজো গন্ধ। দুর্গামণ্ডপে কুমোরকাকা আবার প্রতিমা-গড়ার কাজ শুরু করে দেয়। শঙ্খরা দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সেই আশ্চর্য সৃষ্টির দিনগুলো।

এর মধ্যে হঠাৎ আবার একটা অঘটন কাঁপিয়ে দিল তাদের। একদিন ভোরবেলা কে যেন দেখে এল, ইছামতীর তীরে কদমগাছের যে ডালটা নুয়ে এসেছিল রাস্তার দিকে, তার ডালে গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়েছে লাবনী-বৌ।

পাড়াময় মানুষজন হুড়িয়ে এল ইছামতীর ধারে। বোধহয় আত্মহত্যাই। তবু এহেন ঘটনা পাড়াগাঁয়ে জন্ম দেয় হাজারো ফিসফাস, কানাকানির। সবাই বলাবলি করতে লাগল, কী এমন হয়েছিল লাবনি-বৌএর, যে হঠাৎ তাকে আত্মহত্যা করে জীবন জুড়োতে হল!

এক-এক জনের মুখে এক-এক গল্প পল্লবিত হয়ে ঘুরতে লাগল গাঁয়ে। কেউ বলল, তার স্বামী অনেককাল হল তার খোঁজ নেয়নি, তাই। কেউ বলল, আগে মাস-মাস মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাত তার স্বামী, ক'মাস হল তাও বন্ধ। মেয়েটা খাবে কী। কোলের ছেলেটারেই বা কী খাওয়াবে, তাই। কেউ বলল, টাকা পাঠাবেই বা কোন দুঃখে। কালোমানিকের সঙ্গে অমন ঢলাঢলি করে দিনরাত, সেই জন্যিই তো টাকা পাঠায় না।

সেদিন শঙ্খর ঠাক্‌মার কাছে দুপুরের দিকে রোহিনীমাসি এল গল্পের ছালা নিয়ে। ছালা বিছিয়ে বসল জুতজাত করে। তারপর পান চিবুতে চিবুতে বলল, শুনিছ ঠাকুরঝি, কী কাণ্ড। কালোমানিক কোথায় না কোথায় হেদিয়ে গেল, মেয়েমানুষটার আর খোঁজ নেল না!

ঠাক্‌মা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছেন রোহিনীমাসির দিকে, রোহিনীমাসি নতুন কী খবর নিয়ে এসেছে কে জানে।

—কী বেত্তান্তই না শুনি আলাম, বৌদি, মেয়েমানুষটার সোয়ামি তো আজ একবছর নিপাত্তা। এদিকি লাবনি-বৌএর পেটে একখানা সাতমাসের বাচ্চা। ওই হারামজাদা কালোমানিক মজা লুটে মেয়েমানুষটারে ফেলে দে পলিয়েছে কোথায়—

লাবনি-বৌএর আত্মহত্যার খবরে ঈশ্বরীপুরে আবার বেশ আলোড়ন, কত কীই যে বলতে লাগল গাঁয়ের মানুষ। সে-সব গল্প গাঁয়ের বাতাসে সাতখান্ হয়ে ঘুরতে-ফিরতে থাকে পল্লবিত হয়ে।

কালোমানিকের আকস্মিক অন্তর্ধানের রহস্যও উন্মোচিত হল এতদিনে। কোথায় সে চাকরি পেয়েছে, পুরুলিয়া না বাঁকুড়ায় তাও কেউ জানে না। তার বাড়ির লোকও ঘাড় নাড়ে, তারাও বলতে পারে না কিছু। তা শুনে লোকে হাসে। তীক্ষ্ণ হয়ে ঝরে পড়ে টিপ্পনী।

এত সব বিস্ময়ের ভেতর শঙ্খ একা-একা জেরবার। কালোমানিকের আড়বাঁশি শুনতে শুনতে সেও তো কত সন্ধে কত রাত সম্মোহিত হয়ে থেকেছে। তার ভারী পছন্দের মানুষ ছিল কালোমানিক। যেমন ছিল অর্ঘদা। কাউকেই ঠিক-ঠিক চিনতে পারেনি সে। সব মানুষ একে-একে ঈশ্বরীপুর ছেড়ে চলে যেতে শঙ্খ নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সারাক্ষণ কী এক মন-খারাপ তাকে দুঃখী করে রাখে।

খেয়াঘাটের পাশে যে কদমগাছটার নীচে বসে সে আর অর্ঘদা সারা-বিকেল গল্পে গল্পে কাটাতো সে-পথ মাড়ায় না আর। এখন সেদিকে তাকাতে গা শিরশির করে ওঠে তার। কদমগাছের নিচু হয়ে আসা ডালটাতেই তো লাবনি-বৌ—

হঠাৎ শঙ্খর মনে হল, ঈশ্বরীপুর গাঁ তার কাছে ক্রমশ যেন ছোট হয়ে আসছে। কমে আসছে ভালো-লাগার জায়গাগুলো। তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভালো-লাগা মানুষেরাও। এখন খুবই একা লাগে তার। এখন তাদের টালির ঘরের দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে পড়তে পড়তে কখনও উদাস হয়ে যায়। আর ক'দিন পরেই প্রতিবছরের মতো বেজে উঠবে পুজোর ঢাক। পুজোর এই সম-সম সময়ে তার কাছে শুধু একটাই ভালো-লাগার খবর রনোকাকার চাকরি। রনোকাকা এক-একদিন দশ-বারো পৃষ্ঠা করে কপি করছে। সন্ধেবেলা ফিরে আসছে ক্লান্ত হয়ে। শরীরে ক্লান্তি অথচ মুখময় এক আশ্চর্য উজ্জ্বলতা। টাকা রোজগার করার একটা আলাদা শিহরণ আছে। তাই রনোকাকার মুখে জমা হয়েছে একটা গোলাপি আভা। একদিন বসিরহাট থেকে ফিরে এসে বলল, আজ পনের পৃষ্ঠা কপি করেছি।

প-নে-র পৃ-ষ্ঠা!

মাঝে একদিন রাসবিহারীবাবুকে দেখতে গিয়েছিল শঙ্খ। দীর্ঘ অসুখে ভুগে এমন শীর্ণ আর দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে শঙ্খ তার কাছে পড়তে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। উনি অবশ্য বললেন, আর একমাস। তারপর নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠব। রোজ ভোরে উঠে পায়চারি করছি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে। আগের চেয়ে শরীরে জোর পাচ্ছি বেশ।

জীবেন্দ্রনাথের শরীর দিনে-দিনে দুর্বলতর হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। সরকারি ডাক্তার প্রায়ই তাঁর সাইকেলের বেল বাজিয়ে এসে হাজির হল শঙ্খদের বাড়ি। ঠাকুর্দাকে ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, আর গম্ভীর হন প্রতিদিনই। একটা করে প্রেসক্রিপসন লেখেন, আর বাইরে বেরিয়ে বকলস-বাঁধা হ্যাটটি মাথায় পরতে গিয়ে নিজের মনেই ঘাড় নাড়তে থাকেন, চাটুজ্জেমশাই অসুখটা বেশ ভালোমতোন বাধিয়েছেন।

গোটা বাড়ি জুড়ে একটা থমথমে ভাব। রনোকাকা প্রথম মাসে যে ক'টা টাকা রোজগার করেছিলেন, তার বেশিটাই চলে গেছে ঠাকুর্দার ওষুধ কিনতে।

সরকারি ডাক্তার চলে যাওয়ার পর ঠাকুর্দাও ঘাড় নাড়তে থাকেন, বিড়বিড় করে বলেন, ওষুধ-টষুধ কিনে আর লাভ নেই রে, ও যা হবার তাই হবে।

আগে রোজ সকাল-বিকেল দু'বার করে বাইরের দাওয়ায় এসে জলচৌকিতে উবু হয়ে বসতেন কিছুক্ষণ, ক্রমে আর উঠে হেঁটে আসার সামর্থও রইল না। শীর্ণ ফ্যাকাসে চেহারা কয়েকদিনের মধ্যে বিছানার সঙ্গে মিশে গেল। শুয়ে শুয়েই একদিন মণিকাকাকে ডাকলেন,

ওরে, তোরা বইপত্তর নে বসছিস তো? ভালো করে লেখাপড়া কর। তোদের সামনে আবার একটা দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। তারপর শঙ্খকে ডেকে বললেন, ক্লাসে ফার্স্ট হওয়াটা যেন বজায় থাকে। লোকে যেন বলতি পারে, সাতক্ষীরের চাটুজ্জেবংশটা নেহাৎ ফেল্‌না ছিল না।

সরকারি ডাক্তারের সঙ্গে আরও একজন ডাক্তার এলেন সেদিন। বসিরহাটের বড় ডাক্তার। শার্ট ফুলপ্যান্ট পরা। ফুলপ্যান্ট পরা মানুষ ঈশ্বরীপুরে প্রায় নেই বললেই চলে। নতুন বি.ডি.ও-অফিসের চাকুরেরা এ গাঁয়ে ফুলপ্যান্ট আমদানি করেছিল। এ গাঁয়ের লোক ফুলপ্যান্টকে বলে দোনলা। সেই দোনলা পরা ডাক্তারও অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, খুবই সিরিয়াস কেস। শরীরে রক্ত বলতে আর নেই। হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। বেশ কয়েক বোতল রক্ত না দিলে—

হাসপাতালে ভর্তির নাম শুনেই বাড়িতে আবার একটা শোকের ছায়া নেমে এল। হাসপাতালে ভর্তি হলে মানুষ আর ফেরে না। তার মানে খুব সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে।

ঠাকুর্দা অবশ্য তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়লেন, হাসপাতালে যাব কেন, মরতি হলি ঘরের চৌকিতে শুয়ে মরব।

অনেক চেষ্টা করেও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রস্তাবে রাজি করানো গেল না জীবেন্দ্রনাথকে। তাঁর গোঁ বড় ভীষণ। কোনও ব্যাপারে একবার না বললে হ্যাঁ করানো খুব কঠিন। ওষুধও যে ঠিকমতোন খেতে চান তাও নয়। বলেন, সব টাকা যদি ওষুধের পেছনে ঢালবি তো খাবি কী! আগে খেয়ে পরে বাঁচবি তো—

রোজ মন খারাপ করে শঙ্খ ইস্কুলে যায়। এতকাল ঠাকুর্দার পাশে শুয়ে না ঘুমোলে তার মনে স্বস্তি হতো না। ইদানীং ঠাকুর্দাকে একটা আলাদা চৌকিতে বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। সে চৌকিটা জানলার ধারে। সে বিছানায় ভালো করে আলো বাতাস খেলে। ডাক্তাররা সেরকমই বলে গেছেন বাড়িতে—

দিনসাতেক শয্যাশায়ী থাকার পর একদিন সকালে ঠাকুর্দা বললেন, ওরে, তোরা আমারে একবার দাওয়ায় বসিয়ে দে তো। একটুখানি জগতের আলো দেখি। আর কতকাল ঘরে শুয়ে থাকব!

দু-তিনজন মিলে ঠাকুর্দার শীর্ণ শরীরটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে বসিয়ে দেওয়া হল বাইরের জলচৌকির ওপর। দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঠাকুর্দা বসে রইলেন অনেকক্ষণ। পুজোর ঠিক আগে আগে বলে সোনালি রোদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে উঠোনে, তার দিকে তাকিয়ে রইলেন একমুখ প্রশান্তি নিয়ে। কী যেন বলতে লাগলেন বিড়বিড় করে। প্রায় হলদে-হয়ে আসা চোখে দেখতে লাগলেন পরপর বড় হয়ে উঠতে থাকা নারকেল গাছগুলোর দিকে। কোনওটায় ফল ধরতে শুরু করেছে, কোনওটায় ধরেনি, কোনওটায় ধরব-ধরব করছে। একটা আমগাছ পুতেছিলেন, তেমন ডালপালা মেলে বেড়ে ওঠেনি এখনও। খুব ইচ্ছে ছিল, অন্তত একখানা পাকা ঘর তুলে যাওয়ার। একটা নকশাও ভেবে রেখেছিলেন মনে-মনে। তাও আর করা হয়ে উঠল না।

কিছুক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাকুর্দা আবার বললেন নে, অনেক হয়েছে। শরীর বলতি আর কিছু নেই মনে হচ্ছে। আমারে বিছানায় দে আয়—

সেদিন ইস্কুলে বেরুবার সময় ঠাক্‌মা হঠাৎ মণিকাকা আর শঙ্খকে বললেন, সকাল-সকাল বাড়ি ফিরিস আজ। ওনার গতিক ভালো ঠেকছে না যেন।

সারাদিন ইস্কুলে কাটানোর ফাঁকে বুকখানা শূন্য মনে হতে লাগল শঙ্খর। রনোকাকা চাকরি পেতে হঠাৎ একঝলক রোদ চলকে উঠেছিল তাদের বাড়ি, আবার যেন আঁধার হয়ে এসেছে চারদিক। শঙ্খর বাবাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে ঠাকুর্দার শরীর খারাপের কথা জানিয়ে। অচিনকাকাকে কলকাতায় খবর পাঠানো হয়েছে, এক্ষুনি চলে এসো।

বিকেলে বাড়ি ফেরার পথেই হঠাৎ কে যেন বলল তাদের, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, খোকারা।

বুকের ভেতরটা ছাঁত করে উঠল শঙ্খর। দূর থেকে মনে হল, অনেক লোকজন। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে তাদের বাড়ির দিকে, বাড়ির দাওয়ায় আরও অনেকে। তাদের চোখ দরজা পেরিয়ে ঘরের ভেতরদিকে।

শঙ্খরা দ্রুত দাওয়া পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢোকে। একবুক ভয়তরাস নিয়ে দেখল, ঠাকুর্দা সংজ্ঞাহীন হয়ে শুয়ে আছেন খাটে, শুধু তাঁর মাথাটা ডানদিকে কাত্ হয়ে যাচ্ছে বারবার, আবার সোজাও হচ্ছে পরক্ষণে। বুকের পাঁজর দ্রুত উঠছে-নামছে, আর শিয়রের কাছে বসে আছেন ঠাক্‌মা। তাঁর হাতে একটি পাখা, অল্প অল্প বাতাস করছেন ঠাকুর্দাকে।

দৃশ্যটি এমনই চমকে দেওয়ার মতো যে মুহূর্তে বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল শঙ্খর।

ওপাশের বাড়ি থেকে ছুটে এসেছেন রোহিনী-মাসি, ছুটে এসেছেন ছোট ঠাকুর্দা ছোট্-ঠাক্‌মা, উমনো-ঝুমনোর মা বাবা সব্বাই। আজ তাঁদেরও কেমন চিন্তাক্লিষ্ট, সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। শঙ্খদের দেখে বললেন, তোরা আজ সকাল-সকাল দুটো খেয়ে নে। রাতে কী হয় না হয়---

তখন সবেমাত্র সন্ধে হয়েছে। এমন সন্ধেবেলা হঠাৎ তাদের ভাত খাইয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন শঙ্খ বুঝতে পারল না। কিন্তু সে ভাত তার গলায় সেঁধুল না সেদিন। বুকের ভেতরে একটা ব্যথা চাপ হয়ে আছে। যত রাত বাড়তে লাগল, ততই ভারী হয়ে উঠতে লাগল বাতাস। অনেকগুলো মুখ একই সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ঠাকুর্দার বিছানার উপর। যেন একটি-একটি করে মুহূর্ত গুনছে অতগুলো মানুষ। শঙ্খর কানে গেল শুধু একটাই কথা, ডাক্তার সন্ধেবেলা জবাব দিয়ে গেছে।

কতটা রাত হয়েছে তা শঙ্খ অনুমান করতে পারে না। ডাক্তারের জবাব দেওয়া যে কী, তা বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে শুধু অনুভব করতে পারে চারপাশে চাপ্-চাপ্ অন্ধকার। তারপর একসময় হঠাৎই ডুকরে কেঁদে উঠলেন ঠাক্‌মা, চলে গেল রে। আর ধরে রাখতি পারলাম না---

বাড়িময় তখন কান্নার রোল। শঙ্খও বুঝতে পারল, ঠাকুর্দা আর নেই।

ঠাকুর্দা না থাকা মানে কী, সেইমুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারল সে। তার মনে হল, বাইরে প্রবল ভন্না হচ্ছে। বৃষ্টির প্রবল ধারা ঘরের ভেতর নেমে আসছে চাল ফুটো হয়ে। তারা বাড়িসুদ্ধ লোক রাত জেগে বসে আছে সে জলের ধারা সামলাতে। সারা মেঝেয় বাটি পেতে, শানকির থালা পেতে সে জল সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। আজ যেন তাদের মাথার ওপর কোন ছাউনিই নেই।

মধ্যরাত্রে বাঁশের চালায় শুয়ে ঠাকুর্দা শ্মশানে চলে গেলেন। এ বাড়ি থেকে তাঁর শেষবারের মতো যাত্রা। আর কোনও দিন আগের মতো ঋজু শরীরে লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে আসবেন না। ফিরে এসে বলবেন না, কী রে, সন্ধে হয়ে গেল, এখনও হাত-পা ধুয়ে

পড়তে বসলি নে?

কত লোক যে পাড়া থেকে দেখতে এসেছিল জীবেন্দ্রনাথকে! বাঁশের চালায় তোলার একটু আগে এসে পৌঁছেছিলেন হীরালাল অধিকারী, বললেন, আমার একপাশের স্তম্ভটাই ভেঙে পড়ে গেল আজ। তালুইমশাই আমার যে কতখানি ছিলেন, তা এখন বুঝতে পারছি। অচিনকাকা, অবনীকাকা, রনোকাকাকে ডেকে বললেন, এতদিন বটগাছের আড়ালে বাস করছিলে। এবার তোমাদের বুক বাঁধতে হবে। তালুইমশাই ঠিক যেখানে সংসার রেখে চলে গেলেন সেখান থেকেই ফের শুরু করতে হবে তোমাদের। সব নতুন করে। নতুন ভিত করে একটা পাকাবাড়ি তোলো। তাহলে ওঁর আত্মা শান্তি পাবে।

পরের ক'দিন শঙ্খর কেটে গেল একটা নিদারুণ ঘোরের ভেতর। শঙ্খর বাবা তখনও এসে পৌঁছননি। কাকারা হবিষ্যি খেতে শুরু করলেন। শঙ্খর গলা দিয়ে ভাত নামল না ক'দিন। এক বিশাল বিপর্যয়ের পর ক্রমশ এক ভীষণ দুর্দিন নেমে আসছে তাদের সংসারে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছিল। চলতে চলতে হঠাৎই তাদের সংসার মুখ থুবড়ে পড়েছে পথের ধুলোয়। আর কখনও উঠতে পারবে কি না তা কেউ জানে না।

শ্রাদ্ধের দিন কাকারা পর পর মাথা ন্যাড়া করে উঠে দাঁড়াতেই সেই দুর্যোগের চেহারাটা আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। কে যেন শঙ্খকে বলল, তুইও বোস, মাথাটা ন্যাড়া করে নে। তোরও তো কপাল ভাঙল।

ইঁটের ওপর বসে নাপিতের কাছে চুলভর্তি মাথাটা এগিয়ে দিতে দিতে চোখ ফেটে হু-হু করে জল নেমে এল শঙ্খর। সবাই বুঝতে পারছে, সেও যেন পিতৃহীন হল আজ। তার মাথার ওপর যে বটগাছ এতকাল আগলে রেখেছিল তাকে, সে আজ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে পড়েছে।

দিন পনের ইস্কুলে কামাই করার পর ইস্কুলে যেতে মাস্টারমশাইরা সবাই অবাক, ঠাকুর্দা মারা গেছেন, তাতে তুই ন্যাড়া হয়েছিস কেন!

শঙ্খ জবাব দিতে পারে না, কাউকে এ সব কথা বোঝাতে পারবে না সে। তার চোখ ফেটে শুধু জল বেরুতে চায় হু-হু করে।

সাগরদ' পৃথিবীর এমন এক শেষ প্রান্তে অবস্থিত যেখানে ডাকের চিঠি পৌঁছতেই দশ-পনেরদিন সময় লাগে। সংবাদ পেয়ে শঙ্খর বাবা একদিন এলেন ঈশ্বরীপুরে। এসে অবাক হয়ে দেখলেন, মাথা ন্যাড়া করে একমনে ঘাড় গুঁজে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে শঙ্খ।

বুঝতে পারলেন না। শঙ্খ ন্যাড়া হয়েছে কেন!

দুর্গাপুজোও যে এমন নিরানন্দ, বিষন্ন, বিবর্ণ হতে পারে তা শঙ্খর ধারণায় এই প্রথম। গতবছরও সারাটা পুজো সে হুল্লোড় করে বেড়িয়েছে। এবার প্রতিমা গড়ার শেষ দিনগুলো

সে একবারও দুর্গামণ্ডপের দিকে যেতে পারেনি। পুজোর চারদিন প্রায় ঘরে বসেই কাটিয়েছে। ঠাক্‌মার শাদা থান পরা চেহারাটার দিকে তাকাতেই পারে না আজকাল।

পল্টন এসেছিল, টুপুর এসেছিল, এমনকি উমনো-ঝুমনোও, এসে বলল, চ'না শঙ্খ, ঘরে বসে থেকে কী করবি। আয় ঠাকুর দেখবি।

শঙ্খর বুকটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। একটা বিশাল ছাউনি হঠাৎ ঝড়ে পড়ে যাওয়ার পর পৃথিবীটা যেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, ঠিক তেমনি। যেন কী ছিল কী নেই এমন একটা হা-হা শূন্যি। শুধু বিসর্জনের দিন পশ্চিমের বাঁশঝাড় থেকে লম্বা কঞ্চি কেটে এনে তা দিয়ে কলম বানালো। কচি কলাপাতা কেটে এনে তা দিয়ে পৃষ্ঠা। তারপর কলমের ছুঁচোলো ডগা আলতায় ডুবিয়ে কচি কলাপাতার উল্টোদিকে খুব যত্ন করে লিখল, ওঁ শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়। এরকম বারোবার। তারপর কলাপাতাটা মুড়ে গুঁজে রাখল টালির চালের বাতায়।

বিজয়ার রাতে প্রতিবছর এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে গুরুজনের পা পেলেই নিচু হয়ে পেন্নাম ঠোকার রেওয়াজ। তারপর পেট পুরে ঘুগনি, নারকেল-সন্দেশ, আঙুলে-গজা কিংবা মিহিদানা খাওয়া। দশ-পনের বাড়ি ঘুরলেই পেট ভরে জয়ঢাক। এবার শঙ্খ কুঁকড়ে রইল ঘরের ভেতর। বেরুতে ইচ্ছেই করল না।

এত ঝড়ঝাপ্টার মধ্যেও হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষাটা বেশ মন দিয়ে দিয়েছিল শঙ্খ। ভেবেছিল, রেজাল্ট বেরুলে ঠাকুর্দাকে তাক লাগিয়ে দেবে। কিন্তু পুজোর আগে রেজাল্ট বেরুল না। অ্যানুয়াল পরীক্ষা হবে সেই মার্চে, তাই হেডমাস্টারমশাই জানিয়ে দিলেন, হাফ-ইয়ার্লির ফল বেরুবে পুজোর ছুটির পর। ঠাকুর্দাকে অবাক করে দেওয়ার ফুরসতই পেল না।

পুজোর ঠিক সম-সম সময়ে ঈশ্বরীপুরে বেশ হিম পড়ে যায় প্রতিবছর। এ-বচ্ছর একটু বেশিই ঠাণ্ডা পড়ে গেল। ভোরের দিকে, সন্ধে পড়তে-না-পড়তে মনে হয়, সুতির চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলে ভালো হতো। গোটা পুজোর ছুটিটা শঙ্খর কাটল কেমন উদাসীন, অন্যমনস্কের মতো। রাসবিহারীবাবু বলেছিলেন, ধাক্কা খেতে খেতে মানুষ বড় হয়ে যায়। শঙ্খ এমন এক বিশাল ধাক্কা খেয়েছে যে তার মনে হল, কয়েকদিনের মধ্যে দ্রুত বড় হয়ে গিয়েছে। এখন মাথার ওপরে বটগাছ নেই, শুধু খাঁ খাঁ নীল আকাশ। এখন নিজেই তৈরি করে নিতে হবে মাথার ওপরের ছাউনি, নিরাপত্তা।

এমন একটা মন-খারাপ-করার দিনে ঈশ্বরীপুরে ফি-বছরের মতোই এসে হাজির হল স্বপ্নাদিরা। শঙ্খ তার ম্লান, বিষন্ন দিনগুলোর মধ্যে একটু বৈচিত্র পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। স্বপ্নাদিকে একবছর পরে দেখল সে। এর মধ্যে আরও একটু বড়ো হয়ে গেছে স্বপ্নাদি। আগের চেয়ে আরও একটু সুন্দরও হয়েছে। গায়ের রঙে একটু লালচে আভাও ছড়িয়েছে যেন। মুখের দু'পাশ দিয়ে যখন লম্বা চুলের রাশ ছড়িয়ে থাকে, তখন কী যে চমৎকার দেখায় তাকে, ঠিক সেই রূপকথার রাজকন্যার মতোই।

শঙ্খ ন্যাড়া হয়েছে দেখে স্বপ্নাদি প্রথমটা একটু থমকে গেল, আস্তে আস্তে বলল, তোর খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না শঙ্খ!

শঙ্খ কিছু বলতে পারল না। কষ্ট হয়েছে বলতে গেলে হয়তো কেঁদেই ফেলবে সে। শুধু হাসল ম্লানভাবে, বলল, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

স্বপ্নাদি একটু যেন গম্ভীর হল, সে তো অনেকদিন আগের চিঠি। ক্লাস সেভেনে ফার্স্ট হয়ে উঠেছিলি সেই খবর জানিয়ে। তারপর তোকে পর পর দু'খানা চিঠি দিয়েছি। প্রথম

চিঠিতে ফার্স্ট হওয়ার জন্য কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে, তারপরে আরও একটা। তার একটারও কিন্তু উত্তর দিসনি।

শঙ্খ ঘাড় নাড়ল, সে সত্যিই কোনও উত্তর দেয়নি। দেবে কী করে। স্বপ্নাদির প্রতি চিঠিতে শুধু অর্ঘদার কথা লেখা থাকত। অর্ঘদা যে আর ঈশ্বরীপুরে নেই, সে কথা জানাতে পারেনি স্বপ্নাদিকে। সব শুনে স্বপ্নাদি যে খুবই দুঃখ পাবে তা বুঝেই। স্বপ্নাদি তো জানে না, এই একবছরে কতখানি বদলে গেছে ঈশ্বরীপুর। একবছর আগের ঈশ্বরীপুর, আর একবছর পরের ঈশ্বরীপুরে ঢের ফারাক।

স্বপ্নাদি আবার বলল, বললি নে তো, কেন চিঠি দিসনি? আমাকে ভুলে গিয়েছিলি?

শঙ্খ ঘাড় নাড়ল, না, ভুলিনি। কত যে ঝড়ঝঞ্ঝাট গেল ক'মাস ধরে—

স্বপ্নাদি গলা নামাল এবার, তোর অর্ঘদাকে দেখছি নে এবাব এসে। পুজোব ছুটিতে বাড়ি গেছে? কাঁকিদহ?

শঙ্খ কী বলবে ভেবে পেলনা। হ্যাঁ বললে মিথ্যে বলা হয়। না বললে—

—তোমাকে আমি পরে সব বলব, স্বপ্নাদি।

—কী বলবি, স্বপ্নাদির ফর্সা চমৎকার মুখখানা হঠাৎ কালো হয়ে যায়।

সেদিন বিকেলেই স্বপ্নাদি শঙ্খকে টানতে টানতে নিয়ে গেল খেয়াঘাটের দিকে। খেয়াঘাটের পাশে, সেই কদমগাছটার নীচে যেখানে সে আর অর্ঘদা বসত পাশাপাশি পা ঝুলিয়ে। এই কদমগাছের ডালেই তো লাবনি-বৌ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছিল—

আজ কিন্তু শঙ্খর সে ভয় একটুও করছিল না। কতকাল হয়ে গেল কী এক অপরিসীম ত্রাসে সে কদমগাছের ধারে কাছে মাড়ায়নি। অথচ আজ সে স্বপ্নাদির পাশে নদীব পাড়ে বসে পড়ল বুকে অন্য এক ত্রাস নিয়ে। স্বপ্নাদির মুখোমুখি হওয়ার ত্রাস। এখন ইছামতীর সার ভাঁটা। নদীর চরে থিকথিক করছে পলিমাটি। শঙ্খদের পায়ের একটু নীচেই। শঙ্খ হঠাৎ কেঁপে উঠল যেন।

স্বপ্নাদি এতক্ষণ মুখ অন্ধকার করে ছিল। এবার ঈশ্বরীপুরে এসে নিশ্চয় অনুমান করেছে, কিছু একটা হয়েছে অর্ঘদার। কেউ আর অর্ঘদার নামও করছে না। কিন্তু কী যে ঠিক হয়েছে তা বুঝতে পারছে না। বোঝা সম্ভবও নয়। খানিকক্ষণ নদীর ওপারে ভেড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, কী হয়েছে বল্ তো, শঙ্খ।

শঙ্খর ভেতরটা তখন ভেঙে চুরে তছনছ হচ্ছে। অর্ঘদার জন্যে তার বুকের মধ্যে যে একটা জায়গা ছিল, তাতে একটা ভূঁইকাঁপ এসে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে সবকিছু। স্বপ্নাদির ভেতরেও অর্ঘদার জন্যে একটা বড় আসন পাতা রয়েছে, সেখানেও আজ এই মুহূর্তে একটা ভূঁইকাঁপ এসে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। সে ভূঁইকাঁপ আরও ভয়ঙ্কর। শঙ্খ তার তীব্রতার কথা আর ভাবতে পারছিল না।

শঙ্খর চোখ তখন ভেড়ির ওপারে চালাঘরটার দিকে। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ স্বপ্নাদি তার হাতখানা মুঠোয় ধরল, কী রে, বল? কী এমন ব্যাপার, যা বলাই যাচ্ছে না আমার কাছে!

শঙ্খ বলতে শুরু করল। একটু-একটু করে ঘটে যাওয়ার ঘটনাগুলো উজাড় করে দিতে লাগল স্বপ্নাদির কাছে। একটু করে বলছে, আর স্বপ্নাদির মুখের দিকে তাকাচ্ছে। স্বপ্নাদির সুন্দর মুখখানা কীভাবে আষাঢ়ের মেঘে ঘন হয়ে ভরে যাচ্ছে তা দেখছে শঙ্খ। সে ঘন মেঘ কীভাবে আকাশ কালো করে ছেয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কালা-পাহাড়ের মতো পৃথিবীতে প্রলয় তুলবে এমন

ভঙ্গিতে ধেয়ে আসছে সাঁ সাঁ শব্দ তুলে। সে এলোঝড় যেন ধরিত্রী টলিয়ে দেবে। সে বিপুল ঝড় একনাগাড় মাতামাতি করতে লাগল কতক্ষণ, কতক্ষণ ধরে। যেন চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকাচ্ছে গোটা বিশ্বভুবন, তারপর আকাশ ভেদ করে ঝাঁপিয়ে নেমে এল মুষলধারে বৃষ্টি। সে এমন বৃষ্টি যাতে বিশহাত দূরের মানুষ দেখা যায় না। বৃষ্টির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে পৃথিবীর পর পৃথিবী।

স্বপ্নাদি শুনছে, আর তার হাতের মুঠোয় ধরা শঙ্খর হাতখানা পিষ্ট হচ্ছে. যেন তার হৃদয় ঠিক যেমনটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে সেভাবেই ছিঁড়েখুড়ে ফেলতে চাইছে শঙ্খর হাত। তার দু'গাল বেয়ে হু হু করে নেমে আসছে জলধারা। সে অশ্রু টুপিয়ে নামছে চিবুক দিয়ে। তার বক্তিম ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠছে থরথর করে। এই একবছর ধরে তিলতিল কবে তার জমানো ভালোবাসা নিমেষে পিঁসে গুঁড়িয়ে গেল এই মুহূর্তে।

শঙ্খ তার কথা শেষ করে থম হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার বুকের ভেতর ফাঁকা জায়গাটা তখন উলট-পালট খাচ্ছে এক অপরিসীম কষ্টে। কিন্তু সে বুঝতে পারছে, তার কষ্ট আর স্বপ্নাদির কষ্ট একরকম নয়। স্বপ্নাদির কষ্ট অন্যরকম। অনেক গভীর, অনেক তীব্র, অনেক প্রবল।

ইছামতীর তীরে তখন বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নেমে এসেছে। এভাবেই একদিন অর্ঘদা তাব জীবনের গল্প বলতে বলতে সন্ধে নামিয়ে এনেছিল পৃথিবীতে। আজ সেই অর্ঘদারই গল্প বলতে বলতে আর একবার ইছামতীব বুকে সন্ধে নামিয়ে আনল শঙ্খ। শুধু সন্ধেই নয়, অনেকখানি হিমও নেমে এসেছে তাদেব শবীবে। হেমন্তের হিম। সে হিমে প্রবল কাঁপন ধরছে দুজনের শরীরে।

বহুক্ষণ পর স্বপ্নাদি বলল, ওর আর কোনও খবর পাসনি?

শঙ্খ ঘাড় নাড়ল, না।

আরও অনেকটা সময় থম্ হয়েথেকে স্বপ্নাদি বলল, একটা মানুষ এভাবে পৃথিবী থেকে শুধু-শুধু হারিয়ে যাবে?

শঙ্খ অন্ধকারের ভেতর চোখে একরাশ শূন্যতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। সে জানে না, কী ভাবে অর্ঘদাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, যদি না সে নিজেই কোনও দিন আবার ফিরে আসে। এই বিশাল পৃথিবীর কোনও কিছুই শঙ্খ চেনে না, জানে না। এত বড় ভূখণ্ডের কোন কোণে অন্য নামে অন্য পরিচয়ে একটা নতুন মানুষ হয়ে বেঁচে আছে অর্ঘদা, তা শঙ্খর চেনা জানার বাইরে।

স্বপ্নাদির গলা তখনও বুজে আসছে কান্নায়, কোনওক্রমে বলল, সে মানুষটারে আর কোনও দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, শঙ্খ?

শঙ্খর গলাও তখন উথলে আসছে কান্নায়। সে বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু ততখানি বড় নয় যাতে অর্ঘদাকে খুঁজে বার করতে পারে। ঠাকুর্দা একদিন তাকে বলেছিলেন, তুই স্বাধীনতার বয়সী বালক। তুই যত বড় হবি, দেশও বড় হয়ে উঠবে তত। সে এখন এগার পেরিয়ে বারোয় পড়েছে। তাকে আরও বড় হয়ে উঠতে হবে। অনেক, অনেক বড়। ক্রমে একটা শঙ্খচিল হয়ে সে উঠে যাবে অনেক উঁচুতে। তখন অর্ঘদার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। যে মানুষটা এক আকস্মিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এত বড় দেশটার সব চিনতে হবে একে-একে। এই বিশাল অচিন ভূখণ্ড কোণা-কোণা ঘুরবে। তন্ন তন্ন করে খুঁজবে অর্ঘদাকে। একটুকরো সবুজ বুকে বয়ে নিয়ে এসেছিল যে মানুষটা, তার

ভেতরে যে এত রক্তের দাগ লেগে ছিল, তা বুঝতেই পারেনি সে। স্বপ্নাদিও নয। ধুয়ে ফেলতে হবে সেই রক্ত। এ রক্তের আঁচড় যেন সেই র‍্যাড্‌ক্লিফ সাহেবের কলমের খোঁচা লেগেই—

শঙ্খ হঠাৎ ফিসফিস করে বলল, আমি খুঁজে বার করব স্বপ্নাদি। দেখো, একদিন ঠিক খুঁজে বার করব অর্ঘদাকে।

স্বপ্নাদির কান্না-জড়ানো গলায় থইথই করে উঠল একটু আলোর সঙ্কেত, সত্যি?

শঙ্খ তখনও বিড়বিড় করছে, অন্ধকারে চিকচিক করতে থাকা ইছামতীর তিরতির ঢেউএর দিকে তাকিয়ে, দেখো, একদিন ঠিক—